BANGLAR SAMAJ SANSKRITI O RAJNAITIK ETIHAS ABONG BANGLA SAHITYA

(Dasom Theke Astadosh Satabdi)

MA [Bengali]

First Semester

BNGL - 701C

Directorate of Distance Education

TRIPURA UNIVERSITY

Reviewers

Ujjal Kumar Majumder

Retired Professor, Calcutta University

Dr. Manjubhas Mitra

Ex-Professor, Presidency College

Authors

Manoranjan Naskar & Dr Kuntal Mitra

Copyright © Reserved, 2016

Books are developed, printed and published on behalf of **Directorate of Distance Education, Tripura University** by Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

All rights reserved. No part of this publication which is material, protected by this copyright notice may not be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form of by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the DDE, Tripura University & Publisher.

Information contained in this book has been published by VIKAS® Publishing House Pvt. Ltd. and has been obtained by its Authors from sources believed to be reliable and are correct to the best of their knowledge. However, the Publisher and its Authors shall in no event be liable for any errors, omissions or damages arising out of use of this information and specifically disclaim any implied warranties or merchantability or fitness for any particular use.

VIKAS®

Vikas® is the registered trademark of Vikas® Publishing House Pvt. Ltd.

VIKAS® PUBLISHING HOUSE PVT. LTD.
E-28, Sector-8, Noida - 201301 (UP)
Phone: 0120-4078900 • Fax: 0120-4078999
Regd. Office: 7361, Ravindra Mansion, Ram Nagar, New Delhi – 110 055
• Website: www.vikaspublishing.com • Email: helpline@vikaspublishing.com

সিলেবাস বই-ম্যাপিং টেবিল

বাংলার সমাজ সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ইতিহাস এবং বাংলা সাহিত্য (দশম থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী)

সিলেবাস	বই-ম্যাপিং
প্রথম একক - দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী প্রাচীন বাংলা - দেশকাল-ভাষা, বাংলা ভাষার বিবর্তন, বাংলা লিপি-প্রাচীন অধিবাসী, বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, বাংলার ভৌগলিক পরিসীমা : দশম - দ্বাদশ শতাব্দী, লক্ষ্মণ সেনের রাজসভার পঞ্চরত্ন, বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ, দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলা ব্রতীত অন্যভাষায় রচিত বাংলা সাহিত্যিক নিদর্শন, বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির প্রাককথা, দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলা ব্যাতীত অন্য ভাষায় রচিত, বাংলার সাহিত্যিক নিদর্শন, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ-অবহটঠ্‌, বাংলার রাজনৈতিক ঘটনাবলিঃ দশম - দ্বাদশ শতাব্দী, বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বাতাবরন : দশম - দ্বাদশ শতাব্দী, দশম-দ্বাদশ শতক : বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন চর্যারীতি, চর্যার কাব্যমূল্য, চর্যাগানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব	(পৃষ্ঠা ১-৯৬)
দ্বিতীয় একক - ত্রয়োদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দী ত্রয়োদশ শতকের বাংলা : বিদেশী আক্রমন : রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি ত্রয়োদশ শতকের বাংলা সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায় না কেন, চতুর্দশ শতকের বাংলা : রাজনৈতিক - সামাজিক পরিস্থিতি, চতুর্দশ শতকের বাংলার সাহিত্যিক নিদর্শন : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	(পৃষ্ঠা ৯৭ -১১৮)
তৃতীয় একক - পঞ্চদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী পঞ্চদশ শতক : বাংলার প্রধান রাজনৈতিক ঘটনাবলী, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাতাবরণ, পদাবলি সাহিত্য : বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস ভাগবত অনুবাদ : মালাধর বসু ও শ্রীকৃষ্ণবিজয়, রামায়ন অনুসারী সাহিত্য **লোকজীবনস্পর্শী সাহিত্য** কাব্যপরিচয়, অন্যান্য লোকাবত সাহিত্য, মঙ্গলকাব্যের স্বরূপ **মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের চৈতন্যচরিত ধারা** **বৈষ্ণব পদাবলী** **অনুবাদ সাহিত্যের ধারা**	(পৃষ্ঠা ১১৯ - ২৮৮)
চতুর্থ একক - সপ্তদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী **মঙ্গলকাব্যের ধারা** মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল **নতুন মঙলকাব্য ও শাক্তপদাবলী** **আরাকান রাজসভা**	(পৃষ্ঠা ২৮৯ -৩৭৫)

সূচীপত্র

প্রথম একক - দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী (পৃষ্ঠা ১-৯৬)

- উদ্দেশ্য
- প্রাচীন বাংলা - দেশকাল-ভাষা
- বাংলা লিপি - প্রাচীন অধিবাসী
- বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়
- বাংলার ভৌগলিক পরিসীমা : দশম - দ্বাদশ শতাব্দী
- লক্ষণ সেনের রাজসভার পঞ্চরত্ন
- বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ
- দশম - দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলা ব্রতীত অন্য ভাষায় রচিত বাংলা সাহিত্যিক নিদর্শন
- বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টির প্রাককথা
- দশম - দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলা ব্যতীত অন্য ভাষায় রচিত বাংলা সাহিত্যিক নিদর্শন সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ - অবহট্‌ঠ
- বাংলার রাজনৈতিক ঘটনাবলি : দশম - দ্বাদশ শতাব্দী
- বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বাতাবরন : দশম - দ্বাদশ শতাব্দী
- দশম - দ্বাদশ শতক : বালা সাহিত্যের নিদর্শন চর্যারিতি
  - পুথি আবিষ্কার ও পুথি পিচয়
  - কবি - পরিচয়
  - চর্যাগীতির নিহিত ধর্মীয় দর্শন ও তত্ত্ব
  - দেশ-কাল-সমাজ
- চর্যার কাব্যমূল্য
- চর্যাগানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

দ্বিতীয় একক - ত্রয়োদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দী (পৃষ্ঠা ৯৭-১১৮)

- উদ্দেশ্য
- ত্রয়োদশ শতকের বাংলা : বিদেশি আক্রমন : রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি
- ত্রয়োদশ শতকের বাংলা সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায় না কেন?
  - এই কাল পর্বকে অন্ধকার যুগ বলা কি সমীচীন?
- চতুর্দশ শতকের বাংলা : রাজনৈতিক - সামাজিক পরিস্থিতি
- চতুর্দশ শতকের বাংলার সাহিত্যিক নিদর্শন : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
  - পুঁথি আবিস্কার
  - পুঁথি পরিচয়
  - শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : কবি পরিচয়
  - শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : কোন্‌ রীতির রচনা?

টিপ্পনী

টিপ্পনী

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : পুরান ও লোকায়ত সংস্কৃতির মিশ্রণ

সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গুরুত্ব

- অনুশীলনী

তৃতীয় একক - পঞ্চদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী (পৃষ্ঠা ১১৯ - ২৮৮)

- উদ্দেশ্য
- পঞ্চদশ শতক : বাংলার প্রধান রাজনৈতিক ঘটনাবলি
- পঞ্চদশ শতক ; সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাতাবরন
- পদাবলি সাহিত্য : বিদ্যাপতি

  জীবনী

  রচনা

  বাংলা সাহিত্যে কেন গুরুত্বপূর্ন

  বিদ্যাপতি ও তার কবি প্রতিভার মূল্যায়ন।
- পদাবলী সাহিত্য : চন্ডীদাস

  চন্ডীদাস সমস্যা

  পদকর্তা চন্ডীদাস

  চন্ডীদাস ও তাঁর বিভিন্ন রসপর্যায়ের পদে কবি কৃতির মূল্যায়ন

  দীন চন্ডীদাস

  সহজিয়া চন্ডিদাস

  অন্যান্য কবি
- ভাগবত অনুবাদ : মালাধর বসু ও শ্রীকৃষ্ণবিজয়

  কবির জীবন

  সাহিত্য পরিচিতি ও কাব্যের অনুসারী সাহিত্য
- রামায়ন অনুসারী সাহিত্য

  কৃত্তিবাস : জীবন

  কাব্যপরিচয়

  সাহিত্য ও সমাজে এই অনুবাদের গুরুত্ব
- অনুশীলনী

লোকজীবনস্পর্শী সাহিত্য

- উদ্দেশ্য
- কাব্যপরিচয়
- অন্যান্য লোকায়ত সাহিত্য
- মঙ্গলকাব্যের স্বরূপ
- অনুশীলনী
- গ্রন্থপঞ্জী

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের চৈতন্যচরিত ধারা

বৈষ্ণব পদাবলী

অনুবাদ সাহিত্যের ধারা

চতুর্থ একক - সপ্তদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী (পৃষ্ঠা ২৮৯ -৩৭৫)

মঙ্গলকাব্যের ধারা

মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল

নতুন মঙ্গলকাব্য ও শাক্তপদাবলী

আরাকান রাজসভা

টিপ্পনী

মুখবন্ধ

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস জানা বাংলা সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয়। আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের বয়স আনুমানিক প্রায় এক হাজার পনেরো বছর। চর্যাগীতি থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বিশেষত একুশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যপর্ব পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের নান সংরূপ (Genre) - গত বৈচিত্র যেমন নির্মিত হয়েছে, তেমনি তার ফর্ম (Form) ও বিষয় (Content) নিয়েও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা বহু শাখায় প্লবিত হয়ে চলেছে।

টিপ্পনী

সুলতান হুসেন শাহের সিংহাসন লাভ থেকে শুরু করে পলাসীর প্রান্তরে সিরাজদ্দৌল্লার পতন ও ইংরেজ বণিকের মানদন্ড শাসকের রাজদন্ডে রূপান্তর ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের কালপর্বে এই ছিল বাংলার রাজনৈতিক চালচিত্র। দু'শ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাসকে সাম্রাজ্যের পতন - অভুৎদয়ের সঙ্গে যুক্ত করে শাসন পর্বের ক্রমবিভাগ করলে দেখা যাবে হুসেন শাহী বংশ, শের শাহ ও সুর বংশ, করবানী বংশ মুঘল শাসন ও বাংলার স্বাধীন নবাবের অধীনে থাকা কালীন অবস্থাতেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিস্তার লাভ ঘটেছে ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকে নীচে কালপর্ব অনুযায়ী শাসক বংশের তালিকা সূত্রাকারে লেখা হল :

(১) হুসেন শাহী বংশ (১৪৯৩ - ১৫৩৮)

(২) শের শাহ ও সুর বংশ (১৫৩৮ -১৫৬৪)

(৩) করবানি বংশ (১৫৬৪ -১৫৭৬)

(৪) আকবরের সময়ে মুঘল অভিযান ও মানসিংহের বাংলা শাসন (১৫৭৬ -১৬০৫)

(৫) মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গির (১৬০৫ -১৬২৭) শাহজাহান (১৬২৭ -১৬৫৮) ও ঔরংজেব (১৬৫৮ - ১৭০৭) এর শাসন পর্বে বাংলা।

(৬) বাংলার স্বাধীন নবাব - মুর্শিদকুলি (১৭০০ - ১৭২৭), মুজাউদ্দিন (১৭২৭ -১৭৪০), আলিবর্দী (১৭৪০- ১৭৫৬) ও সিরাজউদ্দৌল্লা (১৭৫৬ -১৭৫৭)

অত্যাচারী হাবসী খোজা শাসকদের হাত থেকে বাংলাকে উদ্ধার করে সুশাসন ফিরিয়ে আনেন হুসেন শাহ ও তাঁর পুত্র নুসরৎ শাহ। শ্রী চৈতন্যদেব (১৪৮৬ -১৫৩৩) কে কেন্দ্র করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারায় উজ্জীবিত বৈষ্ণব সাহিত্যের স্বর্নযুগ ও সূচিত হয় ষোড়শ শতকেই হুসেন শাহর অধীন নবদ্বীপের কোন এক কাজীর নাম সংকীর্তনে প্রাথমিক বাধাদান ছাড়া শাসক বর্গের কাছ থেকে ধর্ম-সংস্কৃতি বিকাশের পথে কোন বাধা তো আসেইনি বরং রূপ ও সনাতনের মত হুসেন শাহের দুই অমাত্য রাজ কার্য ত্যাগ করে বৈষ্ণবীয় গোস্বামীতে অভিষিক্ত হন। গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে কেন্দ্র করে চৈতন্যচরিত কাব্যরচনার সূত্রপাত ঘটে ষোড়শ শতকে এসে সংকলিত হতে থাকে বিভিন্ন সংকলন গ্রন্থে। বৈষ্ণব সাহিত্য ছাড়াও মঙ্গলকাব্য ও অনুবাদ সাহিত্য এই পর্বে বিকশিত হয়। নীচে ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য, নাথ সাহিত্য ও নতুন সাহিত্য ধারাকে সুত্রাকারে লিপিবদ্ধ করা হল :

টিপ্পনী

(১) মঙ্গলকাব্য (ক) মনসামঙ্গল : বিপ্রদাস পিপলাই, দ্বিজ বংশীদাস, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, তন্ত্রবিভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল, জীবনকৃষ্ণ মৈত্রেয়।

(খ) চন্ডীমঙ্গল : দ্বিজ মাধব, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, দ্বিজ রামদেব।

(গ) শিবায়ন : রামকৃষ্ণ রায়, রামেশ্বর ভট্টাচার্য।

(ঘ) কালিমঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর : দ্বিজ শ্রীধর, কৃষ্ণরাম দাস, রামপ্রসাদ সেন, বলরাম চক্রবর্তী

(ঙ) ধর্মঙ্গল : ময়ূরভট্ট, রূপরাম চক্রবর্তী, রামদাস আদক, সিতারাম দাস, যদুনাথ, ঘনরাম চক্রর্তী, মাণিকরাম গাঙ্গুলি।

(চ) অন্নদামঙ্গল : ভারতচন্দ্র রায়

(২) বৈষ্ণব সাহিত্য (ক) বৈষ্ণব পদাবলী : মুরারী গুপ্ত, নরহরি সরকার, শিবানন্দ সেন, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, রামনন্দ বসু, বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়, বলরাম দাস, জ্ঞানদাস, মাধবদাস, অনন্তদাস, বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, গোবিন্দদাস, শ্রীনিবাস, নরোত্তম ঠাকুর, শ্যামানন্দ, রায়শেখর , রায়বসন্ত, যদুনন্দন, কবিবল্লভ, ঘনশ্যাম দাস, চম্পতি, জগদানন্দ, প্রেমদাস, গোকুলচন্দ্, চন্দ্রশেখর-শশীশেখর, দৌলত কাজী, আলাওল, সৈয়দ মুর্তাজা, নসির মামুদ, আলীরাজা।

(খ) চৈতন্যচরিত কাব্য : বৃন্দাবন দাস, লোচনদাস, জয়ানন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, গোবিন্দ দাস, চূড়ামনিদাস, প্রেমদাস, আকিঞ্চন দাস, নরহরি চক্রবর্তী।

(গ) বৈষ্ণবপদ সংকলন : ক্ষণদাগীত চিন্তামণি, গিতচন্দ্রোদয়, গৌরচরতি চিন্তামনি, পদামৃতাসমুদ্র, পদকল্পতরু।

(৩) অনুবাদ সাহিত্য(ক) সংস্কৃত - রামায়ণ : অদ্ভুতাচার্য, চন্দ্রাবতী।

অনুবাদ - মহাভারত : কাশীরাম দাস।

ভাগবত : রঘুনাথ, মাধবাচার্য, দুঃখী শ্যামদাস।

(খ) ফারসী ও হিন্দী অনুবাদ : দৌলত কাজী, সৈয়দ আলাওল।

(৪) নাথসাহিত্য (ক) গোরক্ষনাথবৃত্ত : শ্যামদাস সেনের মীনচেতন

শেখ ফয়জুল্লাহর গোরক্ষবিজয়

ভীমসেন - এর গোর্খবিজয়

(খ) ময়নামতী গোপিচন্দ্র ঋত্ত : দুর্লভ মল্লিকের গোবিন্দচন্দ্রের গীত, ভবানী দাসের ময়নামতীর গান, আবদুল সুকুর মহম্মদের গোপীচাঁদে সন্ন্যাস

(৫) নতুনসাহিত্যধারা(ক) শাক্ত পদাবলী : রামপ্রসাদ সেন, কমলা কান্ত।

(খ) বাউলগান : লালন শাহ, দুদ্দু শাহ্, পাঞ্জু শাহ, কুবীর গোঁসাই, যাদুবিন্দু, গগন

হরকরা হাসন রাজা, লাল শশী, হাউড়ে গোঁসাই, আর্জান শাহ, জালালুদ্দিন।

(গ) গাথা সাহিত্য : গঙ্গা রামের মহারাষ্ট্রপুরাণ

(ঘ) ময়মনসিংহ - পূর্ববঙ্গ গিতিকা।

টিপ্পনী

ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের বাংলা সাহিত্যের এই বৃহদায়তনের মধ্য দিয়ে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটটি বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মসম্প্রদায়ের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্টি হয়েছিল বৈষ্ণব সাহিত্যের বিপুল ভান্ডার। পাশাপাশি মঙ্গলকাব্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন অসংখ্য সামন্তরাজা বা জমিদার। মঙ্গলকাব্যে কবিদের আত্মকথার মধ্যদিয়ে তৎকালীন বাংলা সমাজের একটা আদল পাওয়া যায়। শাসকের পরিবর্তন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যান্বেষী কবি সমাজের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অভিবাসন ছিল কবিজীবনের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, একদিকে দেবায়ন অন্যদিকে মানব জীবনের সংগ্রাম - এটাও ছিল সেকালের আর এক জীবনসত্য। মনসা ও চন্ডীমঙ্গল ষোড়শ শতকের পূর্বেই রচিত হয়েছিল, ধর্মমঙ্গ ও অন্যান্য মঙ্গল এই পর্বেই সৃজিত হয়। প্রাগার্য তথা লৌকিক দেবতার সংস্কৃতায়ণ বা হাতে ওঠার কাহিনীকে কেন্দ্র করে সামাজিক টানাপোড়ন অষ্টাদশ শতকেও মাণিকরাম গাঙ্গুলিকে ভাবিয়েছিল। একদিকে যেমন মুসলমান বৈষ্ণব কবি অথবা আরাকান রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতাপূর্ন দৌলত কাজী বা সৈয়দ আলাওলকে ফারসী - হিন্দী সাহিত্যের উপাদান নিয়ে সাম্প্রদায়িক চোখরাঙানিকে অস্বীকার করে সাহিত্য সৃজন করতে দেখা যায় তার বিপরীত প্রান্তে দেখা যায় লালন শাহের জেহাদ। মধ্যযুগের এই পর্বে একদিকে যেমন ছিল বৃহত্তর ধর্মসম্প্রদায় অথবা রাজসভা ও সামন্তরাজার পৃষ্ঠপোষকতার সাহিত্য রচনা অন্যদিকে ছিল লালন শাহী, কর্তাভজা প্রমুখ গৌণ ধর্ম সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে হিন্দু মুসলমানের সীমারেখা ভেদ করে নিম্নবর্গের অভুৎক্ষান। এই সামগ্রিক ইতিহাস বারে বারে, নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে মূল্যায়ন করার মধ্য দিয়েই বাংলা সাহিত্যে ইতিহাসের পরম্পরা প্রকমোন।

বর্তমানে এই এককে দশম থেক অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত প্রধান সাহিত্য ধারাকে যেমন ধরার চেষ্টা করেছি, পাশাপাশি এই সময় পর্বের ঐতিহাসিক চরিত্র নিয়েও ছাত্র-ছাত্রীদের একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করেছি। আমার এই উপাদান নির্মাণের ক্ষত্রে অগ্রজদের কাছ ধেকে বহু ভাবে ঋন নিয়েছি। তবু সর্বোপরি এই লেখা ছাত্র - ছাত্রীদের যদি কাজে লাগে তাহলে পরিশ্রমের মূল্য পাবো।

প্রথম একক

দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী

সূচনা

প্রাচীন বাংলা-দেশকাল-ভাষা

বাংলা ভাষার বিবর্তন

বাংলা লিপি - প্রাচীন অধিবাসী

বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

বাংলার ভৌগোলিক পরিসীমাঃ দশম-দ্বাদশ শতাব্দী

লক্ষ্মণ সেনের রাজসভার পঞ্চরত্ন

বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ

দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলা ব্রতীত অন্য ভাষায় রচিত বাংলা সাহিত্যিক নিদর্শন

বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির প্রাককথা

দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলা ব্যতীত অন্য ভাষায় রচিত বাংলার সাহিত্যিক নিদর্শন

সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ

বাংলার রাজনৈতিক ঘটনাবলিঃ দশম-দ্বাদশ শতাব্দী

বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বাতাবরণঃ দশম-দ্বাদশ শতাব্দী

দশম-দ্বাদশ শতকঃ বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন চর্যারীতি

- পুথি আবিষ্কার ও পুথি পরিচয়
- কবি-পরিচয়
- চর্যাগীতির নিহিত ধর্মীয় দর্শন ও তত্ত্ব
- গুরুম্নবাদ
- দেশ-কাল-সমাজ

চর্যার কাব্যমূল্য

চর্যাগানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

টিপ্পনী

সূচনা

যে কোনো ভাষায় সাহিত্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাষার সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ বাঞ্ছনীয়। ভাষা আগে - তার অব্যবহিত পরেই সাহিত্য। সাহিত্যিক বিশেষ কালখণ্ডে আবির্ভূত হন। তাঁর অভিজ্ঞতা, জীবন জিজ্ঞাসা - সব কিছুর উপরেই যুগের ছাপ থেকে যায়। সাহিত্যের উৎকর্ষ অবশ্য নির্ভর করে কালোত্তীর্ণতায়। তবু যুগের দাবি অস্বীকার করা যায় না। সাহিত্য সৃষ্টির বিবর্তনের ক্রমটি জানা প্রত্যেক পাঠকেরই কাম্য। সেটি জানা থাকলে তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যে সমালোচ্য বিষয়টির নির্দিষ্ট মানটিকে ছোঁয়া যায়। সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করতে হবে ইতিহাস-পাঠকের জিজ্ঞাসা নিয়ে। ইতিহাসকে কালানুক্রমিকভাবে অনুসরণ করা দরকার। বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব দশম শতাব্দীতে। বর্তমান এককটির উদ্দেশ্য আদিযুগের স্ফুটনোন্মুখ বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। কোনো জাতিকে জানতে হলে যেমন তার ইতিহাস জানতে হয়, উদ্ভব থেকে শুরু করে বিবর্তনের ধারায় নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে কেমন করে সেই জাতি বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে তা জানতে হয় - তেমনই কোনো ভাষার সাহিত্য জানতে গেলেও ঐ একই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। এই এককে দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের আলোচনা কালানুক্রমিকভাবে করা হবে। তবে তার আগে দশম-দ্বাদশ শতকের বাংলার ভৌগোলিক পরিসীমা, রাজনৈতিক ঘটনাবলি, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ধর্মীয় বাতাবরণ এবং উক্ত সময়ের মধ্যে রচিত অন্য ভাষার সাহিত্যিক নিদর্শন সম্পর্কে সংক্ষেপে দু-চার কথা বলা হবে। এগুলি না জানলে সাহিত্যের ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে সফল হবে না। সাহিত্যের সঙ্গে এগুলির যোগ ঘনিষ্ঠ।

টিপ্পনী

প্রাচীন যুগ

প্রাচীন বাংলা - দেশ কাল ভাষা

প্রায় ৮০,০০০ বর্গমাইল বিত নদীবিধৌত পলি দ্বারা গঠিত এক বিশাল সমভূমি এই বাংলা। এর পূর্বে ত্রিপুরা, গারো ও লুসাই পর্বতমালা; উত্তরে শিলং মালভূমি ও নেপাল তরাই অঞ্চল; পশ্চিমে রাজমহল ও ছোটনাগপুর পর্বতরাজির উচ্চভূমি এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এই বিস্তৃত সমভূমির দক্ষিণ দিক সাগরাভিমুখে ঢালু এবং গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার জলরাশি দ্বারা বয়ে আনা বিপুল পরিমাণ পলি সাগরে উৎসারিত হচ্ছে। সমুদ্রোপকূলবর্তী নিম্নভূমি জঙ্গলাকীর্ণ; এর পেছনেই প্রায় পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইল সমতলভূমি, যার গঠনে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা প্রবাহের অবদান রয়েছে।

আবদুল মমিন চৌধুরী : বাংলার ভৌগোলিক পরিচয় (আনিসুজ্জামান সম্পাদিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খন্ডর অন্তর্গত)

প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালে সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশ - আমাদের এই বঙ্গভূমি। এই দেশ জল জঙ্গলে পূর্ণ, আদ্রতায় সিক্ত। হিমালয় দাঁড়িয়ে আছে শীর্ষভূমিতে। বঙ্গোপসাগরের জলে ঢেউ খেলে যার চরণতলে। আর নদী নালা খাল বিলে পূর্ণ ছিল এই দেশ - তাই নাম হয়েছে গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি। এক সংহত নৃগোষ্ঠী এখানে বিদ্যমান ছিল। বিভিন্ন কারণে অন্যান্য প্রায়েংক্ষার লোক বা আক্রমণকারীরা ঢুকতে পারেনি এই দেশে। তাই বাংলা ছিল

স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। এই স্বাতন্ত্র্যই তাকে অপরের কাছে বিরূপ করেছে। হয়ত এখানকার মানুষদের চিযংক্মায়-ভাবনায় তেমন কোনো সমুন্নত মহিমা ছিল না। প্রত্যপশালী আভিজাত্য গর্বিত আর্যরা মনে করত বাংলা ছিল অনার্যদের দেশ। 'দেশোহনার্যনিবাসঃ'। বোধায়ন ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে যে বঙ্গ প্রভৃতি দেশে বাস করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। নির্বাসিত পান্ডবরাও এই ব্রাত্য দেশে আসতে চাননি। তাই এটা ছিল পান্ডববর্জিত দেশ। বাংলা ভাষাও উন্নত ছিল না, বাণভট্ট বলেছেন 'গৌড়েষু অক্ষরডম্বর'।

ক্রমে বাংলার মর্যাদা প্রতিপন্ন হল। বিভিন্ন শাস্ত্রে ধর্মগ্রন্থে রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থে গৌড়বঙ্গ সম্মানের আসন লাভ করল। অবহেলা অবজ্ঞার ধূলিমালিন্য অতিক্রম করে বঙ্গভূমি আপন মহিমায় অধিষ্ঠিত হল। কালে কালে বাংলার সীমানা অনেক প্রসারিত হয় এবং তা ভৌগোলিক পরিসরের সঙ্গে ভাষা-সাহিত্যের সমন্বয়ে দূর বিস্তৃত হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গেই প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. নীহাররঞ্জন রায় জানিয়েছেন যে - 'উত্তরে হিমালয় এবং হিমালয় হইতে নেপাল, সিকিম ও ভোটান রাজ্য; উত্তর-পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্রনদ-উপত্যকা; উত্তর-পশ্চিমদিকে দ্বারবঙ্গ পর্যযংক্ষ ভাগীরথীর উত্তর সমা রালবর্তী সমভূমি; পূর্বদিকে গারো-খাসিয়া-জৈন্তিয়া-চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণী বাহিয়া দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত, পশ্চিমে রাজমহল-সাঁওতাল পরগণা-ছোটনাগপুর-মানভূম-কেওঞ্জর-ময়ূরভঞ্জের শৈলময় অরণ্যময় মালভূমি, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর - এই ভূখন্ডই ঐতিহাসিক কালের বাঙালীর কর্মকৃতির উৎস এবং ধর্ম-কর্ম-নর্মভূমি' (বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব)।

বাংলার যথার্থ ইতিহাস রচিত হয় গুপ্ত যুগ থেকে। এই সময়ে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে বাংলার সভ্যতা-সংস্কৃতি বিশেষভাবে গড়ে ওঠে। হূণ আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত নড়ে যায়। বিভিন্ন রাজ্য ঘোষণা করে স্বাধীনতা। গৌড় এমনই এক রাজ্য। রাজা শশাঙ্কর নেতৃত্বে স্বাধীন গৌড়রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে। শশাঙ্ক ছিলেন কোনো গুপ্ত রাজার সাম। তিনি 'শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক' রূপে উল্লেখিত হয়েছেন। তিনি ছিলেন শক্তিশালী রাজা। তিনি ছিলেন গৌড়াধিপৎ। কর্ণসুবর্ণ ছিল তাঁর রাজধানী। তিনি বাংলাকে ঐতিহাসিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। গৌড়কে কেন্দ্র করে তিনি এক বিরাট রাজ্য গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর (৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দ) পর বাংলায় শুরু হয় বিশৃঙ্খলা অরাজকতা। প্রায় একশ বছর ধরে চলে এই নৈরাজ্য। দেশে কোনো নীতি নিয়ম নেই, চলছে মাৎসন্যায় - সবাই রাজা হতে চায়, আবার আজ যে রাজা পরদিনই সে নিহত হচ্ছে।

তখন দেশের মানুষরা সমবেতভাবে এক ধীর, বিচক্ষণ যোদ্ধাকে বাংলার রাজারূপে নির্বাচন করলেন। তার নাম গোপালদেব। গোপালদেব সবাইকে নিয়ে কুচক্রী দুষ্কৃতিদের দমন করে, দুর্নীতিপরায়ণ জমিদারদের শাসন করে এক ঐক্যবদ্ধ সুনিয়ন্ত্রিত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। প্রতিষ্ঠিত হল পালবংশের শাসন। তার মৃত্যুর পর রাজা হন ধর্মপাল, তারপর দেবপাল। পালবংশ প্রায় চারশ বছর রাজত্ব করে ১১৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

পালবংশের পতনের পর বাংলার সিংহাসনে বসলেন সেনবংশের রাজারা যারা সুদূর কর্ণাটক থেকে এসেছিলেন। এই বংশের বিজয়সেন গৌড়ের সেনরাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পুত্র বল্লাল সেন প্রায় কুড়ি বছর রাজত্ব করার পর রাজা হন, লক্ষ্মণসেন ১১৭৮ খ্রিষ্টাব্দে। সেন বংশের রাজত্বকালে বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রসার ঘটে। লক্ষ্মণসেনও ছিলেন অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী রাজা। তাঁর রাজসভাকে অলংকৃত করেছিলেন বিশিষ্ট জনেরা - যেমন, হলায়ুধ মিশ্র উমাপতিধর গোবর্ধন আচার্য জয়দেব শরণ ধোয়ী প্রমুখ। তবে সম্ভবত তাঁর সময়ে ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের মানুষ জমিদার বা অর্থবান ব্যক্তিরা যতটা গু রুত্ব পেতেন সাধারণ মানুষরা সেরকমই ছিলেন অবহেলিত ব্রাত্য। তাই ইফতিকার

টিপ্পনী

উদ্দিন-বিন-বখতিয়ার খিলজী মাত্র কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে লক্ষ্মণসেনের রাজধানী নবদ্বীপ আক্রমণ করলে বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেন কোনো প্রতিরোধ করতে পারেননি এবং সপরিবারে পূর্ববঙ্গে পলায়ন করেন ও সেখানে তিনি রাজত্ব করেন কয়েক বছর। ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রয়াত হন।

১২০২ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী আক্রমণ সংঘটিত হয়। তা বাংলার ইতিহাসে আমুল পরিবর্তন আনে। দেশের প্রচলিত জীবন সমাজব্যবস্থা সংস্কৃতি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। গড়ে ওঠে নতুন সভ্যতা, প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলমান শাসন। তুর্কী আক্রমণের ভয়াবহতা অতিক্রম করে বদান্য শাসকদের প্রয়াসে বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি নতুন করে জেগে ওঠে নতুন প্রত্যয় নতুন ভাবনায়।

টিপ্পনী

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকেই বাংলায় সংস্কৃতের চর্চা ছিল। সংস্কৃতে সাহিত্য ব্যাকরণ স্মৃতিপুরাণ ধর্মগ্রন্থ ইত্যাদি রচিত হয় তখন থেকেই। ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার', বিশাখাদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস', ক্ষেমীশ্বরের 'চন্ডকৌশিক' প্রভৃতি নাটক এই সময়েই রচিত হয়। অনুমান করা হয় যে এই লেখকরা ছিলেন বাঙালী এবং গ্রন্থগুলি সংস্কৃতেই লেখা। অভিনন্দ ও সন্ধ্যাকর নন্দী দুই কবির একই নামের দুটি কাব্য 'রামচরিত' অবশ্যই বাঙালীর লেখা। সন্ধ্যাকর নন্দীর কাব্যটি এই কারণে বিশেষ উল্লেখ্য যে চারটি পরিচ্ছেদেসমাপ্ত এই কাব্যটি দ্ব্যর্থকভাবে তিনি রচনা করেছেন যার এক অর্থ রামায়ণের রামচন্দ্রের কাহিনী, অন্য অর্থ তখন পাল রাজা রামপাল ও তার পুত্র মদনপালের কথা। সাহিত্য ব্যতীত সংস্কৃতে অন্যান্য গ্রন্থও রচিত হয় গুপ্ত, পাল ও সেন যুগে। যেমন শ্রীধরের 'ন্যায়কন্দলী', গৌড়পাদের 'আগমশাস্ত্র', ভবদেবের 'ব্যবহারতিলক', 'প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ', জীমূতবাহনের 'দায়ভাগ', হলায়ুধের 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব', চন্দ্রগোমীর 'ব্যাকরণ', বন্দ্যঘাটীয় সর্বানন্দর 'টীকাসর্বস্ব', পালকপ্যের 'হস্ত্যায়ুর্বেদ', মাধবের 'রম্নগবিনিশ্চয়', চক্রপাণি দত্ত-র 'চিকিৎসাসারসংগ্রহ' ইত্যাদি ধর্ম দর্শন চিকিৎসা বিষয়ক অজস্র গ্রন্থ।

লক্ষ্মণসেন ছিলেন শিল্পসংসকৃতির বড় পৃষ্ঠপোষক। সে যুগের কবি পন্ডিত রাষ্ট্রবিদরা তাঁর সভা অলংকৃত করেছিলেন। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ', ধোয়ীর 'পবনদূত', গোবর্ধন আচার্যর 'আর্যাসপ্তশতী' বাঙালী রচিত সংস্কৃত কাব্যের উজ্জ্বল নিদর্শন।

প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ বেশ কিছু রচনা সংকলন আছে যাতে বাঙালী কবির লেখা ও বাংলার পটভূমিকায় রচিত বেশ কিছু কবিতা আছে। প্রাকৃত ভাষায় লেখা 'প্রাকৃত-পৈঙ্গল' বিশেষ উল্লেখ্য রচনা সংকলন। প্রাকৃত-পৈঙ্গলের কিছু কবিতা উল্লেখ্য যাতে বাঙালী জীবনের ছাপ আছে। কয়েকটি কবিতা স্মরণীয়-

সো মহ কান্তা
দূর দিগন্তা।
পাউস আএ
চেলু দুলাএ।।

-সেই আমার কান্ত এখন দূর দিগন্তে। বর্ষা আসছে, আঁচল -সেই আমার কান্ত এখন দূর দিগন্তে। বর্ষা আসছে, আঁচল দোলাব।

একটি কবিতায় খাবার তালিকা দেওয়া হয়েছে যা বাঙালীর রসনাতৃপ্তির উপযোগী -

ওগগর ভত্তা
রম্ভঅ পত্তা।
গায়িকা ঘিত্তা

দুদ্ধ সজুত্তা।
মোইনি মচ্ছা
নালিচ গচ্ছা।
দিজ্জিই কন্তা।
খাই পুণবন্তা।।

-ওগরা ভাত, রম্ভার (কলাগাছের) পাত, গাওয়া ঘি, সাজা দুগ্ধ অর্থাৎ দই, ময়না মাছ, নালিতা (পাট) শাক। কান্তা রেঁধে দেয়। পুণ্যবান খায়।

প্রেমের কথা, কৃষ্ণর নৌকাবিলাসের কথা কয়েকটি কবিতায় আছে। 'প্রাকৃত-পৈঙ্গল' বাংলা বৈষ্ণবকাব্য বা মঙ্গলকাব্য ইত্যাদিকে প্রভাবিত করেছিল।

টিপ্পনী

বাংলা ভাষার বিবর্তন

ভাষার আশ্চর্য রহস্য চিন্তা করে বিস্মিত হই। আজ যে বাংলা ভাষা বহুলক্ষ মানুষের মন-চলাচলের হাজার হাজার রাস্তায় গলিতে আলো ফেলে সহজ করেছে পরস্পরের প্রতি মুহূর্তের বোঝাপড়া, আলাপ-পরিচয়, এর দীপ্তির পত্ররেখা অনুসরণ করে চললে কালের কোন্ দুরদুর্গম দিগন্তে গিয়ে পৌঁছব। তারা কোন্ যাযাবর মানুষ, যারা অজানা অভিজ্ঞতার তীর্থযাত্রায় দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ের পথিক ছিল, যারা এই ভাষার প্রথম কম্পমান অস্পষ্ট শিখার প্রদীপ হাতে নিয়ে বেরিয়েছিল অখ্যাত জন্মভূমি থেকে সুদীর্ঘ বন্ধুর বাধাজটিল পথে। সেই আদিম দীপালোক এক যুগের থেকে আর এক যুগের বাতির মুখে জ্বলতে জ্বলতে আজ আমার এই কলমের আগায় আত্মীয়তার পরিচয় নিয়ে এল।

ইতিহাসের যে বিপুল পরিবর্তনের শাখা-প্রশাখার মধ্য দিয়ে আদিযাত্রীরা চলে এসেছে তারই প্রভাবে সেই শ্বেতকায় পিঙ্গলকেশ বিপুলশক্তি আরণ্যকদের সঙ্গে এই শ্যামলবর্ণ ক্ষীণ আয়ু শহরবাসী ইংরেজ রাজত্বের প্রজার সাদৃশ্য ধূসর হয়েছে কালের ধূলিক্ষেপে। কেবল মিল চলে এসেছে একটি নিরবচ্ছিন্ন ভাষার প্রাচীন সূত্রে। সে ভাষায় মাঝে মাঝে নতুন সূত্রের জোড় লেগেছে, কোথাও কোথাও ছিন্ন হয়ে তাতে বেঁধেছে পরবর্তী কালের গ্রন্থি, কোথাও কোথাও অনার্য হাতের ব্যবহারে তার সাদা রঙ মলিন হয়েছে কিন্তু তার ধারায় ছেদ পড়েনি। এই ভাষা আজও আপন অঙ্গুলি নির্দেশ করছে বহুদূর পশ্চিমের সেই এক আদি জন্মভূমির দিকে যার নিশ্চিত ঠিকানা কেউ জানে না।

রবীন্দ্রনাথ : বাংলাভাষা পরিচয়

সাহিত্যিক বাংলা ভাষার বয়সসীমা মাত্র হাজার বছর পূর্ণ করলেও ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে বাংলা ভাষা পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষাগোষ্ঠীর উত্তরাধিকার অর্জন করেছে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাই সম্ভবত পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা রূপে পরিগণিত। সেখান থেকে উদ্ভূত হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা। এই ভাষাগোষ্ঠীর এক শাখা ইন্দো-ইরাণীয় নামে ভারতবর্ষে আসে, তার থেকে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার উদ্ভব হয়। সেখান থেকে জাত হয় সংস্কৃত যাকে বৈদিক সংস্কৃত ও কথ্য সংস্কৃত ভাষারূপে বিভক্ত করা যায়। সেই কথ্য প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা কালক্রমে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার পথ ধরে মাগধী-প্রাকৃত-অপভ্রংশ হয়ে নব্য ভারতীয় আর্যভাষার মধ্য দিয়ে বাংলাভাষার রূপ নেয়। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে বাংলা ভাষা পর্যন্ত বিবর্তনের এক সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র আঁকা যায় -

টিপ্পনী

ইন্দো-ইউরোপীয় (ওহফড়-উঁৎড়ঢ়বধহ)

১. কেলটিক (Celtic) ২. ইটালিক (Italic) ৩. জার্মানিক (Germanic) বা টিউটনিক (Teutonic) ৪. গ্রীক (greek) ৫. বালটো-স্লাবিক (Balto Slavic) ৬. আলবাণীয় (Albania) ৭. আর্মেণীয় (Armenian) ৮. তোখারিয় (Tokharian) ৯. ইন্দো-ইরাণীয় (Indo-Iranian) বা আর্য (Aryan)

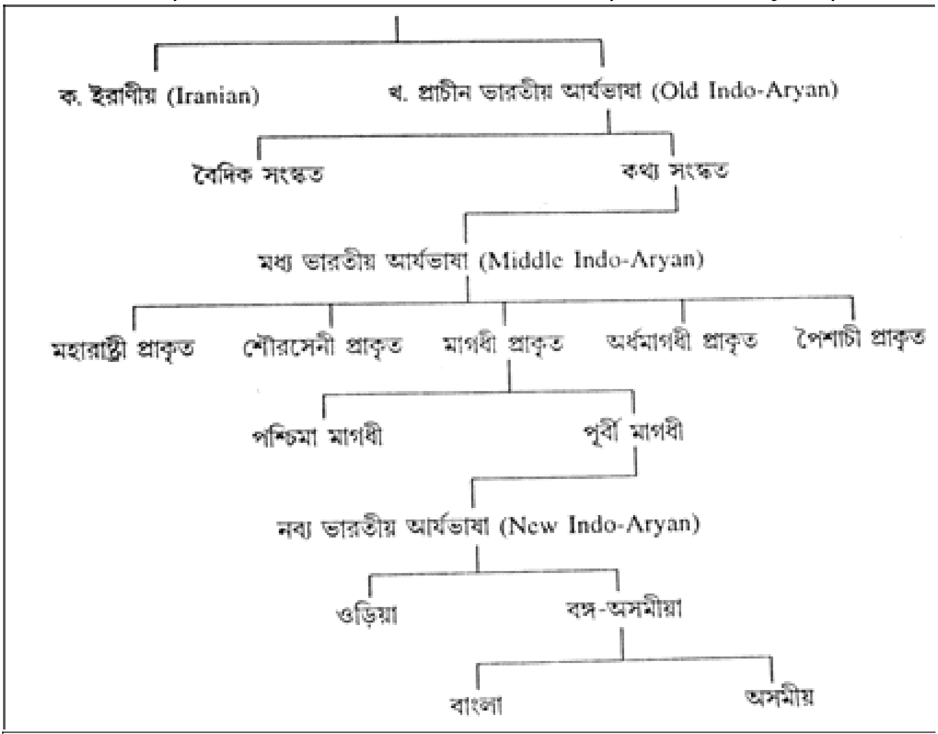

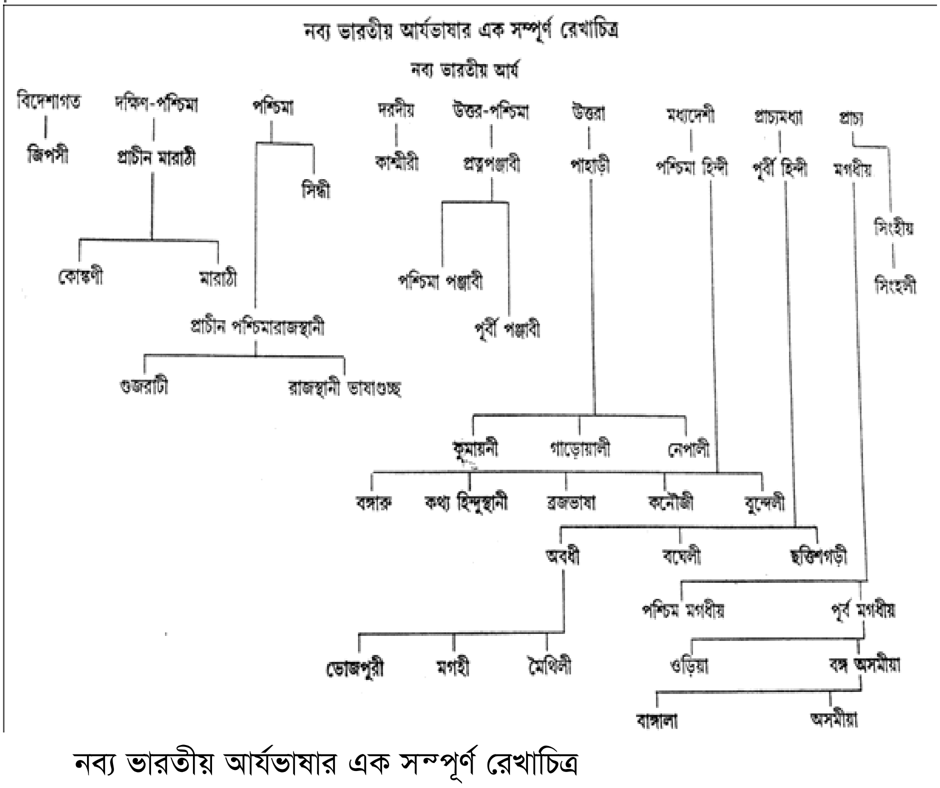

নব্য ভারতীয় আর্যভাষার এক সম্পূর্ণ রেখাচিত্র

বাংলা লিপি

প্রসঙ্গত বাংলা লিপির উৎস ও বিবর্তনের কথা বলা যেতে পারে। ভারতবর্ষে যত লিপি প্রচলিত আছে সেসব লিপি অক্ষরের উৎস বা আদিপ্রকাশ হল ব্রাহ্মী লিপি। ব্রাহ্মী লিপি কোনো গ্রন্থগত প্রকাশ হয়ত নেই। পর্বতগাত্রে যে সব অনুশাসন সম্রাট অশোক উৎকীর্ণ করে রেখেছিলেন তাতেই ব্রাহ্মী অক্ষরের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায়। এই ব্রাহ্মী লিপি ভারতবর্ষেই জাত হয়েছে। 'ব্রাহ্মী লিপির বিবর্তনগত আকার দেখলে বোঝা যায়, ভারতের তাবৎ লিপির মূল রহস্য ব্রাহ্মী লিপিতেই নিহিত আছে।' (ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। অষ্টম শতাব্দীতে ব্রাহ্মী অক্ষর তিনটি রূপে পরিবর্তিত হয় - পশ্চিমা লিপি, মধ্য ভারতীয় লিপি এবং পূর্বী লিপি। বলা যায় ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রচলিত ব্রাহ্মীলিপি থেকে পূর্ব ভারতের সব লিপির আবির্ভাব ঘটেছে। নবম শতাব্দী থেকে বাংলা অক্ষর নিজস্ব রূপ পেতে প্রয়াসী হয় এবং ক্রমে তা পূর্ণতা পায়।

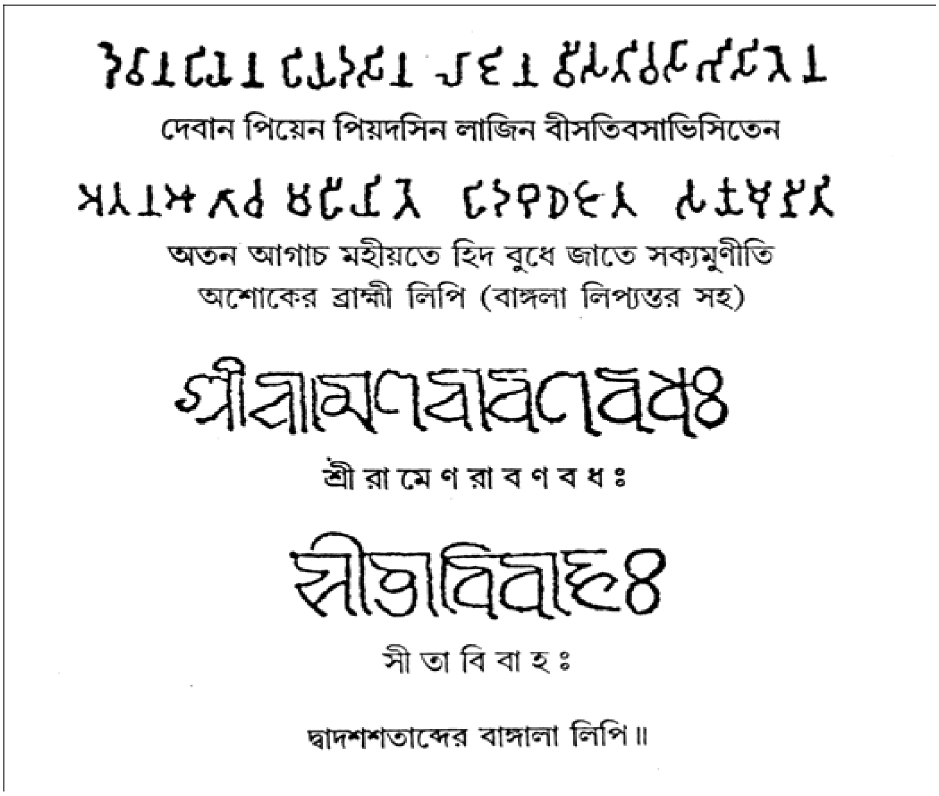

অশোকের ব্রাহ্মী লিপি (বাঙ্গলা লিপ্যন্তর সহ)

দ্বাদশশতাব্দের বাঙ্গালা লিপি॥

প্রাচীন অধিবাসী

আর্যদের আগমনের আগে বাংলায় ও ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতির মানুষরা বসবাস করত এবং তাদের নিজস্ব সভ্যতাও ছিল। এদের মূল বসবাসকারী বা অধিবাসীরূপে অভিহিত করা হয়। কোল, ভীল, সাঁওতাল, মুন্ডা, লোধা, শবর, ওঁরাও প্রভৃতি জাতির মানুষদের আবাস ছিল বঙ্গভূমি এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক অঞ্চলে। ভারতের আদিবাসীদের প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ১. নিগ্রোবটু বা নিগ্রোটা-রা (ঘবমৎড়রঃড়) এদেশের প্রথম ও প্রাচীনতম অধিবাসী। এরা খর্বকায়, কৃষ্ণবর্ণ, কালো ও কোঁকড়ানো চুল সমন্বিত; এদের ঠোঁট পুরু, মাথা লম্বা গোল ও চওড়া। ২. প্রোটো-অস্ট্রোলীয় (চৎড়ঃড়-

টিপ্পনী

অংঃৎধষড়রফ) শ্রেণীর লোকেরা মধ্যমাকৃতির, চ্যাপ্টা নাক, চুল ঢেউ খেলানো। ওঁরাও, মুন্ডা, সাঁওতাল, কোল, ভীল, লোধা, শবর প্রমুখ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ৩. মঙ্গোলীয় (গড়হমড়ষড়রফ) শ্রেণীর লোকেদের মাঝারি আকৃতি, হলুদবর্ণ, দাড়ি–গোঁফ প্রভৃতি অভাব ইত্যাদি। লেপচা, টোটো, রাভা, চাকমা, মগ প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রোটো-অস্ট্রেলীয় শ্রেণীর সঙ্গে বাংলার আদি অধিবাসীদের সম্পর্ক বেশি বলে মনে করা হয় এবং এই গোষ্ঠীর ভাষা 'অস্ট্রিক'ই বাংলা ভাষার ভিত্তি স্থাপন করে। বাংলা ভাষায় 'অস্ট্রিক' বহুল শব্দ আছে। চর্যাপদের সমাজ ও জীবন তো এই আদিবাসী মানুষদের চিত্র।

টিপ্পনী

তারপর বাংলায় বহু জাতির পদার্পণ ঘটেছে। আর্য থেকে শক হূণদল পাঠান মোগল সবাই এসেছে। এসেছে ইংরেজ। সবাইকে বাংলা গ্রহণ করেছে, তার দেহে মনে সত্তায় সবাই লীন হয়ে গেছে। গড়ে উঠেছে এক নতুন সভ্যতা যা সারা বিশ্বে সমাদৃত। ড. আম্বেদকর এক জায়গায় বলেছিলেন যে, 'রক্তের মিশ্রণ না ঘটলে ঐক্যবোধ বা প্রাণের টান সৃষ্টি হয় না।' এই রক্তের মিশ্রণ বা প্রাণের সংযোগ বাংলা ভাষা সাহিত্য সাংস্কৃতিক পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ সৃজনরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

প্রাচীন যুগের কবিদের পরিচয় দেওয়া হল।

বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় অতি জটিল। তাছাড়াও এ বিষয়ে আজো পূর্ণাঙ্গ গবেষণা হয়নি। কাজেই নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়। তবু বলা চলে এদেশে রক্ত সাঙ্কর্য একটু বেশি পরিমাণেই হয়েছে। তাই নৃতাত্ত্বিক গবেষণায়ও হয়তো নির্ভুল তথ্য মেলা ভার। আনুমানিক তেরো শতকে সংকলিত বৃহদ্ধর্ম পুরাণে বাঙালীকে বর্ণভেদে ছত্রিশ জাতে ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু এ বিভাজন নৃতাত্ত্বিক নয় - বৃত্তিসংপৃক্ত সমাজভিত্তিক। এছাড়া আধুনিক কালে রিজলি, রমা প্রসাদ চন্দ, বিরজা শঙ্কর গুহ প্রমুখ অনেকেই বাঙালীর আঙ্গিক বিচার করেছেন ও করছেন। মাথা-কপাল-নাক-ঠোঁট কিংবা চোখ-চুল-চামড়া এ পরীক্ষার অবলম্বন। কিন্তু প্রায় তিন হাজার বছরের সাঙ্কর্য কারন্নর কোন লক্ষণই অবিকৃত রাখেনি। তাই সমস্যা রয়েই গেছে। মোটামুটিভাবে বলা চলে নেগ্রিটো, আদি-অস্ট্রেলীয় (ভেড্ডিড) ও মোঙ্গলীয় নরগোষ্ঠীরই মিশ্রণ ঘটেছে বেশি। তাই শতকরা ষাট ভাগ অস্ট্রেলীয়, বিশ ভাগ মোঙ্গলীয়, পনেরো ভাগ নেগ্রিটো এবং পাঁচ ভাগ অন্য নানা নরগোষ্ঠীর রক্ত মিশেছে বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়। নিষাদ, কোল, ভিল, মুন্ডা, সাঁওতাল, শবর, পুলিন্দ, মালপাহাড়ী প্রভৃতি হচ্ছে অপেক্ষাকৃত স্বল্প সঙ্কর আদি অস্ট্রেলীয় বা ভেড্ডিড। আর কিরাত, রাজবংশী, নাগা, কোচ মেচ, মিজো, কুকী, চাকমা, আরাকানী প্রভৃতি হচ্ছে স্বল্প সঙ্কর মোঙ্গলীয়। তাছাড়া কাল প্রবাহে কত কত গৌড়, মালব, চৌড়, খশ, হূণ, কুলিক, কর্ণাট, লাট, (মনহলিপট্রোলী - মদন পাল দেব) দ্রাবিড়, মুরন্ডা, শক, কুষাণ, ইউচি, আরব, ইরানী, হাবসী, গ্রীক, তুর্কী, আফগান, মুঘল, পর্তুগীজ ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজ-রক্ত মিশ্রিত তো হয়েইছে। তবে তা পরিমাণে বেশি নয়। পুন্ড্র, রাঢ়া, বঙ্গা, সুহ্মা নামের অস্ট্রিক গোত্রগুলোই ছিল ভৌগোলিক বাংলাদেশে প্রধান। অপ্রধানের মধ্যে কোল, শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চন্ডালেরা ছিল নিজিত। পশ্চিমবঙ্গে পান্ডুরাজার ঢিবি উৎখননের ফলে আবিষ্কৃত নানা সামগ্রী দৃষ্টে মনে হয় জৈন ও বৌদ্ধদের সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বেও এদেশে উন্নয়নশীল গোত্র ও বিকাশমান সংস্কৃতি ছিল। এই রক্ত-সঙ্কর মানুষের স্বভাব-চরিত্র হয়েছে অনন্য।

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের ধারনায় প্রাচীন বাঙালীর চরিত্র এইরূপ :

"শাস্ত্রচর্চা ও জ্ঞানচর্চায় বুদ্ধি ও যুক্তি অপেক্ষা প্রাণধর্ম ও হৃদয়াবেগের প্রাধান্য ... আবর্তন ও বিপ-ব, দুঃসাহসী সমন্বয়, সাঙ্গীকরণ ও সমীকরণ যেন বাঙালীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সনাতনত্বের প্রতি একটা বিরাগ যেন বাঙলার ঐতিহ্য ধারায়, বাঙালীর বৃত্তি যথার্থত বৈতসী। যে আদর্শ, যে ভাব-স্রোতের আলোড়ন, ঘটনার যে তরঙ্গ যখন আসিয়া লাগিয়াছে, বাঙলাদেশ তখন বেতস লতার মত নুইয়া পড়িয়া অনিবার্য বোধে তাহাকে মানিয়া লইয়াছে এবং ক্রমে নিজের মত করিয়া তাহাকে গড়িয়া লইয়া নিজের ভাব ও রূপদেহের মধ্যে তাহাকে সমন্বিত ও সমীকৃত করিয়া লইয়া আবার বেতস লতার মতই সোজা হইয়া স্ব-রূপে দাঁড়াইয়াছে। যে দুর্মর অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি বেতস গাছের, সেই দুর্মর প্রাণশক্তি বাঙালীকে বার বার বাঁচাইয়াছে।"

বাঙালীর জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ইসলামের গ্রহণের এবং গ্রহণ করেও আন্তরিক ভাবে বরণ না করার রহস্য এবং জৈব-জীবনের তাগিদে তাকে প্রয়োজন মতো রূপ দেবার তত্ত্ব এখানেই নিহিত। বিভিন্ন বৌদ্ধ যান, যোগ, দেহতত্ত্ব, কায়া সাধন ও পার্থিব জীবনের মিত্র ও অরি দেবতার পূজা প্রবণতার কারণ এ-এ। ডক্টর রায় তাই বলেন:

"প্রাচীন বাঙালীর হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়লুতার ইঙ্গিত তাহার প্রতিমা শিল্পে ও দেব-দেবীর রূপ-কল্পনায় ধরা পড়িয়াছে।... সিদ্ধারা বলতেন বিরাগাপেক্ষা পাপ আর কিছু নাই, সুখ অপেক্ষা পুণ্য নাই। ... অরূপের ধ্যান এবং বিশুষ্ক জ্ঞানময় অধ্যাত্ম সাধনার স্থান বাঙালী চিত্তে স্বল্প এবং শিথিল। বাঙালীর বুদ্ধি একটা শাণিত দীপ্তি লাভ করিয়াছিল... বাঙালী তাহার এই বুদ্ধির দীপ্তিকে সৃষ্টি কার্যে নিয়োজিত করে নাই। ... তখন (মুসলিম বিজয় কালে) রাষ্ট্রে, ধর্মে, শিল্পে সাহিত্যে, দৈনন্দিন জীবনে যৌথ অনাচার নির্লজ্জ কাম-পরায়ণতা, মেরুদন্ডহীন ব্যক্তিত্ব, বিশ্বাসঘাতকতা, রুচিতারল্য এবং অলঙ্কার বাহুল্যের বিস্তার - সমাজদেহে দুষ্টক্ষতের মতো প্রকট হইয়াছিল।"

(বাঙালীর ইতিহাস - আদিপর্ব)

বাঙালী চরিত্র সম্বন্ধে বিদেশীদের ধারণাও কখনো ভাল ছিল না। মিথ্যা কথন, ভীরুতা, মামলা-প্রিয়তা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি বাঙালী চরিত্রে ছিল সুলভ।

বাঙালী ভোগলিপ্সু কিন্তু কর্মকুণ্ঠ। বৈরাগ্য-প্রবণ জৈন-বৌদ্ধ-বৈষ্ণব মতবাদ বাঙালী চিত্তে কর্ম কুণ্ঠা আরো প্রবল করেছে। এমন মানুষ ভিক্ষা বৃত্তি বা চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করে। বাঙালী চরিত্রে যে একদিকে মিথ্যা ভাষণ, প্রবঞ্চনা, চৌর্য, ছদ্ম বৈরাগ্য ভাব, চাতুর্য, সুবিধাবাদ ও সুযোগ সন্ধান, তোয়াজ ও তদ্বির প্রবণতা প্রভৃতির প্রাবল্য এবং আত্মসম্মান বোধের অভাব, অন্যদিকে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে যে দেবানুগ্রহ জীবিতা রয়েছে, তা ঐ কর্মকুণ্ঠারই প্রসুন। তাই বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য যুগে আমরা বাঙালীকে কেবল তুক-তাক, দারুন-উচাটন, ঝাড়-ফুক, বাণ-মারণ, বশীকরণ, কবচ-মাদুলি, যোগ-তন্ত্র ও ডাকিনী-যোগিনী নির্ভর দেখতে পাই। তার সাহিত্যে পাই দেবতার স্তুতি ও মাহাত্ম্যকীর্তন। তার গানে গাথায় পাই বৈরাগ্য মহিমা ও পারত্রিক-চেতনা। চিরকাল বিদেশী শাসন-শোষণের ফলে স্বাধীনভাবে আত্মবিকাশের সুযোগ মেলেনি বলেই হয়তো বঞ্চিত দরিদ্রের নিঃস্ব জীবনে আধ্যাত্মিক শক্তি লাভের এ প্রয়াস, দৈবশক্তির সাহায্যে অলৌকিক উপায়ে বাঞ্ছা সিদ্ধির ও প্রয়োজন পূতির এই আগ্রহ এবং বাঁচার তাগিদেই অনন্যোপায় মানুষের ভিক্ষাবৃত্তি, মিথ্যার

টিপ্পনী

আশ্রয় ও প্রতারণার পথ বরণ আবশ্যিক হয়েছে। সম্রাট বাবুর তাঁর আত্মচরিত বাঙালী মানসের এক গুরত্বপূর্ণ পরিচয় দিয়েছেন, - "বাঙালীর 'পদ'-কেই শ্রদ্ধা করে। তারা বলে আমরা তখতের প্রতি বিশ্বস্ত। যিনি সিংহাসন অধিকার করেন আমরা তাঁরই আনুগত্য স্বীকার করি।"

প্রতীচ্য মানুষ আত্মপ্রত্যয় নিয়ে বাঞ্ছাসিদ্ধির ও জীবনের নিরাপত্তার বাস্তব উপায় বের করেছে। আর আত্মপ্রত্যয়হীন প্রাচ্য মানুষ অলৌকিক উপায়ে বাঞ্ছাসিদ্ধির ও জীবনের নিরাপত্তার উপায় সন্ধানী।

টিপ্পনী

প্রাচ্যের এই নিষ্ক্রিয় দলের জীবন-স্বপ্ন মানুষকে করেছে কল্পনাবিলাসী। ভূত প্রেত-দেত্ত-দানব, গন্ধর্ব-পরী-অপ্সরা তাঁদেরই কল্পলোক সহচর। মন্ত্র বলে আকাশে উড়তে কিংবা পাতালে প্রবেশ করতে অথবা নদ-নদী উল্লঙঘনে কিংবা মরম্ন-কান্তার উত্তরণে বাধা নেই কোথাও সেই কল্পনা ও বাসনার জগতে। রূপকথা, উপকথা, ধর্ম কথা, পুরাণ কথা প্রভৃতি এদেরই সৃষ্টি।

যারা উদ্যমশীল তারা জ্ঞান, বুদ্ধি ও আত্মপ্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে আসে বাস্তবক্ষেত্রে বাঞ্ছাসিদ্ধির উপায় উদ্ভাবনে। তারা আকাশে উড়বার যন্ত্র, পাতালের খবর জানার কৌশল, সাগর তলা দেখবার দৃষ্টি, রোগ নিরাময়ের নিদান, কর্মে সাফল্যের কল এবং অন্যান্য বাঞ্ছা সিদ্ধির সামর্থ্য অর্জনে হয় ব্রতী। এমনি মানুষের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে মানুষের বৈষয়িক জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান। এরাই করেছে প্রয়োজনীয় সব বস্তু আবিষ্কার ও নির্মাণ। শস্য-উৎপাদন অথবা মৃতে প্রাণ সঞ্চার থেকে আণবিক শক্তি সন্ধান কিংবা গ্রহলোকে গমন অবধি সব কিছুই উদ্যমশীল আত্মপ্রত্যয়ী মানুষের দান। এরাই মিটিয়েছে অলস মানুষের সুখ-স্বপ্ন ও সাধ।

আজ উদ্যমশীলতা ও আত্মপ্রত্যয় প্রতীচ্যের সম্পদ আর উদ্যমহীনতায় ও দৈব নির্ভরতায় প্রাচ্য-মানবের পরিচয়। প্রাচ্যে যা কল্পনা, পাশ্চাত্যে তাই বাস্তব, প্রাচ্যে যা আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য, প্রতীচ্যে তাই যান্ত্রিক সম্পদ। এই পার্থক্যের মূলে রয়েছে প্রতীচ্য মানুষের শোনা কথায় সন্দেহ ও অনাস্থা এবং কৌতূহল, জিজ্ঞাসা, আত্মবিশ্বাস, উদ্যম ও অবিরাম প্রয়াস, আর প্রাচ্য মানবের প্রয়াসহীন প্রাপ্তিলিপ্সা, আজন্ম লালিত বিশ্বাস-সংস্কার নিষ্ঠা, প্রশ্নহীন প্রত্যয় ও আত্মসামর্থ্যে অনাস্থা। জিজ্ঞাসার ও আকাঙ্খার, আত্মপ্রত্যয়ের ও উদ্যমের মেলবন্ধন না হলে জীবনে ও জীবিকায়, মনে ও মননে যে-জীর্ণতা আসে, তা থেকে হাজার হাজার বছরেও যে ব্যক্তির বা সমাজের মুক্তি ঘটে না, তার সাক্ষ্য আফ্রো-

এশিয়ার অনুন্নত ও আরণ্য সমাজ।

বাংলার ভৌগোলিক পরিসীমা : দশম-দ্বাদশ শতাব্দী

দশম-দ্বাদশ শতকের বাংলার ভৌগোলিক পরিসীমা সম্পর্কে একটা ধারণা থাকা দরকার। এ বিষয়ে নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব' গ্রন্থে বলেছেন - "উত্তরে হিমালয় এবং হিমালয় হইতে নেপাল, সিকিম ও ভোটান রাজ্য উত্তর-পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদ উপত্যকা, উত্তর পশ্চিমদিকে দ্বারবঙ্গ পর্যন্ত ভাগীরথীর উত্তর সীমান্তরালবর্তী সমভূমি; পূর্বদিকে গারো খাসিয়া জৈন্তিয়া ত্রিপুরা চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণী বাহিয়া দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত; পশ্চিমে রাজমহল - সাঁওতালপরগণা - ছোটনাগপুর মালভূমি - ধলভুম - কেওঞ্জর

ময়ূরভঞ্জের শৈলময় অরণ্যময় মালভূমি; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর - এই ভূখন্ডেই ঐতিহাসিকগণের মতে বাঙ্গালীর কর্মকৃতির উৎস এবং ধর্মকর্মনর্মভূমি। ”

প্রাচীনকালে অবশ্য বাংলা নামে সমগ্র দেশের নামকরণ হয় নি। সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশে রাঢ়, সুহ্ম, পুন্ড্র, তাম্রলিপ্ত, সমতট, বরেন্দ্রী, গৌড়, হরিকেল প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত ছিল। সুকুমার সেন বলেছেন - “বঙ্গ” শব্দজাত “বঙ্গাল” শব্দটি পাইতেছি একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী হইতে। দ্বাদশ শতাব্দীর এক অনুশাসনে “বঙ্গালবল” (অর্থাৎ বঙ্গাল রাজার সৈন্য) কর্তৃক নালন্দার একটি বিহার ধ্বংসের উল্লেখ আছে।” ডঃ সেন মনে করেন “বঙ্গাল” শব্দটি সংস্কৃত শব্দ। এর অর্থ যারা কাপাস চাষ করে বা যে দেশে ভাল কাপাস উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালা নামটি মুসলমান অধিকারের গোড়ার দিকে চালু হয়। ফরাসী “বঙ্গালহ” থেকে পর্তুগীজ ‘Bengala’ ও ইংরেজি ‘Bengal’ এসেছে। তুর্কি বিজয়ের আগে পর্যন্ত এদেশের সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরার মতো কোন নির্দিষ্ট নাম ছিল না। পুন্ড্র ও বরেন্দ্র ছিল উত্তরবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গের ছিল রাঢ় ও তাম্রলিপ্ত, দক্ষিণবঙ্গে সুহ্ম, সমতট ও হরিকেল এবং পূর্ববঙ্গে বঙ্গালা প্রভৃতি জনপদ ছিল।

টিপ্পনী

লক্ষ্মণসেনের রাজসভার পঞ্চরত্ন

উমাপতি ধর

জয়দেব মনে করেন উমাপতি পল্লবিত কাব্যরচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইনি ছিলেন লক্ষ্মণসেনের অন্যতম মন্ত্রী। ‘সদুক্তিকর্ণামৃতে’র সংকলনে উমাপতির কাব্যরীতির পরিচয় মেলে। তিনি তাঁর রচনায় গৌড়ী রীতিকে অনুসরণ করেছেন। গৌড়ী রীতির আদর্শে ‘অক্ষর ডম্বর’ ও ‘অলঙ্কার ডম্বরে’র সাহায্যে রাজসভার কবি উমাপতি বিজয়সেনের যে প্রশস্তি রচনা করেছেন তা নিম্নে উদ্ধৃত হল -

বিলেশয়বিলাসিনী মুকুট কোটিরত্নাঙ্কুর -
স্ফুরৎকিরণমঞ্জরীচ্ছুরিতবারিপুরং।
চখান পুরবৈরিণঃ স জলমগ্ন পৌরাঙ্গনা
স্তনৈর্নমদসৌরভোচ্চলিত চঞ্চলীকং সরঃ।।

অনুবাদ : তিনি (বিজয়সেন) পুরশত্রুর (মহাদেব) সম্মুখে একটি সরোবর খনন করাইয়াছিলেন, এই সরোবরের জল সপ্তরমণীদের মুকুটলগ্ন রত্নখন্ড হইতে বিচ্ছুরিত কিরণমঞ্জরীতে পূর্ণ ছিল এবং নাগরিকদের স্নানার্থিনী স্ত্রীদের বক্ষোলিপ্ত কস্তুরিগন্ধে মধুকর আকৃষ্ট হইয়াছিল। (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত - প্রথম খন্ড)

শরণঃ

শরণও প্রতিভাধর কবি ছিলেন। তাঁর ব্যক্তি পরিচয় কিছুই জানা যায়নি। জয়দেব শরণ সম্বন্ধে বলেছেন, তিনি দুরূহ ও দ্রুত পদ রচনা করতে পারতেন - ‘শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহ দ্রুতে’। অর্থাৎ শরণ দ্রুততার সঙ্গে কঠিন কবিতা লিখতে পারতেন - যা তাঁর বিশিষ্ট প্রতিভার স্বাশ্রবহ। ‘সদুক্তিকর্ণামৃতে’ শরণদেব, শরণদত্ত, শরণ এবং চিরন্তন শরণ প্রভৃতি নামে বাইশটি শ্লোক সংকলিত হয়েছে। এমনকি রূপ গোস্বামীর পদ্যাবলীতেও তাঁর কিছু শ্লোক সংকলিত হয়েছে। তাঁর রচিত শ্লোকের নির্দশন -

‘পীযূষং বিষমপ্যসূত জলধিঃ কান্তে কঙ্কালস্য চ।’

ধোয়ী

ধোয়ী ছিলেন প্রতিভাধর কবি। জয়দেব এঁকে বলেছেন, "শ্রুতি ধরো ধোয়ী কবিযক্ষ্মাপতি।" 'সুভাষিতাবলি'তে ধোয়ীকে বলা হয়েছে 'কবিরাজ'। 'মেঘদূতের' অনুসরণে তাঁর কাব্যের নাম 'পবনদূত'। কাব্যটি বৈদর্ভী রীতিতে রচিত। লক্ষ্মণসেনের দাক্ষিণাত্য অভিযান কালে কুবলয়বতী নামে এক গন্ধর্বকন্যায় প্রণয় নিবেদন কাহিনি এই কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। মোট ১০৪টি শ্লোকে মন্দাক্রান্তা ছন্দে এই কাব্যটি রচিত। এই কাব্যের কাব্যসৌন্দর্য অনুপম। তবে ঘটনা-পরিকল্পনা ও রচনারীতি প্রায় কালিদাসের অনুরূপ। এই কাব্যটি মূলত আদিরসাত্মক গাথাকাব্য। কারো কারো মতে সমসাময়িক বাংলাদেশের নৈতিক অধোগতির চিত্র রয়েছে। পবনদূত কাব্য ছাড়াও নানা সংকলনে তাঁর বিভিন্ন কবিতা সংকলিত হয়েছে। তিনি ছিলেন জীবনরসিক কবি। তাঁর কবিতার নিদর্শন -

টিপ্পনী

গৌষ্ঠীবদ্ধঃ সকলকবিভির্বাচি বৈদর্ভীরীতির্বাসো
গঙ্গাপরিসর ভূবি স্নিগ্ধ ভোগ্যা বিভূতিঃ।

গোবর্ধন আচার্য

লক্ষ্মণসেনের সভাকবি গোবর্ধন আচার্য ছিলেন দ্বাদশ শতকের একজন বিশিষ্ট কবি। তিনি ব্রাহ্মণ, পন্ডিত ও সরল চরিত্রের মানুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন গৌড়ের অধিবাসী। কবি জয়দেব বলেছেন, আদি-রসাত্মক সৎকবিতা রচনায় গোর্বধন আচার্যের প্রতিস্পর্ধী কেউ ছিল না - 'শৃঙ্গারোত্তর সৎপ্রমেয় রচনৈরাচার্য গোবর্ধনঃ স্পর্ধী কোহপি ন বিশ্রুতঃ।' তাঁর কাব্যের নাম 'আর্য সপ্তশতী'। 'আর্যা সপ্তশতী' কাব্যটি রতিবিষয়ক কোষকাব্য। এটি সাত শত শ্লোকে রচিত। প্রথমে দেববন্দনা ও কবি প্রশস্তি করে কবি ক-করাদি বর্ণক্রমে শ্লোকবিন্যাস করেছেন - যা মঙ্গলকাব্যের চৌতিশার উৎস হতে পারে। এই কাব্যটি প্রেমবিষয়ক মুক্তকের সমষ্টি। নায়ক-নায়িকা বা সখীর উত্তর-প্রত্যুত্তরে নায়ক-নায়িকার প্রেম, প্রেমের বিভিন্ন অভিব্যক্তি কাব্যে ব্যক্ত হয়েছে। এর বিষয়বস্তু হালের গাথাসপ্তশতী বা অমরুশতকের মতো। 'আর্যা সপ্তশতী'-র শ্লোকগুলিতে বাঙালির পরিহাসরসিকতার জীবন্ত রূপ চিত্রিত হয়েছে। "প্রেম, প্রেমের বহিরঙ্গ বিলাস ও অন্তর্মুখী গভীরতা, প্রেমের ভুজঙ্গ কুটিল গতি ও স্বাভাবিক ঋজুতা এবং সর্বোপরি প্রেমের সূক্ষ্ম গভীর মনস্তত্ত্ব আর্যার শ্লোকাবলিতে বর্ণশাবল্যে চিত্রিত হইয়াছে।" (জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তীঃ 'আর্যা সপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ')

আর্যার কয়েকটি শ্লোকের নমুনাঃ

(এক) অতি পূজিত তারেয়ং দৃষ্টিঃ শ্রুতি লঙ্ঘন ক্ষমা সুতনুঃ।
জিনসিদ্ধান্ত স্থিতিরিব সবাসনা কং ন মোহয়তি।। (অ. স.-২১)

নায়িকাপক্ষেঃ অতিবিস্তৃত এই লোচনতারা, কর্ণবিস্তারী দৃষ্টি, বাসনাচঞ্চল এই সুন্দর তনু কাহাকে না মুগ্ধ করে।

দেবীপক্ষেঃ বেদবিরোধী নাস্তিক মতে প্রতিষ্ঠিতা অতি পূজিতা এই তারা (মহাবিদ্যা) কাহাকে না মোহিত করে।

(দুই) যন্নিয়তনির্গুণং যন্ন বংশজং যচ্চ নিত্যনির্বাণম্।
কিং কুর্মস্তন্নিহিতং ধনুষ্পদে দেবরাজেন।। (আ. স. - ৪৮০)

নায়িকাপক্ষেঃ নির্গুণ, অকুলীন, আসার নায়ক দ্বারা নায়িকাকে উপভুক্তা দেখে নায়কের আক্ষেপোক্তি) হায় রে, যে নির্গুণ, যে অকুলীন, যে সকল গুণশূন্য দেবরাজ তাকেই কিনা এই সুন্দরীর স্থানে যুক্ত করেছেন।

দেবীপক্ষেঃ স্বয়ং দেবরাজ এই দেবীর পদে নির্গুণ নির্বাণকে স্থাপন করেছেন - অর্থাৎ দেবীপদেই নির্বাণ-মুক্তি।

জয়দেব
বাংলার রবি জয়দেব কবি কান্ত কোমল পদে
করেছে সুরভি সংস্কৃতের কাঞ্চন কোকনদে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত : আমরা

টিপ্পনী

লক্ষ্মণ সেনের রাজসভার বিশিষ্ট কবি ছিলেন জয়দেব। জয়দেব সংস্কৃতে গীতগোবিন্দ রচনা করলেও বাংলা সাহিত্যে তিনি মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। বাংলা সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণ প্রেমকেন্দ্রিক যে ভক্তিরসের ধারা উৎসারিত ও অবারিত হয়েছিল বিপুল সমৃদ্ধি নিয়ে তার গোমুখী উৎস বলা যায় জয়দেবের কাব্যকে। চৈতন্যদেবের আস্বাদন মাহাত্ম্যে বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যের সঙ্গে জয়দেবের রচনাও সমসূত্রে গ্রথিত হয়েছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন -

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ আরও বলেছেন -
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিনে করায় প্রভুর আনন্দ।

মহাপ্রভুর 'পরম আনন্দ' লাভে শ্রীগীতগোবিন্দ কাব্য এক পবিত্র ভূমিকা গ্রহণ করে এবং বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত শ্রীগীতগোবিন্দ বিদ্যমান রয়েছে এক জ্যোতির্ময় মাহাত্ম্যে। হরিস্মরণে মনকে সরস করা এবং বিলাসকলা কুতূহলে শিল্পসৌকর্য নির্মাণ করা - দুক্ষেত্রেই গীতগোবিন্দর গ্রষ্টার পারদর্শিতা ছিল অসাধারণ এবং উত্তরকাল একারণেও শ্রেষ্ঠ বা অতি প্রিয় পূর্বসূরিকে স্মরণ করে আন্তরিক অনুভবে। রাধাকৃষ্ণ পদাবলী সৃজনের ক্ষেত্রে কবি জয়দেব বাংলা সাহিত্যের পূর্বজ এক অনন্য গ্রষ্টা, কাব্যঙ্গিকের বিচারেও জয়দেব প্রাণিত করেছেন সহস্র বৎসর প্রসারিত বাংলা সাহিত্যকে। ভাষার দিক থেকে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'কে আদি যুগের বাংলা সাহিত্যের অন্তর্গত করা যায় অবশ্যই। আবার ড. সুকুমার সেন বলেছেন যে 'বাঙ্গালা প্রভৃতি আধুনিক আর্য-ভাষার আদি কবিও বটেন'।

জয়দেব দ্বাদশ শতকের কবি। অজয় নদের ধারে বীরভূমের কেন্দুবিল্ব গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তবে অনেকের মতে কবির জন্ম উড়িষ্যার পুরীর কাছাকাছি কেন্দবিল্ব নামক একটি গ্রামে। কিন্তু সে দাবী যথেষ্ট প্রমাণগ্রাহ্য নয়। বাংলাদেশেই তাঁর জন্ম এ মতই গৃহীত হয়েছে। তাঁর পিতার নাম ভোজদেব, মাতার নাম বামাদেবী। কবির স্ত্রীর নাম পদ্মাবতী যিনি জয়দেবের কাব্যচরনার সহায়ক ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। জয়দেব একটি পদের ভূমিকায় নিজেকে বলেছেন যে তিনি হলেন 'পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্তী' অর্থাৎ পদ্মাবতীর চরণাশ্রিত চারণ বা গায়কদের প্রধান। এখানে পদ্মাবতী হতে পারেন দেবী সরস্বতী বা তাঁর স্ত্রী। পদ্মাবতী নৃত্যনিপুণাও ছিলেন যিনি জয়দেবের গানে (পালাগানে) নৃত্যও করতেন।

গীতগোবিন্দ কাব্য দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত। বারটি সর্গ হল-সামোদ-সামোদর, অক্লেশ কেশব, মুগ্ধ মধুসূদন, স্নিগ্ধ মধুসূদন, সাকাঙক্ষা পুন্ডরীকাক্ষ, ধৃষ্ঠ বৈকুণ্ঠ, নাগর নারায়ণ,

বিলক্ষ লক্ষ্মীপতি, মুগ্ধ মুকুন্দ, মুগ্ধ মাধব, সানন্দ গোবিন্দ এবং সুপ্রীত প্রীতাম্বর। প্রত্যেকটি নামের তাৎপর্য আছে। এছাড়া আছে প্রশস্তি বর্ণনা ও দশাবতার স্তোত্র। গীতগোবিন্দে চব্বিশটা গান আছে। গীতগোবিন্দর কাহিনীর মধ্যে খুব একটা জটিলতা নেই। কৃষ্ণর জন্য বৃন্দাবনের বনে রাধা অপেক্ষারত; তিনি শুনলেন যে কৃষ্ণ অন্য নায়িকাদের সঙ্গে আনন্দে মত্ত। রাধা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। সখীর মুখে একথা শুনে কৃষ্ণ এলে তাঁকে তিনি প্রবল আঘাত ও প্রত্যাখ্যান করলেন। কৃষ্ণ চলে গেলেন। রাধা বেদনায় ভেঙে পড়লেন। সখী গিয়ে কৃষ্ণকে রাধার মর্মদাহের কথা জানালে কৃষ্ণ এলেন রাধার কাছে এবং নতজানু হয়ে তাঁর পা ছুঁয়ে ক্ষমা চাইলেন। শেষে উভয়ের মিলন হয়। সামান্য এই প্রেমকাহিনী কাব্যিকতায় অসামান্য হয়ে উঠেছে। শব্দের নিপুণ প্রয়োগে, অলংকারের শিল্পিত দক্ষতায়, সঙ্গীতের অপরূপ রূপায়ণে, কথনশিল্পের কুশলী চাতুর্যে গীতগোবিন্দ হয়ে উঠেছে সহৃদয় হৃদয়সংবাদী এক নান্দনিক সৃষ্টি।

টিপ্পনী

সাহিত্যের বিচারে গীতগোবিন্দ এক অসামান্য শিল্পকর্মরূপে পরিগণিত। প্রথমত, রাধাকৃষ্ণ লীলার মনোরম আস্বাদ এতে পাওয়া যায় - ঈশ্বরীয় প্রেমলীলার দৈবী মহিমার সঙ্গে মর্ত্যলোকের জীবনকথার সমন্বয়ে গীতগোবিন্দ অনন্য সৃজনরূপ পরিগ্রহ করেছে। দ্বিতীয়ত, গীতগোবিন্দ গ্রন্থে চব্বিশটি গান আছে যা সুর তাল লয়ে সমৃদ্ধ। বিভিন্ন গান মালব গুর্জরী রূপক ইত্যাদি তালে বাঁধা হয়েছে। গীতগোবিন্দ যথার্থই গেয় রচনা। তৃতীয়ত, গীতগোবিন্দ একটি উচ্চাঙ্গের নাট্যগীতি। গান এর মধ্যে আছে এবং তিনটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে এর নাট্যরূপ নির্মিত হয়েছে। কবিতার উচ্ছ্বাস উন্মাদনা নাটকীয় দ্বন্দ্ব গতি উৎকণ্ঠায় সম্পৃক্ত হয়ে অপরূপ শিল্পমূর্তি নির্মাণ করেছে। চতুর্থত, বাক এবং অবাক-এর সমন্বয়ই কাব্য এবং কবিতার মধ্যে অবাকধর্ম সন্ধানের যে প্রযুক্তি তা হল কাব্যকলা। এই কাব্যকলায় আঙ্গিকের চমৎকারিত্ব ও বৈচিত্র্যে গীতগোবিন্দ সমৃদ্ধ। সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী শার্দুলবিক্রীড়িত ছন্দ ও পাদাকুলক ছন্দের প্রয়োগ জয়দেবের কাব্যে আছে। ত্রিপদী পয়ারের যথাযথ ব্যবহার আছে। সংস্কৃত ছন্দপ্রয়োগ তো তাঁর কাব্যে আছেই, পাদাকুলক ছন্দের যে রূপ তাঁর কাব্যে আছে তা বাংলা পয়ারের পূর্বরূপ।

জয়দেব এক পঙক্তির শ্লোক লিখেছেন যা ভারতীয় সাহিত্যে তুলনারহিত। অবশ্য আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যে তেমন কবিতাও পাওয়া যায়। জয়দেবের কবিতা হল -

শ্রিতকমলাকুচমন্ডল ধৃতকুন্ডল কলিতললিতবনমাল।।

বাংলা কাব্যের সঙ্গে গীতগোবিন্দ অচ্ছেদ্য নিবিড় যোগসূত্র আবদ্ধ। ১. পরবর্তী বাংলা কাব্যে জয়দেবের গভীর প্রভাব ও প্রেরণা পরিলক্ষিত হয়। ড. সুকুমার সেন যথার্থই বলেছেন যে, পরবর্তী কালের বৈষ্ণব পদাবলীর বিষয় ও গঠনরীতি জয়দেবের গানেরই মতো। ২. বাংলায় রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার যে প্রকাশ ঘটেছে, বাংলার অগ্রজ কবির মধ্যে তার অনুরূপ আবির্ভাব ঘটেছিল। ৩. বাংলায় নাট্যকাব্যরীতির যে প্রকরণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ইত্যাদির মধ্যে প্রকট হয়েছিল, গীতগোবিন্দে তারই সূচনা। ৪. পরবর্তী বাংলা কবি বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস প্রমুখের কবিতায় জয়দেবের প্রভাব ও প্রেরণা আছে। বিদ্যাপতি তো নিজেকে আখ্যাত করেছেন 'অভিনব জয়দেব' রূপে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রূপবিন্যাসে গীতগোবিন্দ-র প্রভাব তো আছেই, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বড়ু চন্ডীদাস গীতগোবিন্দ কাব্যের শ্লোককেও গ্রহণ করেছেন রূপান্তরের মাধ্যমে। যেমন -

অবিরলনিপতিত মদনশরাদিব ভাবদবনায় বিশালম।
স্বহৃদয়মর্মানি বর্ম করোতি সজল নলিনীদলজালম।।
জয়দেবের এই পদ বড়ুর কাব্যে এভাবেই রূপায়িত হয়েছে।

অহে নিশি মদন মারে তারে শরে।
হৃদয়ে নলিনীদল সংনাহ্য করে।।

আধুনিক কালের সাহিত্যিকরাও জয়দেবের অনুপ্রাণনা লাভ করেছেন। মধুসূদন জয়দেবের কাব্যের যমুনাতীরস্থ গ্রামে কৃষ্ণ-বলরামের লীলাক্ষেত্র গোকুল ভবনের কথা ও ব্রজলীলার কথা বলেছেন 'জয়দেব' কবিতায় -

চল যাই, জয়দেব, গোকুল-ভবনে
তব সঙ্গে, যথা রঙ্গে তমালের তলে
শিখিপুচ্ছ-চূড়া শিরে, পীত ধড়া গলে
নাচে শ্যাম, বামে রাধা-সৌদামিনী ঘনে!
না পাই যাদবে যদি, তুমি কুতূহলে
পূরিও নিকুঞ্জরাজী বেণুর স্বননে!

বঙ্কিমচন্দ্র জয়দেবের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে এই দুই মহান কবির কাব্যবৈশিষ্ট্যের কথা বিশেষভাবে বলেছেন। তাঁর মতে - "জয়দেবের গীত রাধাকৃষ্ণের বিলাসপূর্ণ; বিদ্যাপতির গীত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়পূর্ণ। জয়দেব ভোগ; বিদ্যাপতি আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতি। জয়দেব সুখ; বিদ্যাপতি দুঃখ। জয়দেব বসন্ত; বিদ্যাপতি বর্ষা। জয়দেবের কবিতা উৎফুল্লকমলজালশোভি বিহঙ্গমাকুল স্বচ্ছ বারিবিশিষ্ট সুন্দর সরোবর; বিদ্যাপতির কবিতা দূরগামিনী বেগবতী তরঙ্গসঙ্কুলা নদী। জয়দেবের কবিতা স্বর্ণহার; বিদ্যাপতির কবিতা রুদ্রাক্ষমালা। জয়দেবের গান মুরজবীণা সঙ্গিনী স্ত্রীকণ্ঠগীতি; বিদ্যাপতির গান সায়াহ্ন সমীরণের নিশ্বাস" (বিবিধ প্রবন্ধ-বিদ্যাপতি ও জয়দেব)।

বঙ্কিমের অনেক নায়িকার বর্ণনায় জয়দেবের অনুপ্রাসঝঙ্কৃত উপমাসমৃদ্ধ তৎসম বাক্য গঠিত রূপচিত্রণের কথা আছে। 'রজনী' উপন্যাসের এক অনন্য নারীর নাম লবঙ্গলতা, তার প্রৌঢ় স্বামী আদর করে বলতেন-ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে।

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে শব্দ ছন্দ ভাবনা সবই রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ আবিষ্ট করেছিল। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি লিখেছেন যে গীতগোবিন্দ তিনি ছেলেবেলায় অনেকবার পড়েছিলেন। জয়দেবের বক্তব্য তিনি ঠিকমতো বুঝতে না পারলেও ছন্দেও ও কথায় তার মনে যে এক ভাব গাঁথা হয়ে যাচ্ছিল তা ছিল অসামান্য। 'নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতস্য নিশি রহসি নিলীয় বসন্তং' পঙক্তিটি বিশেষত তার ছন্দের ঝংকারে কবির মনে সৌন্দর্য জাগিয়ে তুলত। এই কাব্যপঙক্তির স্মৃতিতেই কোনো এক মেঘলা দিনের ছায়াঘন আকাশের অবকাশের আনন্দে বাড়ীর ভিতরে এক ঘরে খাটের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে একটা শেস্নট নিয়ে লেখা হল 'গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে'।

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের প্রথম শেস্নাকের প্রথম পদ হল মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ, এটি শার্দুলবিক্রীড়িত ছন্দে লেখা। কবি বললেন - 'আকাশ কালো মেঘে স্নিগ্ধ, বনভূমি তমালগাছে শ্যামবর্ণ, ব্যপারটি এর বেশি কিছুই নয়। ... কবি বরাবরকার মতো বলতে লাগলেন -

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ

কবির মনের মেঘলা দিনের সংবেগ চড়ে বসল ছন্দপক্ষিরাজের পিঠে, চলল চিরকালের মনোহরণ করতে' (গদ্যছন্দ-ছন্দ)।

টিপ্পনী

রবীন্দ্রনাথ গীতগোবিন্দের দুটি পঙক্তির ছন্দের পরিচয় দিয়েছেন -
বদসি যদি/কিঞ্চিদপি/দন্তরুচি/কৌমুদী
হরতি দর/তিমিরমতি/ঘোরম।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে এটা 'পাঁচমাত্রা অর্থাৎ বিষমাত্রার ছন্দ'। এই কথা ও রীতিকে তিনি বাংলায় তরজমা করে বলেছেন -

বচন যদি/কহ গো দুটি/দশনরুচি/উঠিবে ফুটি
ঘুচাবে মোর/মনের ঘোর/তামসী। (ছন্দ)
রবীন্দ্রনাথ গীতগোবিন্দ থেকে তিনটি পদ অনুবাদ করেছেন-
ক. মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ
নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।

টিপ্পনী

- অম্বর অম্বুদে স্নিগ্ধ,
তমালে তমিগ্র বনভূমি,
তিমির শর্বরী এষে
শঙ্কাকুল-সঙ্গে লহো তুমি। (রূপান্তর)

খ. বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম।

- বচন যদি কহ গো দুটি
দশনরুচি উটিবে ফুটি
ঘুচাবে মোর মনের ঘোর তামসী। (রূপান্তর)

শেষ কবিতার ছন্দ অক্ষুণ্ণ রেখে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন -
পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একী সন্ন্যাসী
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে!

ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে ওঠে নিশ্বাসী,
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে। (কল্পনা - মদনভস্মের পর)

একজন কথাসাহিত্যিক জয়দেবের 'বদসি যদি'র অনুকরণে লিখেছেন মজার প্যারডি -

সত্য যদি চটিয়াছিলে আমার পরে মানময়ী।
দিলেনা কেন বচন শরঘাতং,
শুনলে গুটিকয়েক তব ধারালো বাণী শানময়ী।
তখনি সখি হতাম আমি কাতং। (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়)

রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'য় আবেগের চরম মুহূর্তে লাবণ্য লিখেছিল অমিতের নোট বইতে -
মিতা, ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভূষণং,
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্।

মধ্যযুগে ও আধুনিক যুগে বাংলা সাহিত্যে এভাবেই বিকীর্ণ হয়ে রয়েছেন জয়দেব। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর অচ্ছেদ্য সহৃদয় যোগসূত্রের সম্পর্কে। এ সত্য অস্বীকার করা যাবে না।

জয়দেবকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অন্তর্ভুক্তির কারণঃ
জয়দেব কবি নৃপচক্কেব, খন্ডমন্ডলেশ্বর আনি কবি।
প্রচুর ভয়ো তিহুঁ লোক গীতগোবিন্দ উজাগর।।

টিপ্পনী

ষোড়শ শতাব্দীর হিন্দি সন্ত কবি নাভাজী দাসের জয়দেব-ভক্তির উচ্ছ্বাসকে মেনে নিলেও দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর সংস্কৃত সাহিত্যের পটভূমিকায় লক্ষ্মণসেনের সভাতলের সারস্বত পঞ্চরত্নের অন্যতম 'গীতগোবিন্দ'-এর কবি জয়দেবকে নৃপচক্কেব বলা অসঙ্গত নয়। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য পূর্ববর্তী আটশ' বছরের সংস্কৃত সাহিত্যের গৌরবজ্জ্বল অধ্যায়কে ম্ল-ান করে বিশালকায় পুরীর মতো পরবর্তী সাহিত্যিক শাখাসমূহকে আশ্রয় দিয়েছে। 'গীতগোবিন্দ' ছড়া জয়দেব রচিত অন্যান্য কবিতাসমূহের সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেও এই একটি মাত্র কাব্যই জয়দেবের স্থান নির্ধারণ যথেষ্ট। বিষয়বস্তু নতুন নয় তথাপি 'গীতগোবিন্দ' লৌকিক ও অধ্যাত্ম জীবনের সেতু রচনাকারী রামায়ণ, মহাভারত, গীতা-ভাগবতাদিগ্রন্থাদি সঙ্গে একই পঙক্তিতে আসীন। ম্রিয়মাণ যুগের ক্রান্তিলগ্নে অপর যে গৌরব জয়দেবের প্রাপ্য তা হল বাঙালি কবি হিসেবে একটি মাত্র সংস্কৃত কাব্য লিখএ সংস্কৃত সাহিত্যের ধারায় তিনি আলোড়ন সৃষ্টি করে বাঙালি জাতির গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।জয়দেব দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের শেষ বড় মৌলিক কবি তিনি। সেকালের লৌকিক সাহিত্যের গীতিকবিতাকে সংস্কৃতে ঢেলে সাজিয়ে তিনি দেবভাষার অভিনব কবিতার সৃষ্টি করেছিলেন। এক হিসেবে তিনি বাংলা প্রভৃতি আধুনিক আর্যভাষার আদি কবিও বটে। তাঁরই গীতিকবিতার আদর্শে বাংলাদেশে, মিথিলায় ও অন্যত্র রাধাকৃষ্ণ পদাবলি ও অনুরূপ গীতিকবিতার ধারা নেমেছিল। এককালে জয়দেবের জনপ্রিয়তা এতই বেশি হয়েছিল যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও জয়দেবকে স্বদেশীয় বলে দাবি করে থাকেন।

কোনো কোনো সমালোচক জয়দেবকে বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করতে অস্বীকার করেন। কারণ (১) জয়দেব সমৃদ্ধে যেসব তথ্য পাওয়া গেছে তা এতই সামান্য যে তার ভিত্তিতে বাঙালি বলে প্রতিপন্ন করা দুরূহ। (২) জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও অন্যান্য রচনা 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' সঙ্কলিত সংস্কৃত অথবা অবহট্‌ঠ মিশ্রিত সংস্কৃত রচনা।

গীতগোবিন্দ মহাকাব্যের আধারে রচিত কৃষ্ণলীলাত্মক গীতিনাট্য। দ্বাদশ সর্গে সমাপ্ত, উক্তি-প্রত্যুক্তি ও সংগীতময় রাধাকৃষ্ণের মিলনলীলা নিয়ে চব্বিশটি গানে কাহিনিটি বর্ণিত। কৃষ্ণ রাধাকে এড়িয়ে অন্য গোপীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে জেনে রাধার দুর্জয় মান, ভর্ৎসিত ও পরিত্যক্ত কৃষ্ণের নির্বেদ এবং সখী দূতীর মধ্যস্থতায় দুই জনের মিলন এই কাব্যের বস্তু। পুরাণ, উপপুরাণ এবং লৌকিক কাহিনির অনুসরণে রচিত এই কাব্য। কাব্যখানিতে আছে মানব-মানবীর প্রেম মিলনের ছবি, আছে বাস্তবতাজনিত নাটকীয় উক্তি-প্রত্যুক্তি আর গীতিমাধুর্য-যার অন্তঃস্থলে ভক্তিরসধারা বহমান। বাংলা সাহিত্যের অন্তর্নিহিত প্রবণতার সঙ্গে জয়দেবের গীতগোবিন্দকে তুলনা করলে দেখা যাবে দুয়ের মধ্যেই একটি অবিচ্ছেদ্য আত্মীয়তা রয়েছে। কাব্যখানি ভাবে-ভাষায়-ছন্দে বাঙালি রুচির বড়ই অনুকূল। তাই পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে এর অপ্রতিহত প্রাধান্য স্বীকৃত। জয়দেবকে বাদ দিয়ে কি প্রাচীন, কি অর্বাচীন - বাংলা সাহিত্যের কোনো যুগের আলোচনাই সম্পূর্ণ হতে পারে না।

আদিরসাত্মক গীতিকাব্যখানিতে বৈষ্ণবীয় ভক্তিরসের একটি ব্যাকুল আবেগ প্রকাশ পেয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ভাববৈশিষ্ট্য 'গীতগোবিন্দে' পরিস্ফুট হওয়ায় জয়দেবকে বৈষ্ণব কাব্যধারার আদি কবির সম্মান প্রদান করা হয়। উত্তরচৈতন্য যুগের কবিগোষ্ঠীর ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিমার জন্য জয়দেবের খ্যাতি প্রতিপত্তি বাঙালির মধ্যে কালজয়ী হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত জয়দেবের কবিখ্যাতিকে আচ্ছন্ন করে তার উপর ভক্তের গৌরব আরোপিত হয়েছে। চৈতন্যদেব 'শ্রীগীতগোবিন্দ' দিবারাত্রি আস্বাদন করতেন।

টিপ্পনী

কবিরাজ গোস্বামী 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' লিখেছেন -

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিনে করায় প্রভুর আনন্দ।।

সহজিয়া মতে বৈষ্ণবগণ জয়দেবকে 'নবরসিকে'র অন্যতম এবং আদিগুরুরূপে বলে গ্রহণ করেছিলেন। বৈষ্ণবভক্তগণ জয়দেবকে গোস্বামীর পর্যায়ে তুলে ধরেছিলেন, অবৈষ্ণব সমাজেও তা স্বীকৃত হয়েছিল। আধুনিক কালের গৌড়ীয় ভক্তজন এই কাব্যকে ভক্তিশাস্ত্রের উপনিষদরূপে গ্রহণ করে থাকেন। বাংলা ও বাংলার বাইরে জয়দেবকে কেন্দ্র করে অনেক অলৌকিক উপকথার সৃষ্টি হয়েছিল। বাঙালির যে বৈষ্ণব গীতিকবিতা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একমাত্র সম্পদ, তার উৎস এই গীতগোবিন্দে নিহিত। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ঊষা-আবির্ভাবের প্রাক্-মুহূর্তে কবি জয়দেব গোস্বামীর আর্বিভাব হয়েছিল। অবশ্য তাঁর রাধামাধবের সঙ্গে পরবর্তীকালের বিশেষত রূপ গোস্বামীর রসশাস্ত্র এবং চৈতন্যদেবের ভক্তিভাবের আদর্শে গৌড়ীয় ভক্তিশতদলে প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণ রাধার মহাভাব স্বরূপের প্রকৃতিগত কিছু বিভেদ আছে। বরম বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাসই সাক্ষাৎভাবে জয়দেবের আর্দশ গ্রহণ করেছেন। বিদ্যাপতি 'অভিনব জয়দেব' উপাধি ধারণ করে শস্নাঘা অনুভব করতেন।

জয়দেবের ভাষাভঙ্গি পর্যন্ত সংস্কৃত ব্যাকরণ অলংকার শাস্ত্রের অনুসারী হলেও অন্তরঙ্গে বাংলা ভাষা-শৈলীর সম-স্বভাবের। সংস্কৃত ছন্দে রচিত বর্ণনামূলক শেস্নাকগুলি বাদ দিলে যে রাগমূলক পদাবলি গীতগোবিন্দের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সেগুলি নামমাত্র সংস্কৃত ভাষা ও ছন্দে রচিত হলেও এই ভাষা ও ছন্দের ভঙ্গি যতটা প্রাকৃত বা দেশী ভাষা ও ছন্দের অনুযায়ী, ততটা সংস্কৃতের নয়।

গীতগোবিন্দের গীতাবলীর ছন্দ মাত্রাপ্রধান হলেও তা প্রাকৃত অপভ্রংশের স্বভাবযুক্ত, সংস্কৃতের সঙ্গে তার পার্থক্য আমূল। এই পদাবলির বহুস্থানে অপভ্রংশ ষোলমাত্রিক পাদাকুলক ছন্দের ব্যবহার করা হয়েছে। যেমনঃ

↓ ↓ ↓ ↓   ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓   ↓ ↓
বি হ র তি । হ রি হ র । স র স ব । সন্ তে ৪ + ৪ + ৪ + ৪ = ১৬

ওপরের চরণটি আসলে চোদ্দ অক্ষরের সমষ্টি। শেষপদের দুটি অক্ষরকেই দীর্ঘ মাত্রাযুক্ত করে ষোল মাত্রা রচনা করা হয়েছে। উচ্চারণগত শিথিলতার ফলে এই ষোল মাত্রা অনায়াসে চোদ্দ অক্ষরে পর্যবসিত হতে পারে আর অনুরূপ সম্ভাবনার পরিণতিতেই ক্রমশ ষোল মাত্রার পাদাকুলকের পরিবর্তে বাংলা ভাষার চোদ্দ অক্ষরের পয়ার গড়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে অন্ত্যমিল পয়ার-ধর্মকে আরও নিবিষ্ট করেছে। তাছাড়া ত্রিপদীর সুরও গীতগোবিন্দে কোথাও কোথাও অস্পষ্ট আকারে পাওয়া যায়। পূর্বোদ্ধৃত 'পততি পতত্রে' ইত্যাদি পদটিকে সহজেই ত্রিপদীর আকারে দেওয়া যায় -

পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে
শঙ্কিত ভবদুপযানম্। ইত্যাদি।

আর 'গীতগোবিন্দে'র গীতাংশই আসলে 'মধুর কান্ত পদাবলি যে বাংলাধর্মী, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সে কথা ব্যক্ত করেছেনঃ "সংস্কৃত কবিতা সাধারণত পদ চতুষ্টয় সমন্বিত এক একটি stanza-য় পর্যবসিত; এবং এইরূপ শ্লোকের সমষ্টি লইয়াই কাব্য। শ্লোকগুলি কখনও সম্বন্ধ, কখনো অসম্বন্ধ, কিন্তু এক-একটি শ্লোক প্রায়ই সম্পূর্ণ ভাবের জ্ঞাপক। পদাবলির প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এগুলিকে ব্যষ্টিভাবে লইলে সম্পূর্ণ অর্থ গ্রহণ করা যায় না। গানের মত পৃথক রূপে বিভিন্ন ভাবের প্রকাশত হইলেও এগুলিকেই সমষ্টিভাবেই ধরিতে হইবে এবং অন্তের নিবিষ্ট refrain বা ধ্রুবপদই ইহার ভাব পরম্পরার যোগসূত্র। পদাবলির এই ধারণাটি দেশীয় গানের প্রথাই অবলম্বন করিয়াছে।"

টিপ্পনী

গীতগোবিন্দের কাহিনি সংস্থাপনে নাট্যলক্ষণটুকুও লক্ষ করার মতো। অধিকাংশ ভাগই কৃষ্ণ ও সখীর সংলাপ-মাধ্যম প্রকাশিত হয়েছে; মাঝে মাঝে বর্ণনামূলক শ্লোকের দ্বারা সেই সংলাপমূলক ঘটনাবলিকে গ্রথিত করা হয়েছে। এই কলাকৃতিই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো বাংলা "গীতিনাট্য শ্রেণীর গীতিকাব্য"-তে পরবর্তীকালে অনুসৃত হতে দেখি। এদিক থেকে গীতগোবিন্দের রূপাঙ্গিকের মধ্যে বাংলার নিজস্ব নাট্যস্বভাবের প্রথম ঐতিহাসিক পরিচয় নিবদ্ধ হয়েছে। এই রূপ-প্রকৃতির কাঠামো পরবর্তীকালের সংলাপমূলক বাংলা কাব্য-কবিতায় অনুসৃত যে হয়েছিল, এ তথ্য অনস্বীকার্য।

অন্যপক্ষে, অভিজাত-অনভিজাত এই দুই সমান্তরাল ধারায় বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঙালি সংস্কৃতির যে ঐতিহ্য পরিচয় সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার মাধ্যমে পৃথক পৃথক ভাবে প্রবাহিত হচ্ছিল, তাকেই একত্র সংবদ্ধ করে নবজন্ম নিয়েছিল বাংলা ভাষার সাহিত্য। চর্যাপদে সেই মিলনের একটি রূপ আভাসিত হয়েছে, গীতগোবিন্দে সেই প্রচেষ্টারই স্পষ্টতর সাক্ষর। মধ্যযুগে আর্য-ব্রাহ্মণ্য এবং ব্রাহ্মণ্যেত্তর ঐতিহ্যকে একত্র আত্মসাৎ করেই নতুন ভাবরূপে আবির্ভূত হয়েছিল বাঙালির সাহিত্য, সেই সংস্কৃতি সমন্বয়ের বাস্তব জীবনমূর্তি হিসেবেই চৈতন্যদেব কেবল বৈষ্ণব ধর্ম সাহিত্যেরই নয়, মধ্য যুগের বাঙালি জীবন ও বাংলা সাহিত্যেরও একক ও অনন্য পথদ্রষ্টা। চৈতন্যদেব যে জীবনবোধের চূড়ান্ত পরিণতি, জয়দেব তারই প্রথম অঙ্কুরোদ্গম। এই কারণেই জয়দেব চৈতন্যদেবের কাছে পূর্বাচার্যের মর্যাদা পেয়েছিলেন। আর চৈতন্যের হাতে বাংলা সাহিত্যপথের যে মুক্তি, গীতগোবিন্দ-পদাবলিতে তার পূর্বসূচনা বলেই, মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পথের প্রথম একক উল্লেখ্য নির্মাতা কবি জয়দেব গোস্বামী। সহজিয়া বৈষ্ণবগণ তাঁকে আদিরসিক বলে ধরলেও আমরা তাঁকে পুরাতন বাংলা সাহিত্যের আদিকবি বলেই গ্রহণ করেছি।

জয়দেবকে বাংলা সাহিত্যের একজন বলার কারণগুলি সূত্রাকারে দেওয়া গেল-

১. জয়দেব বাঙালি কবি।
২. তাঁর প্রেমময় রাধাকৃষ্ণলীলা বাঙালি মনের অনুরূপ।
৩. পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রভাব।
৪. পদাবলি সাহিত্যে যে ভক্তিরসধারা প্রবহমান তার উৎসমুখ 'গীতগোবিন্দ'।

গীতগোবিন্দ কাব্যের বিষয় ও কাব্যগত বৈশিষ্ট্যঃ

গীতগোবিন্দের বিষয় রাধাকৃষ্ণের বসন্তরাস। গীতগোবিন্দ কাব্য দ্বাদশ সর্গে রচিত। কাব্যের প্রথমে মঙ্গলাচরণের শ্লোক, তারপর কবি পরিচিত, হরিস্মরণ, কবি প্রশস্তি ও বিখ্যাত দশাবতার স্তোত্র স্থান পেয়েছে। মূল কাব্যের আরম্ভ অপূর্ব বসন্ত দিয়ে। সখী এসে রাধার বিরহ অবস্থা বর্ণনা করলেন'ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয়সমীরে। মধুকর নিকরকরম্বিত কুঞ্জকুটীরে। বিহরিত হরিরিহ সরস বসন্তে। নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্যদুরন্তে।' কৃষ্ণের বিরহদশা বর্ণনা করলেন এবং আরও বললেন

‘রতি-সুখসারে গতমভিসারে মদন-মনোহরবেশম্ ।’ মিলনে উৎকণ্ঠিতা হলেও রাধআ বিরহে শক্তিহীনা, সে খবর সখী গিয়ে কৃষ্ণকে দিলেন। এদিকে রাধা বাসকসজ্জিকা অবস্থায় প্রলাপ বকছেন। সেই বিলাপ করন্নণ ও মর্মস্পর্শী। প্রভাতে কৃষ্ণ এলেন তখন মদনানলে জর্জ্জরিতা খণ্ডিত রাধার মানিনী অবস্থা। সখীরা উপদেশ দেন। কৃষ্ণ রাধার মানভঞ্জনের প্রয়াস করেন -

“স্মরহরল খন্ডনং মম শিরসি মন্ডনম্
দেহি পদ পল্লাব মুদারম্”।

টিপ্পনী

এরপর সখীর অনুরোধে কলহান্তরিতা রাধার কুঞ্জ গৃহে গমন। কৃষ্ণের তখন চন্দ্র দর্শনে তুঙ্গ তরঙ্গের জল নিধির মতো অবস্থা। রাধারও প্রিয়তম দর্শনে স্বেদাক্ত সহর্ষভাব। এই অবস্থায় লজ্জা, লজ্জা পেয়ে দূরে অন্তর্হিত হল (সলজ্জা লজ্জাপি ব্যগদতিদূরং মৃগদৃশঃ)। দ্বাদশ সর্গে সুপ্রীত পীতাম্বরের সঙ্গে পীতাম্বরের সঙ্গে রাধার মিলন। রতি বিলাস ও বিলাসান্তে ‘পত্রলেখা’ রচনা এবং প্রার্থনার মাধ্যমে কাব্যের পরিসমাপ্তি। এই কাব্যের দ্বাদশ সর্গ। বারোটি সর্গ হল সামোদ দামোদর, অক্লেশকেশব, মুগ্ধ মধুসূদন, স্নিগ্ধ মধুসূদন, সাকাঙ্ক্ষা পুন্ডরীকাক্ষ, ধৃষ্ট বৈকুণ্ঠ, নাগর নারায়ণ, বিলক্ষলক্ষ্মীপতি, মুগ্ধ মুকুন্দ, মুগ্ধ মাধব, সানন্দ গোবিন্দ এবং সুপ্রীত পীতাম্বর।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ নাট-গীতের আকারে লেখা। তবে গীতগোবিন্দের গানগুলি অপরিহার্য ও মর্মস্পর্শী - নাট্যধর্ম তুলনা গৌণ। উক্তি-প্রত্যুক্তি গীতের আকারেই পরিবেশিত। পাত্রপাত্রী মাত্র তিনটি - সখী, কৃষ্ণ ও রাধা। এই কাব্য সঙ্গীতপ্রধান। কাব্যের অমূল্য সম্পদ এই গান। তা গীতিকবিতার মতো হৃদয়ভাবের প্রকাশে ঝঙ্কৃত।

জয়দেব গীতগোবিন্দ ছাড়া কয়েকটি পদ লিখেছিলেন। তার মূল্য কিছু নেই। এই পদগুলির অধিকাংশই ‘যুদ্ধ’, বীররস, লক্ষ্মণসেনের স্তুতি এবং আদি রসের বর্ণনা।

জয়দেবের কাব্য অতি মধুর। ভাষা সুললিত, পরিমার্জিত ও শ্রুতি সুখকর। এর রস শৃঙ্গার রস। এই কাব্যে মানব প্রেমের দেবায়ন সপ্রতিষ্ঠিত। লৌকিক বৈভব এখানে রাধা কৃষ্ণে পরিণত। লৌকিক প্রেমানুভব এখানে দেব শৃঙ্গারানুভাবে রূপান্তরিত। জয়দেব স্পষ্ট করে বলেছেন, ‘এই কাব্য হরির বিলাস বর্ণনা। এই কাব্য বর্ণনা করলে হৃদয় সরস হয়।’

পরিপূর্ণ প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি ছিলেন জয়দেব। তিনি অপার্থিবকে পার্থিব রূপ ও রসের সীমানায় লাভ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। কবি জয়দেব তাঁর আত্মগত ভাবনার দ্বারা রূপ ও রসের প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের অপূর্ব এক যুগলমূর্তি রচনা করেছেন। তিনিই প্রথম রাধাপ্রেমকে কাহিনির অখন্ডতায় নায়িকার পূর্ণ মর্যাদা দান করেন।

এই কাব্য থেকে বৈষ্ণব ধর্মের রাধার সুপ্রতিষ্ঠার ইতিহাসটি অবগত হওয়া যায়। পূর্ববর্তী প্রেমকাব্যে রাধা সাধারণ নায়িকা। ‘গীতগোবিন্দে’র রাধা ‘সংসার বাসনা বদ্ধ শৃঙ্খলা’। লোকজগতের নায়িকা এখানে প্রায় ‘মহাভাবময়ীরূপে চিত্রিতা’। জয়দেব এসে যে প্রেমধারায়া প্রবল উচ্ছ্বাস প্রবাহিত করেছে, সেই ধারাই প্রবাহিত হয়েছে বাংলার বৈষ্ণব পদাবলিতে। প্রেমকবিতার বিবর্তনের ইতিহাসে জয়দেব একটি সীমাচিহ্ন।

গীতগোবিন্দ মিলনান্তক। বিরহী রাধাকৃষ্ণের মিলন বর্ণনা দিয়ে এ কাব্য পরিসমাপ্ত। পার্থিব কামনা-বাসনার কথা থাকলেও গীতগোবিন্দ ভক্তিমূলক কাব্য। সর্ব ভারতে ভক্তিগীতিরূপেই এই কাব্যের প্রতিষ্ঠা। প্রতিটি সর্গে প্রতিটি গানের প্রতিটি গানের পরে কবি ভক্তশ্রোতার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন -- ‘হরি পাতু বঃ’, ‘বিতনোতু শুভানি’। জয়দেব ভক্তের শ্রবণ-মনন-স্মরণের জন্যই গীতগোবিন্দ রচনা করেছেন। যাঁরা মন্তব্য করেন,

‘গীতগোবিন্দে গীত আছে, গোবিন্দ নাই’ - তাঁরা ভুল বলেন। গীতগোবিন্দে গীতও আছে, গোবিন্দও আছে। তবে সে গোবিন্দ শঙ্খ-চক্রধারী কৃষ্ণ নন, তিনি বংশীধারী মধুর কৃষ্ণ। সে কৃষ্ণ ‘মূর্তিমান শৃঙ্গার’। জয়দেব তাই ভক্তকবি।

জয়দেবের কাব্য সংস্কৃতে রচিত হলেও তার ভাবধর্ম একান্তভাবে লৌকিক প্রাণধর্মের অনুকূল। জয়দেব রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনিকে আধ্যাত্মিক রূপদানে প্রয়াসী হয়েছেন।

গীতগোবিন্দ-এর ভাষা বিচার করে প্রথমে লসেন ও পরে পিসেল সাহেব মন্তব্য করেছেন যে ‘গীতগোবিন্দ’র পদগুলির ভাষা, ছন্দ ও অন্ত্যানুপ্রাস-এর মধ্যে অপভ্রংশের স্পষ্ট প্রভাব উপলব্ধি করা যায়। ‘গীতগোবিন্দে’র ছন্দের মধ্যে যে অপভ্রংশের প্রবল প্রভাব রয়েছে তা অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। ঘটনার বর্ণনায় এবং কৃষ্ণ-রাধার ও সখীর উক্তি প্রত্যুক্তিগুলি সংস্কৃত জাতি ছন্দে রচিত -

“পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিত-ভবদুপযানম্।
রচয়িত শয়নং সচকিত-নয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্।”

এই ছন্দের মধ্যে প্রাচীন বাংলার সুর অনুরণিত হয়।

‘গীতগোবিন্দ’ কোন্ শ্রেণির রচনা এই নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যেমন -

উইলিয়াম জোনস্ - রাখালী নাটগীতি।
লসেন - গীতিনাট্য।
ভনশ্রোয়েভআর - উন্নত ধরনের যাত্রা।
পিসেল - অপেরা (অতিনাটকীয় লক্ষণাক্রান্ত)।

এইসব কথা মনে রেখেও বলা যায় এই কাব্যে কাব্য, আখ্যান, নাটকীয়তা ও সঙ্গীত প্রত্যেকটিরই প্রভাব রয়েছে। তবে এর মধ্যে আখ্যান ধরনের লক্ষণ বেশি থাকায় কাব্যটি বাহ্যত আখ্যানকেন্দ্রিক খন্ডকাব্য রূপে বিবেচিত হয়। R. W. Frazer-এর মত এই প্রসঙ্গে আলোচ্য - “The poem of Joydeva marks the gradual development in the twelfth century of the doctrine of Faith (bhakti), of emotion, and personal love towards a deity in human form.”

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের উপর জয়দেবের প্রভাব স্মরণীয়। বৈষ্ণব পদাবলির ভাষা, শব্দপ্রয়োগ, ধ্বনিঝংকার, অলংকার কৌশল প্রভৃতিতে জয়দেবের প্রভাব পরিলক্ষিত। পদাবলির চন্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস, রায়শেখরের পদে রাধাকৃষ্ণলীলায় যার চূড়ান্ত পরিণতি, জয়দেবের মধ্যে তার সার্থক সূচনা। জয়দেবের অনেক পদ কাব্যমূল্যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর কিন্তু তাঁর ধ্বনিঝংকার চৈতন্য পরবর্তী অনেক সল পদকর্তা জ্ঞানদাস, জগদানন্দ, যদুনন্দন প্রভৃতি অনুসরণ করে পদ রচনা করেন।

জ্ঞানদাস -- কষিল কনক রম্নচির গৌর অখিল ভুবন মরমচৌর
করভশুন্ড বাহুদন্ড কল্মষ তাপ ত্রাসনি।
প্রচুর পুলক শোভিত অঙ্গ নটনলীলা অধিকরঙ্গ
বয়ান শরদ পুলিন ইন্দু সরস হাসভাষণি।।

জগদানন্দ - মঞ্জু বিকচ কুসুম পুঞ্জ
মধুপ শবদ গুঞ্জ গুঞ্জ
কুঞ্জর গতি গঞ্জিগমন
মঞ্জুর কুলনারী।।

টিপ্পনী

বড়ু চন্ডীদাস তাঁর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নানা জায়গায় গীতগোবিন্দের সাক্ষাৎ অনুসরণ করেছেন। যথা 'গীতগোবিন্দ'

'অবিরল-নিপতিত-মদনশরাদিব ভবদবনায় বিশালম্।

স্ব-হৃদয়মর্মানি বর্ম্ম করোতি সজলনলিনীদলজালম্।।'

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একটি পদে তার সার্থক রূপায়ণ। যেমনঃ

অহো নিশি মদন মারে তারে শরে।

হৃদয়ে নলিনীদল সংনাহা করে।।

অথবা, স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্।

সা মনুতে কৃশতনুরিব ভারম্।।

বড়ু চন্ডীদাস যার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেন -

তনের উপর হারে। আল মানএ যেহেন ভারে।

আতি হৃদয়ে খিনী রাধা চলিতে না পারে।।

অথবা, নিন্দতি চন্দনমিন্দু কিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্।

ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরম্।।

রাধাবিরহ অংশে -

নিন্দএ চান্দ চন্দন রাধা সব খনে।

গরল সমান মানে মলয় পবনে।।

বসন্তরঞ্জন রায় এই সব অনুবাদপ্রসঙ্গে বলেন, 'সর্বতোভাবে আদর্কের সৌন্দর্য্য রক্ষা করিয়া রীতিসিদ্ধ ভাষায় এমন কথায় কথায় অনুকরণ চন্ডীদাসেরই অনুরূপ।

শুধু এই স্বচ্ছন্দ বা ভাবানুবাদ নয়, কেবল বিষয় বা রচনা রীতিরই মিল নয়। উভয়ের মধ্যে গঠন সাদৃশ্যও বিদ্যমান।'

জয়দেবের পদগুলির ছন্দ পরবর্তীকালের বাংলা পদসাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করেছিল। পয়ার ও ত্রিপদীর আদিম রূপ গীতগোবিন্দের কোন কোন পদ

আকস্মিকভাবে ধরা পড়েছে। যেমনঃ

বিহরিত হরিরিহ সরসবসন্তে।

কিংবা, হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামম্

বিরহবিহিতমরণেব নিকামম্।।

পঙক্তিগুলি পাঠ করলেই পয়ার ছন্দের সুর কানে ধরা পড়ে। পাদাকুলক, ত্রিপদী, চৌপদী - যেখানে হতেই পয়ারের জন্ম হোক্ না কেন, গীতগোবিন্দের মধ্যে তার একটা আদিম রূপ প্রত্যক্ষ করা যাবে। এই যুগের ষোড়শ মাত্রার পাদাকুলক ছন্দ যে ধীরে ধীরে পয়ারে রূপান্তরিত হচ্ছিল তার প্রথম স্তর হল গীতগোবিন্দের এই পঙক্তিগুলি।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁর জয়দেব প্রবন্ধে লিখেছেন, "জয়দেব বৈষ্ণব পদাবলির আদি গঙ্গা-হরিদ্বার।"

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যের প্রিয় ছন্দ ত্রিপদীর সুরও গীতগোবিন্দের কোথাও কোথাও স্পষ্টভাবে মিলেছে।

পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিত-ভবদুপযানম্।

রচয়তি শয়নং সচকিত-নয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্।।

এমনকি আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত -

পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একী সন্ন্যাসী

বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে,

টিপ্পনী

এবং - সাগর জলে সিনান করি সজল এলো চুলে
বসিয়াছিলে উপল-উপকূলে।

এই পঙক্তিগুলির সঙ্গে,
বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী
হরতি দর তিমিরমতি ঘোরম্।

পঙক্তির ধ্বনিস্পন্দন প্রায় একই রকম।

দৌলত কাজীর 'সতী ময়না' কাব্যে সৈয়দ আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যে নায়িকাদের রূপ বর্ণনায় জয়দেবের প্রভাব পড়েছে।

কেবল মধ্যযুগ নয়, আধুনিককালেও মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই জয়দেবকে সাগ্রহ স্বীকৃতি দিয়েছেন। মধুসূদন যে জয়দেবের সঙ্গে গোকুলভবনে মানসপরিক্রমা করেছিলেন -

চল যাই, জয়দেব, গোকুল-ভবনে
তব সঙ্গে, যথা রঙ্গে তমালের তলে
শিখিপুচ্ছ চূড়াশিরে, পীতধড়া গলে
নাচে শ্যাম, বামে রাধা - সৌদামিনী ঘনে!

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কথাসাহিত্যে নায়িকার রূপ বর্ণনা, প্রকৃতি বর্ণনায় জয়দেবের ভাষা অনুসরণ করেছেন। ললিতলবঙ্গলতা নাম, আনন্দমঠে সত্যানন্দের ইঙ্গিতবহ গান, বিবিধ প্রবন্ধে বিদ্যাপতি জয়দেব প্রবন্ধ তার প্রমাণ। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের নবম পরিচ্ছেদে হরিদাসী বৈষ্ণবী সেজে যে গান ('ব্রজের সুখ রাই দিয়ে জলে/বিকাইনু পদতলে') গেয়েছে তা জয়দেবের 'স্মরগরলখন্ডনং' শ্লোককে মনে করিয়ে দেয়।

রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন, "গীতগোবিন্দ খানা যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না। জয়দেব যাহা বলিতে চাহিয়াছিলেন তাহা কিছুই বুঝি নাই, কিন্তু ছন্দে ও কথায় মিলিয়া আমার মনের মধ্যে যে জিনিষটা গাঁথা হইতেছিল তাহা আমার পক্ষে সামান্য নহে। আমার মনে আছে, 'নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তং' -এই লাইনটি আমার মনে ভারি একটি সৌন্দর্যের উদ্রেক করিত। ছন্দের ঝংকারের মুখে 'নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং' এই একটিমাত্র কথাই আমার পক্ষে প্রচুর ছিল। ... সেদিন আমি 'অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণং হরিবিরহ দহন বহনেন বহুদূষণং' - এই পদটি ঠিকমত যতি রাখিয়া পড়িতে পারিয়া সেদিন কতই খুশি হইয়াছিলাম। জয়দেব সম্পূর্ণ তো বুঝিই নাই, অসম্পূর্ণ বোঝা বলিলে যাহা বোঝায় তাহাও নহে তবু সৌন্দর্যে আমার মন এমন ভরিয়া উঠিয়াছিল যে, আগাগোড়া সমস্ত গীতগোবিন্দ একখানি খাতায় নকল করিয়া লইয়াছিলাম।" ('পিতৃদেব' অধ্যায়)

'নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং' গতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তং-এর স্মৃতিতেই কোন এক মেঘলা দিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ীর ভিতরে একঘরে খাটের উপর উপুড় হয়ে পড়ে একটি শ্লেট নিয়ে লেখা হল 'গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে' ('ভানুসিংহের কবিতা' অধ্যায়); তারপরের তিনটি লাইন হল -

'মৃদুল মধুর বংশি বাজে,
বিসরি ত্রাস লোকলাজে
সজনি, আও আও লো।'

কবে কোন্ বিস্মৃত অতীতে কবি জয়দেব লিখেছিলেন,
মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্ বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।।

টিপ্পনী

আধুনিককালের শ্রেষ্ঠতম কবি বর্ষামেদুর শ্যাম বঙ্গদেশে বসে কবি জয়দেবকে স্মরণ করে লিখেছিলেন -

যেথা জয়দেব কবি কোন বর্ষা দিনে
দেখেছিলা দিগন্তের তমাল-বিপিনে
শ্যামচ্ছায়াপূর্ণ মেঘ মেদুর অম্বর।

'কল্পনা' কাব্যের 'মদনভস্মের পূর্বে' ও 'মদনভস্মের পর' কবিতায়, 'মহুয়া' কাব্যের 'সাগরিকা', 'সোনার তরী' কাব্যের 'দুই পাখি' কবিতায় জয়দেবের ছন্দকে অনুসরণ করেছেন। তাই জয়দেবকে বাদদিয়ে কি প্রাচীন, কি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কোন যুগের আলোচনাই পূর্ণ হতে পারে না। বাংলা সাহিত্যে জয়দেবের প্রভাব সাম্পরতিক কাল পর্যন্ত অনতিক্রমণীয়। ভাব, ভাষা, ছন্দের সাগরিকা 'গীতগোবিন্দ' যেন পরবর্তী গোত্ররূপে প্রবহমান। জয়দেব তাই বাংলা সাহিত্যের আদিগুরু।

টিপ্পনী

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে জয়দেবের গুরুত্ব

ক) গীতগোবিন্দের মাধ্যমে বাংলার সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের সেতুবন্ধন রচিত হয়েছে।

খ) নতুন ছন্দচেতনা এনে বাংলা কাব্যে প্রাকৃত ছন্দস্পন্দন প্রেরণা জুগিয়েছেন।

গ) গীতগোবিন্দের নাটগীতি পালা শ্রীকৃষ্ণকীর্থনে অনুসৃত হয়েছে।

ঘ) অলৌকিক দেবকাহিনির মধ্যে রোমান্টিক মানবিক প্রণয়রাগ সঞ্চারিত করেছেন যার ফলে মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, নাথ সাহিত্য এবং সাধারণভাবে রাজসভার সাহিত্যে মানবিকতা প্রকাশের পথ সুগম হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ

বাংলা ভাষায় বিকাশের আগে বাঙালি কবিদের সাহিত্যচর্চা

বাংলা ভাষার বিকাশের আগে বাঙালি কবিরা মূলত সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছিলেন। সপ্তম শতকে বাণভট্ট তাঁর 'হর্ষচরিত'-এ বাংলা দেশের সংস্কৃত চর্চাকে 'গৌড়ী রীতি' আখ্যা দিয়েছিলেন। চন্দ্রগোমীর ব্যাকরণ, ভবদেব ভট্ট কিংবা হলায়ুধের স্মৃতিশাস্ত্র, সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্' প্রভৃতি পাল ও সেন যুগের বাঙালির সংস্কৃত সাহিত্য চর্চার উদাহরণ। এছাড়া সংস্কৃত ভাষায় 'সদুক্তিকর্ণামৃত' এবং প্রাকৃত ভাষায় লেখা 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' নামের সংকলনে প্রাচীন যুগের বাঙালির কাব্যচর্চার পরিচয় মেলে। 'ডাকার্ণব', 'দোহাকোষ' প্রভৃতি গ্রন্থ অপভ্রংশ ভাষায় লেখা সহজিয়া বৌদ্ধদের রচনা।

যুগবিভাগ

নানা সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক ঘটনা জাতির জীবনে উল্লেখযোগ্য বাঁকবদল ঘটায়। ফলে সাহিত্যেও তার প্রভাব পড়ে। যেমন বৌদ্ধ পালরাজাদের রাজত্বের শেষদিকে সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্মসাহিত্য 'চর্যাপদ' রচিত হয়েছিল। দ্বাদশ শতকে সেন-বর্মণ রাজারা হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ফলে এই সময়ে বেশ কিছু সংস্কৃত সাহিত্য (যেমন জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্') ও শাস্ত্রগ্রন্থ রচনার ক্ষেত্র তৈরি হয়। রাজা বল্লালসেন নিজেই 'দানসাগর', 'অদ্ভুতসাগর' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

আবার তেরো-চৌদ্দ শতকে তুর্কি আগমন বাংলার রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ঠিক তেমনি পনেরো শতকের শেষে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রি.) বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধে এদেশে ইংরেজ অধিকারের সূত্রপাত। তারপর

আমাদের সাহিত্যও বিদেশি সংস্কৃতির প্রভাবে নতুন রূপ নিল। এই সব তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা আর তার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া ভিত্তিতে বাংলা সাহিত্যকে কয়েকটি যুগে ভাগ করা চলে।

(১) প্রাচীন বা আদিযুগ

বাংলা ভাষার উদ্ভব থেকে তুর্কি আগমন-পর্ব কাল। আ. ৯৫০-১২০০ খ্রি., অর্থাৎ দশম থেকে বারো শতকের শেষ পর্যন্ত - আড়াইশো বছর।

যুগসন্ধিকাল

তুর্কি আগমন থেকে তুর্কি আধিপত্যের প্রথম পর্ব। আ. ১২০০ - ১৩৫০ খ্রি., অর্থাৎ তেরো শতকের সূচনা থেকে চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝি, এই দেড়শো বছর।

(২) মধ্যযুগ

(ক) আদি-মধ্যযুগ বা চৈতন্য-পূর্ব যুগ (১৩৫০ - ১৫০০ খ্রি.) [চৈতন্যদেব (১৪৮৬ - ১৫৩৩)]; (খ) চৈতন্যযুগ (১৫০০-১৬০০খ্রি.); (গ) অন্ত্যমধ্যযুগ বা চৈতন্য-পরবর্তী যুগ (১৬০০-১৭৫৭ খ্রি.)।

যুগসন্ধিকাল

(১৭৫৭-১৮০০ খ্রি., আনুমানিক পঞ্চাশ বছর)

(৩) আধুনিক যুগ (১৮০০ থেকে -)

আদি ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যঃ প্রধান ধারা ও রচনাকার

দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলা ব্যতীত অন্য ভাষায় রচিত বাংলার সাহিত্যিক নিদর্শন

বাংলা সাহিত্যের উদ্ভবের যুগে বাঙালি সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠ ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছে। সেইসব ভাষায় রচিত সাহিত্যের নিদর্শন তুলে ধরা হচ্ছে এই এককে। সৃজ্যমান বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপরে এগুলির প্রভাবের দিকটি উপেক্ষণীয় নয়।

সংস্কৃত

বাঙালি কবিরা সংস্কৃত মহাকাব্য, খন্ডকাব্য ও কোশকাব্য রচনা ও সম্পাদনা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। অভিনন্দ নামে বাঙালি কবি 'রামচরিত' কাব্য লেখেন। আর একজন অভিনন্দ যিনি গৌড়াভিনন্দ নামে পরিচিত তাঁর বেশ কিছু শ্লোক সংকলিত আছে 'রবীন্দ্ররচনাসমুচ্চয়', 'সদুক্তিকর্ণামৃত', 'সূক্তিমুক্তাবলী', 'পদ্যবলী', 'সুভাষিতাবলী' প্রভৃতি কোষকাব্যে। দুই অভিনন্দ একই ব্যক্তি হতে পারেন। তবে পন্ডিতদের মধ্যে এই বিষয়ে মতপার্থক্য আছে।

অভিনন্দ রচিত 'রামচরিত' চল্লিশ সর্গে রচিত। এই কাব্যের কাহিনী গৃহীত হয়েছে রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকান্ড ও যুদ্ধ কান্ড থেকে।

আর এখটি 'রামচরিত' কাব্যের বাঙালি রচয়িতা সন্ধ্যাকর নন্দী। বরেন্দ্রের অন্তর্গত 'পুন্ড্রবর্ধনে কবি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা প্রজাপতি নন্দী ছিলেন পালরাজ রামপাল দেবের

টিপ্পনী

টিপ্পনী

মন্ত্রী। কাব্যটি সম্ভবত দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধে রচিত। কাব্যটি শ্লেষকাব্য। দ্ব্যর্থবোধক শব্দের সাহায্যে কবি একই সঙ্গে রামায়ণের রামচন্দ্র এবং সঙ্গ অধিপতি, রামপালদেবের কীর্তিকাহিনী বর্ণনা করেছেন। চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই কাব্যটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। কেননা পালযুগের শেষদিকের ইতিহাস জানা যায় এই গ্রন্থ থেকে।

একাদশ শতকের কবি নীতিবর্মা মহাভারতের বিরাট পর্বের কাহিনী অনুসরণ করে 'কীচকবধ' নামে একটি কাব্য রচনা করেন। পাঁচ সর্গে রচিত এই কাব্যটি যতগুলি টীকা পাওয়া গেছে তার সবগুলিই রচনা করেছেন বাঙালি। সেইজন্য কবি নীতিবর্মাকে বাঙালি বলে অনুমান করা হয়। তিনি যে বাঙালি ছিলেন এমন কথা বলার মত কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই।

মহাভারত নল নময়ন্তী আখ্যান অবলম্বনে শ্রীহর্ষ রচনা করেন 'নৈষধচরিত' নামে একটি কাব্য। কাব্যটির প্রধান গুণ পদলালিত্য। কাব্যটিতে বেশ কিছু বঙ্গদেশীয় আচার ও সংস্কারের উল্লেখ আছে। সেই জন্য কবিকে বাঙালি বলে অনুমান করা হয়।

এই পর্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাব্য হল জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'। জয়দেব গৌড়ের রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন। কাব্য থেকে জানা যায় কবির পিতার নাম ভোজদেব, মাতার নাম বামাদেবী। জন্মস্থান সম্পর্কে কবি নিজে কিছু বলেন নি। বিষয়টিকে নিয়ে বিতর্ক চালিয়েছেন পন্ডিতেরা। বীরভূম জেলার অন্তর্গত কেঁদুলি গ্রামকে কবির জন্মস্থান হিসাবে অনেকে দাবি করেছেন। পূর্ববঙ্গের বগুড়া জেলার কেন্দুলি গ্রামকেও কবির জন্মস্থান হিসাবে দাবি করা হয়েছে। অধিকাংশ পন্ডিতের দাবি হল এই যে জয়দেব বাঙালি ছিলেন। মিথিলাবাসীরা এবং ওড়িশাবাসিরা কবির জন্মস্থান হিসাবে যথাক্রমে তিরহুত জেলার কেন্দোলি গ্রাম ও পুরীর কাছে অবস্থিত বিন্দুবিল্ব গ্রামের নাম করে থাকেন। রাধাকৃষ্ণের রাসলীলাকে কবি দ্বাদশসর্গে রূপ দিয়েছেন। খন্ডকাব্য ও মহাকাব্য - দুই ধরনের কাব্যের লক্ষণ পাওয়া যায় বইটিতে। বাঙালি বৈষ্ণবসমাজে জয়দেব আদিকবি হিসাবে বিবেচিত। তাঁর রচিত রাধাকৃষ্ণলীলার বিবরণ মধ্যযুগের বাংলা বৈষ্ণবপদাবলির উৎসমুখ খুলে দিয়েছে।

সেন রাজসভার আর একজন খ্যাতিমান কবির নাম 'আর্যাসপ্তশতী' রচয়িতা আচার্য গোবর্ধন। উক্ত কাব্যের শ্লোকগুলি প্রেমমূলক। গ্রন্থটিতে কোন ধারাবাহিক আখ্যান নেই। খন্ড কবিতা দ্বারা 'আর্যাসপ্তশতী' পরিপূর্ণ। কবি বাঙালি ছিলেন। পিতার নাম নীলাম্বর।

পবনদূত রচয়িতা ধোয়ী ছিলেন লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি। সুহ্মদেশের বর্ণনা আছে কাব্যে।

কোশকাব্য বা সংকলনকাব্যে বাঙালি কবিরা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। প্রাপ্ত কোশকাব্যগুলির মধ্যে প্রাচীনতম হল বিদ্যাকরের 'সুভাষিতরত্নকোষ'। বিদ্যাকর সম্ভবত পালরাজত্বের শেষদিকে আবির্ভূত হন। সংকলনের সময় দ্বাদশ শতক। সংকলনের ধৃত অঙ্গোক, ডিম্মোক, সরোক প্রমুখ কবিরা বাঙালি ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। গ্রন্থটির একটি খন্ডিত পুঁথি প্রথমে নেপালে পেয়েছিলেন এফ.ডবি-উ.টমাস। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে এটির সম্পাদনা করেন তিনি। টমাস এটির নাম দেন 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়'। পরবর্তী সময়ে সম্পূর্ণ পুঁথি আবিষ্কৃত হয়। তখন গ্রন্থের আসল নাম ও সংকলকের নাম পাওয়া যায়।

তুর্কি আক্রমণের অব্যবহিত পরে (১২০৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি-মার্চ) শ্রীধর দাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃত' নামক সংকলনের কাজ সমাপ্ত হয়। আরম্ভ হয় তুর্কী আক্রমণের আগে। কবির পিতা বটু দাস ছিলেন লক্ষ্মণ সেনের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও রাজকর্মচারী। 'সদুক্তিকর্ণামৃত' গ্রন্থের তালিকায় অনেক বাঙালি কবির নাম আছে। যেমন - লক্ষ্মণ সেন, কেশব সেন, উমাপতি ধর, গোবর্ধন আচার্য, শরণ, কমল গুপ্ত, যজ্ঞ ঘোষ, প্রভাকর দত্ত, কালিদাস নন্দী প্রভৃতি। কোন কোন রচনায় পল্লী জীবনের শান্ত ছবি ও দরিদ্র গৃহস্থালির পরিচয় পাওয়া

যায়। বাঙালির খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, ধর্মাচার প্রভৃতির পরিচয় ফুটে উঠেছে অনেকগুলি শ্লোকে।

অনেকের দাবি 'বেণিসংহার' নাটক প্রণেতা ভট্টনারায়ণ, 'অনর্ঘরাঘব' প্রণেতা মুরারি, 'মুদ্রারাক্ষস' প্রণেতা বিশাখ দত্ত এবং 'চণ্ডকৌশিক' প্রণেতা ক্ষেমীশ্বর বাঙালী ছিলেন। এই দাবির পিছনে কোন জোরালো প্রমাণ নেই। 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' রচয়িতা কৃষ্ণমিশ্রকেও বাঙালি বলে মনে করা হয়। নাটকে গৌড়, রাঢ়াপুরী প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ থেকে তাকে বাঙালি বলে অনুমান করা হয়।

বৈয়াকরণ চন্দ্রগোমী বাঙালি ছিলেন। বরেন্দ্রভূমিতে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর 'চান্দ্রব্যাকরণ' পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'র সংক্ষিপ্ত সহজ রূপ।

টিপ্পনী

পালি

পালি বিশেষজ্ঞ বিধুশেখর শাস্ত্রীর মতে 'পংক্তি' শব্দ থেকে 'পালি' শব্দের উৎপত্তি। পংক্তি বলতে শাস্ত্র পংক্তিকে বোঝান হয়। পরেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন - "প্রথম যুগে পালি বলতে বৌদ্ধ শাস্ত্রের পংতি বা মূল শাস্ত্র ত্রিপিটককে (বিনয়, সূত্ত, অভিধম্ম-পিটক) বোঝান হত; পরে ক্রমে ক্রমে ক্রিপিটকের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত যে কোন গ্রন্থই পালি নামে অভিহিত হত।" সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, আর্যাবর্তের 'মধ্যদেশ' (বর্তমান দিল্লি-মিরাট-মথুরা) এবং মূলত এই অঞ্চলের শিক্ষিত 'শিষ্ট'জনের ভাষার উপর ভিত্তি করে পাণিনি সংস্কৃত ভাষায় ধ্রুপদী ছাঁদটি রচনা করেছিলেন। মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার যুগে এখানকার শৌর সেনী প্রাকৃত ছিল সংস্কৃতের সবচেয়ে নিকট সম্পর্কিত ভাষা। শৌরসেনীর পূর্বতন রূপের উপরে ভিত্তি করে পালি ভাষা গড়ে তোলা হয়েছিল। সুকুমার সেনের মত হল - "দক্ষিণ পশ্চিমা ও প্রাচ্যমধ্যার মিলনে সম্ভবত প্রথমে কেন্দ্রীয় উজ্জয়িনী অঞ্চলে উদ্ভূত দেশিবিদেশি সর্বসাধারণের ব্যবহার্য যে মধ্যভারতীয় সাধুভাষা যাহাকে সেকালের Lingua franca বলিতে পারি - তাহা হইতে পালি উৎপন্ন।"

মূলত মধ্যদেশের প্রাকৃতের উপর ভিত্তি করে সবরকমের প্রাকৃতেরই উপাদান গ্রহণ করে পালি গড়ে উঠেছিল। পালি ভাষার বিস্তারকাল হল খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পর থেকে পালিভাষায় সৃজনশীল রচনা বন্ধ হয়ে যায়। এরপরে মূলত এই ভাষায় দক্ষিণ ভারতে টীকা-ভাষ্য রচনার চর্চা চলতে থাকে। বৌদ্ধধর্মের মূল গ্রন্থ ত্রিপিটক পালি ভাষায় রচিত হলেও মহাযানী বৌদ্ধরা পালিভাষা ব্যবহার করতেন না। তাঁদের গ্রন্থরচনায় তাঁরা বিশেষ এক ধরনের, ঈষৎ সরলীকৃত সংস্কৃত ভাষাই ব্যবহার করতেন। এই ভাষার নাম বৌদ্ধ সংস্কৃত বা মিশ্র সংস্কৃত। 'দিব্যাবদান' 'অবদানশতক'। প্রভৃতি গ্রন্থ এই ভাষায় রচিত। বৌদ্ধ সংস্কৃতের স্থিতিকাল খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টীয় ৩০০ অব্দ পর্যন্ত।

পালি ভাষা এবং বৌদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় বাঙালিরা দশম-দ্বাদশ শতকে কিছু রচনা করেছেন এমন কথা জোর করে বলা যাবে না। তবে শৌরসেনী অপভ্রংশ বাঙালির রচিত বৌদ্ধধর্মগ্রন্থের নিদর্শন আছে। যেমন সরহপাদের দোহাকোষ, তিল্লোপাদের দোহা, কাহ্নপাদের দোহা প্রভৃতি। এগুলির ভাষায় পালি ও বৌদ্ধ সংস্কৃতের প্রভাব আছে।

প্রাকৃত

পূর্বভারতে মাগধী প্রাকৃতের বশবহার ছিল। মাগধী প্রাকৃতে এবং অন্যান্য প্রাকৃতে লেখা অল্প রচনা পাওয়া গেছে।

হালের 'গাহাসওসঙ্গ' মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে লেখা কবিতা সংগ্রহ। সংকলকের নাম হাল। এই গ্রন্থে প্রথম রাধার উল্লেখ আছে। মধ্যযুগের বাংলা বৈষ্ণব পদের উপর এর প্রভাব পড়েছে। এই বই এর দু-একটি শ্লোকে বাংলাদেশের জনজীবন মূর্ত হয়ে উঠেছে।

আর একটি সংকলন গ্রন্থের নাম 'প্রাকৃতপৈঙ্গল'। প্রাকৃত ছন্দে অভিজ্ঞ করে তোলার জন্য বিশেষ উদ্দেশ্যে এই সংকলন গ্রন্থটি লেখা হয়েছে। সংকলকের নাম পিঙ্গল। শৌরসেনী প্রাকৃত ও অপভ্রংশে বইটি লেখা। এর কোন কোন শ্লোকে বাঙালি জীবনের ছায়াপাত আছে। কৃষ্ণকথার কিছু উপাদান এখানে পাওয়া যায়।

টিপ্পনী

অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার দুটি রূপ ছিল - একটি সাহিত্যিক, অন্যটি কথ্য। কথ্যরূপের তিনটি আঞ্চলিক ভেদ বা উপভাষা ছিল - প্রাচ্য, উদীচ্য ও মধ্যদেশীয়। কথ্য রূপগুলি থেকে জন্ম হয়েছে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার অর্থাৎ প্রাকৃতের। মধ্য ভারতীয় আর্যের চারটি উপভাষা (১) উত্তর-পশ্চিমা, (২) পশ্চিমা বা দক্ষিণ-পশ্চিমা (৩) প্রাচ্য-মধ্যা এবং (৪) প্রাচ্য। এই আঞ্চলিক রূপগুলির উপর ভিত্তি করে সাহিত্যিক ভাষার রূপ গড়ে ওঠে। সাহিত্যিক প্রাকৃতের পাঁচটি উপভাষা - (১) পৈশাচী (উত্তর-পশ্চিমা থেকে), (২) শৌরসেনী (পশ্চিমা বা দক্ষিণ-পশ্চিমা থেকে), (৩) মাহারাষ্ট্রী (পশ্চিমা ব দক্ষিণ-পশ্চিমা থেকে) (৪) অর্ধমাগধী (প্রাচ্য-মধ্যা থেকে) এবং মাগধী (প্রাচ্যা থেকে)।

প্রত্যেক শ্রেণির সাহিত্যিক প্রাকৃতের ভিত্তিস্থানীয় যে মৌখিক প্রাকৃত ছিল তা লোকমুখে পরিবর্তিত হয়ে অপভ্রংশ ভাষার সৃষ্টি করেছিল। অপভ্রংশেরই শেষ রূপ অবহট্‌ঠ।

'প্রাকৃত পৈঙ্গল-এ' বাঙালি অবহট্‌ঠ কবির কবিতা পাওয়া যায়। যেমন -

সোম হ কন্তা
দূর দিগন্তা।
পাউস আএ
চেউ চলা এ।।

অনুবাদ- সেই মোর কান্তা দূর দিগন্তে। প্রাবৃট আসে চিত্ত বিচলিত।

কোন কোন অবহট্‌ঠ কবিতায় বাঙালির বাস্তব জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন - 'ওগ্‌ গর ভত্তা, রম্ভঅ পত্তা, গাইক ঘিত্তা, দুগ্ধ সজুত্তা ইত্যাদি।'

বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির প্রাককথা

বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির পূর্বে বাঙালিদের রচিত সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ সাহিত্য এবং বাংলা সাহিত্যে সেগুলির প্রভাবঃ

চর্যার কালই যে বাংলা ভাষার জন্মের উষালগ্ন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বাংলা সাহিত্য ইতিহাসেরও সূচনা এখান থেকেই। কিন্তু ইতিহাসেরও ইতিহাস আছে। আর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় বাঙালির সেই প্রাচীনতম ঐতিহ্যের পরিচয় নিঃসন্দেহে প্রাসঙ্গিক। কারণ বাংলা সাহিত্যের জন্মলগ্ন সেই ঐতিহ্যের দ্বারাই একান্তভাবে পরিপুষ্ট। সুতরাং বাংলাদেশে আর্যভাষআ প্রবর্তিত হবার পর থেকে সংস্কৃত এবং প্রাকৃত অপভ্রংশে যা কিছু রচিত হয়েছে তার আলোচনা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের মুখ্য অঙ্গ না হলেও উপক্রমণিকা রূপে গণ্য।

কাজেই আমরা বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির পূর্বেকার সাহিত্যকে তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি-

(ক) সংস্কৃত সাহিত্য।
(খ) প্রাকৃত সাহিত্য।

(গ) অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ সাহিত্য।

সংস্কৃত সাহিত্যঃ

বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষায় রচিত সাহিত্যের ইতিহাসকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা চলে-

(১) প্রস্তর, তাম্রপত্র, মন্দিরগাত্র প্রভৃতিতে উৎকীর্ণ রাজকীয় শাসন, দেবমাহাত্ম্যজ্ঞাপক শ্লোক, শিলালেখ প্রভৃতিঃ মৌর্য যুগেই বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য আর্যসংযোগ ঘটে বলে পন্ডিতেরা মনে করেন। কিন্তু এ যুগেও বাঙালির সাহিত্য সাধনার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রাচীনতম শিলালিপি পাওয়া গেছে বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে, যা পূর্বীপ্রাকৃতে রচিত লিপিটি খন্ডিত, ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা। অনুমিত হয়েছে লিপিটি মৌর্য যুগের। হয়ত খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় শতকে তা উৎকীর্ণ হয়েছিল। এর পরবর্তী প্রামাণিক লিপিটি শুশুনিয়া পাহাড়ে সংস্কৃত ভাষায় উৎকীর্ণ হয়ে আছে। রাজা চন্দ্রবর্মা উৎকীর্ণ করেছিলেন। প্রত্নবিশারদদের মতে এটির লিপিকাল খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী। এছাড়াও গুপ্তযুগের এমন অন্তত আটটি তাম্রলিপি পাওয়া গেছে।

এইসব তাম্রলিপিগুলি মূলত পুরাণাশ্রয়ী এবং তা সেন ও বর্মন বংশের শাসনকালে উৎকীর্ণ। যেমন, কাটোয়ার কাছে সীতাহাটি-নৈহাটিতে প্রাপ্ত বল্লালসেনের শাসনের আরম্ভ শ্লোকঃ

সন্ধ্যাতান্ডবসম্বিধানবিলসান্নান্দী নিনাদোর্ম্মিভি
নির্ম্মর্য্যাদরসার্ণবো দিশতু বঃ শ্রেয়োর্দ্ধ নারীশ্বরঃ।
যস্যার্দ্ধে ললিতাঙ্গহারবলনৈরর্দ্ধে চ ভীমোদ্ভটে
নাট্যারম্ভরয়ৈর্জায়ত্যভিনবদ্বৈধানুরোধশ্রমঃ।।

অনুবাদঃ 'যাঁহার অর্দ্ধাঙ্গে সুললিত অঙ্গচেষ্টায় এবং অপর অর্দ্ধাঙ্গে ভীমোদ্ভট নাট্যারম্ভ - প্রচেষ্টায় অভিনয়দ্বয়ানুরন্ধন্ধ শ্রম উদ্ভুত হইতেছে, সন্ধ্যাতান্ডবোৎসবে উদ্যত নান্দীনিনাদরূপ ঊর্মিতে উদ্বেলিত রসার্ণব যাঁহার স্বরূপ সেই অর্দ্ধনারীশ্বর তোমাদের শ্রেয় বিধান করুন।' (সুকুমার সেন - বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - প্রথম খন্ড, পূর্বার্ধ, পৃষ্ঠা ২৯-৩০)

(২) সাহিত্যের বিষয় যথা - নিবন্ধ, ব্যাকরণ ইত্যাদিঃ খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর আগে বাংলাদেশে সাহিত্য -গুণান্বিত গদ্য বা পদ্য লেখার নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে সপ্তম শতাব্দীর আগেই সাহিত্যের বিষয়ে বাঙালির সংস্কৃত রচনার পরিচয় খুব দুর্লভ নয়। এদের মধ্যে প্রাচীনতম হচ্ছে পালকাপ্য রচিত 'হস্ত্যায়ুর্বেদ' গ্রন্থ। বিখ্যাত 'চান্দ্রব্যাকরণে'র প্রণেতা চন্দ্রগোমী আলোচ্য যুগের বাংলায় আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে অনুমিত হয়। 'লোকানন্দ' নামক নাটক এবং 'শিষ্যলেখ' নামক ধর্মকাব্যের রচয়িতা ছিলেন ঐ একই চন্দ্রগোমী।

'গৌড় পাদকারিকা' নামক আগমশাস্ত্রের লেখক পরিচয় সম্পর্কে মতানৈক্য আছে। কথিত আছে, গ্রন্থকার গৌড়পাদ শুকদেবের শিষ্য এবং শঙ্করাচার্যের পরম গুরু ছিলেন। এই রচনা খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে রচিত।

বাংলাদেশে কিছু ন্যায়বৈশেষিক সংক্রান্ত তর্কবিদ্যা এবং অনেকগুলি ধর্মশাস্ত্র রচিত হয়েছিল। এদের মধ্যে শ্রীধর ভট্টের 'ন্যায়কন্দলি' নামক টীকাটি উল্লেখযোগ্য। ভবদেব ভট্টের 'ব্যবহারতিলক', 'প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ', জীমূতবাহনের 'দায়ভাগ', 'ব্যবহারমাতৃকা', হলায়ুধের 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' প্রভৃতি গ্রন্থে বাঙালির উচ্চকোটির সমাজগঠনের বিচিত্র প্রকরণ বর্ণিত হয়েছে।

বৌদ্ধ মহাযান ও সহজযান মতাবলম্বী বাঙালি যোগী ও তান্ত্রিক সাধক সিদ্ধেরা সংস্কৃত ভাষায় দর্শন ও যোগতত্ত্বঘটিত কিছু গ্রন্থ, দেবদেবীর স্তব ও পূজা সাধন-বিষয়ক

টিপ্পনী

নিবন্ধ লিখেছিলেন। এঁদের মধ্যে শীলভদ্র, অতীশ দীপঙ্কর, সরহপাদ, কৃষ্ণপাদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

(৩) প্রকীর্ণ কবিতাঃ সেকালের বাঙালি কবিরা বড় বড় কাব্য অপেক্ষা ছোট ছোট কবিতা অথবা খুচরা শ্লোক রচনায় বেশি তৎপর ছিলেন, এবং এইসব শ্লোকে বাঙালির লিরিক-প্রতিভা একটা নূতন প্রকাশ-রীতি লাভ করেছিল। সাহিত্যে বাঙালির এই প্রগতিপরায়ণতা একাদশ-দ্বাদশ শতকের পূর্বেই প্রকট হয়েছিল। এই সময়ের বাংলাদেশে সংস্কৃত কবিতা রচনা ও রসচর্চার বিস্তার ছিল বিচিত্র। বিদ্যাধর সংকলিত 'সুভাষিত রত্নকোষ' তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বস্তুত তুর্কী আক্রমণ পূর্ব বাংলাদেশে কবিতাকৃতির সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন ধরা আছে 'সুভাষিত রত্নকোষ' এবং 'সদুক্তিকর্ণামৃত' নামক সংকলন গ্রন্থে। সংকলনকাল অনুমিত হয়েছে দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগ - তখনও বঙ্গে পালরাজত্ব চলছে।

বস্তুত বিদ্যাধর সংকলিত 'সুভাষিত রত্নকোষ' সংস্কৃত ভাষায় প্রথম সংকলিত কোষকাব্য-এর আগে প্রকীর্ণ শ্লোকসংগ্রহের অনুরূপ উদ্যম আর দেখা যায়নি। এতে প্রায় ১৫০ জন কবির ১৭৩৮টি প্রকীর্ণ শ্লোক গৃহীত হয়েছে। সকলেই কিন্তু বাঙালি কবি ছিলেন না। কালিদাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সর্বভারতীয় কবিগোষ্ঠীর শ্লোকও গৃহীত হয়েছে। বাঙালি কয়েকজন কবির নাম এই কোষগ্রন্থ ছাড়া আর কোথাও পাওয় যায়নি। সংস্কৃত ভাষায় প্রকীর্ণ কবিতা রচনায় বাঙালি কবিকুল একাদশ শতকের আগেই সাধারণভাবে যে সাবলীলতা অর্জন করেছিলেন, তারই ঐতিহাসিক দলিল এই গ্রন্থ।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙালীর দান' গ্রন্থে জানিয়েছেন, 'সুভাষিত রত্নকোষ'-এর অংশবিশেষ হল 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' নামক সংকলন গ্রন্থ। এই সংকলনের সম্পাদক এফ. ডবলিউ. টমাস সমগ্র পুঁথিটিকে 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' নামে অভিহিত করেছেন। এই গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা কে তা জানা যায় না। তবে সঙ্কলয়িতা যে একজন বৌদ্ধ ছিলেন তার প্রমাণ হল এই গ্রন্থের প্রথম দুটি ব্রজ্যায় বৌদ্ধ কবিতাগুলি সংগৃহীত হয়েছে। সম্ভবত কোন বাঙালি ছিলেন এক সঙ্কালক; কারণ, কবিতাসমষ্টির অনেকগুলি বাঙালি কবিদের (গৌড় অভিনন্দ, মধুশীল, শ্রীধর নন্দী) রচনা। গ্রন্থটিতে মোট ৫২৫টি কবিতা আছে। কবিরা কেউই একাদশ শতাব্দীর পরবর্তী নয়। তাই খ্রিস্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকের মধ্যে গ্রন্থখানি সংকলিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়।

গ্রন্থের কবিতাগুলি লিরিকধর্মী। বিভিন্ন ঋতুর বর্ণনা বেশ লাবণ্যময়। 'হরিব্রজ্যায়' উদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে রাধা-কৃষ্ণ লীলার মধুর রসের পরিচয় পাওয়া যায়। এভাবে 'ব্রজ্যা' ক্রমে সংকলের কবিতাগুলি সজ্জিত। প্রথমেই 'সুগত ব্রজ্যা'। তারপর 'লোকেশ্বর ব্রজ্যা'।

তারপর 'হরিব্রজ্যা' ও 'সূর্যব্রজ্যা'। এরপর 'বসন্ত', 'মালিনী', 'বিরহিণী' প্রভৃতি ব্রজ্যা।

'হরিব্রজ্যা'য় ২১ নং শ্লোকে রাধা কৃষ্ণের রহস্যমধুর চিত্রের পরিচয় রয়েছে। যেমন,

কোহয়ং দ্বারি হরিঃ প্রয়াহ্যুপবনং শাখা মৃগেনাত্র কিং
কৃষোহহং মধুসূদনো ব্রজ লতাং তামেব পুষ্পাসবাম্
ইত্থং নির্বচনীকৃতো দয়িতয়া হ্রীণো হরিঃ পাতু বঃ।।

অনুবাদঃ "দ্বারে কে ও? হরি। শাখামৃগের এখানে প্রয়োজন কি? উপবনে যাও। ওগো দয়িতে, আমি কৃষ্ণ। কৃষ্ণ! তবে তো আরও ভয় পাইতেছি। বানর কি কালো? ওগো মুগ্ধে, আমি মধুসূদন। তাহা হইলে মধু পুষ্পলতার কাছে যাও। প্রিয়াদ্বারা এই প্রকারে নিরুত্তরীকৃত লজ্জিত হরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন।" (জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী- প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার - দ্বিতীয় খন্ড, ১৩৭১)

টিপ্পনী

রাধাকৃষ্ণের এই লীলাই বর্ণিত হয়েছে জয়দেবের গীতগোবিন্দে এবং পরবর্তীকালের বৈষ্ণব পদাবলিতে। আসলে 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' গৌড়ীয় রাধাকৃষ্ণলীলার প্রাকরূপ। বিরহিণী বা অসতীব্রজ্যায় যে সব লৌকিক প্রেমের কবিতা রয়েছে, তার প্রভাব পড়েছে বৈষ্ণব পদাবলীতে। রাধাকৃষ্ণ প্রেমের সূক্ষ্মতা ও সৌকুমার্য সম্পাদনে বৈষ্ণব পদকর্তাগণ 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে'র শ্লোকগুলির কাছে ঋণী। যেমন 'বিরহিণী ব্রজ্যা'র একটি শ্লোক -

মা মুঞ্চাগ্নিমুচঃ করান্ হিমকরং প্রাণাঃ ক্ষণং স্থীয়তাম্।।
নেত্রে মুদ্রয় লোচনে রজনি হে দীর্ঘাতিদীর্ঘো ভব।।

অনুবাদঃ সূর্য যেন উদিত না হয়, স্নিগ্ধ কিরণ কঠিন হউক, প্রাণ একটু স্থির হও। ওগো নিদ্রে, লোচনদ্বয়কে মুদ্রিত কর, ওগো রজনি, তুমি দীর্ঘাতিদীর্ঘ হও। (জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী- পুর্বোক্ত)

মিলনের ক্ষণকে দীর্ঘতর করবার জন্য ভাবী বিরহের আশঙ্কায় শঙ্কিতা নায়িকার কাতরোক্তি পরবর্তী বৈষ্ণব পদকর্তাদের প্রভাবিত করেছে।

বাংলাদেশে সংকলিত আর একটি জনপ্রিয় চয়নিকা হল 'সদুক্তিকর্ণামৃত'। এই চয়নিকার সংকলক হলেন রাজা লক্ষ্মণসেনের 'প্রেমৈক পাত্র সখা' বটুদাসের সুযোগ্য পুত্র 'মহামাণ্ডলিক' শ্রীধর দাস। এই চয়নিকাতে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের বাঙালির জীবন ও সমকালীন সমাজের যে প্রতিফলন প্রতিফলিত হয়েছে সেদিক থেকে উক্ত গ্রন্থের গুরুত্ব যথেষ্ট। মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে এই চয়নিকার প্রভাব অপরিসীম।

১২০৬ খ্রিস্টাব্দে 'সদুক্তিকর্ণামৃত' সংকলিত হয়। এতে মোট পাঁচটি প্রবাহ এবং এক একটি প্রবাহে কয়েকটি বীচি এবং প্রত্যেক বীচি-তে পাঁচটি করে কবিতা সংগৃহীত হয়েছে। কবিতার সংখ্যআ ২৩৭০টি এবং মোট কবির সংখ্যা ৪৮৫ জন। এতে অজ্ঞাত পরিচয় ৮০ জন কবি (সম্ভবত বাঙালি) ছাড়া কালিদাস, ভাস, ভামহ, ভর্তৃহরি, উমাপতিধর, জয়দেব প্রভৃতি বাঙালি কবিদের শ্লোক স্থান পেয়েছে।

সদুক্তিকর্ণামৃতের মতো সংকলন গ্রন্থের গুরুত্ব যথেষ্ট। যেমন, (এক) চয়নিকার সংগৃহীত শ্লোকাবলী থেকে বাংলার চিরকালীন রূপ, বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, ধর্ম-দর্শন এবং বাংলার বৈষ্ণব ও শাক্ত সাহিত্যের স্বরূপ সম্পর্কে বহু তথ্য সংগ্রহ করা যায়। (দুই) মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে এই সংকলন গ্রন্থের প্রত্যক্ষ প্রভাব না পড়লেও পরোক্ষভাবে বৈষ্ণব পদাবলিতে এবং মঙ্গলকাব্যে দৈনন্দিন জীবনবিষয়ক কবিতাগুলির প্রতিফলন পড়েছে। (তিন) বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির পূর্বে বাঙালি যে বিভিন্ন শ্লোক রচনার মধ্য দিয়ে তার লিরিকধর্মী মনের পরিচয় প্রকাশ করছিল, তার প্রমাণ মেলে এই সংকলন গ্রন্থে। (চার) গ্রন্থটি বাঙালি কবিদের রচিত এবং বাঙালি দ্বারা সংকলিত পদসংকলন গ্রন্থ। (পাঁচ) ক্ষিতিমোহন সেন এই গ্রন্থ সম্পর্কে বলেছেন, "নানা কবির রচনা হইতে মাধুকরী বৃত্তিতে সংগ্রহ করিবার কাজটা হয়তো বাঙলাদেশেই আরম্ভ হইয়াছিল।"

'সদুক্তিকর্ণামৃতে'র কয়েকটি নমুনাঃ

(এক) শালিচ্ছেদসমৃদ্ধ হালিকগৃহাঃ সৃষ্টনীলোৎপল
স্নিগ্ধশ্যামযবপ্ররোহ নিবিড় নব্যাদীর্ঘসীমোদ্রাঃ।
মোদন্তে পরিবৃত্তধেন্বনডুহশ্ছাগাঃ পলালৈর্ণবৈঃ
সংসক্তস্বনাদিক্ষুয়ন্ত্রমুখরা গ্রামাগুড়া মোদিনঃ।।

অর্থাৎ, পৌষমাস পাকা ফসলের মাস। এই সময় হালিকের ঘর শআলিধানে পূর্ণ হয়, মাঠে মাঠে ষাঁড় ও ছাগল চরে বেড়ায়, গ্রামগুলি ইক্ষুযন্ত্রের শব্দে মুখর হয়ে ওঠে।

টিপ্পনী

(দুই)   চলৎকাষ্ঠং গলৎকুড্যমুত্তানতৃণসঞ্চয়ম্।
গন্ডু পদার্থি মুন্ডুকাকীর্ণ জীর্ণং গৃহং মম।।

এখানে কুটিরে ঘেরা বাংলার গ্রামের চিরদারিদ্রের ছবি। বর্ষায় কাঠের খুঁটি প্রায় ভেঙে পড়ে, মাটির দেওয়াল ধ্বসে যায়, জীর্ণ গৃহ মুন্ডুকাকীর্ণ হয়ে পড়ে।

(তিন)   রত্নচ্ছায়াস্ফুরিত জলধৌ মন্দিরে দ্বারকায়া
রম্নক্মিণ্যাপি প্রবল পুলকোদ্ভেদয়ালিঙ্গিতস্য।
বিশ্বং পারান্ মসৃণযমুণাতীরবানীরকুঞ্জে
রাধাকেলিভরপরিমলধ্যানমূর্ছা মুরারেঃ।।

টিপ্পনী

অনুবাদঃ রত্নচ্ছায়াস্ফুরিত জলধির তীরে দ্বারকার মন্দির মধ্যে প্রবলভাবে পুলকিত রম্নক্মিণীর আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়াও শ্যামল যমুনাতীরের বেতসকুঞ্জে রাধারা সঙ্গে প্রেমক্রীড়ার মহত্ত্ব ও মাধুর্য ধ্যান করিতে করিতে মুরারির যে মূর্চ্ছা তাহা বিশ্বকে পালন করম্নক। (সুকুমার সেন - বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খন্ড-পূর্বার্ধ)

(চার) ধূমেন রিক্তমপি নির্ভর বাষ্পকারি দূরকৃতানলমপি প্রতিপন্ন তাপম্।
দৈন্যাতিশূন্যমপি ভূষিত বন্ধুবর্গ আশ্চর্য্যমেব খলু খেদকরং।।

অনুবাদঃ দরিদ্রের গৃহ ধূমশূন্য হইয়াও বাষ্প পরিপূর্ণ, আগুন না থাকিলেও তাপ রহিয়াছে, দৈন্যের দ্বারা শূন্য, কিন্তু ভূষিত বন্ধুবর্গের দ্বারা পূর্ণ - ইহাই আশ্চর্য এবং বেদনাপূর্ণ। (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত - প্রথম খন্ড)

(৪) কাব্য নাটক ইত্যাদিঃ অতি প্রাচীন কালে যাকে রসসাহিত্য বলে, যার দ্বারা একটা জাতির প্রাণ ও মনের গূঢ় রহস্য আবিষ্কার করা যায়, বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষায় সেরূপ সাহিত্যের বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। তার কারণ সেনযুগের যখন নূতন করে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যানুশীলন আরম্ভ হয়েছে তখন প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে অবক্ষয়ের যুগ আরম্ভ হয়ে গেছে। অপভ্রংশ সাহিত্যের ছায়াতল ছেড়ে উত্তর ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাসমূহ কেবল স্বাতন্ত্র্য লাভ করছিল; সুতরাং এতদঞ্চলে সংস্কৃত ভাষায় বিশুদ্ধ সাহিত্য রচনার বিশেষ অবকাশ ঘটেনি।

কয়েকখানি সংস্কৃত নাটকের নাট্যকার বাঙালি ছিলেন, অথবা দু-একটি সংস্কৃত নাটক বাংলাদেশএ রচিত হয়েছিল, এমন লোকশ্রুতি প্রচলিত আছে। বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস'; নারায়ণ ভট্টের 'বেণীসংহার'; মুরারির 'অনর্ঘরাঘব'; ক্ষেমীশ্বরের 'চন্ডকৌশিক' এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু নাটকগুলিতে এমন কোন উল্লেখ নেই, যার দ্বারা নাট্যকারদের জাতকুল নির্ণয় করতে পারা যায়।

কাব্যের ক্ষেত্রেও শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত, নীতিবর্মার কীচকবধ প্রভৃতি বাঙালি কবির রচনা বলে দাবি করা হলেও সেই দাবির পিছনে ঐতিহাসিক প্রমাণের যথেষ্ট অভাব আছে। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত'-ই এ সময়কার বাঙালির সাহিত্যকর্মের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ নিদর্শন। রচনাটি শেস্নষ কাব্যের উৎকৃষ্ট প্রতিনিধিরূপে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু কাব্যকাহিনীতে রামকথা যেমন প্রাঞ্জলরূপে প্রকাশিত হয়েছে, বঙ্গাধিপ রামপালদেবের ইতিহাস তেমন সুব্যক্ত হয়নি।

বাংলার রাজনৈতিক ঘটনাবলিঃ দশম-দ্বাদশ শতাব্দী

ভারতের ইতিহাসে গৌড়রাজ্যকে যিনি প্রথম প্রাধান্য লাভের সুযোগ করে দেন তিনি হলেন 'গৌড়ভুজঙ্গ' শশাঙ্ক। সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে 'গৌড়'কে (উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গ) তিনি একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেন। তাঁর মৃত্যুর পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা শৌচনীয় আকার ধারণ করে। দেশে আইনশৃঙ্খলা ছিল না

বললেই হয়। একশ বছর ধরে চলে 'মাৎস্যন্যয়'। অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাংলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা গোপাল নামে একজন জনপ্রিয় নায়ককে রাজা বলে বরণ করে নেয়। গোপালের রাজবংশ পাল-রাজবংশ নামে খ্যাত। তাঁর পুত্র ধর্মপাল উত্তর ভারতে গৌড় ও মগধের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করেন। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন দেবপাল। ৮১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৮৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। দেবপালের মৃত্যুর পর থেকে পাল বংশের মহিমা ক্রমে-ম্লান হয়ে পড়ে। পরবর্তী রাজারা ছিলেন শক্তিহীন। দশম শতাব্দীর শেষভাহে মহীপাল নাম একজন রাজা এই বংশের গৌরব বহুল পরিমাণে রক্ষা করেন। প্রথম মহীপালের প্রপৌত্র দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে বরেন্দ্রভূমিতে কৈর্বত বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহের নায়ক দিব্বোক দ্বিতীয় মহীপালকে পরাজিত করে উত্তরবঙ্গে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। এই সময় পাল সাম্রাজ্য রক্ষা করার দায়িত্ব নেন দ্বিতীয় মহীপালের ভাই রামপাল। দিব্বোকের ভ্রাতুস্পুত্র ভীমকে নিহত করে উত্তরবঙ্গ পুনরুদ্ধার করেন রামপাল। তিনি উৎকল (ওড়িশা) ও প্রাগজ্যোতিষপুর (আসাম) জয় করেন। পূর্ববঙ্গের বর্মন রাজারা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন। রামপালের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরদের দুর্বলতার কারণে পালরাজবংশ গৌরবহীন হয়ে পড়ে। দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে সেন বংশের অভ্যুত্থান হলে পাল রাজত্ব চিরতরে অবলুপ্ত হয়। সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সামন্ত সেন দক্ষিণাত্যের কর্ণাটক থেকে বাংলায় আসেন। তাঁর পৌত্র বিজয় সেন (১০৯৫-১১৫৮) প্রথম বাংলাদেশএ একটি শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁর পুত্র বল্লাল সেন সামরিক কীত্বির অধিকারী ছিলেন না। কিন্তু বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন (১১৭৯-১২০৫) পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। ১২০১ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ ঘোরীর অনুচর ইখতিয়ারউদ্দিন-বিন-বখতিয়ার খিলজির অতর্কিত আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে বৃদ্ধ লক্ষণ সেন পূর্ববঙ্গে চলে যান।

টিপ্পনী

বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বাতাবরণঃ দশম-দ্বাদশ শতাব্দী

সমাজ - প্রাচীন বাংলার সমাজ ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আত্মনির্ভর পল্লীসমাজে বিভক্ত। গ্রামের উৎপাদনে মোটের উপরে গ্রামবাসীর জীবনযাত্রা নির্বাহ হত। পল্লীর উৎপাদন পল্লীর প্রয়োজনমতই হত। উৎপাদনবৃদ্ধির তেমন তাগিদছিল না। বাংলার পল্লীসমাজ ছিল কৃষিপ্রধান সমাজ। কৃষির যন্ত্রপাতি ও কৃষিপদ্ধতি ছিল গতানুগতিক। পল্লীর উৎপাদনের প্রধান অংশ যেত গ্রামের উচ্চবর্গের সেবায় এবং সামন্ত গোষ্ঠীক নানা স্তরের ভূস্বামীর হাতে।

তাম্রলিপ্ত ছিল প্রাচীন ভারতের প্রধানতম বন্দর। পাল যুগে বণিক শ্রেণি ছিল। সেযুগে কৃষি ও বাণিজ্য দুইই ছিল। তবে স্বয়ংসম্পূর্ণ পল্লী সমাজে বণিক শক্তির বিকাশের তেমন সুযোগ ছিল না। সেন আমলে জাতিভেদের কুসংস্কারের বাড়াবাড়ি থাকার দরুণ সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে বহিঃসমুদ্রে আরব জাতির লোকেরা বাণিজ্য অধিকার স্থাপন করে। মুষ্টিমেয় ভারতীয় বণিকদের বাণিজ্যযাত্রা বিপদজনক হয়ে পড়ে। রাজশক্তির দ্বারা বণিকশক্তি খর্বিত হয়। সেন রাজারা সমাজে বেনেদের অপাংক্তেয় করে রাখে। বাঙালি বণিক শ্রেণি উৎপাদক শক্তিরূপে বিশেষ বিকাশলাভ করেনি। পাল রাজত্বের পরে বহির্বাণিজ্য হারিয়ে তারা অন্তর্বাণিজ্যে নিবদ্ধ হয়ে যায়।

প্রাচীন বাংলার সমাজে সাধারণ ক্ষুদ্র ভূস্বামী ও কৃষক সংখ্যায় বেশি ছিল। শূদ্র পর্যায়ের ভূমিহীন কৃষিজীবী ও কারুজীবীরা (হালিফ, জালিফ, ডোম, বাগদি, শবর প্রভৃতি) ছিল মূলত প্রাচীন উপজাতির বংশধর - প্রান্তেবাসী এবং হীনাবস্থা। এরাই ছিলউৎপাদনের প্রধান বাহন।

সংস্কৃতি - বাঙালি যখন বাংলা ভাষায়া সাহিত্য রচনা করতে আরম্ভ করে তখন ভারতের আর্য সংস্কৃতি বা বৈদ্দিক সংস্কৃতি কতকটা সামাজিক নিয়মে, আবার কতকটা এই

দেশের প্রাচীনতর আদিবাসীদের জীবনযাত্রার সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে এক নিজস্ব সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। গোপাল হালদারের ভাষায় - "সাধারণভাবে ভারতের এই সংস্কৃতিকে বলা চলে প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতি - যদিও তার অনেক স্তর আছে; দেশভেদে সম্প্রদায়ভেদে তার অনেক প্রকারভেদও ছিল।" (বাঙালা সাহিত্যের রূপরেখা)

এই হিন্দু সংস্কৃতির বাস্তব জীবনযাত্রা ছিল পল্লী সভ্যতার উপযোগী বাহুল্যহীন। সমাজ ছিল জাতিভেদে বিভক্ত। আধ্যাত্মিক চিন্তার ক্ষেত্রে এই সমাজের ছিল পরজন্ম এবং কর্মফলবাদে বিশ্বাস। যাঁরা সংস্কৃতিমান ও উচ্চকোটির চিন্তার পক্ষপাতি, বাংলা দেশে তাঁদের চেষ্টা ছিল এই হিন্দু সংস্কৃতির ধারাকে যথাসম্ভব মান্য করা। এই সংস্কৃতি বাঙালি সাহিত্যিকের একটি উত্তরাধিকার।

টিপ্পনী

বাংলায় যারা প্রকৃত জন তারা জাতি হিসাবে আর্য গোষ্ঠীর নয়। কালক্রমে আর্যভাষা তারা গ্রহণ করে ঠিকই কিন্তু সেই সংস্কৃতির উচ্চকোটির চিন্তায় বা আচার-নিয়মে তাদের অধিকার ছিল না। তারা আচারে নিয়মে, জীবনযাত্রায়, ভাবনা-কল্পনায় নিজস্ব বৈশিষ্ট বহন করে চলত। এটি লৌকিক ধারা। এই সংস্কৃতি বাঙালি সাহিত্যিকদের আর একটি উত্তরাধিকার।

হিন্দু সংস্কৃতির মূলধারা বাঙালির একটি উত্তরাধিকার। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একে বলেছেন 'ম্যাটার অফ স্যানসক্রিট' রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ ইত্যাদির বিষয়বস্তু অবলম্বনে সেই উত্তরাধিকারের দ্বারা পুষ্ট হয়েছে বাঙালি। অন্যদিকে অন্য উত্তরাধিকার - সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় 'ম্যাটার অফ বেঙ্গল' তথা লৌকিক উত্তরাধিকারের দ্বারা পুষ্ট হয়ে লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের চর্চা করে এসেছে বাঙালি।

ধর্মীয় বাতাবরণ - বর্ণবিন্যাসের কেন্দ্রে ছিলেন ব্রাহ্মণেরা। কিন্তু পালযুগে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। পালরাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। বর্ণভেদ তেমন দৃঢ় ও কঠোর ছিল না সমাজে। বৌদ্ধরাও ব্রাহ্মণের মতো মনুর অনুশাসন মেনে চলতেন। পালরাজারা বৌদ্ধ হয়েও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তবে স্মৃতিশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁরা তেমন নিষ্ঠা পোষণ করতেন না। সেনযুগে বর্ণভেদ কঠোর ও দৃঢ় হয়। সেন রাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বল্লাল সেন কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তক বলে কথিত আছে। সেন রাজারা পাল রাজাদের মতো ধর্মীয় উদারতা পোষণ করতেন না। সেন আমলে বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থা খুব ভাল ছিল না। সেন রাজারা পৌরাণিক যুগকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। ব্রাহ্মণদের প্রধান বৃত্তি ছিল অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও ধর্মাচারণ। সমাজ পঞ্চোপাসক সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। যাঁরা বিষ্ণুর উপাসক তাঁরা বৈষ্ণব, যাঁরা শক্তির উপাসক তাঁরা শাক্ত, যাঁরা সূর্যের উপাসক তাঁরা সৌর, যাঁরা গণপতির উপাসক তাঁরা গাণপত্য ও যাঁরা শিবের উপাসক তাঁরা শৈব। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এদের দ্বারাই। অবশ্য গাণপত্যদের কোনো লিখিত সাহিত্য নেই।

মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যঃ রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় প্রেক্ষিত

মধ্য যুগের বাংলা সমাজ যখন বিরামহীন রাজনৈতিক দুর্যোগ ও ঘনঘটায় আবৃত তখন সেই সময়ের মানুষেরা এই দুর্যোগ-দুর্বিপাক থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে নিজেদেরকে ভক্তিরসে অভিসিঞ্চিত করে দেব-দেবীর চরণতলে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছিল। বলাবাহুল্য, এই ভক্তি ছিল ভয়ে ভক্তি, তাই অষ্টাদশ শতকের শেষে তা স্তিমিত হয়ে গেল। একথা ঠিকই, মধ্যযুগের মানুষদের দেব-দেবীদের আরাধনায় নিজেদের ব্যাপৃত রাখলেও সেই দেব-দেবীদের তাঁরা মানবিক রূপেই দেখেছেন, পারিবারিক সম্পর্কের বন্ধনে জড়িত করেছেন - 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।' সুতরাং একদিকে ভয় অন্যদিকে ভক্তি, একদিকে

দেব-দেবী, ভক্তি রস, অন্যদিকে মানবতাবাদী চেতনা - এই সময়ের মানুষের মধ্যে বর্তমান ছিল। তারপর প্রেমধর্মের মূর্তিমান বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যের আগমনে মধ্য যুগের সমাজে মানবতাবাদী চেতনার বিস্তার ঘটল - যার প্রভাবে প্রভাবিত হল চৈতন্য-পরবর্তী বাংলা সাহিত্য।

মধ্য যুগের বাংলার সমাজ ও রাষ্ট্রের দিকে তাকালে দেখতে পাব, সে সময়টা রাজ-রাজড়া, আমীর-ওমরাহ, সুলতান-বাদশাহদের যুদ্ধবিগ্রহ, সিংহাসনলিপ্সু রাজপুরুষ, এমন কি দাসদের কূটচক্রান্ত ও অন্তর্দ্বন্দ্ব, জায়গীর প্রার্থী রাজকর্মচারীদের আকস্মিক বিদ্রোহ, ভূম্যাধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তিদের লোভাতুর দৃষ্টি ও পাপাচরণের মেঘে ঢাকা। আর এই কলুষ-কলঙ্কিত পটভূমির অন্তরালে শুনতে পাওয়া যায় রূপান্তরহীন আত্মচেতনাহীন গ্রাম্য সমাজ জীবনের নিরন্তর বয়ে-চলা স্থির মন্থর-ধ্বনি।

আবার রাষ্ট্রীয় জীবনের এই ঘূর্ণিপাক ও ওঠা-নামার পাশাপাশি ছিল ধর্ম-কলহ, হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব। মধ্য যুগে ইসলামের আগমন ও বিজয় সম্ভব হয়েছিল তাদের সামাজিক সাম্যের এবং একেশ্বরবাদের আদর্শের জন্য। সামাজিক সমানাধিকারের আদর্শ এবং শ্রেণিগত সংস্কারের অনুপস্থিতিই বর্ণসংস্কারে জর্জরিত ভারতে ইসলামের বিজয়াভিযানের অন্যতম কারণ। তাদের সামাজিক চিন্তাধারার উদারতা এবং সমানাধিকারের আদর্শই ভারতের সমাজেতিহাসে ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। আর এই আদর্শের মধ্যে আছে মানুষের মানবতার স্বীকৃতি। পৃথিবীকে সহজ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে সাধারণ মানুষের পক্ষে সুখী হওয়ার বিধান হিসেবে ইসলামী ভাবধারা কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করল। তাদের একেশ্বরবাদের আদর্শ ও অনাড়ম্বর জীবনাচরণের আদর্শ মানবতাবাদী চেতনার প্রকাশকে ত্বরান্বিত করল।

তাছাড়া মধ্য যুগের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ছিল সামন্ততান্ত্রিক। আর সামন্ততন্ত্রের নৈতিক মূল্যমানে মানুষের মানবিক মর্যাদার স্থান কিম্বা মানবতাবাদী চেতনার স্থান ছিল সামান্যই। যে সমাজে দাসপ্রথা প্রচলিত, যেখানে মানুষ শুধু পণ্যের বিকিকিনি নিয়ে ব্যস্ত সেখানে মানবতার সুর কীভাবেই বা ধ্বনিত হবে। ১৮০৭ সালে বুকাননের রিপোর্টে পাওয়া যায়, একজন পূর্ণবয়স্ক দাস ১৫/২০ টাকায় বিক্রি হত। অন্যদিকে সে সময়ে বাংলায় পণ্য উৎপাদন যেমন প্রভূত ছিল, তেমনি জিনিসও ছিল বেশ সস্তা। কিন্তু মানুষ নানা কারণে ভোগ-সুখ থেকে বঞ্চিত ছিল, অমানবিক সংস্কার ও বিধি-বিধানের মধ্যে তারা ছিল বেদনায় পান্ডুর ও বিষণ্ণ।

মনে রাখতে হবে, সামন্তযুগের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মধ্য যুগের সামন্ত সমাজ অত্যন্ত সংকীর্ণ সীমার বন্ধনে মানুষকে আবদ্ধ রেখেছিল। তাই এই সমাজে বহির্দেশ তথা বাইরের প্রতি আকর্ষণ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায়, একটি নিজস্ব বৃত্তে পূর্ব-পুরুষদের আচরিত জীবন, গুরু-প্রভুদের নির্দেশ মেনে সে সময়ের মানুষরা আত্মতৃপ্তি লাভ করত। ফলে মানবতার দিকটি ছিল অবহেলিত। বাইরের প্রসারিত দৃষ্টিকে অন্তরের মধ্যে সংকুচিত করার ফলে জীবন সম্পর্কে সব ধরনের সৃষ্টিশীল, গতিশীল আগ্রহ-অনুরাগ বিলুপ্ত হয়ে যায়। জীবন সম্বন্ধে পলায়নপর মনোভঙ্গি তাদের ধর্মচর্চায়, ধর্মীয় জীবনযাপনে অভ্যস্ত করে তোলে। ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের ব্যাকরণের কূটকচালি, বিভিন্ন শাস্ত্র নির্দেশ ও পুরোহিতদের ছলচাতুরী মানুষকে দাসত্বের বন্ধনে আবৃত করে রাখার ফলে মানবতাবাদের সুর তেমন করে বেজে উঠতে পারেনি।

মধ্য যুগের এই সাংস্কৃতিক অধঃপতনের সময়ে সামাজিক চাহিদাবশত প্রেমধর্মের মূর্ত বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেবের আগমন মানবতাবাদী চেতনা প্রসারে সহায়তা করে। জাতিভেদ যুক্ত সমাজে, ভেদাভেদের মধ্যে তিনিই শোনালেন 'জন্ম বড় কথা নয়, কর্মই বড়'। অবশ্য মধ্য যুগের সামন্ত শ্রেণির শাসনের মধ্যে বণিক সমাজের আগমন, তাদের চিন্তাধারার

টিপ্পনী

আদান-প্রদান মধ্য যুগের গুমোট আবহাওয়ায় এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস এনে দিয়েছিল - যা মানবতাবাদের সুরকে, মর্ত্যমানুষের মর্ত্যচেতনাকে, দেবতার অধীন মানুষের মধ্যে ব্যক্তিচেতনাকে জাগ্রত করতে পেরেছিল।

চৈতন্যদেবের আগমন ষোড়শ শতকে নবজাগরণের সৃষ্টি করল, যে নবজাগরণের মূলে ছিল মানবতাবাদী চেতনা, শ্রীচৈতন্য জাতিকে মানবপ্রেমে দীক্ষিত করলেন, মানুষের কর্ম-ই তার যর্থার্থ পরিচয় তা প্রচার করলেন। জাতিভেদ ভুলে, উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে নিজের কর্মের দ্বারা নিজেই তা দেখিয়ে দিলেন ও জাতিকে মানবিক মূল্যবোধে দীক্ষিত করলেন। সাধারণ মানুষকে দিলেন আশ্রয়, যারা দীর্ঘদিন ধরে অচ্ছুৎ, অপাঙক্তেয় রূপে বিবেচিত হয়ে আসছিল। যে সব অন্ত্যজ, অপাঙক্তেয় মানুষ এতদিন কোন সামাজিক স্বীকৃতি পায়নি, শ্রীচৈতন্যের মানবতাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা সমাজে নিজেদের জায়গা করে নিতে পারল। চৈতন্য প্রবর্তিত মানবধর্ম তাদের কাছে একটি নতুন পথের দিশা দেখাল - যেখানে জাতিভেদ নেই, জাতিবিদ্বেষ নেই, মানুষে মানুষে ভেদ নেই, আছে পারস্পরিক প্রীতিবোধ। স্বাভাবিকভাবে সামাজিক এই পরিবর্তন সাহিত্যেও মানবতাবাদী চেতনাকে প্রসারিত করল। মধ্য যুগের দেবদেবীকেন্দ্রিক সাহিত্যে স্বাভাবিকভাবেই এল মানবতাবাদী চেতনা। দেবশক্তি ও অলৌকিককতা হ্রাস পাওয়ায় সাহিত্যে মানুষের মানবতা কীর্তিত হল। তবে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে শাসকদের অমিতব্যয়িতা, কুশাসন, উচ্ছৃঙ্খলতা মধ্যযুগের সমাজকে আর এক দুর্বিপাকের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। সেজন্য শাক্ত সাধরদের বলতে হয়েছিল - 'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা?'

টিপ্পনী

রাজনৈতিক প্রেক্ষিত

(ক) পাঠান আমলঃ ত্রয়োদশ শতকের প্রথমে তুর্কী বিজয়ের পর একাদিক্রমে বাংলার রাজনৈতিক জীবনের ভাগ্যবিধাতারূপে বহিঃশক্তি আবির্ভূত হয়। বক্তিয়ার খিলজীর অবসানের পর (১২০৬ খ্রিস্টাব্দ) থেকে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত (১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ) সময়টি ছিল পাঠান শাসনকাল। যেমন -

(অ) খিলজী আমীর-ওহরাহের অধীনে বাংলা (১২০৬-১২২৭ খ্রিস্টাব্দ),
(আ) দিল্লীর সুলতানের অধীনে বাংলা (১২২৭-১৩৪১ খ্রিস্টাব্দ),
(ই) ইলিয়াসশাহী বংশের প্রথম ধারা (১৩৪২-১৪১৩ খ্রিস্টাব্দ),
(ঈ) ইলিয়াসশাহী বংশের দ্বিতীয় ধারা (১৪৪২-১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দ),
(উ) হাবসী খোজাদের শাসন (১৪৮৭-১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দ),
(ঊ) হুসেন শাহী বংশ (১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ),
(ঋ) শের শাহ ও সুর বংশ (১৫৩৮-১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দ),
(ঌ) করনানি বংশ (১৫৬৪-১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ),

(খ) মুঘল আমলঃ ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় মুঘল শাসন পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শের শাহ-র বংশধরদের আধিপত্য বিলুপ্ত হয়। দাউদ খাঁ নিহত হওয়ার পর মুঘল অধিকৃত বাংলায় প্রথম সুবাদার হন খান-ই-জাহান (১৫৭৬-১৫৭৮)। মুঘল আমলের শাসনকর্তাদের শাসনকাল এরকমঃ

(অ) বাংলায় মুঘল অভিধান (১৫৭৬ - ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দ),
(আ) আকবরের অধীনে সুবাদার মানসিংহের কাল (১৫৯৪ - ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দ),
(ই) জাহাঙ্গীরের শাসনকাল (১৬০৫ - ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দ),
(ঈ) শাহজাহানের শাসনকাল (১৬২৭ - ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দ),
(উ) ঔরঙ্গজেবের শাসনকাল (১৬৫৮ - ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ),

(গ) নবাবী আমলঃ ঔরঙ্গজেবের বংশধর শাসনকালঃ

(মুর্শিদকুলি খাঁ, সুজাউদ্দিন, আলীবর্দী খাঁ, সিরাজদৌল্লা) (১৭০৭ - ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ),

(ক) পাঠান আমলের রাজনৈতিক ইতিহাসকে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার প্রকৃত ইতিহাস বলে

স্বীকার করেননি। তাঁর মতে, “ইহা বাঙ্গালার ইতিহাস নহে, ইহা বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অংশও নহে।” কেননা পাঠান রাজত্বের সঙ্গে বাঙালির কোনো সংযোগই ছিল না। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, “পাঠান, খিলজী, বলবন, মামলুক, হাবসী সুলতানদের চন্ডনীতি, ইসলামি ধর্মন্ধতা ও রক্তাক্ত সংঘর্ষে বাঙালি হিন্দুসম্প্রদায় কুর্মবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কোনও প্রকারে আত্মরক্ষা করিতে ব্যস্ত হইয়াছিল।” (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত - ১ম খন্ড)।

টিপ্পনী

পাঠান আমলের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনা হলঃ

১২০৩ খ্রিস্টাব্দে আলিমর্দান-এর রোগপীড়িত ইখতিয়ারউদ্দিন বিন বক্তিয়ারকে হত্যা।

এরপর প্রায় কুড়ি বছর ব্যপী খিলজীবংশীয় বাংলার ওমরাহদের বাদ-বিসম্বাদ, কলহ-দ্বন্দ্ব।

বাংলায় ইসলামি অভিজাততন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও স্বেচ্ছামত আমীর-ওমরাহকে গৌড়ের সিংহাসনে বসানো ও উৎখাত করা।

বন্দী আলিমর্দানের সুলতান হওয়া ও নিজেকে সুলতান আলাউদ্দিন বলে ঘোষণা ও উদ্ধত হয়ে ওঠা।

হুসামউদ্দিনের ‘গিয়াসউদ্দিন ইয়াজ খিলজী’ নাম নিয়ে বাংলার সুলতান পদে আসীন হওয়া (১২১৩ - ১২২৭ খ্রীস্টাব্দ)।

খিলজী ওমরাহের প্রাধান্যের যুগে একমাত্র গিয়াসুদ্দিনই বেশিদিন দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখেছিলেন।

গিয়াসুদ্দিনের পর বাংলায় প্রায় একশ বছর দিল্লীশ্বর সুলতানদের আধিপত্য অব্যাহত ছিল। এই সময় ছিল মামলুক শাসন (১২২৭ - ১২৮৭ খ্রিস্টাব্দ) এবং বলবন শাসন (১২৬৮ - ১৩৪০ খ্রিস্টাব্দ)।

১২২৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর সুলতানের মৃত্যু হলে বাংলায় বিভিন্ন মামলুক নেতাদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ দেখা দেয়।

১২৫৭ - ১২৭২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে উজবক বংশীয় একাধিক শাসনকর্তা দিল্লীশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করে গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ইলিয়াসশাহী বংশ (১৩৪২ - ১৪১৩ খ্রিস্টাব্দ এবং ১৪৪২ - ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দ) বাংলাদেশে রাজত্ব করে রাষ্ট্র ও সমাজে একটি শান্তিপূর্ণ শৃঙ্খলা স্থাপনের নজির স্থাপন করে।

বিখ্যাত হিন্দু জমিদার গণেশ (১৪১৬) ইলিয়াসশাহী যুগে বাংলায় প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন। গণেশের বিরুদ্ধে বাংলায় পীর-ফকির-গাজীরা ‘জেহাদ’ ঘোষণা করেছিলেন। অবশ্য তিনি এদের অপ্রতিহত শক্তি কিছুটা খর্ব করতে পেরেছিলেন।

গণেশ-এর গৌড়ে বেশ কিছুকাল অরাজকতা, হত্যাকান্ড ও অত্যাচারের পালা চলে। এই সময় আমীর ওমরাহরা পূর্বের ইলিয়াসশাহী বংশের বংশধরদেরকে আবার গৌড়ের সিংহাসনে স্থাপন করেন।

টিপ্পনী

রুকনুদ্দিন বরবক শাহ গৌড়ের সিংহাসনে বসে গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি ভাগবতের অনুবাদক মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খান' উপাধি দিয়ে অনুবাদকর্মে উৎসাহিত করেন।

হাবসী খোজার শাসনকাল সন্ত্রাসের কাল। কেননা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিনাশ, হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অভিজাত বংশীয়দের নির্বিচারে হত্যা, চড়া হারে রাজস্ব আদায় প্রভৃতি এই শাসনকালের ঘটনা।

হুসেনশাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা 'আলাউদ্দিন সেরিফ মেক্কা' হুসেন খাঁ বাংলাদেশে গৌরবান্বিত সুলতান হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন। বুদ্ধি, চাতুর্য ও মহানুভবতার সমন্বয়ে তিনি বাংলাদেশএ একটি স্থায়ী শাসনব্যবস্থা ও শান্তিপূর্ণ জীবনধারা প্রচলনের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি অনেক অভিজাত হিন্দুকে অন্তঃপুর ও বাজকার্যের গুরুত্বপূর্ণ পদেনিয়োগ করেছিলেন। কেশব ছত্রী নামে এক হিন্দু তাঁর প্রধান দেহরক্ষী ছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় ত্রিপুরা অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন গৌর মল্লিক। 'চৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থেও হুসেন শাহের ধর্মীয় উদারতার প্রশংসা করা হয়েছে।

অবশ্য জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ হুসেন শাহের রাজনৈতিক কারণে হিন্দুদের উপর অত্যাচার-এর কথা আছে। হুসেন শাহ মুসলমানদের শিক্ষার জন্য সচেষ্ট ছিলেন বলেই চীন পর্যন্ত গিয়ে জ্ঞানান্বেষণ করারও পক্ষপাতী ছিলেন। [সূত্রঃ রজনীকান্ত চক্রবর্তী - গৌড়ের ইতিহাস (২য়)]

হুসেন শাহের আঠারটি সন্তানের মধ্যে বড় ছেলে নুসরৎ শাহ বা ছুটি খাঁ পিতার গৌরব অব্যাহত রেখেছিলেন। শ্রীকর নন্দী এই ছুটি খাঁর নির্দেশে মহাভারত রচনা করেছিলেন, যা 'ছুটি খানের মহাভারত' নামে খ্যাত। নুসরৎ প্রতিকূল ঘটনা ও পাঠান দলপতিদের পারস্পরিক কলহের জন্য বাংলাকে সুদৃঢ় করতে পারেননি।

নুসরতের পুত্র আলাউদ্দিন ফিরুজ মাত্র কয়েক মাস সিংহাসনে বসেছিলেন এবং তিনিও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। কেননা বিদ্যাসুন্দর কাব্যের প্রথম কবি শ্রীধর এঁর দ্বারা উৎসাহিত হয়ে কাব্য রচনা করেছিলেন।

শের খাঁর গৌড় অধিকারের পর হুমায়ুনের বাংলা আক্রমণের খবরে শের খাঁ গৌড় নগর ধ্বংস করে ছয়কোটি স্বর্ণমুদ্রা, সেনাবাহিনী ও অনুচরসহ রোটাসগড়ের দিকে যাত্রা করেন। এরপর হুমায়ুন চৌসার যুদ্ধে পরাভূত হলে (১৫৩৯) শের খাঁ বাংলা পুনরাধিকার করে চারদিকে শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপনে সচেষ্ট হন। শের খাঁ সময় বাংলায় জায়গীর প্রথা ও ভুঁইয়াদের উৎপত্তি হয়।

বাংলায় পাঠান শাসন ভেঙে পড়ার উপক্রম হলে সেই সুযোগে আফগান সর্দাররা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেন। আফগান সর্দারদের প্রধান নেতা আফগানিস্তানের করনানি বংশোদ্ভূত তাজ খাঁ করনানি বাংলার অপদার্থ শাসক তৃতীয় গিয়াসুদ্দিনকে হত্যা করে (১৫৬০) বাংলার মসনদ অধিকার করেন। এসময়ে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলার কারণে বাংলার সাধারণ মানুষের মনে শান্তি ছিল না। তাজ খাঁ গৌড়ের অনেকটা অংশ অধিকার করে ফেলেন।

১৫৬৫-তে সুলেমান খাঁ করনানি বাংলার সুলতান হন এবং তিনি সাতবছর (১৫৬৫-৭২) বাংলায় বিচক্ষণতার সঙ্গে শাসন পরিচালনা করেন। শান্তি স্থাপনে, রাজস্ব বৃদ্ধিতে, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিতে ও বিদ্যানুরাগে সুলেমান হুসেন শাহের মতো স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

অন্যদিকে সুলেমানের কনিষ্ঠ পুত্র দাউদ খাঁ করনানি (১৫৭৩) পিতার বিপরীত মানসিকতার হওয়ায় তাঁর সময়ে আবার বাংলার শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয় ও রাজস্ব ভান্ডারে টান পড়ায় নতুন মুদ্রা ছাপতে হয়। এরপর ১৫৭৪-এ মুনিম খাঁ বাংলায় প্রবেশ করলে বাংলায় মুঘল আধিপত্যের সূচনা হয়।

(খ) মুঘল আমলঃ রাজনৈতিক ঘটনা - মুঘল অধিকৃত বাংলা দেশের প্রথম সুবাদার হন খান-ই-জাহান (১৫৭৫ - ৭৮)। খান-ই-জাহানের পর বাংলার সুবাদার হন মুজাফ্ফর খাঁ (১৫৭৯)। ১৫৮৬-তে ওয়াজির খাঁ এবং ১৫৮৭-তে সৈয়দ খাঁ বাংলার সুবাদার হয়ে আসেন। ১৫৭৬-১৫৯৪ প্রায় আঠারো বছর ধরে বাংলায় ভয়াবহ অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় - শাসকদের অপদার্থতার জন্য। এই সময়ের বিশৃঙ্খলা কবিকঙ্কণ তাঁর কাব্যে বর্ণনা করেছেন।

আকবর বাংলায় শাসনশৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের জন্য ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে মানসিংহকে বাংলার সুবাদার করে পাঠান - যিনি বিচক্ষণ, সাহসী ও সুশাসক ছিলেন। মানসিংহ ইশা খাঁ ও কেদার রায়-এর মতো ভুঁইয়াদের পরাস্ত করেন এবং বাংলায় পাঠান শক্তিকে ছত্রভঙ্গ করে ফেলেন। ১৬০২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কেদার রায়, মুসা খাঁ প্রভৃতি প্রবল প্রতাপান্বিত ভুঁইয়াদের শক্তি বিনষ্ট হয়।

১৬০৫-এ আকবরের মৃত্যু হলে জাহাঙ্গীর সিংহাসে বসে মানসিংহকে বিহারের সুবাদার (১৬০৬) করে কুতুবুদ্দিন খানকে বাংলার সুবাদার করে পাঠান। এরপর বাংলার সুবাদার হন জাহাঙ্গীর কুলি খাঁ (১৬০৭), ইসলাম খাঁ (১৬০৮), কাসিম খাঁ চিস্তি (১৬১৩), ইব্রাহিম খাঁ ফতে জঙ্গ (১৬১৭), মহাবৎ খাঁ (১৬২৫), মুকরম খাঁ (১৬২৬-১৬২৭)। এঁদের মধ্যে ইসলাম খাঁ-ই শাসক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

জাহাঙ্গীরের শাসনকালে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল - স্থানীয় পাঠান-আফগান ও হিন্দু ভূস্বামী সামন্তদের সমস্ত স্বাতন্ত্র্য, শক্তি ও বিরোধিতা নষ্ট হয়ে যাওয়া, আরাকান মগ জলদস্যু ও পর্তুগীজ বোম্বেটদের হতবল হয়ে পড়া।

শাহজাহানদের ত্রিশ বছর ব্যাপী শাসনকালে গৌড় বঙ্গ যুদ্ধবিগ্রহ ও অর্থনৈতিক শোষণে পর্যুদস্ত হয়। এই সময় বাংলার সুবাদাররা ছিলেন - কাশিম খাঁ জুয়িনি (১৬২৮-১৬৩২), আজম খাঁ মীর মুহম্মদ বাকর (ইরাদৎ খাঁ) (১৬৩২- ১৬৩৫), ইসলাম খাঁ মাশাদি (১৬৩৫ - ১৬৩৯), শাহজাদা সুজা (১৬৩৯ - ১৬৪৯, ১৬৪৮ - ৫২, ১৬৫২ - ৫৮)। এই সময়ে ভাগীরথী ও সরস্বতী নদি কেন্দ্রিক সপ্তগ্রামের বাণিজ্য গৌরব হ্রাস পায়। শাহজাহানের প্রচন্ড আঘাতে বাংলাদেশে পর্তুগীজ শক্তি কোনোদিন প্রকাশ্যে বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করতে পারেনি।

ঔরঙ্গজেবের শাসনকাল বাংলায় শৃঙ্খলা ফিরে আসে। তাঁর সময়ে বাংলার সুবাদাররা হলেন - মীরজুমলা বা মুয়াজ্জম খাঁ (১৬৬০৬৩), শায়েস্তা খাঁ (১৬৬৩-৭৮), শাহজাদা মুহম্মদ আজম (১৬৭৮-৮০), ইব্রাহিম খাঁ (১৬৮৯-৯৮) প্রভৃতি। মীরজুমলার বেশিরভাগ সময় কেটেছে কুচবিহার ও কামরূপ অভিযানে। তিনি রাজস্ব ফাঁকি বন্ধ করেছিলেন। এই সময় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। শায়েস্তা খাঁ যখন বাংলার সুবেদার তখন তাঁর প্রতিদিনের আয় ছিল দু'লক্ষ টাকা এবং তার এক লক্ষ টাকা তিনি প্রতিদিন ব্যয় করতেন। তাঁর মতো নির্মম শোষক ও অর্থলোভী সুবাদার বাংলাদেশে বড়ো একটা আসেননি। তাঁর অর্থলোলুপতার ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রায় ভেঙে পড়েছিল। তিনি বাঙালি হিন্দু-মুসলমানদের ধরে নিয়ে গিয়ে গো-মহিষের মতো দাস হাটে বিক্রয় করে দিতেন। দ্বিতীয়বার সুবাদার হওয়ার পর শায়েস্তা খাঁর সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরোধ বাধে।

(গ) নবাবি আমলঃ রাজনৈতিক ঘটনা - ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু এবং ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ রাজত্বের শুরু। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকেই মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় শুরু হয়েছিল। দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে ঔরঙ্গজেবের রাজকোষ শূন্য হয়ে যায়। সে সময়ে ঔরঙ্গজেবের প্রধান ভরসা মুর্শিদকুলি খাঁর কর্মদক্ষতা ও বাংলার রাজস্ব। ফলে মুর্শিদকুলি তাঁর দক্ষতা দেখালেন বাংলার রাজস্ব আদায়ে।

টিপ্পনী

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুর্শিদকুলি খাঁ (১৭০৫-১৭২৭) বাংলার সুবেদারি লাভ করেন ও তিনিই প্রথম বাংলার স্বাধীন নবাব। মুর্শিদকুলি নিজে জন্মেছিলেন ভারতের ব্রাহ্মণকুলে, কিন্তু লালিত পালিত হন পারস্যে পারসিক প্রভুর আশ্রয়ে শিয়া মুসলমান রূপে। ফারসি ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে তিনি মানুষ হয়েছিলেন, ফলে হিন্দুধর্ম, পাক ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁর দরদ ছিল না।

মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভেই নতুন রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। মুঘল রাজ্যের শূন্য কোষাগারে মুর্শিদকুলি বাংলার রাজস্ব নিয়মিত যুগিয়েছেন। বস্তুত মুর্শিদকুলি খাঁ রাজস্ব নীতি নির্ধারণে, শাসন দক্ষতায় এবং সর্বোপরি স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনায় অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থার ইতিহাসে মুর্শিদকুলির নাম অমর হয়ে আছে। দেওয়ান পদে নিযুক্ত হয়ে তিনি বাংলাদেশে এসে প্রথমেই লক্ষ করলেন যে, রাজকর্মচারীগণ বেতনের পরিবর্তে বিশাল পরিমাণ জমি জায়গির হিসেবে ভোগদখল করতেন। এর ফলে সরকারের যেমন জমি থেকে কোন রাজস্ব আয় হত না, তেমনই জায়গিরদারদের স্থানীয় ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ক্রমে বাড়তে থাকত। এজন্য তিনি সরকারী কর্মচারীদের অধীন জমি সরকারের হাতে নিয়ে এলেন এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ বাৎসরিক রাজস্ব দেবার বিনিময়ে সেই জমি ইজারা দিলেন। এইসব ইজারাদারই পরবর্তীকালে জমিদার হিসেবে পরিচিত হন। মুর্শিদকুলি খাঁ রাজস্ব আদায়ের ব্যয়হ্রাস, অপ্রয়োজনীয় সৈন্যসংখ্যা হ্রাস এবং শাসনকার্যে মিতব্যয়িতা অনুসরণ করে সরকারের আর্থিক অবস্থায় উন্নতি ঘটিয়েছেন। এমনকি, তাঁর আমলে ইংরেজ বণিকরা বাংলাদেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার পেত না।

মুর্শিদকুলির কোন পুত্রসন্তান না থাকায় তাঁর জামাতা সুজাউদ্দিন খাঁ (১৭২৭-৩৯) বা সুজা-উদ-দৌল্লা বাংলার পরবর্তী নবাব হন। সুজাউদ্দিন মুর্শিদকুলির সময়কার বাংলার দেওয়ান সরফরাজকে দেওয়ান পদে বহাল রাখেন। সরফরাজের শাসনের প্রথম দিকে সুজাউদ্দিন খাঁ ছিলেন উদারচেতা, ন্যায়পরায়ণ নবাব। কিন্তু মুঘল আমির ওমরাহের মতো তিনি শেষ জীবনে বিলাসী ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েন।

১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র ঢাকার শাসনকর্তা সরফরাজ পিতার আসনে বসেন। তিনি ছিলেন যেমন অকর্মণ্য তেমনই ক্ষমতাহীন। ফলে বাংলাদেশের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা যায়। এই সুযোগ আলীবর্দী খাঁ ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। আলীবর্দী মুঘল সম্রাট মুহম্মদ শাহকে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ উপঢৌকন দিয়ে অন্যায়ভাবে লব্ধ বাংলার শাসনকর্তা পদে তাঁর অধিকার কায়েম করেন (১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে)। আলীবর্দি বিশ্বাসঘাতকতা করে সিংহাসনে বসলেও সুশাসক ছিলেন। কিন্তু আলীবর্দীর সময় বহিরাক্রমণ স্মরণীয় ঘটনা।

১৭৪২ থেকে ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মারাঠা বর্গীদের বাংলা আক্রমণে আলীবর্দী পর্যুদস্ত হয়ে পড়েন। মারাঠা সেনাবাহিনী (বর্গি) ভাস্কর পন্ডিতের নেতৃত্বে পশ্চিমবাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অত্যাচার চালিয়ে, লুঠতরাজ করে নারীদের উপর ঘৃণ্য অত্যাচার করে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। দেশরক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা করেও আলীবর্দী যখন মারাঠাদেরকে প্রতিহত করতে পারলেন না, তখন তিনি বাৎসরিক বারো লক্ষ টাকা চৌথ এবং ওড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের অধিকার তাদেরকে দিতে স্বীকার করে মারাঠা আক্রমণ থেকে বাংলাদেশকে বাঁচান।

অন্যদিকে ইংরেজদের ক্রমবর্ধমান শক্তিবৃদ্ধি সম্পর্কে আলীবর্দী চিন্তান্বিত ছিলেন। সুতরাং একদিকে স্থলের শত্রু মারাঠা অন্যদিকে জলের শত্রু ইংরেজ বণিক সম্বন্ধে আলীবর্দী সচেতন ছিলেন। এই কারণে আলীবর্দী ইংরেজদের প্রতি সতর্কতামূলক বন্ধুত্বনীতি অনুসরণ করেছিলেন। তবুও ইংরেজ বণিকরা সুকৌশল বাংলায় বাণিজ্য চালাতে ও অধিকার সাব্যস্ত করতে উঠে পড়ে লেগেছিল।

আলীবর্দী মৃত্যু হয় ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে। মৃত্যুর পূর্বেই তিনি তাঁর ছোট মেয়ের পুত্র সিরাজকে পরবর্তী নবাব মনোনীত করে যান।

সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপঃ

(১) জমিদার শ্রেণির উদ্ভব এবং রাজস্ব আদায়ে জমিদারদের অত্যাচার।

(২) নবাবী আমলের বিলাস-ব্যসন, ব্যভিচার ও বিশৃঙ্খলায় দেশের সামাজিক কাঠামো ভেঙে খান খান হয়ে যাওয়া।

টিপ্পনী

(৩) বর্গীর আক্রমণে বাঙালি তখন ভীষণভাবে পর্যুদস্ত ও অসহায়তাবোধ তাদের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠছে। বাংলা ছড়ায় তাই দেখা যায় -

ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো, বর্গী এল দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে।

(৪) বিদেশী ইংরেজ বণিকের বাণিজ্যের নামে শোষণ ও ক্ষমতা দখলের লড়াই।

(৫) পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ তখন অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করে নতুন বণিকরাজের কাছে।

সামাজিক প্রেক্ষিতঃ

পাঠানযুগে বাংলার সমাজ বিজাতীয় আক্রমণে ভিন্ন জীবনাদর্কের প্রভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ইখতিয়ার থেকে শুরু করে হুসেনশাহী আমলের পূর্ব পর্যন্ত মুসলমান শাসকরা হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করা, হিন্দু মন্দির ধ্বংস করাকে আবশ্যিক কর্ম বলে মনে করত। পীর ফকিরদের সঙ্গে হিন্দু ভূস্বামীদের দ্বন্দ্ব কলহ লেগেই থাকত। বিদ্যাপতির সময়ে তুরুক ও হিন্দুর মধ্যে উৎকট জাতিবিদ্বেষ দেখা দিয়েছিল। যেহেতু বর্ণহিন্দুদের জীবনাদর্শের সঙ্গে নিম্ন হিন্দু বা অন্ত্যজদের (চাঁড়াল, বারুই, চামার, দুলে, মালো প্রভৃতি) কোনো যোগ ছিল না, তাই তারা ইসলামের নবমানবতার বাণীকে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেনি।

তবে হুসেন শাহের আমলে হিন্দু-মুসলমানের বিজাতীয় সম্পর্ক অনেকটা হ্রাস পায়। পূর্বে খিলজী বংশীয় ওমরাহদের কলহ দ্বন্দ্বের ফলে উচ্চবর্ণের অনেক হিন্দু-মুসলমান প্রভাবিত অঞ্চল ত্যাগ করে মিথিলা, উড়িষ্যা প্রভৃতি নিরাপদ হিন্দু অঞ্চলে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

বিদেশী ভ্রমণকারীদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে সাধারণ বাঙালির আর্থিক অবস্থা মন্দ ছিল না। দেশ ছিল কৃষিজীবী এবং আহার্য দেশেই উৎপন্ন হত। আমীর ওমরাহদের অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সমাজে খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। দেশের মুদ্রা প্রায় দেশের মধ্যেই থাকত। রূপার মুদ্রা ব্যবসা-বাণিজ্যের মুদ্রামান ও অন্যান্য রাজকাজে ব্যবহৃত হত। কড়ির ব্যবহারও ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে রেশমী কাপড়, কাগজ ও অন্যান্য কারুশিল্পের প্রাচুর্য দেখা যায়। ১৩২৫-৫৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইবন বতুতা বাংলাদেশের কিছু কিছু অঞ্চল ভ্রমণ করে দেখেছিলেন, সাত টাকায় নয় মণ চাল, সাড়ে তিন টাকায় চোদ্দ সের ঘি, সাত টাকায় ২৮ মণ ধান, একুশ টাকায় একটি দুগ্ধবতী গাভী পাওয়া যেত।

পাঠান আমলে বল্লালী কৌলীন্যপ্রথা হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণদের অনৈক্যের বিষে জর্জরিত করে ফেলে। তাছাড়া শ্রেণিবিদ্বেষ ও শ্রেণি বিভাজন সমাজের মধ্যে বর্তমান থাকায় সামাজিক অবস্থা শান্তিপূর্ণ ছিল না। হিন্দু যুগের গ্রামীণ সংস্কৃতি পাঠান আমলে এসে নাগরিক সংস্কৃতির দিকে অগ্রসর হয়। বহির্বাণিজ্যের ফলে নগরের বিকাশ ঘটল এবং বাঙালির আর্থিক পরিস্থিতিরও বদল ঘটল।

হুসেন শাহের আমলে পূর্বের ক্ষমতাচ্যুত ও ভূমিহীন ওমরাহ ও হিন্দু অভিজাত সমাজকে পুনরায় পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনেন। গৌড়ের হিন্দু জমিদাররা নিমন্ত্রণের আসরে স্বর্ণপাত্রে অতিথিদের ভোজন করাতেন। চৈতন্যদেবের আগমনে সমাজে ভেদাভেদ অনেকখানি লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। অন্ত্যজ হিন্দুরা সমাজে স্বীকৃতি পেয়েছিল। চৈতন্যের প্রেমধর্ম ভক্তিমান হিন্দু সমাজের উত্তম অধমকে একসূত্রে বেঁধে ফেলেছিল।

সুলতানী আমলে গৌড়ের অধিকার শক্তিশালী ও স্থায়ী রাজশক্তি সূচিত করত। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় রাজধানী পরিবর্তনের ফলে একদিকে সেই জায়গার মর্যাদা ও গুরুত্ব যেমন হানি হত অন্যদিকে একাধিক জায়গায় রাজধানী স্থাপনের ফলে নগরায়ণ প্রক্রিয়া শক্তি সঞ্চয় করত।

টিপ্পনী

সুলতানী শাসনকালে বাংলার বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির কারণে নদী ও সামুদ্রিক বন্দরগুলি অভ্যন্তরীণ ও বর্হিবাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই বন্দরগুলির মাধ্যমে বাংলার রেশম ও সুতিবস্ত্র রপ্তানি হত। ধনপতি সদাগরের বদল বাণিজ্যের মধ্যে (চন্ডীমঙ্গল) তার উল্লেখ রয়েছে। হিন্দু বণিকেরা ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম থেকে শুরু করে সিংহল হয়ে গুজরাট চলে যেতেন। তাই সুলতানী আমলে বৈদেশিক বাণিজ্য রাজতন্ত্র ও বণিকতন্ত্রকে এক অবিচ্ছিন্ন স্বার্থের সূত্রে বেঁধে দিয়েছিল। মনে রাখতে হবে, নদীর গতিপথ পরিবর্তন বাংলার নগরায়ণের ইতিহাসে গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। এ কারণে শহর ও বন্দরের উত্থান পতনও ঘটেছে।

মধ্য যুগে নগরগুলি কৃষি-উদ্বৃত্তের উপর নির্ভরশীল ছিল। তাই নগরায়ণের প্রক্রিয়া পারিপার্শ্বিক গ্রাম এলাকার উদ্বৃত্ত শস্য ও পণ্যদ্রব্যের উপর ভিত্তি করে সচল থাকত। ভূমি ব্যবস্থায় কৃষকের ও অন্যান্য উৎপাদকের সঙ্গে শাসকদের, সামন্ত প্রভুদের, রাজসেবীদের কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। গ্রাম ও গঞ্জকে শোষণ করেই নগরজীবনের সমৃদ্ধি ঘটত এবং সেই নগরের দ্বারা গ্রাম-গঞ্জের কোনো উপকার হত না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলও নগরেই সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রামীণ বৃহত্তর জীবনে কিম্বা কৃষি অর্থনীতিতে তার কোনো প্রভাব পড়েনি।

চৈতন্য ও চৈতন্য সম্প্রদায়ের প্রভাবে সপ্তদশ শতাব্দীর হিন্দু সমাজের বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। চৈতন্যপ্রভাবের পূর্বে হিন্দুসমাজে শাক্ত, শৈব, নাথধর্ম ও ধর্মঠাকুরের দল উপদলের আধিপত্য ছিল - যা চৈতন্যজীবনীকাব্যগুলিতে উল্লিখিত হয়েছে। শাক্ত ধর্মের মধ্যে পৌরাণিক তন্ত্রাশ্রয়ী উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজ ও লৌকিক শাক্ত মতের অন্তর্ভুক্ত চন্ডী-মনসা-বাসুলী প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যের দেবীরাও সমাজে গৃহীত হলেন।

হিন্দুসমাজে মুসলমানি আদব কায়দা ও দরবারি রীতিনীতিও অল্পবিস্তর স্থান পেতে থাকে। বৈষ্ণব সমাজে গরস্ত্রী গর বলে গৃহীত হলেন। যেমন অদ্বৈত গৃহিণী সীতাদেবী, নিত্যানন্দের কনিষ্ঠা পত্নী জাহ্নবা দেবী গুরু হিসেবে স্বীকৃতি পেলেন।

মুঘল শাসনে বাংলার সমাজে ভৌগোলিক সংকীর্ণতা কিছুটা হলেও নষ্ট হয়। মুঘল শাসনের প্রথমদিকে বাংলার হিন্দুসমাজের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় রাজানুগ্রহের আশায় ফার্সী শিখতে লাগল। ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের শাসন ও রাজস্ববিভাগে কিছু কিছু হিন্দু কাজ পাওয়ায় চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত সমাজের উত্থান ঘটে। মুর্শিদকুলি ও আলিবর্দীর সময়ে শাসন, রাজস্ব ও সামরিক বিভাগে বাঙালি ও অবাঙালি হিন্দুর বিশেষ প্রাধান্য স্থাপিত হয়।

মধ্যযুগীয় ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে জমিদার শ্রেণি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কৃষিজ উৎপাদনে, হস্তশিল্প ও ব্যবসায় জমিদারদের প্রভাব ছিল। মুঘল আমলেই 'জমিন্দার' শব্দটি চালু হয়। ক্ষমতাশালী, স্বাধীন ও স্বরাট সর্দার থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রমধ্যস্বত্বভোগী পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের উত্তরাধিকার স্বার্থ বোঝাতে শব্দটি ব্যবহৃত হত। মুঘল আমলের জমিন্দারিকে তিনটি প্রধান বর্গে ভাগ করা হয় - (ক)

স্বরাট সর্দার, (খ) মধ্যস্বত্বভোগী জমিন্দার (গ) প্রাথমিক জমিন্দার। সর্দাররা ছিল তাদের অধিকৃত এলাকার স্বরাট শাসনকর্তা - তারা উত্তরাধিকার সূত্রে সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করত। স্বরাট সর্দাররা মুঘল আমলে ব্যাপক অঞ্চলের শাসক ছিলেন।

সম্রাটদের মধ্যে আকবরই প্রথম সাম্রাজ্য ও সর্দারদের মধ্যে মজবুত যোগসূত্র স্থাপনের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। মুঘলরা সর্বোচ্চ ক্ষমতার নীতি চালু করেছিল - যার ফলে একজন সর্দারকে তার ক্ষমতা ও অধিকারের জন্য সহজাত অধিকারের চেয়ে সম্রাটের সদিচ্ছার উপর নির্ভর করতে হত। মুঘল সম্রাটরা প্রভাবশালী সর্দারদের পোষ্যদের সঙ্গেও প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপনের কর্মনীতি অবলম্বন করেছিলেন। সম্রাটরা সর্দারদের বাধ্য করতেন তাদের এলাকায় অনুপ্রবিষ্ট বিদ্রোহী দুষ্কৃতি ও ফেরারিদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে।

টিপ্পনী

মুদ্রা অর্থনীতির আবির্ভাব কৃষিজ উৎপাদনকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল।

মুঘল আমলে মধ্যস্বত্বভোগী জমিন্দার-রা ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের মেরুদণ্ডস্বরূপ এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ভারও ছিল এদের হাতে। এরা বিভিন্ন পরিষেবা দানের বিনিময়ে দস্তুরি পাবার অধিকারী ছিল। যেমন, দালালি, রেয়াত, করমুক্ত জমি, উপকর ইত্যাদি। মধ্যস্বত্বভোগী বর্গটির অন্তর্ভুক্ত ছিল চৌধুরী, দেশমুখ, দেশাই, দেশপাণ্ডে কয়েক ধরনের মুকদ্দম, কানুনগো ও ইজারাদারেরা, আর সেই শ্রেণির জমিন্দার যাদের সঙ্গে রাষ্ট্রের চুক্তি ছিল একেকটি নির্দিষ্ট এলাকার রাজস্ব আদায়ের এবং যারা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে 'তালুকদার' বর্গ নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। তাই দেশের সবকটি অঞ্চলই ছিল কোনো না কোনো ধরনের মধ্যস্বত্বভোগীদের দখলে।

মধ্যস্বত্বভোগীদের অধিকাংশকেই রাষ্ট্রের নিরীক্ষার জন্য রাজস্ব নির্ধারণের তফশিল তৈরি করতে হত, ভূমি রাজস্ব আদায়ে সাহায্য করতে হত, কৃষির সম্প্রসারণে উৎসাহ দিতে হত, শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষায় কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করতে হত এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য যোগান দিতে হত।

প্রাথমিক জমিন্দাররা ছিল কৃষি ও বাস্তুজমির মালিকানাভোগী। এই বর্গের অন্তর্গত ছিল মালিক-কৃষি যারা নিজেরাই চাষ করত বা ভাড়াটে শ্রমিক দিয়ে চাষ করাত, আর ছিল একটি বা কয়েকটি গ্রামের অ-কৃষক মালিকরাও। দেশের সমস্ত কৃষিজমিগুলিই ছিল কোনো না কোনো ধরনের প্রাথমিক জমিন্দারের হাতে। এদের অধিকার ছিল বংশগত ও হস্তান্তরযোগ্য। এই অধিকার যারা বংশপরম্পরায় ভোগ করত, বা যারা এ অধিকার ক্রয় করেছিল, তারা ছাড়া আরো বহুলোককে মুঘলরা এই অধিকার প্রদান করেছিল। কৃষিজমির পরিমাণ বাড়ানোর যে কর্মনীতি মুঘলরা অনুসরণ করেছিল সেই ধারাতেই সম্রাটরা সেইসব লোককে উদার হাতে জমি বিলি করেছিলেন, যারা জঙ্গল ও পতিত জমিগুলিকে কৃষির আওতায় নিয়ে আসবে। এর দ্বারা রাজস্ব আদায়ও বাড়ত।

মালিক কৃষক ছাড়া অন্য জমিন্দাররা তাদের জমি সাধারণত প্রজাদের বংশানুক্রমিক ইজারায় চাষ করতে দিতে। নিয়মিত ভূমি-রাজস্ব প্রদানের শর্তে এই চাষীদের পাট্টা মঞ্জুর করা হত - যা তাদের কাছে ছিল প্রজাস্বত্বের প্রমাণপত্র। তবে একথা ঠিকই বিভিন্ন বর্গের জমিন্দারদের চাহিদা মেটানোর সমস্ত বোঝাটা পড়েছিল কৃষকদের উপর এবং সে কারণে কৃষি অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়ায় কৃষিক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি ঘটেনি। এমনকি কৃষকদের জীবনধারণের মানের উন্নতি ঘটেনি।

গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিতে জমিদাররা ছিল একদিকে ভূম্যধিকারী এবং তারা স্থানীয়ভাবে স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী। 'মদদ-ই-মায়েশ' গ্রামীণ অর্থনীতিতে ও গ্রামীণ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। 'মদদ-ই-মায়েশ' ফারসী শব্দ যার অর্থ নিষ্কর জমির উপভোগকারীর দল এবং এদের অবস্থিতি সরকারিভাবে স্বীকৃত ও সমর্থিত ছিল।

গ্রামীণ অর্থনীতিতে মহাজনের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। রাজস্বের দাবি বা অতিরিক্ত করের দাবি মেটাবার জন্যে, কিম্বা তাদের গৃহপালিত পশু মরা গেলে পশু কেনার জন্যে, কিম্বা তাদের গৃহে নানারকম অনুষ্ঠান করার জন্যে অথবা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ মেটাবার জন্যে কৃষকরা মহাজনের দ্বারস্থ হত। মহাজনদের সুদের হারও ছিল চড়া। ব্রিটিশ আমলে সুদের ভারে অবনত কৃষকরা মুঘল আমলের রায়তদেরই উত্তরসুরী। গ্রামীণ সমাজে কিছুটা সম্পন্ন লোকই মহাজনী ব্যবসায় হাত দিত। জমিদারের কর্মচারিরাও টাকা ধার দিত। বহু সম্পন্ন কৃষকও মহাজন ছিল। সম্পন্ন কৃষক বা জমিদারদের কর্মচারিরা কৃষি থেকে গৃহীত উদ্বৃত্ত সম্পদের একাংশ মূলধন হিসেবে খাটাত।

টিপ্পনী

কোরানে সুদ নেওয়াকে মহাপাপ বলে উল্লেখ করলেও রাষ্ট্র মহাজনদের সর্বতোভাবে রক্ষা করত। ঔরঙ্গজেবের মতো ধর্মভীরু লোকও সিংহাসনে বসার সময় মহাজনদের রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেন। জমিদারদের সঙ্গে মহাজনদের সম্পর্ক ছিল দ্বন্দ্ব-মধুর। এমনকি অর্থনৈতিক কারণে জমিদাররা অনেক সময় মহাজনদের উপর নির্ভরশীল ছিল। কৃষকদের কাছে মহাজনী ব্যবস্থা উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োজনীয় অংশ হিসেবেই প্রতীয়মান হয়েছিল। কারণ কৃষকদের জীবন ধারণের সঙ্গে মহাজনের ঋণ ওতঃপ্রোত ও ব্যাপকভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে কৃষিকাজে মূলধন যোগাবার

প্রায় একচ্ছত্র অধিকারী ছিল মহাজান। মুদ্রার ব্যাপক প্রচলন ও মহাজনী মূলধন বৃদ্ধির অর্থই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার জন্ম নয়, কারণ এই মহাজনী মূলধন, পুরনো উৎপাদন ব্যবস্থার পদ্ধতিকে জিইয়ে রেখেছিল।

মধ্য যুগে আরব-ইরাক-ইরান ও মধ্য এশিয়া থেকে আগত ইসলাম প্রচারকদের প্রভাব সমাজে যথেষ্ট ছিল। তাদের প্রচারিত একেশ্বরবাদ, সামাজিক সাম্যবাদ বহু নির্যাতিত মানুষকে মুক্তির দিশা দেখায়। চৌদ্দ শতকের আগেই বিভিন্ন পীরবাদী সুফী সম্প্রদায়ের দরবেশ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

মুসলিম সমাজে ও মসজিদে কেউ অচ্ছুত ছিল না। মুসলিম সমাজে প্রজন্মক্রমিক নিস্তরঙ্গ পেশাজীবীর দৃষ্টান্তই বেশি, তাঁরা কেউই সন্তানকে লেখাপড়া শেখানোর গরজ বোধ করত না। আর যারা লেখাপড়া শিখত তাদের প্রাপ্য সবচেয়ে বড় চাকরি ছিল কাজীর ও ফৌজদারের পদ। বাংলার গৌড়ে, ঢাকায়, মুর্শিদাবাদে ছয়শো বছরের তুর্কি-মুঘল শাসনে কোনো দেশজ মুসলিম কোনো উচ্চতর পদলাভ করেনি। তাছাড়া শিক্ষার কোনো সামাজিক তাগিদ দেশজ মুসলিমরা অনুভব না করায় শিক্ষায় ও দরবারে উচ্চপদে তারা আসীন হতে পারেনি। আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে বা হীনমন্যতার ফলে কোনো দেশজ মুসলিম রাজনীতির ক্ষেত্রে নেতৃত্বও দিতে পারেনি।

পঞ্চদশ শতকের শেষ পাদ থেকে সুফী দরবেশের কাছে দীক্ষিত মুসলিমরা কোরাণ-হাদিস অনুগ ভাবনা-চিন্তা ও আচরণের ক্ষেত্রে আগ্রহী হয়। ফলে লোকধর্মের চর্চা বাড়তে থাকায় লোককথা তথা লোকধর্ম কর্ম সমাজে প্রভাব বিস্তার করে। ব্রাহ্মণ্য সমাজের বজ্র আঁটুনিতে বিরক্ত অন্ত্যজ হিন্দু সম্প্রদায়ও এই লোকধর্ম ও লোকাচরণের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সমাজে মনসা, চন্ডী, ধর্ম, শিব প্রভৃতি দেবদেবীর পূজাও হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির মিলনজাত ফল।

মুঘল আমলে কৃষকের শ্রম জমি থেকে সম্পদ আহরণের জন্যে অপরিহার্য ছিল। তবে কৃষিকর্ম বিস্তারের জন্য কৃষকেরা সুযোগ সুবিধা পেত। ব্যাপকভাবে চাষ ও বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদনের জন্য কৃষকেরা রাষ্ট্রের কাছ থেকে সবরকম সাহায্য পেত। নতুন অনাবাদি জমিকে কৃষির আওতায় আনলে বা জমিতে সেচের বন্দোবস্ত করলে ধার্য রাজস্বের হার কমানো হত।

প্রথমে যে বা যারা আবাদ করত, অনেক সময় জমিদারির অধিকার তাদেরই দেওয়া হতো। তাদের বলা হতো 'বনকোটি' জমিদার। বাংলা সাহিত্যে এরকম উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। সপ্তদশ শতকে রচিত 'সারদামঙ্গল' কাব্যে পাই-

যাহার রাজা নেই অরাজত্ব জমি।
সেই গ্রাম আমারেই ইজারা দেহ তুমি।
... ...
বেরন্নণ্যা (এড়ন্ড) কাটেন বন বসাইল প্রজা।
রাজ্যের পালন যেন করে রামরাজা।।

তিন বৎসরের কৃষি নাহি রাজকর।
বনকাটা বেরন্নণ্যা যে বসাল্য নগর।।

বহুসময় জমিদার কৃষকদের অর্থ ধার দিতেন বা তাদের নিজেদের এলাকায় নানা 'আবওয়াব' মকুব করে তাদের বসবাস করতে উৎসাহ দিতেন, 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যে কালকেতুর গুজরাট পত্তনে লেখা হয়েছে -

বীর কর অবধান   প্রজাগণ দেহ পান
ভূমি বাড়ি করিয়া চিহ্নিত।
কিছু দিবে ধান্য কড়ি   বলদ কিনিতে কড়ি
সাধন হইবে বিলম্বিত।
...   .
ধার লহ লক্ষ তঙ্কা   কারে না কর শঙ্কা
দক্ষিণ আশায় কর বাস।

সম্পন্ন চাষীরা বাংলা সাহিত্যে বারবার মোড়লের ভূমিকায় চিত্রিত হয়েছে। বিজয় গুপ্তের 'পদ্মপুরাণ' কাব্যে বলা হয়েছে -

জহাই নামেতে মন্ডল নগরেতে ঘর।
ধনের অন্ত নাহি রাজার সামাসর।।

বাংলাদেশে অপরের জমিতে চাষ করে এমন কৃষকের কথা ফরাসি দলিলেও পাওয়া যায়। অনেকে গ্রামের চাষীদের দ্বারা নিয়োজিত হতো। তার একটি প্রমাণ আছে পদ্মাপুরাণে। চাঁদ সদাগর মজুরের কাজ করেছিল এবং নিয়োগকর্তা মন্ডল কিষাণ লাগিয়ে চাষ করাত।

এত শুনিয়া মন্ডলিয়া কহে চান্দের কাছে।
আগে কর্ম করিবার ভাত পাব পাছে।।
এতেক ভাবিয়া মন্ডল মনে মনে পাছি।
ধান্য নিড়াইতে চান্দের হাতে দিল কাঁচি।।
...   .
মার মার বলিয়া মন্ডল করে হাহাকার।
এত শুনি আসিল তথায়ে কিষাণ তাহার।।
সকলে আসিয়া তখন চান্দেরে ধরিল।।

রাষ্ট্র বা জমিদারদের ক্ষেত্রে মূল সাহায্য ছিল বীজ ধান দেওয়া ও কৃষককে প্রথমদিকে সুবিধাজনক হারে রাজস্ব দেবার সুবিধা করে দেওয়া। কৃষিক্ষেত্র সরাসরি প্রসারের ক্ষেত্রে এবং জঙ্গল হাসিল করার ক্ষেত্রে দায়িত্ব ছিল কৃষকের এবং এই কাজে সে সম্পূর্ণ তার নিজের গ্রামবাসীদের সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল ছিল। একবার 'মিরাসি' বা ভোগদখলি-স্বত্ব পেয়ে গেলে তাকে নিয়মিত রাজস্ব যেন তেন প্রকারে দিতেই হতো। অষ্টাদশ শতকের

প্রারম্ভে রচিত 'শিবায়ন' কাব্যে চাষের কাজে নিয়োজিত চাষীর এইসব সমস্যা বিবৃত হয়েছে। চাষ করার জন্য শিবরূপী চাষীকে নানাজনের দ্বারে যেতে হয়। যেমন-

কাত্যায়নী কন কান্ত কিছু নাঞিঃ কেন।
কুবেরের বাটি বীজ বাড়ি কর্‌য়া আন।।
তুমি চাষ চষিলে কিসের অসদ্ভাব।
শক্রের সাক্ষাৎ হলে সদ্য ভূমিলাভ।
ঘরে আছে বুড়া আড্যা ধরে মহাবল।
যমের মহিষ আন বলারি লাঙ্গল।।

টিপ্পনী

ক্ষেতে জমি হাসিল করার জন্যে চাষীকে প্রচন্ড পরিশ্রম করতে হয় ও নানা অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে চাষ করতে হয়। যেমন -

চৈত্র গেল চতুর্দশ চাষ হৈল পূর্ণ।
মাঠো করা মই দিয়া মাটী কৈল চূর্ণ।।

কৃষকদের শ্রমই ছিল মুঘলযুগের শোষকশ্রেণীর বিপুল ঐশ্বর্যের উৎস। এই শ্রমজাত উদ্বৃত্ত শুধুমাত্র নির্দিষ্ট আইনানুগ রাজস্বের মাধ্যমেই সংগৃহীত হতো না, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নানা ধরনের 'আবওয়াব' বা বেআইনি কর।

কবি মুকুন্দের রচনাতেও এইসব আবওয়াবের একটি ফিরিস্তি আছে। এইরকম কিছু আবওয়াব বাতিল করে কালকেতু কৃষকদের বিশেষভাবে গুজরাট নগরে বসবাস করতে আকৃষ্ট করেছে। ঘটনাটি এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে -

শুন ভাই বুলান মন্ডল।
আমার নগরে বৈস জত ভূমি চাষ চষ
সাত সন বহি দিয় কর।
সেলামী বাঁস গাড়ী নানা বারে জত কড়ি
নাহি দিহ গুজরাট দেশ।
পার্বণি পঞ্চক-জাত গুড়া লোন সানা ভাত
ধান কাটি কলম কসুরে।
জত বেচ চালু ধান তার নাহি দিব দান
অঙ্ক নাহী বাড়াইব পুরে।

প্রথম পর্যায়ে বাংলাদেশের জমিদারদের জমি জরিপ ও শস্যের ওপর কর আদায়ের চেয়ে লাঙালপিছু কর সংগ্রহের দিকেই ঝোঁক ছিল। ('হাল প্রতি দিব তঙ্কা')

মুঘল শাসনব্যবস্থার প্রভাবে উৎপন্ন শস্যের ভিত্তিতে, মাপজোখ ও জরিপের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করা এবং এজন্যে কর্মচারি নিয়োগ করার প্রথা চালু হয়ে গিয়েছিল। এই রূপান্তরের ফলে প্রজার ওপর ক্রমবর্ধমান চাপকে কবি মুকুন্দপ্রমুখ কৃষি-সমাজের প্রতিভূ কবিরা মোটেই সুনজরে দেখেননি। এই লাঙল-ভিত্তিক রাজস্বব্যবস্থা থেকে জমির জরিপ ও উৎপন্ন শস্যভিত্তিক রাজস্ব ব্যবস্থায় উত্তরণজনিত চাপের বর্ণনা কবি মুকুন্দের রচনায় বিশদভাবে বলা আছে। প্রথমে আত্মজীবনীতে "প্রজার পাপের ফলে ডিহিদার মামুদশরীপের" কাজ হচ্ছে দুটো - "মাপের কোণে দিয়া দড়া। পনের কাঠায় কুড়া। নাহি শুনে প্রজার গোহারি।" দ্বিতীয় - "খিল ভূমি লেখে লাল" (অর্থাৎ অনাবাদী জমিকে আবাদী জমি হিসেবে লিখে নিয়ে খাজনা ধার্য করা হত) কালকেতু প্রজাদের আশ্বস্ত করছে এই বলে যে, সে ডিহিদার নিয়োগ করবে না।

অত্যাচারী ভাঁড়ু দত্ত লাঙলপিছু খাজনা নেবার পরিবর্তে প্রজাকে ভূমি অনুযায়ী (বসবাস করিয়ে নির্ধারিত পরিমাণ বা হারে শস্য নিতে বলেছে -

তাড়বালা দিবে মান দিবে হে বলদ ধান

উচিত কহিতে কিবা ভয়।
জিনিতে প্রজার মায়া পত্র নিবে এক ছিয়া
বন্দে বন্দে যেন প্রজা রয়।।
যখন পাকিব খন্দ পাতিবে বিষম দ্বন্দ্ব
দরিদ্রের ধান্যে দিবে নাগা।
খাইয়া তোমার ধন না পালায় কোন জন
অবশেষে নাহি পাও দাগা।।

মুঘল শাসনব্যবস্থায় এ ধরনের চাপ হয়তো জমিদারদের নিজেদের রাজস্ব আদায়ের বা ঐ ব্যবস্থার কাঠামোকে পরিবর্তনের পথে নিয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে মুর্শিদকুলি খান ব্যাপকহারে জমির জরিপ ও রাজস্ব প্রেরণ ও সংগ্রহে নিয়ন্ত্রণ আনার জন্যে খ্যাতিলাভ করেছেন। এ ধরনের রাজস্ব ব্যবস্থা শাসনব্যবস্থার কাঠামোকে সুদৃঢ় করে এবং অন্যদিকে থেকে কৃষি-সমাজে চাপ বাড়ায় ও কৃষকের উদ্বৃত্তকে আরো নিপুণভাবে আত্মসাৎ করে। তাই ডিহিদার নিয়োগ, জমির জরিপ ও লাঙলপিছু করের পরিবর্তে উৎপন্ন শস্যের ওপরে কর কৃষি-সমাজের প্রতিভূদের কাছে সুদিনের বার্তাবহ বলে মনে হয়নি। এভাবে মুঘল যুগে কৃষি-অর্থনীতিতে সামাজিক সংঘাত প্রকট হয়ে উঠেছিল।

জায়গির বদল ও ইজারাদারি ব্যবস্থার প্রচলনের ফলে কৃষকদের ওপর অর্থনৈতিক চাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের কাছে বাঁচবার পথ ছিল দুটো। সাধারণত কৃষক-চেতনায়, ব্যাপক অত্যাচার না হলে, প্রতিরোধের ধারণা অস্পষ্টই ছিল। কবি মুকুন্দের কাছে "প্রজার পাপের ফলেই" ডিহিদার মামুদশরীফের অত্যাচার হয়। ওলন্দাজ কোম্পানির প্রতিনিধির কাছে ভারতীয় কৃষকের সহিষ্ণুতা বিস্ময়কর মনে হয়েছিল।

বার্নিয়ের-এর ভাষায়ঃ "এই স্বৈরাচার যা এক কথায় কৃষককে তার ভিটেমাটি ছেড়ে ভালো ব্যবহার পাবার আশায় কোনো সন্নিহিত রাজ্যে পাঠাত। ষোড়শ শতকে কবি কঙ্কণের আত্মজীবনী এর সুন্দর নিদর্শন। কবি মুকুন্দ নিজে সম্পন্ন চাষী ছিলেন ও বংশানুক্রমিক ভোগদখলি স্বত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর ভাষায়-

সহর সেলিমা বাজ তাহাতে সজ্জন রাজ
নিবাস নেউগি গোপীনাথ।
তাহার তালুকে বসি দামিন্যায় চাষ চষি
নিবাস পুরন্দর ছয় সাত।।

যখন মামুদ শরীফের অত্যাচার চরমে, তখন প্রজারা পালাবার পথ অনুসন্ধান করল এবং তাতে বাধা দেবার জন্যে পাহারা বসালো। অন্যের সহায়তায় কবি মুকুন্দ শেষ পর্যন্ত পালালেন। যেমন-

জানদার সভার আছে প্রজাগণ পলায় পাছে
দুয়ার চাপিয়া দিল থানা....

প্রজারা যখন কালকেতুর কাছে ভাঁড়ু দত্তের অত্যাচারের কথা বর্ণনা করে, তখনো পালিয়ে যাবার ভয় দেখায়। যেমন -

মহাবীর রাজা করভাঁড়ু দত্ত লইয়া
সবে জাইব বিদায় হইয়া।
ভাঁড়ু যত পীড়া করে কে তাহা সহিতে পারে,
না জানি পালাইয়া জাব কথি।

অষ্টাদশ শতকের প্রথমে রচিত ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যেও কবি মুকুন্দের বর্ণনার সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন-

অবিচারে ভাঙ্গে রাজ্যে গৌড়ের ভুবন।

টিপ্পনী

পীড়া পেয়ে পাত্রের পলায় প্রজাগণ।।
রাজকর লোকের তেসনি নিল বাড়া।
অতএব সকল প্রজা হল দেশছাড়া।।
সেনের আসান কত আসিছে ময়না।
নীলাচল উৎকল আশ্রয়ে কতজনা।।

বাংলায় সামুদ্রিক বণিক বা অন্যান্য স্তরের বণিকদের সঙ্গে সরাসরিভাবে উৎপাদন-সম্পর্কের যোগাযোগ ছিল না বলে ভূস্বামীদের সঙ্গে স্বাথের্র সংঘাত ব্যাপকতম বা উচ্চতম পর্যায়ে দেখা দেয়নি। দ্বিতীয়ত - স্থানিক বাণিজ্যের বণিকরা কৃষি- অর্থনীতিরই অঙ্গ ছিলেন। ভূস্বামীরা নিজেদের অঞ্চলে শান্তির শৃঙ্খলা বজায় রেখে ও ছোট ছোট হাট-গঞ্জ বসিয়ে তাদের বাণিজ্যের সহায়তা করতেন। এরই বিনিময়ে ঐসব বণিকরা নির্ধারিত তোলা দিতে দ্বিধাবোধ করত না, কিন্তু কিছু অতিরিক্ত হলেই গোলমাল বাধত। কালকেতু স্পষ্ট বলছে, ভাঁড়ুদত্তই ন্যায্য সীমা লঙ্ঘন করে হাটে গোলমাল বাধায়।

কিসের কারণে খুড়জা ধর মোর ছলা।
পূর্বাপর আছে মোর মন্ডলিরা তোলা।।

বর্হিবাণিজ্যের সূত্রে ভারতে ক্রমশ বেশি করে রৌপ্য আসা ও টাঁকশাল থেকে বেশি করে মুদ্রা বার হবার মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে এবং একটা পর্যায়ে চালু তঙ্কা মুদ্রার সংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল। বাজারে টাকা আসা-যাওয়ার সঙ্গে কৃষিজাত দ্রব্যের দামের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল - এটা মুদ্রা-অর্থনীতি প্রসারের একটা প্রমাণ।

বাণিজ্যের প্রধান ধারা ছিল গ্রাম থেকে শহরের দিকে এবং ছোট ছোট হাটগুলি গ্রামের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাত। গ্রামে ষোড়শ-সপ্তদশ শতক থেকে জমিদার শ্রেণির উদ্ভবও গ্রামে এক ধরনের চাহিদার সৃষ্টি করেছিল। তবে, কৃষকদের ব্যাপক দুঃস্থ অবস্থা অবশ্যই গ্রামের চাহিদাকে শহরের চাহিদার সমপর্যায়ে নিয়ে যেতে পারেনি।

ষোড়শ শতকের চৈতন্যভাগবত-এর বর্ণনায় সবজি বিক্রেতা ও গোয়ালা শ্রীধরের বদান্যতায় শ্রীচৈতন্যকে যে উৎকৃষ্টতম খাবার দেবার পরিচয় পাই তা হল -

শ্রীধরের গাছে যেই লাই ধরে চালে।
তাহা খায় প্রভু দুগ্ধ মরিচের ঝালে।।

কৃষিপ্রধান সমাজে শ্রমিক সরবরাহের উৎসকে সজীব রাখাই বর্ণ ব্যবস্থার একটি উদ্দেশ্য। একটি বিশেষ বর্ণ বা জাতির সঙ্গে অন্য কোনো বর্ণের বা জাতির গোষ্ঠীগতভাবে সুনির্দিষ্ট সামাজিক বা অর্থনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখার নামই যজমানি ব্যবস্থা। গ্রামে উচ্চবর্ণের বিশেষ কাজ করে নিম্নবর্ণের লোকেরা কতকগুলি নির্দিষ্ট সুবিধা ভোগ করত। যেমন, নির্ধারিত সময়ে কাজ পাওয়া ইত্যাদি। এখন এই ব্যবস্থার ফলে গ্রামাঞ্চলে হাতের কাছে দিনমজুর পাবার সুযোগ হয়েছিল। এমনকি এর দ্বারা শ্রম বিনিময় (Exchange of labour) রীতিও গ্রামীণ সমাজকে একটি নির্দিষ্ট বেষ্টনীর মধ্যে বেঁধে রেখেছিল। জাতিভেদ প্রথা থাকা সত্ত্বেও এই শ্রম বিনিময় নীতির ফলে একজন ব্রাহ্মণ এবং একজন কৃষকের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও নির্ভরতা গড়ে উঠতে পেরেছিল।

এই বর্ণব্যবস্থা সামাজিক চেতনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। কবি মুকুন্দ, ভারতচন্দ্র ও ঘনরামের নগর বর্ণনায় জাতির ক্রমানুসারে বসতির কথা বলা হয়েছে। গঙ্গারামের মহারাষ্ট্র পুরাণে মারাঠাদের আক্রমণে গ্রাম থেকে বিতাড়িত জনসাধারণের বর্ণনাও বর্ণের ক্রমানুসারে করা হয়েছে। সংস্কারযুক্ত তান্ত্রিক কুলাচারে ভৈরবীকে কতকগুলো নীচজাতির মেয়ে হতেই হতো। কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা বৈষ্ণবরা জগতের চরম মুক্তির দিনে অংশীদার হিসেবে 'আচন্ডাল' জন নিয়ে সমস্ত জাতিকেই

টিপ্পনী

আহ্বান করেছিলেন। তাই, সংস্কারবাদী আন্দোলনের প্রতিবাদী রূপেও প্রকারান্তরে বর্ণব্যবস্থার সামাজিক গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার গোপভূমে জঙ্গল হাসিল করে সদগোপরা গোরক্ষণ থেকে কৃষিকাজে মন দেয় এবং অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হয়। তখন মন্দির তৈরি করে ও জমি দিয়ে এই গোপরা তাদের সামাজিক ক্রিয়াকলাপে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত নিয়োজিত করে এবং তারা 'নবশাখ' বলে উচ্চতর সামাজিক মর্যাদা পায়। মানভূমে দেখা যায়, উপজাতি ভূমিজরা কিভাবে ক্ষত্রিয় রাজার মর্যাদা দাবি করে বিবাহ পদ্ধতি ও ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের দয়া-দাক্ষিণ্যের মাধ্যমে বর্ণব্যবস্থার তলার ধাপ থেকে উপরের ধাপে উঠে গেল।

টিপ্পনী

মুসলিমরাও এই সর্বব্যাপী বর্ণব্যবস্থায় অপাঙক্তেয় নয়। তারা বিজেতা বা শাসক নয়, বরং হিন্দু সমাজের থেকে পৃথক অথচ পাশাপাশি বসবাসের ও সম্মানের উপযুক্ত একটি গোষ্ঠী। কালকেতুর গুজরাট পত্তনের গোড়াতেই কবি মুকুন্দ মুসলিমদের আসার কথা এবং তাদের গোষ্ঠীর কথা বলেছেন।

কলিঙ্গ নগর ছাড়ি প্রজা লয় ঘরবাড়ি
নানা জাতি বীরের নগরে।
বীরের লইয়া পানবৈসে যত মুসলমান
পশ্চিম দিগ বীর দিল তারে।।

এরপরে মুসলিম বসবাসকারীদের নানা গোত্রে ভাগ করা হয়েছে এবং তারপর হিন্দুদের বসবাসের বিবরণ শুরু করা হয়েছে। এখানে মুসলিমদের কথা ব্রাহ্মণদের কথারও আগেই এসেছে। যেমন -

নানা বৃত্তি করিয়া বসিল মুসলমান
সাবধান হইয়া শুন হিন্দুর উঠান।
... ...
পাইয়া বীরের পান বৈসে যত কুলস্থান।
বীরের নগরে বিপ্রগাণ।।

বর্ণব্যবস্থা একটি সামাজিক কাঠামো হিসেবে একদিকে নির্দিষ্ট। আবার, অন্যদিকে খোলামেলা, এখানে ক্রম বা ধাপ বা ক্রমিক স্তর আছে। প্রত্যেকটি জাতি কৃষি-অর্থনীতিতে তার কাজ, তথা সমাজিক সম্পদ বন্টনে তার নিয়ন্ত্রণ ও অংশ অনুযায়ী একটি ধাপে থাকে।

গোটা কাঠামোর ভারসাম্যের বিরুদ্ধে উঠতি নিচু জাতদের ক্ষোভ দানা বাঁধে না। বরং তারা চেষ্টা করে কিভাবে যজমানি ব্যবস্থায় তারা নিজেরা লাভবান হবে। ফলে, নানা সমাজিক ক্রিয়াকলাপে তারা নিজেদের প্রতিপত্তি জাহির করে উচ্চবর্ণদের রীতিনীতি অনুকরণ করে এবং এতদিনের জাতভাই নিচু জাতিদের থেকে দূরে সরে যেত। শ্রেণিদ্বন্দ্বের বিষ এভাবেই ঝরে যেত।

(তথ্যসূত্রঃ গৌতম ভদ্র - 'মুঘলযুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক-বিদ্রোহ'-১৯৯১)

মুঘল যুগে কৃষি অর্থনীতি-জাত সামাজিক কাঠামো নানান বিভেদ, স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ছবিকেই স্পষ্ট করে তুলেছিল। আর এই নির্ভরশীলতাকে রসদ দান করেছিল মধ্যযুগের ধর্মীয় প্রেক্ষিত। নাটমন্দির, দুর্গামন্ডপ, হরিমঞ্চ, মসজিদ, মক্তব, মাদ্রাসা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে সামাজিক বিভেদের ছবিটা অনেকটাই অপসৃত হয়ে গিয়ে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের রূপটিই উদ্ঘাটিত করেছিল। নানান ধর্মীয় অনুষ্ঠান মতভেদ সত্ত্বেও বহু মানুষকে একত্রিত করতে সহায়ক হয়েছিল। একবিংশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক ক্রিয়াকান্ডের উৎস যে পার্টি অফিস তা-ই মধ্যযুগে ধর্মীয় স্থান তথা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ক্ষেত্র

হিসেবে চিহ্নিত ছিল। ভূমিকেন্দ্রিক গ্রামীণ জীবনে যে অধিকারগত পরম্পরা, সেই অধিকারকে কেন্দ্র করে ভূস্বামী বা জমিদার বা মধ্যসত্ত্বভোগীরা সমাজের নিয়ম-কানুন স্থির করে ধর্মীয় আবরণে মানুষের কাছে উপস্থাপিত করত। এভাবে ধর্ম ও স্বার্থ সমীকৃত হয়ে মধ্য যুগের ভূমিকেন্দ্রিক অর্থনীতি ও সামাজিক নিয়ন্ত্রিত করত। পিরামিডের মতো স্থিতিশীল এই সমাজ ব্যবস্থায় নীতি ও মূল্যবোধ ছিল সুদৃঢ় এবং মানুষের সম্প্রীতি ও সহজ-সরলতা ছিল তাদের অন্যতম মূলধন।

টিপ্পনী

মুঘল আমলে রাজস্বের মাধ্যমে শোষণ আমলাতান্ত্রিক সামন্ততন্ত্রের মূল ভিত্তি ছিল। সেকারণে বাজারে ভূমিকা ও মুদ্রা অর্থনীতির অস্তিত্ব মুঘল আমলাদের শোষণের রূপ বজায় রাখার পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। আবার রাষ্ট্রীয় রাজস্ব কাঠামোর কারণেই বাজারের প্রসার ঘটেছিল। চাষীরা বাণিজ্যিক চাষের মাধ্যমে যেমন রাষ্ট্রের চাহিদা মেটাতো তেমনি মহাজনি ও গ্রামের ব্যবসায়ীদের ভূমিকাকেও প্রকট করে তোলে। এমনকি বাণিজ্যিক মূলধন ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর এক ধরনের আঁতাতও সৃষ্টি হওয়ায় শোষণের চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে এই শোষণ সত্ত্বেও কৃষক জীবন ছিল শান্ত ও দ্বন্দ্বমুক্ত।

একথা ঠিকই এই সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোয় ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার বীজ নিহিত ছিল না। মূলত বাজার, মুদ্রা ও নগরের বিস্তার আমলাতান্ত্রিক সামন্ততন্ত্রকে জোরদার করেছিল এবং তা গ্রাম ও নগরের ব্যবধানকে প্রকট হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল মাত্র। ফলে গ্রামীণ অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল সামন্তদের নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ ও সমঝোতা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল - ভূমিজ স্বার্থের কারণেই। আবার ভারতীয় কৃষকদের সঙ্গে মুঘল রাষ্ট্রের সরাসরি কোনো বিরোধ ছিল না। তাই উৎপাদন ব্যবস্থায় জড়িত ক্ষুদ্র কৃষকরাও মুঘল শাসনের ঐতিহ্যকে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে ব্যবহার করেছিল।

অন্যদিকে নবাবী আমলের শেষের দিকে রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ অর্থনৈতিক দুরবস্থা, সামাজিক জীবনে দারিদ্র ও অন্নহীনতাকে প্রকট করে তোলে। তাই ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে ঈশ্বরী পাটনীকে তার সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কিত হতে হয়। সন্তানের আশ্রয় ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে দেবী অন্নদার কাছে বর চেয়ে নিতে হয়। এমনকি এই সময়ের অর্থনৈতিক দুরবস্থা, বিচারালয়ের দুর্দশা ও সমাজ জীবনের অশান্তির দিকটি শাক্ত পদকর্তাদের গানে প্রকট হয়ে উঠেছে - 'কোন্ অবিচারে আমার পরে, করলে দুঃখের ডিক্রি জারি।' কিম্বা- 'মা আমায় ঘুরাবে কত/কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত?' আবার সংসার যন্ত্রণার দুঃখ - 'মলেম ভূতের বেগার খেটে,/আমার কিছু সম্বল নাইকো গেঁটে'।

এভাবে নবাবী আমলে একদিকে গ্রামীণ গোষ্ঠীজীবনের ভাঙন দশা অন্যদিকে শহরে দরবারী সংস্কৃতি তথা ব্যক্তিস্বার্থের প্রাধান্য, সেইসঙ্গে নগর-জীবনের আড়ম্বরপ্রিয়তা, বিলাস-ব্যসন, আভিজাত্য তথা কৃত্রিমতা এবং গ্রামীণ জীবনে অনাহার,

দারিদ্র, অবিচার, উৎপীড়ন সামাজিক জীবনের অসহায় রূপটিকেই উদ্ঘাটিত করে - যা ভারতচন্দ্রের কাব্যে বাস্তব রূপ পেয়েছে, রূপ পেয়েছে শাক্ত পদাবলী ও বাউল গানে। আর এই সূত্রেই মধ্য যুগের দেববাদকেন্দ্রিক ধর্মবিশ্বাসে দোলাচলতা ও অবিশ্বাসের সুর ধ্বনিত হতে থাকে - যা আধুনিক যুগের সূত্রপাত সূচিত করে। সামাজিক জীবনের এই অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা একদিকে, অন্যদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ইংরেজের আগমন আধুনিক সমাজ জীবনের উদ্ভবকে ত্বরান্বিত করে।

ধর্মীয় প্রেক্ষিত

পাঠান আমলে শাসকরা হিন্দুদের ধর্মান্তরিতকরণের উপর জোর দিয়েছিল। বাংলায় পীর, ফকির, মুরশিদ, গাজী প্রভৃতি মুসলমান ধর্মগুরুদের আগমন হতে থাকে। গিয়াসুদ্দিনের

সময় এদেশে মুসলমান পন্ডিতরা আমন্ত্রিত হতেন। ইবন বতুতার বর্ণনায় দেখা যায় তাঁর সময়ে বাংলাদেশে সুফী মতাবলম্বী বহু মুসলমান বাস করতেন। তবে ইসলামের ধর্ম ও আদর্শের প্রতি হিন্দুরা আকৃষ্ট হয়নি। অবশ্য হিন্দু সমাজের নিম্নবর্ণের মধ্যে ইসলামের বাণী প্রচারে মুসলমান শাসকগণ সমর্থ হয়েছিলেন। পীর, ফকির, আউলিয়া, মুরশিদ প্রভৃতি ইসলামধর্মী ধর্মপ্রচারকগণ নানা কৌশলে সমাজের নিম্নবর্ণের মধ্যে ইসলামের প্রভাব মুদ্রিত করার চেষ্টা করেছিলেন। সেজন্য নিম্নশ্রেণির সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুরা সংস্কারবশত পীরের দরগা ও মসজিদে শীর্ণি দিতে আসত।

পাঠান আমলে সাধারণ হিন্দুরা পঞ্চোপাসক ছিল। সমাজে বৈষ্ণব ও শাক্ত দুই সম্প্রদায়েরই প্রাধান্য ছিল। লক্ষ্মণসেনের সময় থেকে বাংলাদেশে বৈষ্ণব প্রভাব সূচিত হতে থাকে। সম্ভবত চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মাধবেন্দ্রপুরীর মাধ্যমে বাংলায় ভাগবতের আদর্শ প্রচারিত হওয়ায় তাঁর শিষ্যরা এদেশে গোপাল মূর্তির পূজা জনপ্রিয় করে তোলেন। চন্ডী পূজা ছাড়াও এসময়ে লোকজীবনে বিষহরি, বাসুলী, মঙ্গলচন্ডী প্রভৃতি গ্রাম্য দেবদেবীর বিশেষ প্রভাব ছিল। অন্যদিকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে নবদ্বীপ শান্তিপুরকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি নতুন পথের সন্ধান করে।

ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম বাংলার ধর্মীয় ভেদাভেদের ক্ষেত্রে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছিল। তাঁর প্রেমধর্মের বাণী-ই হল 'জন্ম বড় কথা নয়, কর্মই বড় কথা'। শুধু তাই নয় তিনি আদ্বিজ চন্ডালে তাঁর প্রেমধর্ম বিতরণ করে ধর্মীয় ক্ষেত্রে একটি স্থিতিস্থাপকতা আনতে পেরেছিলেন। বিশেষ করে তাঁর প্রেমধর্মকে কেন্দ্র করে বাংলায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন প্রসারিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে সনাতন, রূপ ও জীব গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম, রসতত্ত্ব, দার্শনিকতা ও স্মৃতির উপর যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করেন পরবর্তী কালের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও সমাজ তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল।

ষোড়শ শতকে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারের কালে শাক্ত মত ও তন্ত্রাশ্রিত ধর্ম প্রায় সমগ্র বাংলা দেশেই বিস্তার লাভ করে। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ভক্তিবাদের প্রাবল্যে শাক্তমত কিছুটা কোনঠাসা হলেও বাংলাদেশে তা নতুন করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিস্তৃতি লাভ করে।

মধ্যযুগীয় নগরবিন্যাসে সর্বত্রই ধর্মীয় সৌধগুলির প্রাধান্য দেখা যায়। এই যুগে ধর্মীয় তত্ত্ব শুধু ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে নয়, তা রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গেও যুক্ত। কেননা রাষ্ট্র ছিল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালিকা শক্তি, যা যুক্ত ছিল জনকল্যাণমূলক ধারণার সঙ্গে। মসজিদ ছিল মধ্য যুগে ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতির মুখ্য স্তম্ভস্বরূপ। রাজ্যজয় করা মাত্র মুসলমান বিজেতারা মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে বিজয় ঘোষণা করতেন। প্রভাবশালী সুফীদের ও শাসকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত উলেমাগোষ্ঠীকে তোষণ-পোষণ করার জন্য মসজিদ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হতো।

মধ্য যুগের মসজিদ সংলগ্ন অসংখ্য শিলালিপি থেকে প্রমাণিত হয় সুলতান, আমীর মালিকদের অর্থানুকূল্যে বড়ো শহরগুলিতে জামী মসজিদ নির্মিত হতো এবং এগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থাকত বিশিষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তিদের উপর। ধর্মীয় মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি নগরায়ণের ধারাকে ও নগরজীবনকে সেযুগে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করত। মসজিদ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করে রাষ্ট্র ধর্মীয় গোষ্ঠী মারফৎ জনজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করত।

মধ্যযুগের বাতাবরণে ধর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। চিন্তা ও চেতনার জগতে সাধারণ মানুষও ধর্মের নামেই চিন্তা করত। ধর্মের দুটো দিক ছিল - একটি প্রাতিষ্ঠানিকতা বা সরকারি ধর্মমত, অন্যটি প্রতিবাদী ধর্মমত। বাংলায় তথা ভারতে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতক থেকে সুফি ও ভক্তিবাদ বিশিষ্ট ধর্ম প্রচারিত হয়। এসব মরমিয়া ধর্মমতের সমর্থক ও

টিপ্পনী

অনুগতরা ছিল বিভিন্ন নিম্নজাতিভুক্ত কারিগর, খুদে ব্যবসাদার ও কৃষক। ধর্মের বাহ্যিক আচার এবং সামাজিক বহু রীতিনীতির বিরুদ্ধে এইসব ধর্মগুলির প্রতিবাদ ছিল।

শাক্ত, তন্ত্র, নাথ ধর্মও বাংলায় প্রভাব বিস্তার করে। শাক্ত দর্শনের মূল ভিত্তি সাংখ্য - যা গড়ে উঠেছিল প্রাচীন যুগের তন্ত্র থেকে উদ্ভূত প্রকৃতি পুরুষ তত্ত্বকে আশ্রয় করে। সেই সুদূর অতীতের মাতৃপ্রধান সমাজ থেকে প্রকৃতি প্রাধান্যবাদের উদ্ভব হয়েছে, মাতৃকাদেবীকেন্দ্রিক সেই প্রাচীন জীবন চর্যাই আদি তন্ত্র। মাতৃ বা প্রকৃতি-প্রধান ধর্মব্যবস্থা, যার আবেদন ছিল মূলত সমাজের নিম্নস্তরে, বিশেষ করে কৃষিজীবী মানুষের মধ্যে, তা সাধারণ মানুষের জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল এবং এই প্রভাবে ভারতের প্রধান ধর্মগুলিও শাক্ততান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়। আসলে তান্ত্রিক সাধকরা মনে করতেন, বিশ্বভুবনে ও বিশ্বের অন্তরালে এক মহাশক্তির লীলা চলছে। সেই অদ্বৈত শক্তি-উৎস থেকে বিশ্বের যাবতীয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শক্তির লীলা। অন্যদিকে নাথধর্ম মূলত বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মসাধনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

মধ্য যুগে চৈতন্যদেবের নব প্রবর্তিত প্রেমধর্ম তথা লোকধর্মের আদর্শে পরবর্তীকালে বিভিন্ন লোকধর্মের প্রসার ঘটে। ধর্মমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত ধর্মদেবতা আসলে হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মের মিশ্রণজাত লৌকিক দেবতা। শিবায়নের কৃষক শিবও লৌকিক দেবতা, অন্নদামঙ্গলের অন্নপূর্ণাও অন্নহারাদের লৌকিক দেবী। দক্ষিণ দেশের তোতারাম বাবাজী নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্র পড়তে এসে তিনি যে আমাদের বাংলায় লোকধর্মগুলির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা লক্ষ করেছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন-

আউল বাউল কর্তাভাজা নেতা দরবেশ সাঁই।
সহজিয়া সহীভাবকী স্মার্ত জাত-গোঁসাই।
অতি বনি চূড়াধারা গৌরাঙ্গ নাগরী।
তোতা কহে এই তেরোর সঙ্গ নাহি করি।।

তোতা যে ঊনচল্লিশটি লোকধর্মের নাম দিয়েছেন, যা সমকালের বাংলাদেশে লোকধর্মের ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্যকেই প্রমাণ করে। প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলাদেশে ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে 'কর্তাভজা ধর্ম সম্প্রদায়' নামে একটি বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। নদীয়াতে অষ্টাদশ শতকের শেষে সাহেব ধনী সম্প্রদায়েরও উদ্ভব হয়েছিল। বৈষ্ণব ধর্মের অবক্ষয় থেকে সদাচারী জীবনযাপন ও পরকিয়া বর্জনের অভিপ্রায় নিয়ে গড়ে উঠেছিল বলাহারী সম্প্রদায় - যা মূলত নিম্নবর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। লালনের মৃত্যুর পর বাউল ফকিররা লালনশাহী সম্প্রদায়ের মাধ্যমে ধর্মসমন্বয়ের চিন্তাধারাকে প্রসারিত করেন। এরা মূলত ধর্মীয় অনুশাসন-এর বিরোধী এবং অন্ত্যজ বা নিম্নবর্গের উপর উচ্চবর্গের অত্যাচারের কারণে প্রতিবাদী। আসলে এইসব লোকধর্মগুলি গড়ে উঠেছিল পুরোহিতদের শাসন, উচ্চবর্গীয়দের নিম্নবর্গীয়দের উপর অত্যাচার-এর কারণে এবং যা নিপীড়িত ও অত্যাচারিত মানুষের কাছে ছিল মুক্তির দিশা।

মধ্যযুগের সমাজে ধর্মসমন্বয়ের পাশাপাশি ধর্ম কলহের দৃষ্টান্তও যথেষ্ট। বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা'য় চৈতন্য পরবর্তী যুগের এই ধর্মকলহের চিত্র দেখা যায় 'দেউল ভাঁগি মসীব বাঁধ' (দেউল ভেঙে মসজিদ বানায়), 'হিন্দু বোলি দুরহি নিকার, ছোটেও তুরুকা ভভকী মার' (হিন্দুকে বলে, দূরে যাও। তুরুক ছোট হলেও বড়কে মারতে যায়)। আবার ষোড়শ শতকের ধর্মকলহের কথা জয়ানন্দ তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ জানিয়েছেন,

পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ।।
বিষম পিরল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে।
ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে।।

টিপ্পনী

বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতেও দেখা যায় বৈষ্ণব হরিদাসকে মুসলমান হয়ে হিন্দু আচার পালন করা অপরাধে মুসলমানেরা মুলুকপতির কাছে ধরে নিয়ে যায়। তিনি হরিদাসকে হিন্দু আচার ত্যাগ করার অনুরোধ করে বলেছেন,

কত ভাগ্যে দেখ তুমি হৈয়াছ যবন।
তবে কেনে হিন্দুর আচারে দেহ মন।।
আমার হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত।
তাহা তুমি ছোড় হই মহাবংশজাত।।
জাতি ধর্ম লঙ্ঘি কর অন্য-ব্যবহার।।
পর-লোকে কেমতে বা পাইবা নিস্তার।।

ষোড়শ শতকে হিন্দু ও বৌদ্ধের কলহ সম্পর্কে বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবতে জানিয়েছেন,

তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবন।
দেখিলেন প্রভু বসি আছে বৌদ্ধগণ।।
জিজ্ঞাসেন প্রভু কেহো উত্তর না করে।
ক্রুদ্ধ হই প্রভু লাথি মারিলেন শিরে।।
পলাইল বৌদ্ধগণ হাসিয়া হাসিয়া।
বনে ভ্রমে নিত্যানন্দ নির্ভর হইয়া।।

ধর্মকলহের পাশাপাশি ধর্মসমন্বয় তথা উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের দেবদেবীর সমন্বয় মধ্যযুগের ধর্মীয় প্রেক্ষিতের অন্যতম দিক। সেন আমলে ব্রাহ্মণ্য আদর্শে সমাজ সংগঠনের ব্যাপক প্রচেষ্টা হলেও তাতে শুধুমাত্র কাঠামো স্থাপন হয়েছিল, কাঠামোকে বাঁচিয়ে রাখা যে প্রাণ তার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। এরপর মুসলমান অভিঘাতে আর্য ও অনার্যের দেবদেবীর সীমা মুছে যেতে আরম্ভ করে এবং উভয়ের সংমিশ্রণে গড়া এক নতুন ধর্মাদর্শ আত্মপ্রকাশ করে। চাঁদ শিবভক্ত হয়েও মনসার পূজা করে, ধনপতি শিবভক্ত হয়েও চন্ডীর পূজা করতে বাধ্য হয়, ধর্মমঙ্গলের ধর্মদেবতা যা কিনা মিশ্র দেবতা তাও রাঢ় বঙ্গেও বহু মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

আর্যের প্রজ্ঞাধর্মী জীবনবাদের সঙ্গে অনার্যের বস্তুনিষ্ঠ প্রাণধর্মিতা এসে মিলিত হয়, আর্যের চিন্তা ও মনন অনার্যের সজীব ক্রিয়াশীলতার সঙ্গে যুক্ত হয়। আর এই সমন্বিত আদর্কের উপর সামগ্রিকভাবে বর্ষিত হল ইসলামের প্রভাব। এই প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত হয় নতুন ধর্মাদর্শ যার পুরোহিত হলেন মানবতার মূর্ত বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেব।

মধ্যযুগের ধর্মদর্শনঃ

ধর্ম-কে বাদ দিয়ে মধ্য যুগের সমাজ ও সংস্কৃতিকে এবং সাহিত্যকে মূল্যায়ন করা যায় না। ধর্ম ও ধর্মের দর্শন এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান-উৎসব-পালা-পার্বণ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেমন গড়ে উঠেছিল তেমনি তা সাহিত্য সৃষ্টির উপাদান হিসেবে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের ভারতবর্ষে ধর্মকে সমস্ত উদ্যোগের ভিত্তি বলে উল্লেখ করেছেন। একথা ঠিকই যে, বহু মানুষ একটি ধর্ম বা ধর্মের দর্শনকে সামনে রেখে একত্রিত হয়ে তাদের জীবন ও জীবিকার রসদ খুঁজে পেত। বর্তমানে যেমন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং তাদের দর্শন এর ভিন্নতা রয়েছে, তেমনি মধ্য যুগে বৌদ্ধ, হিন্দু, বৈষ্ণব, শাক্ত, সুফি, বাউল, তন্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মও তাদের দর্শন নিয়ে একত্রে স্বাতন্ত্র্য ও বিভেদ বজায় রেখেও সহাবস্থান করত।

টিপ্পনী

বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মদর্শনঃ

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত গৌড়বঙ্গে রাষ্ট্র, ধর্ম ও ভাষার পক্ষে এক গুরূত্বপূর্ণ সংক্রান্তিকাল। গুপ্তযুগের ব্রাহ্মণ্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম তখনও অব্যাহত। এর সঙ্গে প্রচলিত ছিল ষটকর্মবিহিত শাক্তাচার ও শৈব হঠযোগ। জৈনধর্মে কঠিন কৃচ্ছ্র সাধনার সঙ্গে বামাচারী সাধন - অলৌকিক সিদ্ধি এবং ভাবনা-বিমুক্তির নামে রতিকল্প ও বিচিত্র বর্ষা - যোগভ্রষ্ট সাধুদের ('পতৎপ্রকর্ষ সাধুনাং') ক্রিয়া-কলাপে পরিণত হয়েছিল। জৈন সাধুদের একটি শাখা ক্রমশ শৈব হঠযোগের দিকে ঝুঁকে পড়ায় উদ্ভূত হয়েছিল শৈব নাথপন্থ।

টিপ্পনী

বৌদ্ধধর্মে মহাযান শাখায় মাধ্যমিক ও বিজ্ঞানবাদে নানা সূত্র ও শাস্ত্র ব্যাখ্যার প্রচলন ছিল এবং লৌকিক সিদ্ধির লক্ষ্যে ('অমুকীং বশমানয়, অমুকমুচ্চটায়') ছিল বিচিত্র তন্ত্র-মন্ত্র-চর্যায় সাধন। সিদ্ধনাগার্জুন-প্রবর্তিত রস-রসায়নের প্রতিও আকর্ষণ ছিল। সর্বত্রই লৌকিক সিদ্ধি লাভের তাগিদ। বৌদ্ধ তন্ত্রযান বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল - বজ্রযান, কালচক্রমান ও সহজযান।

বৌদ্ধ সহজিয়াদের সহজসাধান 'অনুত্তর' যোগের অন্তর্গত - তা উচ্চস্তরের যোগীর সাধন, তা হিন্দুতন্ত্রের দিব্যভাবের মতই 'সর্বভাবোত্তমোত্তম'। এর তত্ত্ব 'মহাসুখ', এর চর্যা 'মহারাগ নয়'। এর সাধন ও প্রাপ্তি উভয়ই 'অনুত্তর' (যার পর নাই)। এই সহজ মত বৌদ্ধতন্ত্রেরই অন্তর্ভুক্ত। বৌদ্ধতন্ত্রের বিভিন্ন মন্ত্র-মন্ডলাদি দ্বারা তা আচ্ছন্ন ছিল মাত্র।

বৌদ্ধদের পরম সাধনার ধন নির্বাণ- 'নির্ব্বাণং পরমং বদন্তি বুদ্ধা'। দক্ষিণাপথের হীনযান এবং উত্তরাপথের মহাযান। হীনযানও নানা শাখায় বিভক্ত। মহাযানেরও যানভেদ যথেষ্ট - মাধ্যমিক, যোগাচার, বজ্রযান, সহজযান। বাংলা ভাষায় রচিত সিদ্ধ আচার্যদের সংগীতগুলি সহজযানের অন্তর্ভুক্ত, মহাসুখ তাঁদেরই সবার্থসিদ্ধি। তান্ত্রিক বৌদ্ধদের নির্বাণ-ভাবনায় 'মহাসুখ' নব সংযোজন।

মহাসুখ মিলনজনিত একটি সহজ আনন্দঘন অবস্থা; তা সর্বশূন্য, তা নিরালম্ব বিশুদ্ধ বিজ্ঞান; মহাসুখের সঙ্গে অবিনাভাবে যুক্ত অদ্বয়, তথতা ও সমরস বোধ; মহাসুখতরূর ফল মহাকরূণা; এবং সর্বোপরি অলক্ষ্য ও লক্ষণহীন মহাসুখ এখটি স্বসংবেদ্য 'বাক্‌পথাতীত' তত্ত্ব।

মহাসুখের অপর নাম সহজ বা সহজানন্দ। সাধারণ অর্থে 'সহজ' হল সহজাত স্বভাব - 'সহ জায়তে ইতি সহজঃ'। হের্বজতন্ত্র বলেন, জন্মের সঙ্গেই যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাই সহজ ('সহজাত্যং যদুৎপন্নং সহজং তৎ প্রকীর্তিতম্' ১.১০.৪১)। আবার কেউ কেউ বলেন, সহজ মানে সোজা (ঊধ্বং)। আসলে মহাসুখ বা সহজানন্দ একটি অচিন্তনীয় মহাসুখকর অনুভব। পার্থিব জগতে নরনারীর মিলনে যে আনন্দ, তারই একটি কোটিগুণিত আনন্দ এই সহজানন্দ। এই সহজ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'The word 'Sahaja' literally means that which is inborn or which originates with the birthÕ - Obscure Religious cults : S. B. Dasgupta.

চর্যাগীতির মহাসুখ সর্বাত্মক নাস্তিবাদ (Nihilism) নয়। সর্বভাবের ভিতরেও এখানে একটি ভাবাত্মক অবস্থার স্বীকৃতি আছে। চর্যাকারেরা একথা বার বার বলেছেন যে, মহাসুখের অবস্থায় মরণে-বাঁচনে কোন পার্থক্য থাকে না - 'জীবন্তে মঅলেঁ নাহি বিশেষা' - ২২, ৪৯। অর্থাৎ মহাসুখ বা সহজানন্দ জ্যান্তেমরার অবস্থা। জীবন আছে, কিন্তু তা মৃতবৎ - চিত্ত আছে, কিন্তু সে চিত্ত অচিত্ত, মন অ-মন। এখানেই অ-ভাবের ভিতর স্বীকৃতি।

শশীভূষণ দাশগুপ্ত মনে করেন, বৌদ্ধ ধর্মের সর্বাত্মক নাস্তিবাদ ক্রমে ক্রমে ভাবের দিকে ঝুঁকে ভাবকে আত্মসাৎ করে নিয়ে 'হিন্দু ব্রহ্মবাদে বা আত্মবাদে' গিয়ে পৌঁছেছিল।

'বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি' কথাটাকে ঘুরিয়ে অন্যরকম ভাবেও বলা যায় যে, ভাবে অভাব এবং অভাবে ভাব কল্পনা ভারতীয় দর্শনের এখটি সাধারণ লক্ষণ। পরমতত্ত্বকে একদিকে অভাবও বলা যায়, আবার ভাবও বলা যায়। ওটা যেন ভাবাভাবের একটি বিচিত্র অচিন্ত্য অবস্থা। বৌদ্ধধর্মের পরমার্থতত্ত্বও আগাগোড়া এই ভাবাভাবের দোলায় দোদুল্যমান। সহজ মহাসুখতত্ত্ব অভাব-পরিনিষ্ঠিত হলেও ভাব-বিরহিত নয়।

বিজ্ঞানবাদীরা বলেন, ষড়ংশ সাধনে অবয়ব ও অবয়বীয় পরমাণুগুলির উপপত্তি হয় না সত্য, কিন্তু গ্রাহ্য-গ্রাহক বিনির্মুক্ত চিত্ত তখনও থাকে। এই চিত্তই 'বিজ্ঞান' - এটাই জগতের মাপর বা মাত্রা ('চিত্রমাত্রং জগৎসর্বং')। এই বিজ্ঞানকে বলা হয় আলয়বিজ্ঞান বা নিখিল বিজ্ঞানের ভান্ডার (Repository of consciousness); পরিনিষ্পন্ন (বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বা বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা), পরতন্ত্র বিজ্ঞান (অন্তরাভব বা মনোবিজ্ঞান) এবং পরিকল্পিত বা বিকল্প বিজ্ঞান (ইন্দ্রিয়ার্থ জগতের জ্ঞান) - এই আলয়বিজ্ঞানের বিভিন্ন পর্যায়। এক বিজ্ঞানই অন্তর্মুখ (পরিনিষ্পন্ন) এবং বর্হিমুখ (পরতন্ত্র ও পরিকল্পিত) বিজ্ঞানের আলয়। বিশুদ্ধ চিত্ত বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা। তার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু পারমার্থিক স্তরে এই সর্বব্যাপী চিত্ত শূন্য, নিরালম্ব, লক্ষণহীন ও অনির্দেশ্য ('চিত্তমেব ইদমানাকার স্বসংবেদনরূপং')। অতএব ভাবাত্মক বিজ্ঞানও শেষ পর্যন্ত যেন অভাবাত্মক শূন্যতার সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছে। পার্থক্য এই যে, নিরালম্ব অনির্দেশ্য শূন্যতারূপ বিজ্ঞানের অস্তিত্ব আছে, তা গ্রাহ্য-গ্রাহক বর্জিত হলেও সর্বব্যাপী। এই বিজ্ঞানের ভিতরেই মিথ্যাজ্ঞান (Flase ideation) সঞ্চিত রয়েছে বহির্মুখ বিজ্ঞানে তার প্রক্শ। বস্তুত কোন কিছুই 'ন চিত্তেষু বর্হিভূতাঃ'।

সুতরাং সমগ্র বৌদ্ধ দর্শনকেই অচিন্ত্য ভাবাভাববাদে সমীকৃত করা যায়। চর্যাগীতিরও মূল দর্শন - তা শূন্যবাদই হোক বা বিজ্ঞানবাদই হোক - এই অচিন্ত্য ভাবাভাববাদ। বিজ্ঞানের যে তিনটি স্তর বিকল্পিত, পরতন্ত্র (অন্তরাভব বিজ্ঞান) এবং পরিনিষ্পন্ন (নিরালম্ব বিজ্ঞান) - সবগুলিরই পরিচয় চর্যাগীতিতে আছে। তবে সহজিয়া বৌদ্ধগণ যেমন আনন্দ ও শূন্যতার চারটি স্তর কল্পনা করেন, তেমনই বিজ্ঞানেরও চারটি স্তর কল্পনা করেছেন। তাঁদের মতে - দক্ষিণা ও বামা নাড়ীতে কিংবা নির্মাণচক্রে ও সম্ভোগচক্রে যে বিজ্ঞান, তা পরিকল্পিত। অবধূতিকা বা ধর্মকায়ে যে বিজ্ঞান, তা অন্তরাভব বিজ্ঞান এবং সহজকায়ের বিজ্ঞান বিশুদ্ধ নিরালব্ধ বা পরিনিষ্পন্ন।

প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মে 'নির্বাণ'-এর সঠিক অবস্থা যে কি, তা অনাখ্যাত। সেখানে অদ্বৈতবাদস্বীকৃতও হয়নি, অস্বীকৃতও হয়নি। কিন্তু পরবর্তী বৌদ্ধধর্মে অদ্বৈতবাদের স্বীকৃতি আছে। অদ্বৈত বেদান্তের প্রভাবেই এ ধরনের বিবর্তন সম্ভব হয়েছে - এটাই পন্ডিতদের মত। শূন্যবাদীরা বলেন, শূন্যতায় দুয়ের স্থান নাই, ওটা 'অদ্বৈধীকার'; বিজ্ঞানবাদীরা বিশুদ্ধ বিজ্ঞান সম্পর্কে আরও স্পষ্ট করে বলেন, 'দ্বয়ং তত্র ন বিদ্যতে'। বজ্রযানের শূন্যতা-বিজ্ঞানরূপী বজ্রও এক এবং অদ্বৈত। সহজ 'নানত্ববর্জিত', 'একাকার' এবং সর্বব্যাপী। ২২ নং চর্যাটীকায় 'অদ্বয়সিদ্ধি'র একটি বচন উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, যার স্বভাবে উৎপত্তি ও বিনাশ নাই, যা সর্ব সঙ্কল্প-বর্জিত 'তদজ্ঞানমদ্বয়ন্নাম'। অদ্বয়ে যত কিছু দ্বৈত বোধ - ভাব-অভাব, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, ভব-নির্বাণ - সব একাকার। অদ্বৈত বেদান্তবাদীরা যেমন বলেন, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', সহজ-তন্ত্রও তেমনই বলে,

'এক স্বভাবোহসৌ মহাসুখং শশ্বৎপরম্' (হেবজ্র)।

স্বরূপত সহজানন্দের কোন রূপ নাই। যেখানে ভাব নাই, অভাব নাই - তার অস্তিত্ব কে প্রত্যয় করবে? মানুষ ভাবকে বোঝে, ভাবের সম্পর্কে অ-ভাবকেও বুঝতে পারে। চন্দ্র, সূর্য, আলোক মানুষের বোধগম্য, কারণ এগুলি আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়ের অধিগম্য। আবার এদের অ-ভাব যে অন্ধকার, তাও আমাদের ধারণার বস্তু। কিন্তু আলো-অন্ধকারের অতীত যে তত্ত্ব, তাকে কিরূপে ধারণা করা যায়? তাই তো অচিন্ত্য।

টিপ্পনী

বৌদ্ধধর্মে চিত্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। মহাযান বৌদ্ধধর্মে চিত্তের ভূমিকা আরও গুরুতর। সমগ্র মহাযান মতে - সৃষ্টি চিত্তের বিক্রিয়া - 'চিত্তমাত্রং জগৎ সর্বং'। অবিদ্যা-চালিত চিত্তই চৈতসিক (চিত্তধর্ম) সৃষ্টির মূল। শূন্যবাদীরা মনে করেন, পরমার্থতঃ জন্ম নাই, মৃত্যু নাই - সৃষ্টি নাই, ধ্বংস নাই - ভব নাই, নির্বাণ নাই - নিরোধ নাই, উৎপাদনাই, শাশ্বত নাই, উচ্ছেদ নাই - কার্য বলে কিছু নাই, নানার্থ বলেও কিছু নাই - আগম নাই, নির্গমও নাই।

টিপ্পনী

নাথধর্ম বৌদ্ধ সহজধর্মের সহযোগী। জৈনধর্ম কালক্রমে প্রাচীন সিদ্ধ সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নাথধর্মে পরিণত হয়। জৈনধর্মের আচার্যগণ 'নাথ' উপাধিতে ভূষিত - যথা আদিনাথ ঋষভ, নেমিনাথ, পার্শ্বনাথ প্রভৃতি। অহিংসা, ব্রহ্মচর্য পালন ও অলৌকিক সিদ্ধিলাভ করা জৈনধর্মের মূল লক্ষ্য। পরবর্তীকালে এর এক শাখা রসসিদ্ধি, আসনবন্ধ, মুদ্রাদি করণ প্রভৃতি যোগচর্যার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং শৈবধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নাথধর্মে রূপান্তরিত হয়। নাথধর্মকে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন 'নিরীশ্বর', কিন্তু অক্ষয় কুমার দত্ত ও ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত একে 'সেশ্বর' শৈব বলেই ঘোষণা করেছেন।

সহজিয়াদের লক্ষ্য যেমন নিরঞ্জনতত্ত্বে পৌঁছানো, নাথ যোগীদেরও লক্ষ্য যোগদ্বারা এই নিরঞ্জনতত্ত্বে বিলীন হওয়া। যোগপ্রক্রিয়ায় ঈশ্বরতত্ত্ব গৌণ, ক্রিয়াংশই মুখ্য।

যে-কোন যোগ-ক্রিয়ায় গুরুর ভূমিকা অপরিহার্য। গুরুই এখানে প্রকারান্তরে ঈশ্বর বা পরমতত্ত্ব। সহজিয়া বৌদ্ধরা বলেন, মন্ত্রের গুরু স্বয়ং বুদ্ধ, গুরুবক্ত্র সাক্ষাৎ বুদ্ধবক্ত্র; সহজ সিদ্ধ সঙ্গীতেও পদে পদে গুরুর প্রসঙ্গ 'গুরু পুচ্ছিঅ জাণ', 'সুদ গুরি পাঅপএঁ জাইব পুণু জিণউরা'। নায়শাস্ত্রও বলে, 'গুরুপদিষ্ট মার্গেণ যোগমেব সমভ্যসেৎ'। নাথেরা বলেন, 'গুরু সাচা পিন্ড কাচা', 'সদ্গুরু ভজিলে তবে আত্তমা পরিচয়'। গুরুবাক্য ভুলেই মীননাথের পতন - 'ভুলিলা গুরুর বাক্য কামে হইলা ভুলা'।

মনসা মন্ত্র সাধনে নাথপন্থ, তথা বৌদ্ধ সহজযোগের সংকেতটি বেশ স্পষ্ট। বাংলার মনসা ও ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে নাথপন্থের কোথায় যেন যোগ আছে। গোরখপন্থী যোগীদের ছড়ায় - চন্দ্র, সূর্য, ত্রিবেণী, নেত ধুবনী প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়। মনসা-মঙ্গল কাব্যের চন্দ্রধর, ত্রিবেণী ও নেতধুবণী যেন সেই যোগতত্ত্বেরই রূপক। 'ধুবনী', নিশ্চিত বৌদ্ধ সহজিয়াদের 'অবধূতী'। সহজিয়াদের মধ্যা নাড়ী অবধূতী অবহেলায় মল ধৌত করে, ধুবনীও বস্তুমল ধৌত করে। সংকেতটি ইঙ্গিতগর্ভ। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে পদ্মার বিষ- ঝাড়নের প্রক্রিয়ায় সহজ-যোগের স্বাক্ষর আছে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের সঙ্গেই সহজিয়া বৌদ্ধদের যোগ সমধিক। ধর্ম ঠাকুরের স্বরূপ এবং ধর্মপূজা পদ্ধতি বিষয়ে পন্ডিত মহলে বাদানুবাদের অন্ত নাই। পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ধর্মঠাকুরের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের অবশেষ লক্ষ করেছেন। ডঃ সুকুমার সেন ধর্মঠাকুরের ভিতর বৌদ্ধধর্মের প্রতিফলনকে অস্বীকার করেন। কিন্তু ধর্মঠাকুরের পরিকল্পনায় কোথায় যেন নাথ ও বৌদ্ধ মতের সাযুজ্য রয়েছে।

সুকুমার সেন সহজিয়া বৈষ্ণবদেরকে সহজিয়া বৌদ্ধদের 'উত্তরাধিকারী' বলেছেন; ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন, 'The Vaisnava Sahajiya movement of Bengal marks the evolution of the Buddhist Sahajiya in a different channel' (O. R. C. Chap. V).

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

বৌদ্ধদের পরমতত্ত্ব 'সহজ', সহজিয়া বৈষ্ণবদেরও পরমতত্ত্ব 'সহজমানুষ'। এই সহজ 'নিত্যস্বরূপ' ('জন্মমৃত্যু নাই তাঁর অক্ষয় অব্যয়'আগমসার) এবং 'নিত্যানন্দ' (বৌদ্ধমতে 'মহাসুখ')। তান্ত্রিক বৌদ্ধেরা যেমন বুদ্ধের চারটি কায় (নির্মাণ, সম্ভোগ, ধর্ম ও সহজ) কল্পনা করেন, বৈষ্ণবগণও সহজ মানুষের তিনটি দেহ স্বীকার করেন, 'সহজ মানুষ অযোনিমানুষ সংস্কারা মানুষ দেহ'। সহজমানুষ নিত্যধামের কৃষ্ণ। অযোনি মানুষ

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদি দেবতা এবং সংস্কারা মানুষ মন্ত্রের মানব। বৌদ্ধমতে সহজ একটি যামলতত্ত্ব; প্রজ্ঞোপায়ের যুগনদ্ধ বজ্রধর হেরুক।

বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে ইসলামের যোগ যে সুদূর অতীতের, তা ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেছেন (দ্রষ্টব্য 'ভারত ও মধ্যএশিয়া' : ডঃ প্রবোধ বাগচী)। তারাচাঁদ বলেন, পূর্ব এশিয়ায় পারসিক, হিন্দু ও মহাযানের প্রভাব ছিল। অতএব এই অঞ্চলের মুসলিম চিন্তাধারায় হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রভাব থাকাই স্বাভাবিক। বঙ্গের ইসলামী ধারাও এই সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

সুফী গুরুবাদের সঙ্গে সহজিয়া বৌদ্ধদের গুরুবাদের আশ্চর্য মিল। সহজ বৌদ্ধেরা বলেন, গুরু হলেন 'চিন্তামণি', তিনি ইচ্ছাফল প্রদান করেন, তাঁকে প্রণাম কর (তং চিন্তামণিং পণমহ ইচ্ছাফলদেই' - সরহপাদের দোহা)। বৌদ্ধ সহজিয়াদের গানেও পদে পদে নির্দেশ 'গুরু পুচ্ছিঅ জাণ'। সুফীদেরও প্রধান নির্ভর শেখ, পীর বা মুর্শীদ।

দৌলত কাজি বলেন,
গুরু ভক্ত হয় যে সাধক শুদ্ধমতি।
তাহাকে দেয়ন্ত স্বর্গ কৃপাময় পতি।।(লোরচন্দ্রানী)
সহজ মত ও সহজ সাধন পদ্ধতির সার্থক দায়ভাগী বাংলার বাউল।

ডঃ প্রবোধ চন্দ্র বাগচী মনে করেন, বাউলের উৎপত্তি বৌদ্ধ সহজযানে (বাউলের ধর্ম - ডঃ বাগচী)। ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন, "এই সহজিয়াদের (বৌদ্ধ সহজিয়া) একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন - বাউল সম্প্রদায়" (বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ)। (তথ্যসূত্রঃ জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তীঃ চর্যাগীতির ভূমিকা)

কৃষ্ণভক্তি আন্দোলনঃ

চৈতন্যদেবের প্রভাবে কৃষ্ণভক্তি আন্দোলন বিস্তার লাভ করলেও প্রাক্ চৈতন্য যুগে বৈদিক যুগ থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে কৃষ্ণভক্তিবাদ বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রচলিত ছিল। গীতা, পাঞ্চরাত্র, নারদ ও শাণ্ডিল্যের ভক্তিসূত্র, মহাভারত 'নারায়ণীয়' অংশ এবং কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পুরাণাদিত ভক্তির সূক্ষ্মাদিসূক্ষ্ম বর্ণনা থাকলেও রামানুজের সময় থেকেই ভক্তিমার্গের দার্শনিক প্রতিষ্ঠা।

দ্বৈতবাদী ভক্ত-দার্শনিকগণ প্রধানত চারটি শাখায় বিভক্ত : (ক) রামানুজ প্রভাবিত 'শ্রীসম্প্রদায়' ভুক্ত বিশিষ্ট দ্বৈতবাদ, (খ) মধ্ব-প্রভাবিত 'ব্রহ্মসম্প্রদায়'ভুক্ত দ্বৈতবাদ, (গ)বিষ্ণুস্বামি-বল্লভাচার্য প্রভাবিত 'রুদ্রসম্প্রদায়'ভুক্ত শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, (ঘ) নিম্বার্ক প্রভাবিত 'সনকাদি সম্প্রদায়'ভুক্ত দ্বৈতাদ্বৈতবাদ।

রামানুজ ব্রহ্মাকে করুণাময় এবং ভক্তবৎসল বিষ্ণুরূপে গ্রহণ করেছেন এভং বিষ্ণুপুরাণকেই প্রামাণ্য বলে স্বীকার করেছেন।

নিম্বার্কের মতে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু একই এবং রাধাকৃষ্ণকেই উপাস্য দেবতারূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ দ্বৈত অবং অদ্বৈত-দুই-ই।

নিম্বার্কের থেকে মধ্বাচার্য আর একটু এগিয়ে বললেন, জীবজগৎ ও ব্রহ্ম উভয়েই সত্য এবং উভয়ই স্বতন্ত্র। পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে।

বল্লভাচার্যের মতে জীব ও জগৎ উভয়ই সত্য, কেউই মায়া নয়, আবার জীবজগৎ ব্রহ্মময়। ব্রহ্ম সত্য, জীবজগৎ সত্য।

বাংলায় চৈতন্য আগমনের পর্বে কৃষ্ণভক্তি তথা বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশে কয়েকটি গ্রন্থ উল্লেখ্য হয়ে রয়েছে। সেগুলি হল : জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বিল্বমঙ্গলের (লীলাশুক) কৃষ্ণকর্ণামৃত, ব্রহ্মসংহিতা, বোপদেবের মুক্তাফল, বিষ্ণুপুরীর বিষ্ণু ভক্তিরত্নাবলী, লক্ষ্মীধরের ভগবন্নামকৌমুদী, শ্রীধরস্বামীর ভাগবতের টীকা, ঈশ্বরপুরীর কৃষ্ণলীলামৃত। চৈতন্য-পূর্ব

যুগের অনেক বৈষ্ণব ভক্ত মূলত অদ্বৈত পন্থী ছিলেন। মাধবেন্দ্রপুরী, বাসুদেব সার্বভৌম প্রভৃতি দার্শনিক ভক্তগণ অদ্বৈতপন্থা ও ভক্তি পন্থার সমন্বয় করতে

সচেষ্ট হয়েছিলেন, মাধবেন্দ্রপুরী পূর্বভারতে ভাগবতাশ্রিত ভক্তিধর্ম প্রচার করেন এবং তাঁর শিষ্য ঈশ্বরপুরীও সেই পথের পথিক ছিলেন।

মাধবেন্দ্রপুরী বাংলায় ভক্তিধর্মের উদ্গাতা ও ভাগবতের প্রচারক। পুরীতে চৈতন্যদেব ভাবমুগ্ধ হৃদয়ে মাধবেন্দ্ররচিত 'অয়ি দীন-দয়ার্দ্রনাথ' কবিতা আবৃত্তি করকেন। তবে ভক্তিধর্মের অভ্যুত্থানে ভক্তিকে যদিও ঈশ্বর প্রাপ্তির উপায় বলে গ্রহণ করা হয়েছে তবুও রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্খ, বল্লভ সম্প্রদায় মুক্তিকেই লক্ষ্য বলে ভেবেছেন - যা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে অস্বীকৃত হয়েছে। মুক্তিকামনা স্বার্থময় বলেই কৃষ্ণপ্রেমই পরম পুরুষার্থ রূপে স্বীকৃত। শ্রীরূপগোস্বামী তাই জানিয়েছেন,

ভক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে।
তাবদভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ।।

গুপ্তযুগ থেকে বৈষ্ণব ধর্মের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। বৈষ্ণব ধর্ম উচ্চতর ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ঐতিহ্য দ্বারা প্রভাবিত ছিল। অবতার বিষ্ণু ও কৃষ্ণ একাকার হয়ে গিয়ে পৌরাণিক ভাবধারা কৃষ্ণভক্তিকে সমাজে একটি নির্দিষ্ট ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে। ভাগবত পুরাণের চর্চা, বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী রচনা কৃষ্ণভক্তির বিকাশকে ত্বরান্বিত করে।

ভক্তি তিন ধরনের লোকের মধ্যে ধীরে ধীরে এসেছিল, যথাঃ ক. উচ্চপদস্থ, উচ্চশিক্ষিত এবং উচ্চজাতির লোক, যিনি প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মে নূতন কোনো অর্থ খুঁজে পান নি; খ. উচ্চশিক্ষিত, সংস্কৃতজ্ঞ, উচ্চবর্ণের লোক, যিনি 'ভাগবতপুরাণে' কৃষ্ণকাহিনির নূতন কাব্যিক আদর্শ খুঁজে পেলেন; এবং গ. অবস্থাপন্ন শিক্ষিত নাগরিক, যিনি প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শ এবং প্রচলিত লোকধর্ম পূর্ণভাবে সমর্থন করতে পারেন নি।

বৈষ্ণব ভক্তি একটি সদর্থক এবং ধর্মীয় সামাজিক অর্থে প্রগতির সহায়ক মতাদর্শ রূপে উপস্থাপিত এবং প্রচারিত হয়েছিল। ভক্তির যুক্তি-রূপে সমকালীন চৈতন্য-জীবনীকারগণ প্রচলিত সংস্কৃতির তীব্র সমালোচনা করেন।

চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে উচ্চ শ্রেণির বৈষ্ণবদের নেতা ছিলেন অদ্বৈত আচার্য। তিনি শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে-শান্তিপুরে এসেছিলেন। এই দুই নগরে শ্রীহট্ট থেকে আগত বৈষ্ণবরাই সক্রিয় ছিলেন। চৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে এসেছিলেন। স্থানীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে বর্ধমানের শ্রীখন্ড গ্রামের, এবং কুলীন গ্রামের বৈষ্ণবদের সক্রিয়তার তথ্য পাওয়া যায়; শ্রীখন্ডবাসী বৈদ্য নরহরি সরকার সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ 'গৌরাঙ্গ জন্মের আগে/বিবিধ রাগিণী রাগে/ব্রজরস করিলেন গান।।'

ভক্তিমূলক বৈষ্ণবীয় চিন্তাধারা 'ভট্টাচার্য'দের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে আদৌ সমর্থিত হয়নি। এ কারণে, বৃন্দাবন দাস লিখেছেন, অদ্বৈত আচার্য ভীষণ রেগে যেতেন, এবং বিরোধীদের সম্পর্কে কটু মন্তব্য করতেন। সম্ভবত ব্রাহ্মণরা জ্ঞানকান্ড এবং কর্মকান্ড থেকে ভক্তিমার্গকে ক্ষুদ্র ভাবতেন। বৈষ্ণব মাত্রই ছিলেন উপহাসের পাত্র।

ভক্তিবাদীদের মৌল বক্তব্য ছিল এইরূপঃ

ক. ভক্তি প্রধানত ভক্তের চৈতন্যের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ভক্তিমিশ্রিত চৈতন্য রহস্যবাদভিত্তিক। তাই তার কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। ভক্তির সংজ্ঞার্থ নির্ণয় করা সুকঠিন।

খ. ভক্তি সদাচারমূলক; ভক্তির সাধনায় দুর্নীতির স্থান নেই।

গ. ভক্তি 'জ্ঞানবিচার' এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ক্রিয়াকান্ড বিরোধী।

টিপ্পনী

ঘ. ভক্তি বর্ণাশ্রমধর্মের উর্ধ্বে।

ঙ. ভক্তির সাধনায় জাতিভেদ স্বীকৃত হয় না। এখানে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উপরে জোর দেওয়া হয়। সব ভক্তের মধ্যে সাম্য মানা হয়।

চ. ভক্তির তত্ত্বে এবং সাধনায় গুরুর বিশেষ স্থান আছে।

ছ. ভক্তি ছিল প্রধানত সন্ন্যাসী এবং যতিদের ধর্ম। অন্তত ভক্তিতত্ত্ব তাই বলে।

জ. ভক্তির পাত্র/পাত্রী, দেব/দেবী ভক্তের 'ব্যক্তিগত' দেবতা।

চৈতন্য বৈষ্ণব ভক্তিতে জনচিত্তে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ভক্তিই ঈশ্বরপ্রেমের পথ এবং ভক্তির পথে জাতিভেদের কোনো স্থান নেই - এই ছিল শ্রীচৈতন্যের মূল বাণী। তাই সমাজের নিম্নস্তরে এই ভক্তিধর্ম প্রভাব বিস্তার করে। রাষ্ট্রের, অর্থনীতির এবং সমাজব্যবস্থার মধ্যযুগীয় অবস্থায় আমাদের দেশে কোনো ধর্মনিরপেক্ষ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক উদারনীতির উদ্ভাবনার ক্ষেত্র ছিল না। তাই ধর্মীয় আন্দোলনের মাধ্যমে, ভক্তির সূত্র ধরে, এক ধরনের ধর্মীয়-সামাজিক উদারনীতি চৈতন্য এবং তার পরিকরদের দ্বারা প্রচারিত হয়েছিল। চৈতন্য এবং তাঁর পরিকরগণ এসব ধারার সংমিশ্রণ ঘটাবার চেষ্টা করেন নি। তাঁরা ভক্তির সঙ্গে 'ভাগবত পুরাণে' বর্ণিত কৃষ্ণলীলা কাহিনির মিশ্রণ ঘটালেন। তার কারণ ছিল এই যে, কৃষ্ণকাহিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল।

ভক্তির প্রচারের জন্য চৈতন্য যে-সব কাজ করেছিলেন তা হল:

ক. চৈতন্যের নেতৃত্বে নবদ্বীপে একটি প্রভাবশালী বৈষ্ণব-গোষ্ঠী সংগঠিত হয়।

খ. 'মহান্ত'দের সংগঠন সম্ভবত চৈতন্যের নেতৃত্বে করা হয়।

গ. তিনি ঘরে ঘরে 'নাম' প্রচারের ব্যবস্থা করেন। এর দ্বারা সংঘবদ্ধ শক্তির উত্থান হয়।

ঘ. আগে বদ্ধদ্বার গৃহে, অথবা শ্রীরাম পন্ডিত নামক বৈষ্ণবের অঙ্গনে কীর্তন হতো। চৈতন্য শোভাযাত্রা সহ 'নগর কীর্তন' পরিচালনা করেছিলেন। এ-কীর্তনে জাত-বিচার করা হতো না। এর ফলে সমাজে সাধারণ অন্ত্যজ মানুষ এক প্-াটফর্মে এল।

ঙ. চৈতন্য নিজে স্বর্ণকার, মালাকার, শঙ্খকার, গোয়ালা প্রভৃতি শূদ্রএবং পেশাভিত্তিক জাতিসমূহের লোকদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করেন। ফলে সমাজে তাদের স্বীকৃতি এল।

চ. নবদ্বীপে প্রভাবশালী জগাই এবং মাধাই নামে দুই কুক্রিয়াসক্ত দুর্বৃত্ত ব্রাহ্মণকে তিনি 'উদ্ধার' করেন, এর দ্বারা তিনি পাপ-কে ঘৃণা করলেন, পাপীকে নয়।

ছ. চৈতন্য বৈষ্ণব কাহিনির উপরে রচিত নাটকাভিনয়ের ব্যবস্থা করেন, এবং নিজে তাতে অংশগ্রহণ করেন। ফলে বৈষ্ণব ধর্ম ব্যাপক প্রচার লাভ করল।

চৈতন্য-প্রবর্তিত নামকীর্তনে কোনো বিশেষ আচার-অনুষ্ঠানের প্রাধান্য ছিল না। ভক্তিসহ 'নামগান' করলেই যদি ভক্তের উদ্ধার সম্ভাব্য হয়, তবে আর স্মার্ত ক্রিয়াকলাপের কোনো প্রয়োজন থাকে না, ভক্তির দ্বারা বিশিষ্ট অর্থে বৈষ্ণব ধর্ম, এবং সাধারণ অর্থে হিন্দু ধর্ম একটি ব্যাপক সামাজিক ধর্মে রূপান্তরিত হয় - যা সহজেই মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হল।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে কয়েকজন 'পাষন্ড' নবদ্বীপের কাজিকে কীর্তন বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করে। কাজি নিজেও কীর্তনের ফলে 'হিন্দুয়ানী' বেড়ে যাচ্ছে দেখে চিন্তিত হন। তিনি কীর্তন বন্ধের আদেশ জারি করেন। চৈতন্য সাহসের সঙ্গে এই আদেশের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলেছিলেন এবং বিশাল নগরকীর্তন ও শোভাযাত্রা সংগঠিত করে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তখন বিখ্যাত সুলতান আলা-উদ্-দীন হোশেন শাহ্ দেশের শাসনকর্তা, বাংলাদেশে হিন্দুদের উপরে তখন অত্যাচার অভাবনীয় ছিল। কাজি ভয় পেয়ে কীর্তন নিষিদ্ধকরণের আদেশ তুলে নিলেন এবং সুদর্শন, তরুণ চৈতন্যকে 'গ্রাম

টিপ্পনী

সম্পর্কে' নিজের ভাগ্নে বলে অভ্যর্থনা জানালেন। এ-ঘটনার ফলে ভক্তি, কীর্তন আরো বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠল। শোষকের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর সাধারণ মানুষকে উজ্জীবিত করল।

পুরীতে চৈতন্য অদ্বৈত আচার্য এবং নিত্যানন্দকে ধর্ম-প্রচারের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সম্ভবত বার্ধক্যের জন্য অদ্বৈত আচার্য বিশেষ কিছু করতে পারেন নি। তাঁর শাখার বৈষ্ণবদের মধ্যে দলাদলি শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রী সীতা দেবী, এবং পুত্র অচ্যুতানন্দ (বৈষ্ণব শাখার বৈষ্ণব) অদ্বৈতপন্থী বৈষ্ণবদের ঐক্যবদ্ধ করেন।

টিপ্পনী

একটি কেন্দ্রীয় তত্ত্বের অভাবে চৈতন্যের ধর্মান্দোলন ক্রমশ মৌলিকত্ব হারিয়ে ফেলেছিল; এক-এক জায়গায় এক-এক রকমের তত্ত্বের অথবা মতবাদের উদ্ভব হচ্ছিল। এমনকি চৈতন্যের নামে কোনো কোনো লোক এমন সব মত প্রচার করছিল, যা ছিল নিতান্ত অভব্য ও অশ্রদ্ধেয়।

খেতুরির বৈষ্ণব সম্মেলন নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। নবদ্বীপে চৈতন্য যে-আন্দোলনের সূত্রপাত করেন, তার সমাপ্তি এই সম্মেলনে সূচিত হয়। কারণ যখন ধর্মান্দোলনের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক কেন্দ্রীকরণ হয়, তখন ধর্মীয় আন্দোলন আর 'আন্দোলন' থাকে না; তা ধর্ম হয়ে পড়ে। ইউরোপের 'রিফর্মেশন' অথবা ক্যাথলিক ধর্ম-বিরুদ্ধ সংস্কার আন্দোলনেও এই পরিণতি লক্ষ করা যায়।

চৈতন্যের এবং তাঁর পরিকরদের অসাধারণ উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং উচ্ছ্বাসের কোনো প্রশংসাই বোধ হয় পর্যাপ্ত নয়। তার ফলে ব্যক্তির এবং সমাজের প্রগতির লক্ষণসমূহ স্পষ্ট হয়ে উঠল। সাধারণ মানুষের মনে সৃষ্টি হলো নূতন মূল্যবোধ; ব্যক্তি-মানসে জাগল ব্যক্তির সম্পর্কে শ্রদ্ধা। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির জন্য এটা প্রয়োজন ছিল। সংরক্ষণশীল স্মার্ত এবং 'নব্য' নৈয়ায়িক-মতে সামাজিক বা ধর্মীয় চলমানতার ধারণা স্পষ্ট নয়। কিন্তু চৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের ফলে 'আধ্যাত্মিক গণতন্ত্রে'র যে পরিবেশ তৈরি হলো, তাতে ধর্ম-সাধনার ক্ষেত্রে, জাতবিচারের বিশেষ কোনো গুরুত্ব রইল না। এমন কথা অবশ্য বলা যায় না যে, চৈতন্য সামাজিক ক্ষেত্রে বিপ-ব আনতে চেয়েছিলেন, কিংবা তা ঘটিয়েছিলেন। কোথাও প্রচলিত বিধির বিরুদ্ধে চৈতন্যের কোনো সমালোচনার প্রমাণ নেই। কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে নামকীর্তনে, নগরকীর্তনে, মহোৎসবে চন্ডাল-ব্রাহ্মণের কোলাকুলির যথেষ্ট সম্ভাবনাময় তাৎপর্য ছিল।

চৈতন্যের আন্দোলনের ফলেই সপ্তদশ শতক থেকে রাঢ়ে–বঙ্গে সর্বত্র নূতন ভাস্কর্য ও স্থাপত্য বিকশিত হয়। বিষ্ণুপুরের মন্দির শিল্প তার বড়ো প্রমাণ। গ্রামে-গ্রামে তৈরি হলো বহু মন্দির; অধিকাংশ ক্ষেত্রে মন্দির শূদ্রদের অর্থে নির্মিত হয়। এ ঘটনা ক্রমবর্ধমান সামাজিক চলমানতার প্রমাণ রূপে বিচার করা হয়েছে।

বৈষ্ণব কীর্তনের প্রভাব অষ্টাদশ শতকের শেষে এবং উনিশ শতকে উদ্ভাবিত কবিগান, যাত্রা, পাঁচালী, ঢপ, আখড়াই, 'হাফ'-আখড়াই, ঝুমুর প্রভৃতি গানের মধ্যে দেখা যায়। রবীন্দ্রসঙ্গীতেও বৈষ্ণবীয় প্রভাব সুস্পষ্ট।

বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের অন্যতম সার্থক ফল ছিল সামাজিক এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের অবস্থার উন্নতি। চৈতন্যের দ্বিতীয়া পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, অদ্বৈত আচার্যের পত্নী সীতাদেবী, নিত্যানন্দের দ্বিতীয়া পত্নী জাহ্নবা দেবী, শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণী প্রভৃতি সম্মানীয়া মহিলাগণ বৈষ্ণব সমাজে পুজনীয়া ছিলেন, সীতা দেবীর, জাহ্নবা দেবীর এবং হেমলতা ঠাকুরানীর বহু শিষ্য ছিল। স্ত্রী-গুরু রূপে জাহ্নবা দেবী বৃন্দাবনে গিয়ে সম্মানিতা হয়েছিলেন।

বিশেষভাবে বৃন্দাবন দাস ধর্মীয় সহিষ্ণুতার উপরে জোর দেন। তিনি স্পষ্টভাবে লিখেছিলেন যে, বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে অত্যাচারের এবং অত্যাচারীর সম্পর্কে নেই। তাছাড়া,

ভক্তির তত্ত্বে সদাচার প্রাধান্য পেল। অর্থাৎ, ভক্তি, চিন্তার ক্ষেত্রে কিংবা জীবনাচরণের ক্ষেত্রে নৈরাজ্যবাদী বিশৃঙ্খলা নয়, ভক্তি, বৈষ্ণব অর্থে, একটি গঠনমূলক তত্ত্ব।

বৈষ্ণব আন্দোলনের ফলে সেই অর্থে মহোৎসব, নামকীর্তন, নগর কীর্তন ও মেলা হতে থাকে। রঘুনাথদাস নিত্যানন্দের 'চিড়ামহোৎসবে'র ব্যয়ভার বহন করেন। পরে বড়ো বড়ো মহোৎসব হয়েছে কাটোয়াতে, মেদিনীপুরে এবং খেতুরিতে। খেতুরির উৎসবের ব্যয়ভার বহন করেন নরোত্তম দত্তের জ্ঞাতি-ভাই 'রাজা' সন্তোষ দত্ত। মেলা মহোৎসব গ্রামীণ অর্থনীতিকে কিছুটা সচল করে।

চৈতন্য প্রভাবিত ভক্তি আন্দোলন এক শ্রেণির অন্ত্যজ মানুষকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে উৎসাহিত করেছিল। বিশেষ করে তাঁর ধর্মীয় উদারতা সমাজে প্রাথমিক উৎপাদকদের যথেষ্ট উৎসাহিত করে। ১৮৭০-এর জনগণনায় প্রমাণিত হয়েছে বঙ্গের অধিকাংশ শূদ্র জাতি ছিল বৈষ্ণব ভাবাপন্ন। শুধু তাই নয়, সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকে বৈষ্ণব গুরুরা ও মহান্তরা ধনী হতে থাকেন। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গৌড়ীয় গোস্বামীদের কেন্দ্র বৃন্দাবনের সঙ্গে বাংলার যোগ সাধিত হওয়ায়, রাঢ় বঙ্গের সঙ্গে সমগ্র ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

তবে শ্রীচৈতন্যের ভক্তি আন্দোলনের ফলে (ক) ক্রমশ ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে, (খ) ভক্তির দিকগুলি পরবর্তীকালে উপেক্ষিত হল, (গ) ভক্তির উচ্ছ্বাস মন্দীভূত হয়ে তাতে এল অলংকরণ ও বাহ্যাড়ম্বর এবং (খ) বৃহত্তর জনজীবন থেকে এই আন্দোলন বিচ্ছিন্ন হয়ে গোষ্ঠীকেন্দ্রিকতায় পর্যবসিত হল। এর ফলে বৈষ্ণব ধর্ম ও কৃষ্ণভক্তি আন্দোলন স্তিমিত হয়ে তা পুরাতন তন্ত্র ও শাক্ত ধর্মের দিকে নতুন করে গতি পরিবর্তন করে। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে শাক্ত সাধকগণ তন্ত্রাশ্রিত শক্তিদেবীকে নিয়ে নতুন গান রচনায় সফল হয়েছিলেন - রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। (তথ্যসূত্রঃ রমাকান্ত চক্রবর্তীঃ 'মধ্যযুগে বাংলায় বৈষ্ণবধর্ম এবং তার প্রভাব' (প্রবন্ধ): মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি : সম্পাদনা অনিরুদ্ধ রায়, রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়)

টিপ্পনী

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনঃ

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য তাঁর লৌকিক ভাব প্রকাশের মধ্য দিয়ে এবং ক্বচিৎ ভাষণে ও আলাপে যে ধর্মের স্বরূপ পরিস্ফুট করেছিলেন তাই হল গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের ভিত্তি, আর এই ধর্মানুভূতিকে যুক্তি-তর্কে প্রতিষ্ঠা দিতে গিয়ে শ্রীরূপ-সনাতন ও শ্রীজীব যে-সব সিদ্ধান্ত করেছেন - শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা এবং নূতন রসশাস্ত্র প্রণয়ন করে যে-সব অভিমতের পর্যালোচনা করেছেন, বিশেষতঃ শ্রীজীবগোস্বামীর ষটসন্দর্ভে যে বিচারধারা প্রবর্তিত হয়েছে, তার সারস্বরূপই হল গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন। এই দর্শনকে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ নাম দেওয়া হয়েছে - ঈশ্বরের সঙ্গে জীবজগতের সম্পর্ক-নির্ণয়ের দিক থেকে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মূল তত্ত্ব যেমন,

(অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ, কৃষ্ণতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব সখীতত্ত্ব প্রভৃতি - 'চৈতন্য জীবন ও জীবনী সাহিত্য' দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

সুফী দর্শনঃ

বঙ্গে প্রচলিত ইসলামী ধারার তিনটি রূপ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে : (১) শরীয়ত-শাসিত গোঁড়া মুসলিম ধারা, (২) সুফী মতাবলম্বীদের ধারা এবং (৩) বেসর ফকিরী ধারা।

আলাওল ধর্মমতে ছিলেন সুফী সম্প্রদায়ভুক্ত। কবি আলাওল পদ্মাবতী কাব্যের আত্মপরিচয় অংশে তাঁর সুফী ধর্ম ভাবনার পরিচয় দিয়ে বলেছেন -

যার হৃদে জনমিল প্রেমের অঙ্কুর।
মুক্তিপদ পায় সেই সভান ঠাকুর।।....

যার হৃদে বিরহের জ্যোতি প্রকাশিল।
সুখমোক্ষ প্রাপ্তি তার আপদ তরিল।।...
প্রেম কবি আলাওল প্রভুর ভাবক।
অন্তরে প্রবল পুণ্য প্রেমের পালক।। (আত্মপরিচয়, পৃঃ ২৩)

টিপ্পনী

সুফী ধর্মদর্শনের মূলকথা হল ঈশ্বরের প্রেমে সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত। মানুষের মধ্যে সেই অপার্থিব প্রেম জেগে উঠলে তার হৃদয়ে ঈশ্বরের জন্য যে বিরহবোধ জেগে ওঠে সেই বিরহের অগ্নিতে আত্মনাশ হলেই ভগবানের সঙ্গে তার পুর্ণমিলন এবং সেই মিলনের মধ্যেই তার মুক্তি। সুফী ধর্ম ভাবনায় প্রেম-বিরহ-মোক্ষের যে ত্রিধারা তত্ত্বের কথা আছে আলাওল সেই মূল তত্ত্বকেই সংক্ষেপে আত্মবিবরণ পরিচ্ছেদের শেষদিকে বর্ণনা করেছেন। সুফীধর্মের সাধনক্ষেত্র প্রেম-বিরহ-মোক্ষের এই সাধ্যসীমায় পৌঁছতে গেলে মুর্শিদ বা গুরুর আবশ্যক। আলাওল ও আত্মবিবরণ অধ্যায়ের শেষে এই গুরুবাদী ভাবনা প্রকাশ করে লিখেছেন -

বাঞ্ছিত পূরণ হেতু গুরু পরশন।
অন্ধ চক্ষে জ্যোতি হৈল জ্ঞানের আঞ্জন।। (আত্মপরিচয়, পৃঃ ২৪)

সুফী ধর্মসম্প্রদায়ের প্রধান চারটি শাখা - চিশতী, সুহরাবর্দী, কাদেরী এবং নকসবন্দী। এর মধ্যে চিশতী সম্প্রদায়ই প্রাচীন। জায়সী ছিলেন চিশতী সম্প্রদায়ভুক্ত। কাদেরী শাখায় আদিগুরু ছিলেন আবদ আল কাদির অলজীলী। তাঁর বংশীয় সৈয়দ মহম্মদ এই সম্প্রদায় শাখাটিকে ভারতে নিয়ে আসেন। ভারতীয় সুফী ধর্মের অদ্বৈতবাদ, যোগাচারবাদ, সর্বেশ্বরবাদ, বৈরাগ্যতত্ত্ব, নির্বাণবাদ, গুরুবাদ, লালীবাদ, মানবপ্রেম ইত্যাদি যাবতীয় লক্ষণই কাদেরী সম্প্রদায়ের মধ্যেও আছে, উপরন্তু এই সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয়বাদী আদর্শ লক্ষ করা যায়। এই সম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক মীয়া মীরের প্রতি দারা শিকোহ একান্ত অনুরাগী ছিলেন। পরে অবশ্য এই সম্প্রদায় কিছুটা রক্ষণশীল হয়ে ওঠে।

পদ্মাবতী কাব্যের স্তুতিখন্ডটি আলাওল খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে জায়সীর পদ্মাবৎ কাব্যের অস্তুতিখন্ডের অনুসরণ করেছেন। এই খন্ডের অন্তর্গত মুহম্মদ-প্রশস্তি সম্পর্কিত অতিরিক্ত স্তবকটি ছাড়া অন্য বক্তব্যগুলি জায়সীর ঈশ্বর ভাবনারই অনুসৃতিমাত্র। উক্ত স্তুতিখন্ডটিতে কোরাণ ও হাদিস অনুসরণে সৃষ্টিতত্ত্ব, ভগবৎ-তত্ত্ব এবং মহম্মদ ও তাঁর বন্ধুসম্পর্কিত যে স্তুতিকথা আছে তা আসলে জায়সীরই অনুবাদ। তবে সুফীকবি রূপে জায়সী ও আলাওল উভয়েই ধর্মভাবনার সাধারণ লক্ষণগুলি উক্ত স্তুতিখন্ডের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

সুফীদের উদার দার্শনিক মত, সৌভ্রাত্র ও মানবপ্রেমের বাণী সহজেই মননশীল সমাজকে আকর্ষণ করেছে। সুফীদের একদল ছিলেন চিন্তানায়ক, জ্ঞানী, দার্শনিক, মরমী কবি ও সভাপন্ডিত - আর একদল অলৌকিক সিদ্ধিসম্পন্ন পীর, গাজী, আলী ও ফকীর। এই ফকীর 'বসর' ফকীর। তাঁদের অনেকেই চিস্তী, সুরাবর্দী, কাদেরী ও মাদারী হলেও মূল মুসলমানী কলেমা, নামাজ, রোজা জাকাত ও জেকের প্রভৃতি মেনে চলেন।

এই সুফী বা ফকীরদের লোকায়ত প্রতীক 'বেসর' ফকীরসম্প্রদায়। তাঁরাই এদেশে তৃতীয় ধারার ইসলামের বাহক। বেসর ফকীরগণ খানদানী সুফী নন। তাঁদের ভিতর নিয়ম অত্যন্ত শিথিল। তাঁদের অনেকেরই শাস্ত্রজ্ঞান অধ্যয়ন-প্রসূত নয়, লোকশ্রুত। তাঁরা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করেন, কোন আস্তানায় থাকেন, অলৌকিক সিদ্ধির নামে 'ঝারা ফুয়া' দেন, পানপড়া-তেলপড়া-জলপড়া দেন, তাবিজ-তাগা-শিকড় বাঁধেন (দ্রষ্টব্য 'নছর মালুম' - পূর্ববঙ্গগীতিকা)। লোকের বিশ্বাস - বনের বাঘ তাদের বশ মানে, সাগরের দুর্দৈব তাঁদের

নামে কেটে যায় (দ্রষ্টব্য 'রায় মঙ্গল' - কৃষ্ণরাম; 'মুকুটরায়' পালা - পূর্ববঙ্গগীতিকা)। তাঁরা আরও নানাপ্রকার কেরামতি দেখিয়ে থাকেন। আবার এই ফকীরদের ভিতর উচ্চস্তরের সাধকেরও অভাব ছিল না। Murry T. Titus বলেন, 'This group influences a very large multitude'; আহমদ শরীফও মনে করেন "দেশীয় প্রাকৃত জন শরীয়তী ইসলামের শিক্ষা-সৌন্দর্য-মুগ্ধতায় নয়, কেরামতীর আকর্ষণে ও প্রভাবেই প্রধানত ইসলাম গ্রহণ করেছিল।"

এই ত্রিধারার ভিতর সুফী এবং 'বেসর' ফকীরদের ধর্মমত ও সাধন পদ্ধতির সঙ্গে মহাযান বৌদ্ধ, তথা সহজিয়া সিদ্ধাচার্যদের তত্ত্ব ও সাধন পদ্ধতির সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

হৃদয়-ধর্ম, গুরুবাদ এবং সাধন পদ্ধতির দিক থেকে সুফীমতের সঙ্গে অনেকাংশে মহাযান বৌদ্ধমতের মিল আছে। কতকগুলি বিশ্বাস ও কৃত্যের দিক থেকে সুফীগণ মূল ইসলামকে স্বীকার করলেও, হৃদয়-ধর্মের দিক থেকে তাঁরা ছিলেন নিয়ম-তান্ত্রিকতার বিরোধী ('It (Sufism) is rather a natural revolt to the human heart against the cold formalism of a ritualistic religion' - M. T. Titus) - সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্মও হৃদ-বৃত্তি প্রধান ('Religion of the heart' - C. Humphreys); তাঁরা হীনযানী জীবন-বিবিক্ততা ও কঠোর নিয়ম-শাসনের প্রতিবাদী। মিস্টিক উপলব্ধি সহজিয়া ও সুফী উভয় ধর্মের প্রাণ।

দৌলত কাজী, আলাওল, সৈয়দ সুলতান প্রমুখ সুফী কবি এবং প্রেমপন্থ ও যোগপন্থ মুসলমান কবিগণ আল্লার বন্দনায় পরমতত্ত্বকে বলেছেন 'আল্লা নিরঞ্জন'। আলাওল মনে করেন, তিনি 'রূপরেখ' বর্হিভূত। দৌলত কাজী মনে করেন,

অনুপাম নীরূপ নীরেখ নিরাকার।
ত্রিভুবনে নাই কেহ সমান তাহার।। (লোর-চন্দ্রানী)

মূল ইসলামের ঈশ্বর-কল্পনার সঙ্গে এই সুফী-কল্পনার কোন পার্থক্য নেই। মহাযান শূন্যবাদী বৌদ্ধদের শূন্যতত্ত্বের কল্পনাও এ থেকে পৃথক নয়। বৌদ্ধ-সিদ্ধাচার্যদের সহজতত্ত্বও বর্ণচিহ্নরূপ বিবর্জিত, 'জাহের বাণ চিহ্ন-রূর ণ জাণী' (চর্যা ২৯); তা 'অলকখ লকখণ ণ জাই' (চর্যা ১৫)।

সুফী মুসলমানগণ অদ্বয়তত্ত্ব সম্পর্কে অপর যে মতটি পোষণ করেন, তা মূল

ইসলামে নেই। কুরাণের আল্লাহ্ সর্বস্রষ্টা, সর্বপ্রভু-তিনি নিরাকার, নিরঞ্জন - তিনি সর্বব্যাপক। সর্বব্যাপক হলেও সৃষ্টির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট নন। সুফীগণ কিন্তু মনে করেন, আল্লাহ 'বিশ্বলীন'। মূল ইসলামে কোন অবতারবাদ নেই। বঙ্গের সুফী কবিগণ রসুল মহম্মদকে মনে করেন 'পূর্ণ অবতার'। দৌলত কাজী মনে করেন, যিনি 'আহাদ', তিনিই 'মিম যোগে অবতার 'আহমদ' (মহম্মদরূপী সখা') :

আহাদ আছিল এক মিম হস্তে পরতেক
যে মিমেতে জগৎ মোহন।
নিজ সখা অবতার মহম্মদ অলঙ্কার
মিমে কৈল একটি ভুবন।। (লোর চন্দ্রানী)

একেশ্বরের এই যে বিশ্বলীনতা, তা বিশিষ্টদ্বৈতবাদের মূল কথা। বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের ও মূল তত্ত্ব বিজ্ঞানের বিশ্বাত্মকতা। চর্যাতেও এই মতের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়।

লুই ভণই বট দুলকখ বিণাণা।
তিঅ ধাএ বিলসই উহ ন জাণা।।

সুফী গুরুবাদের সঙ্গে সহজিয়া বৌদ্ধদের গুরুবাদের আশ্চর্য মিল। সহজ বৌদ্ধরা মনে করেন, গুরু হলেন 'চিন্তামণি', তিনি ইচ্ছাফল প্রদান করেন, তাঁকে প্রণাম কর ('তং

টিপ্পনী

চিন্তামণিং পণমহ ইচ্ছাফলদেই' সরহপাদের দোহা)। বৌদ্ধ সহজিয়াদের গানেও পদে পদে নির্দেশ - 'গুরুন্ন পুচ্ছিই জাণ'। সুফীদেরও প্রধান নির্ভর শেখ, পীর বা মুর্শীদ। দৌলত কাজী মনে করেন,

গুরুন্নভক্ত হয় যে সাধক শুদ্ধমতি।
তাহাকে দেয়েন্ত স্বর্গ কৃপাময় পতি।। (লোর চন্দ্রানী)

আল্লার সঙ্গে মিলনের পথে পীর মুর্শিদই একমাত্র পথ-প্রদর্শক। গুরুন্নর প্রতি প্রেম নিষ্ঠাতেই মুর্শিদের অন্তরে ঈশ্বর প্রেমের ঝলক জাগে। সুফীগণ মনে করেন, গুরুন্নপ্রেমলীনতা ('ফানাফিশ্বেখ') ঈশ্বর প্রেমলীনতার ('ফানাফিল্লা') সোপান। পল্লীকবিরা এমন কথাও বলেন, 'যেহি মোরশাদ সেহি খোদা' - অতএব তাঁদের নির্দেশ - 'দিন থাকিতে ধর ভাইরে মুর্শিদের চরণ'। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, সুফীধর্মে পীরের প্রতি এই আনুগত্য, পীরের দরগায় সিন্নী মানা ও প্রদীপ দেওয়া প্রভৃতি কৃত্য হিন্দু-বৌদ্ধদের অনুকরণজাত-মুর্শিদ-মুরিদের অন্তরঙ্গ সম্পর্কটিও ভারতীয় 'গুরুন্নচেলা'র অনুকরণে গঠিত।

টিপ্পনী

সুফীদের প্রেমতত্ত্ব আর এক ভাবের সামগ্রী। তাঁরা মনে কেরন, খোদা 'নূর' (জ্যোতি বা রূপ) থেকে রূপময় নর সৃষ্টি করেছেন। খোদাদোস্ত মহম্মদ নূর-নবী-'আদি অন্ত রূপে ভোর, রূপে রূপে নবীর বড়াই' (দৌলত কাজী)। রূপের প্রতি রূপের আকর্ষণই প্রেম। সুফীগণ এই রূপ ও প্রেম উন্মাদ। পরম রূপ ও প্রেমের সঙ্গে মিলিত হওয়াই তাঁদের জীবনের চরম লক্ষ্য। তাঁরা প্রেমপন্থ। আলাওল মনে করেন,

প্রেমবিনে ভাব নাহি ভাব বিনে রস।
ত্রিভুবনে যত দেখ প্রেম হন্তে বশ।।
যাঁর হৃদে জন্মিলেক প্রেমের অঙ্কুর।
মুক্তি পদ পাইল সে সবার ঠাকুর।।

পার্থিব প্রেম থেকে প্রেমের দীপ জ্বালিয়ে নিয়ে তাই সুফীগণ পরম প্রেমের অভিসারে যাত্রা করেন। তাঁদের মতে প্রেম দুই প্রকার - ইসকে মজাজী (পার্থিব প্রেম) ও ইসকে হকিকী (ঐশ্বরিক প্রেম)। আল্লা তাঁদের দৃষ্টিতে 'মাশুক' (ইবষড়াবফ), মানুষ 'আসিক' (প্রেমিক)। ইসকে মজাজী ইসকে হকিকী লাভের সোপান। এজন্য দেখা যায়, অধিকাংশ সুফী কাব্য পার্থিব প্রেমের কাব্য। বাংলার মুসলমান কবিরা যে রাধাকৃষ্ণ প্রেম কথা, বিদ্যাসুন্দর কাহিনি ও পল্লী-প্রেম-গীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, তার প্রধান কারণ 'ইসকে মজাজী' - পেছনে রয়েছে সুফী সংস্কার৯ 'রূপ দেখি রূপের স্মরণ' (দৌলত কাজী)।

বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, দেহ-সাধন ব্যাপারে ভারতীয় সুফীবাদ যোগ-পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত - 'In India the Sufi orders approximated to the Hindu practices of Yoga (Dr. Tarachand) : দৌলত কাজী ও আলাওলের রচনা পাঠ করলেও দেখা যায়, তাঁরা হিন্দুযোগপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। ফয়জুল্লা, সুকুর মামুদপ্রভৃতি মুসলমান কবিরা 'যোগান্ত পুথি' ও যোগীর গান রচনা করেছেন। তাতে 'অনাগত', 'আধোমুকে চন্দ্র তথা অমিয়া বরষে', 'কঠিন সূর্য সাধন' প্রভৃতি প্রসঙ্গ বৌদ্ধ সহজিয়াদের যোগের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। মূল ইসলামে 'যিকির জপের' বিধান আছে 'কোরাণে কহিছে প্রভু জপ মোর নাম' (তোহফা, আলাওল) : দেহের শ্বাসের সঙ্গে সুস্বরে 'যিকির' (আল্লার নাম স্মরণ) করতে হয়। সুফী সাধকগণ বলেন, প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে ঈশ্বরের নাম জপ হচ্ছে ('প্রতি প্রশ্বাসে 'লা ইলাহা' এবং প্রতি নিঃশ্বাসের সঙ্গে 'ইল্লাল্লা' জপ চলে' - বাংলারা বাউল - উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য)।

সুফীদেরও দেহ-বিচার আছে, আত্মোন্নতির বিভিন্ন স্তর আছে। তাতে কোন কোন স্থলে সহজযোগের সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। সুফীরা দেহের মধ্যে 'ছয় লতিফা'র কল্পনা করেনঃ নফ্ (জৈববুদ্ধি), কলব (heart), রুন্নহ্ (soul), ছের (আত্মজ্ঞান), খফী (গুহ্যজ্ঞান)

এবং আখফা (পরমজ্ঞান)। নাভির নিম্নে নফ্, নাভির ঊর্ধ্বে বামে কলব, (দ্রষ্টব্য Sufi saints and shrines in India : A Subhan)।

সুফীরা মনে করেন, জীবসত্তায় রয়েছে ৭০,০০০ আবরণ। দেহের চারটি মোকামে আবরণ - মুক্তির চারটি স্তর - নাছুত, মালকুত, জাবরূত ও লাহুত; নাছুত মানব-স্তর(humanity), মালকুত দেবদূতের স্তর (nature of angels), জাবরূত ঐশ্বরিক শক্তির স্তর (possession of power) এবং লাহুত ঈশ্বরত্বের স্তর (divinity)। আবরণ মোচন করতে করতে সাধক এই চার স্তরের অনুভূতি লাভ করেন। ঐশ্বরিক ভূমিতে যাত্রার পথ চারটি - শরীয়ত (কোরাণ-হাদিসের পথ), তরিকত (সুফী-নির্দেশিত পথ), মারফত (ধ্যান), হকীকত (সমাধি)। সহজিয়াদেরও কায়ভেদের চারটি স্তর; চারপ্রকার অনুভূতি। বৌদ্ধ সহজিয়ারা মনে করেন, পঞ্চাল সত্তা একশ ষাট প্রকার প্রকৃতিদোষের আকর। আবরণগুলি মুক্ত হলে ক্রমে মহামুদ্রার সাক্ষাৎকার ঘটে - তা একপ্রকার মত্তদশা। তা-ই সুফী, সাধকদের 'হাল'।

টিপ্পনী

এদেশে খান্দানী সুফী-র চেয়ে বেসর সুফীদের প্রভাব বেশি। আদর্শ সুফীবাদের সঙ্গে সহজধর্মের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু বেসরা ফরীরদের উপর সহজ ধর্মের প্রভাব পড়েছে। বেসর সুফী আদর্শ সুফীর লৌকিক সংস্করণ। এদেশের ফকীর, সাঁই, দরবেশ তাঁদের প্রতিনিধি।

আলীরাজা মনে করেন, ফকীরের একমাত্র সাধন যুগল যোগ - 'যুগ ভিনে কোন কর্ম সিদ্ধিপন্থ নাই।' সৃষ্টি যুগলেরই লীলা। এক নিরঞ্জন প্রেমরসে যুগল হয়েছেন। আল্লা-রসুল সেই যুগলেরই প্রতিরূপ। স্বর্গ মর্ত্য, বহ্নি-পবন, জল-মাটি, তন্-মন্ সবই যুগল। যুগ ছাড়া সৃষ্টি অচল। 'প্রেমপন্থ যোগী' ফকীরেরও সাধ্য ও সাধন এই যুগল। যুগল-ভাবনা করেন বলেই ফকীরের নাম যোগীঃ

'এ যুগল হৈতে নাম ধরে যোগীকুল। প্রেমপন্থ যোগীর প্রধান তত্ত্ব মূল।।' ফকীরী মতে এই যোগকে বলা হ 'কাকর-মকর' যোগ। কাকরের (কর্কট) 'কা' এবং মকরের 'ম' অর্থাৎ 'কাম' এই যোগের গুহ্য রহস্য। গুহ্য অর্থে কাকর ও মকর যথাক্রমে সূর্যের দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়নের প্রতীক।

এদেশের চিরাগত সহজ সাধনার দ্বারা কেমন সহজে ফকিরী ধারার অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। ফকীরের 'কাকর-মকর' যোগ প্রকারান্তরে বৌদ্ধদের 'কমল-কুলিশ' বা চন্দ্র-সূর্য-মেলন, লক্ষ্য 'চন্দ্রার্ক গতি ভঞ্জন'।

এই সাধনে ফকীরদের যে আচার-আচরণ, তা বৌদ্ধ 'উন্মত্ত' যোগীদের 'বিসদৃশ নয়' থেকে পৃথক নয়। সহজিয়া বৌদ্ধদের উন্মত্ত আচরণে যে বিপরীত ধারার নির্দেশ রয়েছে, ফকীরের জীবন-যাপনেও সেই বৈপরীত্য। 'উলটা রীতি' বা 'পলট যোগই' ফকীরের চর্যা। ফকীরের ভাষাও তাই উলটাঃ তাঁরা সুখকে বলেন দুঃখ, দুঃখকে সুখ - 'মরারে অমরা বলি অমরা মরন্ত।' সম্মুখ তাঁদের কাছে বিমুখ, বিমুখ সম্মুখ। তাঁরা মনে করেন,

'সম্মুখের সব পন্থ বিমুখ করিয়া।
পলটি বিমুখ পন্থে জাইব চলিয়া।।'

তাই শাস্ত্রপথ, পাণ্ডিত্য তাঁদের দৃষ্টিতে অসার 'শাস্ত্রমূলে কদাচিৎ না হয় ফকিরী'। প'ড়ে পণ্ডিত হওয়া যায়, সিদ্ধা হওয়া যায় না। সিদ্ধির পথ ব্যক্ত ('বেকত') নহে, গুপ্ত ('গোপত')। সে পথের সন্ধান জানেন গুরু। তাই ফকীরের একমাত্র অবলম্বন গুরু - 'গুরু সম বন্ধু নাহি এ তিন ভুবনে'।

(তথ্যসূত্রঃ জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তীঃ চর্যাগীতির ভূমিকা)

শাক্ত দর্শনঃ

ভারতে মাতৃ-আরাধনার প্রথাটি অনাদি কালের। বেদে, তন্ত্রে, দর্শনে, পুরাণে একাধিকস্থলে বলা হয়েছে, দেবীই 'প্রথমা' 'আদ্যা' 'নিত্যা'; শাক্ত পদাবলীতে আছে, তিনি 'আদিভূতা সনাতনী'। উক্তিগুলি কেবল তত্ত্বগত নয়। যাঁরা ভূবিদ্যা, নৃবিদ্যা ও প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন, বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণের পথ ধরে সত্য উদ্ঘাটন করতে প্রয়াস পেয়েছেন, তাঁরা মনে করেন, From time immemorial India is the home of the worship of prakriti or later Sakti.)

টিপ্পনী

শক্তিদেবী ও তাঁর উপাসনা পদ্ধতির মধ্যে একদিকে আছে উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিকতা ও ভাবুকতা, অন্যদিকে আছে তামসিক আচারের প্রবলতা; দেবী একদিকে কৃষ্ণবর্ণা, নগ্নিকা, ভয়ঙ্করী, অন্যদিকে বরাভয়দায়িনী; উপাসনার একদিকে বিশুদ্ধ যোগ, অন্যদিকে পঞ্চম-কার তত্ত্বের বাহুল্য। এদের মধ্যে যে আর্য ও ভারতের আর্যেতর জাতির প্রভাব একাধারে সংহত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। দেবতাকে মাতৃরূপে কল্পনা করার পশ্চাতেও আদিমতম জাতির মনোভাবটি সুস্পষ্ট।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে দু'টি স্বতন্ত্র ধারার পরিচয় পাওয়া যায়ঃ 'দৈব আসুর এব চ', 'বৈদিকী তান্ত্রিক চৈব'। একটি দৈব বা বৈদিক, অপরটি আসুর বা তান্ত্রিক। একটি পুরুষ-প্রধান, অপরটি মাতৃ-প্রধান। আর্যসমাজ পুরুষ-কেন্দ্রিক, তাঁদের প্রধান দেবতা পুরুষ। অতএব অপর ধারাটি আর্য ভিন্ন অন্য জাতির। এই জাতি আর্যদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। আর্যসমাজের কাছে এঁরা চিরকাল নিন্দিত হয়ে এসেছেন।

মাতৃ-উপাসনার প্রবর্তক ও কল্পনাকারী যে আর্যেতর মাতৃতান্ত্রিক জাতি, তাতে সংশয়ের অবকাশ নাই। ইতিহাস তার জ্বলন্ত সাক্ষ্য। আর্যগ্রন্থেও বহুস্থলে দেবীকে পুলিন্দ, শবর, কিরাত প্রভৃতির উপাস্য দেবতা বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

পর্ব্বতাগ্রেষু ঘোরেষু নদীষু চ গুহাসু চ।
বাসস্তব মহাদেবি বনেষু পবনেষু চ।।
শবরৈর্ব্বরৈশ্চৈব পুলিন্দৈশ্চ সুপূজিতা।
ময়ূর পিচ্ছধ্বজিনি লোকান্ ক্রমসি সর্ব্বশঃ।।

আদিম জাতির মধ্যে থেকে মাতৃ-উপাসনার ধারা উৎসারিত হয়ে যুগে যুগে অন্যান্য প্রত্যেকটি ধর্মের উপর অমোঘ প্রভাব বিস্তার করেছে। আসুর বা লৌকিক বলে তার প্রতি বক্রকটাক্ষ নিক্ষিপ্ত হলেও এই সাধনার মোহকর আকর্ষণ থেকে কেউ মুক্ত হতে পারেন নি।

আর্যধর্মে ও সাহিত্যে, বৌদ্ধতন্ত্রে, বৈষ্ণব সাধনায় এবং বাঙলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় শক্তি পূজার প্রভাব বিদ্যমান। ঋগ্বেদে স্ত্রী দেবতা যেন পুরুষের ছায়া। কিন্তু আর্যেতর জাতির মাতৃদেবী 'পার্ব্বতী' স্বামী শিবের কেবল ছায়া নন, তিনি স্বতন্ত্রা। ঋগ্বেদেরই শেষাংশে (দশম মন্ডলে) মাতৃকাশক্তি 'আদিশক্তিদেবতা' রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

বৈদিক সংহিতাগুলির ভিতর অথর্ববেদেই শক্তিবাদের প্রভাব বেশি। কেউ কেউ অথর্ববেদকেই শক্তিপূজার মূল উৎস বলে মনে করেন। কেবল অথর্ববেদের সংহিতা ভাগে নয়, উপনিষদগুলিতেও আদিমতম জাতির শিব ও শক্তি দেবতার অখন্ড প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে। শক্তিতন্ত্রে শিব ও শক্তির অদ্বৈত সাযুজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিবই শক্তি, শক্তিই শিব।

পুরাণগুলিতে মাতৃকাশক্তির অখন্ড প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও শক্তিদেবী পুরাণের প্রধান প্রতিমা। কিন্তু সর্বত্রই শক্তির একচ্ছত্র প্রভাব। ব্রহ্মার শক্তিরূপে তিনি ব্রহ্মাণী, বিষ্ণুর শক্তিরূপে তিনি বৈষ্ণবী শক্তি, শিব-শক্তিরূপে তিনি শিবানী। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের প্রতীক যথাক্রমে তিন শক্তি - সরস্বতী, লক্ষ্মী ও কালী। পুরাণে শক্তিরই একচ্ছত্র প্রভাব।

শক্তিদেবীর মহিমা বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তন্ত্রশাস্ত্রে। ব্যাপক অর্থে তন্ত্র বলতে যে-কোন সাধন-শাস্ত্র বুঝায়। তন্ত্রে গণেশ, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতিরও পূজার নির্দেশ আছে; মহানির্বাণতন্ত্রে ব্রহ্ম-উপাসনার পদ্ধতি পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সাধারণত 'তন্ত্র' শক্তিপ্রধান শাস্ত্র। প্রকারভেদে শক্তির তত্ত্ব ও উপাসনা-পদ্ধতি বর্ণনা করাই তন্ত্রের লক্ষ্য। তন্ত্রে সংখ্যাও অসংখ্য। আগম, ডামর, যামল প্রভৃতিও তন্ত্র।

তন্ত্রের প্রধান উপাস্য মাতৃকাশক্তি। স্ত্রীমাত্রই শক্তি। প্রকৃতি (চৎরসধাধষ সধঃঃবৎ): বৈদিক স্ত্রীদেবতা সরস্বতী, মহী, রাত্রি; পৌরাণিক দেবতা দুর্গা, লক্ষ্মী, গঙ্গা, লৌকিক দেবতা ষষ্ঠী, শীতলা, মঙ্গলচণ্ডী সকলেই শক্তির মূর্তি। এককথায় স্ত্রীলিঙ্গবোধক যত কিছু পদার্থ এই শক্তির প্রতীক। সংখ্যাতীত তন্ত্রগ্রন্থে লক্ষ লক্ষ মহাশক্তির উল্লেখ আছেঃ 'শত লক্ষ মহাবিদ্যা তন্ত্রদৌ কথিতা প্রিয়ে' (সিদ্ধ যামল)। এদের মধ্যে প্রধান দশমহাবিদ্যা -

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা।।
বগলা সিদ্ধ বিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যা প্রকীর্ত্তিতাঃ।। (চামুন্ডাতন্ত্র)

তন্ত্রে আর্য ও আর্যেতর ধারার সংমিশ্রণ ঘটেছে। আদিমতম জাতির মধ্যে মাতৃপূজার যে ধারা ছিল, যারা প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল বেদে, দর্শনে, পুরাণে তাদেরই একটি সুসংহত রূপ দেখা যায় তন্ত্রে। সমন্বয়ের রূপটিই তন্ত্রের স্বরূপ।

উপাসনা-পদ্ধতি যাই হোক্, তন্ত্রগ্রন্থে মাতৃকাশক্তির একচ্ছত্র প্রভাব। তন্ত্রের ধ্যান, জ্ঞান, স্তবস্তুতি, জপ, হোম, মন্ত্র, মন্ডল সব কিছুর লক্ষ জগম্মাতা। মাতৃ-তান্ত্রিক জাতির মাতৃভাবাসক্তির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ তন্ত্রশাস্ত্র। তা শক্তি-উপাসনার কল্পভাণ্ডার।

বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্বে ও সাধনায় শাক্ত ধর্মের প্রভাব বহুপূর্বেই প্রবিষ্ট হয়েছিল। বৈষ্ণব 'পাঞ্চরাত্রে' শক্তি ও শক্তিমানের যে অভেদত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে, তা শাক্ত সিদ্ধান্তের অনুরূপ। 'গৌতমীর তন্ত্র' বৈষ্ণব ধর্মসাধনার একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থে

বীজমন্ত্রাদির সাধন সম্পর্কে দীক্ষা, পূজা, ন্যাস, প্রাণায়ামাদির যে-সকল নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সে সকলই শাক্ত তন্ত্রানুসারী। 'রাধাতন্ত্র' নামে যে গ্রন্থখানি প্রচলিত আছে, তাতে শক্তিসহায়ে কাত্যায়নী দেবীর উপাসনার কথা বিবৃত হয়েছে। দেবী বাসুদেবকে বলছেন, তোমার পূজা, জপ, পরিশ্রম - সবই বৃথা, কারণ শক্তির যোগ ছাড়া পূজা নিষ্ফল, কুলাচার ব্যতীত সিদ্ধিলাভের আশা নেই,

কুলাচারং বিনা পুত্র ন হি সিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
শক্তিহীনস্য তে সিদ্ধিঃ কথং ভবতি পুত্রক।। (রাধাতন্ত্র, ২য় পটল)

তিনি আরও বললেন, ভোগ ছাড়া যোগ হয় না, অতএব তুমি শক্তিসহায়ে যোগ সাধন কর।

সুশীলকুমার দে বলেছেন, এই শতাব্দীর ক্রমবর্ধমান শাক্তচেতনা এবং প্রচলিত শাক্ত সাহিত্যগুলিই শ্যামা-সঙ্গীতের উৎস; ঐ চেতনা ও সাহিত্যের উৎস আবার প্রাচীন তন্ত্রশাস্ত্রঃ ওঃ'ং ড়ৎরমরহ সঁংঃ নব ঃৎধপবফ নধপশ ঃড় ঃযব ৎবপৎঁফবংপবহপব ধহফ ঁষঃরসধঃব ফড়সরহধঃরড়হ ড়ভ ঃযব ংধশঃর পঁষঃ ধহফ ংধশঃধ ভড়ৎস ড়ভ ষ=রঃবৎধঃঁৎব রহ ঃযব বরমযঃববহঃয পবহঃঁৎু, যিরপয রহ রঃং ঃঁৎহ সধু নব ঃৎধপবফ রঃং ড়ৎরমরহ রহ মবহবৎধষ ঃড় ঃযব বধৎষরবৎ ঞধহঃৎরপ ভড়ৎস ড়ভ ড়িৎংযরঢ়.

বস্তুত তন্ত্রশাস্ত্রই যে বাঙলার শাক্ত কাব্যগুলির অন্যতম উৎস তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু শক্তিবাদের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস থেকে দেখা গেছে, তন্ত্ররূপ সাধনশাস্ত্র রচিত হওয়ার পূর্বেও শক্তি সাধনার ধারা চলে আসছিল। বেদ, দর্শন ও পুরাণে মাতৃকা দেবীর তত্ত্ব ও লীলা বর্ণিত হয়েছে। শক্তিসাধনার ক্রিয়া-কর্মগুলি তন্ত্রের নিজস্ব হলেও তন্ত্রে দেবীর

টিপ্পনী

লীলা বর্ণনা করা হয়নি। অতএব তন্ত্র শাস্ত্রকে শাক্তপদাবলীর মূল উৎস বলে স্বীকার করলেও, বেদ, দর্শন ও পুরাণের প্রসঙ্গও উপেক্ষা করা যায় না।

শাক্ত পদাবলীর ভাব, উপাস্য ও উপাসনা-তত্ত্বের প্রধান উৎস শক্তিপূজার বিশ্বকোষ তন্ত্রশাস্ত্র। তন্ত্রে বিভিন্ন দেবী-মূর্তির ধ্যান, পূজা ও স্তব বর্ণিত হয়েছে। তন্ত্র ক্রিয়া-প্রধান শাস্ত্র হলেও দেবীর ধ্যান ও স্তবগুলির মধ্যে কবিত্বও আছে।

ভারতীয় জীবনে স-শক্তি এই ত্রি-মূর্তিকেই উপাসনা করা হয়। জ্ঞানী সন্ন্যাসীর প্রণব এই অ, উ, ম অর্থাৎ 'ওম্', যোগীরা তাকেই বলেন উ-অ-ম = 'বম্'; গৃহীর পক্ষে তা-ই আবার উ-ম-অ = 'উমা'। আগমনী ও বিজয়া গানের কেন্দ্রে রয়েছেন এই 'উমা' - সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অধিকর্ত্রী জগদ্বীশ্বরী। একদিকে তিনি গিরিরাজনন্দিনী, 'মেনকানন্দকরী' গৃহকন্যা - একেবারে সাধারণ মানবী, অন্যদিকে তিনিই আবার জগৎ-জননী। স্থূল জগতে কন্যারূপে, জায়ারূপে এবং জননীরূপে তিনি লীলা করে চলেছেন। মানবের স্নেহে-প্রেমে বন্দী হয়ে মানবীয় ভাব প্রকাশ করছেনঃ কখনও জননীর স্তন্য পান করছেন, কখনও চাঁদ ধরে দেবার বায়না ধরছেন, কখনও পিতাকে প্রণাম করছেন, কখনও মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদেআকুল হচ্ছেন। নিখিল বিশ্বে আনন্দের বাজার তিনিই সাজিয়ে রেখেছেন। তিনি যে 'গুণময়ী মা', 'লীলাময়ী মা'। তাঁর লীলার কি অন্ত আছে? উমারূপে তিনি গৃহীকে নিয়ে নানা খেলা খেলছেন।

টিপ্পনী

যিনি কালী, দুর্গা - তিনিই উমা। একই শক্তি জগৎ-ভার হরণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শক্তি-মূর্তি গ্রহণ করছেন, দনুজ-দলনী মূর্তিতে অরিসংক্ষয় করছেন। তাও তাঁর অনন্ত বিশ্বলীলার আর এক দিক।

শক্তির এই যে অসুরনাশিনী মূর্তি - তাও বাহ্যরূপ, স্থূলরূপ। বস্তুত তিনি অরূপ, অব্যক্ত - তিনি 'পরো দিবা পরো এনা পৃথিব্যাঃ', তিনি চৈতন্যরূপিনী চিন্মাত্রা। সে রূপ স্থূল দৃষ্টির অগোচর, অথচ তা পৃথিবীব্যাপী। যতদিন মায়ার অঞ্জন চোখে মাখানো থাকে, ততদিন সে রূপ বোধগম্য হয় না; মানুষ বুঝে না, 'নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্' - তিনি নিত্যা ও জগন্মূর্ত্তিস্বরূপ, তৎকর্তৃক এই সমস্ত ব্যাপ্ত। যখন প্রগাঢ়ভাবে ভাব-তন্ময়তা জন্মে, তখনই মায়া-দৃষ্টি অপসারিত হয়, ঘরের উমাকে ব্রহ্মরূপিণী, চৈতন্যরূপিণী বিশ্বব্যাপিনী বলে তখন প্রতীতি জন্মে। জননী মেনকাও তাঁর বাৎসল্য ভাবাশ্রিত তন্ময়তায় এই সত্য উপলব্ধি করেছেন।

শক্তিই তন্ত্রের উপাস্যা। বেদে, দর্শনে, পুরাণেও শক্তিতত্ত্বের আভাস আছে। কিন্তু শক্তিতত্ত্বের মূল উৎস অগণিত শাক্ত আগম গ্রন্থ। বেদান্তদর্শনও ব্রহ্মপ্রতিপাদক। 'অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা' করতে গিয়ে সূত্রকার প্রসঙ্গত 'মায়া'র উল্লেখ করেছেন। এই মায়া মিথ্যা প্রহেলিকা। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য জগৎ অসৎ।। 'মায়য়া কল্পিতং জগৎ'। অতএব ব্রহ্ম ব্যতীত মায়া ও জগতের কল্পনা ভ্রান্তি। ব্রহ্ম নিরুপাধি, নির্গুণ। মায়াকে আশ্রয় করে তিনি সগুণ রূপে প্রতিভাত হন। এই সগুণ ব্রহ্মই ঈশ্বর, বিশ্বস্রষ্টা। কিন্তু সৃষ্টির কল্পনাটিই বেদান্ত মতে স্বপ্নবৎ। তার পারমার্থিক কোন সত্তাই নাই, শুধু কাজ চালাবার হাত একটা ব্যবহারিক কল্পনা। অতএব বেদান্তে (অদ্বৈতসিদ্ধান্ত মতে) পুরুষই এক ও অদ্বিতীয়, 'মায়া' মিথ্যা ভ্রান্তিমাত্র।

পুরাণে পুরুষ ও প্রকৃতির প্রতিমা - ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও শক্তি। পুরাণের দেব-প্রকৃতি বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শনের ভিত্তিতে রচিত হলেও পুরাণে শক্তির আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। স্ত্রী-কারণবাদী পুরাণে তো বটেই, পুরুষ-কারণবাদী পুরাণেও প্রকৃতিই পুরুষ-শক্তি।

তন্ত্রে মাতৃকাশক্তিরই প্রাধান্য। বৈদিক সাহিত্যের কোন কোন স্থলে কিংবা পুরাণেও মাতৃকাদেবীর এই অপ্রতিহত প্রভাব দেখা যায়।। ঋগ্বেদের দেবীসুক্তে (১০।১০।১২৫) দেবীই সকল সৃষ্টির মূল, তিনিই রাষ্ট্রী (ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী)। স্ত্রী কারণবাদী উপনিষদে

(ত্রিপুরোপনিষৎ) তিনি 'বিশ্বচর্ষণা' - বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয়কারিণী। মাতৃপ্রধান পুরাণগুলিতেও (মার্কণ্ডেয় পুরাণ, কালিকাপুরাণ, দেবীভাগবত) শক্তিদেবীর সার্বভৌমিকত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল স্থলে দেবীই পরম কারণ, 'মহামায়া মূলভূতা' (কালিকা পুরাণ, ৭৪ অঃ)।

মাতৃকাশক্তির এই পরম কারণত্ব ও সার্বভৌমিকত্ব নিয়েই তন্ত্রে শক্তিতত্ত্ব, সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রে শক্তিদেবীই 'আদ্যা', 'অদ্বিতীয়া', 'অক্ষরা', পূরাণী।। তিনিই সচ্চিদানন্দরূপিণী পরমেশ্বরী ব্রহ্মময়ী, 'ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা' (রুদ্রযামল, ৪৭ পটল); তিনিই সগুণ ঈশ্বরী 'সর্ব্বশক্তিস্বরূপা সর্ব্বদেবময়ী তনুঃ' (মহানির্ব্বাণতন্ত্র), তিনিই মহাবিদ্যা 'মহাবিদ্যা মহামায়া মহাযোগেশ্বরী পরা' (কালীতন্ত্র ১ম পটল); তিনিই অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়া। শাক্ততন্ত্রে শক্তিরই একাধিপত্য, তিনি মহাসম্রাজ্ঞী; 'এ৩যব মৎবধঃ ংধশঃর, এ৩যব মৎবধঃ গড়ঃযবৎ, এ৩যব মড়ফফবংং, ডযড় রহংঢ়রঃব ড়ভ যবৎ পড়ঁহঃষবংং হধসবং (উঁৎমধ কধষর ঈযধহফর বঃপ.) রং ড়হষু ড়হব, ঃযব ড়হব ঐরমযবংঃ ছঁববহ (চধৎধসবংধিৎর').

নিখিল জগতের মূলে এক অচিন্ত্য শক্তির লীলা দেখে পাশ্চাত্য দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সর বলেছিলেন, অহ রহভরহরঃব ধহফ বঃবৎহধষ উহবৎমু ভৎড়স যিরপয ঢ়ৎড়পববফং বাবৎুঃযরহম: তান্ত্রিক সাধকও মনে করেন, বিশ্বভুবনে ও বিশ্বের অন্তরালে এক মহাশক্তির লীলা চলছে। সেই অদ্বৈত শক্তি-উৎস থেকেই বিশ্বের যত কিছু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শক্তির বিকাশঃ জড়ে ও জীবনে এই শক্তির লীলা। এই শক্তিই তাপ ও আলো, এই শক্তিই নাদ বা শব্দঃ অবস্থাভেদে তা-ই স্থিতিশীল ও গতিশীল (ঝঃধঃরপ্ ডুহধসরপ); এক কথায় সৃষ্টির যা কিছু, সবই তিনিঃ

মহদাদ্যণু পর্য্যন্তং যদেতৎ সচরাচরম্।/ত্বয়ৈবোৎপাদিতং ভদ্রে ত্বদধীনমিদং জগৎ।।

এই মহাশক্তি এক অব্যক্ত পরা অবস্থা থেকে কিভাবে স্থূল বিশ্বে অবতীর্ণ হচ্ছেন, কিভাবে চিদ্ঘন আনন্দস্বরূপ ক্রমে ক্রমে সঙ্কুচিত হয়ে বহির্বিশ্বে প্রকট হচ্ছেন, তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশেস্নষণ তন্ত্র শাস্ত্রে আছে। শাক্তমতে যে ষটত্রিংশ তত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে, তা এই মহাশক্তিরই বিভিন্ন অবস্থার প্রকাশতত্ত্ব - 'একৈব শক্তিঃ অন্তর্মুখতয়া বিকসন্তী বিদ্যাদিতত্ত্বরূপিণী, বহির্মুখতয়া সঙ্কুচন্তী মায়াদিতত্ত্বরূপিনী,' শক্তির এই প্রকাশের বিশেস্নষণ বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায় কাশ্মীরী শৈবদর্শনের মধ্যে। তাতে এই ছত্রিশটি তত্ত্ব - শুদ্ধ, শুদ্ধাশুদ্ধ ও অশুদ্ধ এই তিন ভাগে বিভক্তঃ (১) পাঁচটি শুদ্ধতত্ত্ব-শিব, শক্তি, সদাশিব, ঈশ্বর, বিদ্যা, (২) সাতটি শুদ্ধাশুদ্ধতত্ত্ব - মায়া, কাল, নিয়তি, কলা, বিদ্যা (অবিদ্যা), রাগ ও পুরম্নষ এবং (৩) চব্বিশটি অশুদ্ধ তত্ত্ব - প্রকৃতি, মহৎ (বুদ্ধি), অহঙ্কার, মন, পঞ্চতন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ), দশ ইন্দ্রিয় (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় - চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক এবং পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় - বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ) এবং পঞ্চভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরম্নৎ, ব্যোম্)।

সৃষ্টির মধ্যে স্থূলরূপে প্রকট যে শক্তি অর্থাৎ যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তা একাধারে এ৩ৎধহংপবহফবহঃ ধহফ ওসসধহবহঃ নিরাকার ও সাকারা ('সাকারাহপি নিরাকারা' - মহানির্ব্বাণতন্ত্র)। এখানেই শক্তিতত্ত্বের অভিনবত্ব ও গূঢ় তত্ত্ব নিহিত।

সাংখ্যের পুরম্নষও নির্বিকার, তাঁর ইচ্ছা বা ক্রিয়া কিছুই নাই। তন্ত্রেও যে পরম শিবের কথা বলা হয়েছে, তিনিও নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, বিকাররহিত, সাক্ষী 'বিকাররহিতঃ সাক্ষী শিবৌ জ্ঞেয়ও সনাতনঃ' (প্রয়োগসার)। কিন্তু তন্ত্রমতে শিব পরম শান্ত, পরিস্পন্দহীন হলেও অতি সূক্ষ্মভাবে স্পন্দনশীল। এই অতি সূক্ষ্ম স্পন্দন বা ক্রিয়া স্থূলবুদ্ধির অগম্য, কিন্তু তার অস্তিত্ব আছে। অস্তিত্ব যে আছে, তার প্রমাণ সৃষ্টির মধ্যে এই শক্তিস্পন্দনের প্রকাশ। শাক্তমতে - 'শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ'। শক্তি ছাড়া শিব নাই, শিব ছাড়া শক্তি নাই।

মহাশক্তি যখন স্থির, নিষ্কম্প - তখন সৃষ্টি নাই; তখন পরম শিবের অবস্থা শান্ত নিষ্ক্রিয়, মৃতবৎ, জড় পদার্থের অনুরূপ। শক্তির প্রথম স্ফূরণে শান্ত শিব অতি সূক্ষ্মভাবে

টিপ্পনী

স্পন্দিত হন, তখন যেন তিনি নিজের মধ্যেই নিজের চৈতন্যরূপ দেখেন। তা পরম শান্ত সত্তার 'পূর্ণাহন্তা' (ও-হবংং) অবস্থা, শক্তির প্রাথমিক অতি সূক্ষ্ম উন্মেষ। তা নির্বিশেষের প্রথম সবিশেষত্ব (ুহঃযবঃরপ ঁহরঃু ড়ভ পড়হংপরড়ঁংহবংং)। বাইরে প্রকাশহীন, অন্তরে স্বাত্মানন্দেবিভোর। শক্তি-বিশিষ্ট, শিব-শক্তির প্রথম প্রকাশ বলে তাকে বলা হয় শক্তিতত্ত্ব।

বিন্দু ত্রিধা বিভক্ত হয়ে স্থূল বিন্দু, নাদ ও বীজে রূপান্তরিত হয়। এই বিন্দু শিবাত্মক, নাদে শক্তির সঞ্চার অধিক এবং বীজ উভয়াত্মক। বস্তুত সূক্ষ্ম স্পন্দনে অভিব্যক্ত শিব-শক্ত্যাত্মক পরা বিন্দু 'কাল'-সান্নিধ্যে বৈষম্য প্রাপ্ত হয়ে সৃষ্টির সম্ভাবনায় পূর্ণ বিন্দু, নাদ ও বীজ হয়। শাক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই 'কাল'ও নিত্য, তা শিবেরই রূপভেদ মাত্র। এই কালের সন্নিধানে পরাবিন্দু থেকে স্থূল বীজের উৎপত্তি।

বিন্দু বিদীর্ণ হওয়ার সময় যে অব্যক্ত রব উত্থিত হয়, তাকে 'শব্দব্রহ্ম' বলে। শব্দ-ব্রহ্ম স্থূল সৃষ্টিতে প্রকট বিন্দু, নাদ ও বীজের প্রতীক - তা বিন্দু-বীজ-নাদাত্মক। স্থূল সৃষ্টির মধ্যে শব্দব্রহ্ম রূপেই শক্তির প্রকাশ ঘটে।

কুন্ডলিনী মহাশক্তি থেকে অভিন্না। শক্তির সঙ্কুচিত রূপটিই কুন্ডলীভূত রূপ। এজন্য তা জটপাকানো অর্থাৎ কুন্ডলীভূত। তা সার্দ্ধত্রিবৃত্তাকৃতি ও ভুজাগাকার। সুষুম্না নাড়ীর অঙ্গভূত ছিদ্রে, দেহস্থ আধারকমলে স্বয়ম্ভু লিঙ্গকে বেষ্টন করে ব্রহ্মদ্বার আচ্ছাদন পূর্বক ইনি অবস্থান করেন।

সাধক যোগী স্বদেহে তাঁকে ধ্যান করেন, আধারকমলে প্রসুপ্তা কুন্ডলিনীকে জাগরিত করে ষটচক্র ভেদপূর্বক সহস্রার কমলে পরম শিবের সঙ্গে মিলিত করেন। তা-ই তান্ত্রিক যোগ এবং এই যোগে সিদ্ধ হলেই পুরুষার্থসিদ্ধি।

বিন্দুরূপিণী শক্তি থেকে 'সদাশিব' তত্ত্বের উৎপত্তি। পরম শিবের যে মায়াচ্ছাদিত রূপ, তা-ই সদাশিব। 'জগৎসাক্ষী সর্ব্বব্যাপী সদাশিবঃ'তা 'পূর্ণাহন্তা'র 'ইদন্তা' (এঃযরংহবংং) রূপে প্রকাশ। সদাশিব থেকে 'ঈশ্বর' অর্থাৎ রুদ্র, বিষ্ণু. ব্রহ্মা।

মায়াতে শক্তির সঙ্কোচ। তা শুদ্ধাশুদ্ধ তত্ত্বের আদি কারণ। এই মায়ায় ভূমিকা থেকেই পঞ্চকঞ্চুক বা আবরণ - কাল, নিয়তি, কলা, অবিদ্যা ও রাগ। 'পুরুষ' সঙ্কুচিত শক্তির শেষ শুদ্ধাশুদ্ধ রূপ। এর পরেই প্রাকৃত সৃষ্টির কারণ 'প্রকৃতি'র স্থান। প্রকৃতি স্থূল সৃষ্টির প্রসূতি। অশুদ্ধ তত্ত্বগুলির উৎপত্তি হয় প্রকৃতি থেকে।

সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতির বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। সেখানে প্রকৃতি অন্ধ এক জড়শক্তি, প্রপঞ্চসৃষ্টির মূলীভূত কারণ। সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণের সাম্যাবস্থা থেকে বিকার প্রাপ্ত হয়ে প্রকৃতিই স্থূল জগতে ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বরূপে প্রকট হন। প্রকৃতির প্রথম বিকার 'মহৎ' বা বুদ্ধি। বুদ্ধি থেকে 'অহংঙ্কার'। অহঙ্কার থেকে মন, পঞ্চতন্মাত্রা, দশেন্দ্রিয় (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়) এবং স্থূল পঞ্চভূত উৎপন্ন হয়। এই পঞ্চ ভূতের সমষ্টি চরাচর জগৎ।

তন্ত্রমতে এক মহাশক্তিই বিভিন্ন প্রকারে অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত সৃষ্টির মধ্যে বিকশিত হচ্ছেন। তা-ই পরাশক্তি বা ব্রহ্মময়ী 'প্রাধানিকং ব্রহ্ম পুমান্'। ইনিই সূক্ষ্ম সবিশেষ ঈশ্বর বা বিদ্যাতত্ত্ব, ইনিই আবার বহির্মুখী মায়া বা প্রকৃতি। শক্তি সর্বাত্মিকা, সকল বস্তুর নিয়মনকারিণী। এই শক্তি সূক্ষ্ম হতেও সূক্ষ্ম, স্থূল হতেও স্থূলতমা। ইনি চরাচর ব্যাপ্ত হয়ে বিরাজ করছেন। দৃশ্যমান নিখিল জগতে অদৃশ্য সৃষ্টিতে এই শক্তিরই লীলা। সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি সমস্ত তেজোময় পদার্থের ইনিই উপাদান ও পরিচালিকা।

অণোরণীয়সী স্থূলাৎ স্থূলা ব্যাপ্তচরাচরা।
আদিত্যেন্দ্বগ্নি ত্যেজোময় যদ্ যত্তত্তন্ময়ী বিভুঃ।। **(প্রপঞ্চসারতন্ত্র)**
শাক্তের দৃষ্টিতে শক্তি সর্ব্ব-সঞ্চারিণী।

দিব্যজীবনে অধিষ্ঠিত হওয়াই শক্তি-সাধনার চূড়ান্ত লক্ষ্য। দিব্যজীবন দিব্যভাবে পূর্ণ; দিব্যশক্তির বিকাশে এ জীবন নির্মল, মুক্ত, স্বচ্ছন্দ, জ্যোতির্ময়। তা মহাশক্তির আধার

এ যেন পঙ্কের উপর প্রস্ফুটিত অপরূপ বর্ণসৌরভময় পদ্ম; অলৌকিক রূপ, অলৌকিক সৌরভ। দিব্যজীবনের পরিপূর্ণ প্রকাশ যুগাবতার ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবঃ দয়ায়, দাক্ষিণ্যে উদারতায়, মৈত্রীবুদ্ধিতে, আনন্দে, আনন্দ-বিকীরণে, সমাধির তন্ময় স্তব্ধতায় একখানি মূর্তিমান দিব্য জীবন। প্রত্যেক শক্তি-সাধকের কাম্য এই দিব্য জীবন।

শাক্ত সাধকদের একমাত্র লক্ষ্য 'মাতৃপদ'। তা-ই তাঁদের দিবসের চিন্তা, রাত্রির স্বপ্ন। সেই লক্ষ্যে উপস্থিত হওয়ার জন্যই তাঁদের যত কিছু আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ ও চেষ্টা, তা-ই তাঁদের সাধন। জ্ঞান ও যোগের পথ ধরে তাঁদের পথ-পরিক্রমা। শাক্তপদাবলীতে অহৈতুকী ভক্তি, বিশুদ্ধ জ্ঞান ও কুন্ডলিনী-যোগ এক মৃণাল সূত্রে-গ্রথিত। দিব্যসাধকের আকূতি - মাতৃকৃপার আকূতি, তাঁদের দীক্ষা - 'মনোদীক্ষা', তাঁদের পূজা - 'মানস পূজা', তাঁদের যোগ - কুন্ডলিনী যোগ, তীর্থ - চরণ-তীর্থ, সিদ্ধি - 'হৃৎকমলে' মায়ের প্রতিষ্ঠা ও মহামায়াকে ব্রহ্মস্বরূপে জানা। সাধন-তত্ত্বমূলক শাক্তপদাবলীর প্রায় প্রত্যেকটি পদে দিব্যভাবোচিত অভিলাষ, সাধন-ক্রিয়া ও সংসিদ্ধির চিহ্ন সুপরিস্ফুট।

(তথ্যসূত্রঃ জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তীঃ শাক্ত পদাবলী ও শক্তিসাধনা)

বাউল দর্শনঃ

'বাউল' শব্দটির ব্যুৎপত্তি নিয়ে আলোচকদের মধ্যে ঐক্যমত্য নেই।

১. < সংস্কৃত 'বাতুল'; ২. < সং 'ব্যাকুল'; ৩. < সং 'বায়ু' + ল-বায়ুপ্রধান,

শ্বাসের সাধন করেন বলে; ৪. < আরবী 'ওয়লী' (বলী), 'আউল ওয়ালী' > আউল বাউল - হরেন্দ্রচন্দ্র পাল; ৫. < ফারসী 'বা' (সহিত) + উল (সন্ধান), বাউল 'তালিব-উল-মওলা' (ঈশ্বরসন্ধানী) = আবু তালিব; ৬. < 'বাজুল' (চর্যাপদ, ৩৫) - লুৎফর রহমান; ৭. < 'আউল'-এর অনুকার শব্দ 'বাউল' - আনোয়ারুল করীম; < 'বা' (ব্যবস্থা) + 'উল' (যার) "তাঁর ব্যবস্থাতেই যিনি আত্মোৎসর্গ"পঙ্কজ বন্দোপাধ্যায়।

শুধু শব্দ ধরলে ব্যুৎপত্তি নির্দেশে যথেচ্ছার সম্ভব। কিন্তু 'বাউল' শব্দটির ব্যবহারের ক্ষেত্র, কাল, সীমাবদ্ধতা এবং বাউল-সাধনার বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভাবলে ঐ সাতটি মত গ্রাহ্য না হতে পারে। ক. বাঙলার এক বিশেষ সাধক সম্প্রদায়কেই বাউল বলা হয়, অর্থাৎ শব্দটির ব্যবহার-ক্ষেত্র সীমিত; খ. কালের দিক দিয়ে এই শব্দটি তখনই ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে যখন বাঙলা ভাষায় প্রচুর আরবী-ফারসী শব্দ এসে গেছে; গ. শব্দটির প্রয়োগে সীমাবদ্ধতা আছে - 'বাতুল' 'ব্যাকুল' 'শ্বাসবায়ুর সাধক' বা 'ঈশ্বরসন্ধানী'কে বাউলই বলা হবে এমন কোন মানে নাই। ঐ সব শব্দের নির্দেশন (ৎবভৎবহঃ) নির্দিষ্ট হতে পারে নি। 'বাউল' শব্দে শব্দার্থ-সংকোচনের (হধৎৎড়রিহম) সম্ভাবনা কতটুকু সে বিচার এখনও করা হয়নি। শব্দটি 'আউলে'র অনুকারও নয়; কারণ অনুকৃত শব্দটি নিরর্থক। 'বাউল' একটি বিশেষ সাধনমার্গ এবং অর্থযুক্ত শব্দ। 'বাজুল' বজ্রগুরু। সম্প্রদায়বাচক নয়।

লৌকিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাঙলার সহজিয়াদের (যাঁরা সহজকে নিয়ে সাধনা করেন) চারটি পর্যায় - আউল, বাউল, দরবেশ এবং সাঁই। এই ধরনের বিভাজন পরস্পরাঙ্গী। উদাহরণ দিলে এই বিভাজনের অকার্যকারিতা ধরা পড়বে।

ক. প্রখ্যাত বাউল লালন শাহ্ তাঁর গানে (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'লালন-গীতিকা' অনুসারে) 'সাঁই-লালন', 'দরবেশ লালন', 'ফকির লালন', 'অধীন লালন' বা শুধু 'লালন' ভণিতা দিয়েছেন। নিজের গুরুকে 'দরবেশ সিরাজ সাঁই' বা 'সিরাজ সাঁই' বলেছেন। কোথাও তিনি নিজেকে 'বাউল' বলেন নি। তাহলে কি বুঝতে হবে লালন এবং তাঁর গুরু সিরাজ একই সঙ্গে 'দরবেশ' আর 'সাঁই'? বাউল নন?

টিপ্পনী

টিপ্পনী

খ. কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রথম পুরুষ আউলচাঁদ ফকিরকে 'দরবেশ'ও বলা হয়; অথচ তাঁর অনুগামীরা 'আউল' নামেই পরিচিত হতে চেয়েছেন।

গ. সোনামুখীর মোহনচাঁদ 'দরবেশে'র অন্যতম শিষ্য 'আউলিয়া' মনোহর দাস।

ঘ. রাঢ়ের খ্যাতিমান বাউল অনুরাগীদের (১৮৮৮ -১৯৭২) নামের শেষে 'সাঁই' উপাধি যুক্ত হয়েছে; কিন্তু তাঁর গুরু পরম্পরায় মোহনচাঁদদরবেশের নাম এবং দুবরাজপুরের 'দরবেশের আখড়া'র (সোমপ্রকাশ পত্রিকা, ১২৭০ সাল, ৭ই পৌষ, পৃ. ৮৭) প্রতিষ্ঠাতা খড়দহের অটলবিহারী গোস্বামীর নামও আসে।

ঙ. সুফীদের মধ্যে 'দরবেশ' অভিধা চলে। সনাতন গোস্বামীকে 'দরবেশ', রূপ গোস্বামীকে 'বাউল', শ্রীচৈতন্যকে 'বাউল', 'মহা বাউল' বলা হয়েছে। বাঙলার বিখ্যাত নানকপন্থী সাধু কিরণচাঁদ 'দরবেশ'। চিশতিয়া সন্ত নিজামুদ্দীন (১২৩৬১৩২৫ খ্রি.) 'আউলিয়া।

- তা হলেই দেখছি আউল, বাউল, দরবেশ এবং সাঁই পৃথক শ্রেণি নয়। এগুলি লৌকিক অভিধামাত্র। (সূত্রঃ বিমল কুমার মুখোপাধ্যায় - 'বাউল সুফী ও মরমিয়াঃ সাধনা সাহিত্য')

পরমতত্ত্বের জন্য যাঁরা আকুল, ব্যাকুল, পাগল (প্রলপনশীল) এবং সংসারে উদাসীন - তাঁরাই বাউল। কাজেই অনেকের যে ধারণা বাংলায় সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে মুসলমান সুফী-ফকীরদের মিশ্রণে বঙ্গে বাউল সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়েছে, তা ঠিক নয়। কারণ চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে একাধিকবার বাউল শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের গানে (২০) একই অর্থে 'বায়ুড়া' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছেঃ

এখানে 'বায়ুড়া' শব্দটি বাসনাহীন, উদাসীন শূন্যতার প্রতীক রূপেই ব্যবহৃত হয়েছে (তুঃ 'বাসনাবরাকী ন বিদ্যতে' - টীকা)। অন্য একটি গানে (চর্যা ১০) এই অর্থেই ডোম্বীকে বলা হয়েছে 'বাপুড়ী' (=বাউলী?)। 'বাপুড়ী' নৈরাত্মা (শূন্য), ঘৃণা লজ্জাদি দোষরহিতা - নগর-বাহিরে তার বাস। এগুলি বাউলেরই ধর্ম। এদিক থেকে স্মরণীয় কালে বৌদ্ধ সহজ সাধকেরাই বাংলার আদি বাউল। পরবর্তীকালে বাংলার বাউল এদেরই বংশধর।

অবশ্য প্রচলিত বাউলগানে 'সহজ', 'স্বভাব', 'স্বরূপ', 'চন্দ্র-সূর্য', 'ত্রিবেণী' (তিরপিণী),'উজান বাওয়া' প্রভৃতি শব্দ বাদে বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দাবলী পাওয়া যায় না। কিন্তু আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপের বিরোধিতা, জীবন-চেতনা, 'স্বচ্ছন্দ চর্যা', গুরুবাদ, কায়-সাধন এবং রহস্যময় প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে বাউলগানে ও চর্যাগানে যথেষ্ট মিল রয়েছে। এই মিল অন্তরের, বাহিরের নয়, এ যেন 'জননান্তর সৌহৃদ'।

আসল কথা, বাউলের স্বতন্ত্র কোন জাতি নাই, সম্প্রদায়গত স্বতন্ত্র কোন ধর্মও নাই। মানবধর্মই তাঁদের ধর্ম। এই সহজ মানবধর্মের প্রেরণায় পরিচালিত বলেই বাউলমাত্রই একজাতি, একবর্ণ, একাভিপ্রায়ী। হিন্দু হোন, বৌদ্ধ হোন, মুসলমান হোন কিংবা শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব হোন - যিনি সহজ প্রাণের সহজ ধর্মকে জীবনে স্বীকার করেন, তিনিই বাউল। সংস্কারবশে তাঁদের গানে জাতিগত ধর্মসংস্কারের কিছু চিহ্ন থাকতে পারে, তা বহিরাগত কোন রঙ্ মাত্র; আসলে তাঁরা শুদ্ধস্ফটিকরূপী ঈশ্বর-প্রেমী মানব। লালন মনে করেন,

'ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই।/হিন্দু কি যবন বলে জাতের বিচার নাই'।।

বাউলিয়া মত আধুনিকও নয়। শাস্ত্রী ক্ষিতিমোহন সেন বলেন, বাউলিয়া সহজমত অনাদিকালের 'যতকাল মানব, ততকাল এই বাউল সহজিয়া মত।' (বাংলার বাউল, 'লীলা' বক্তৃতা, ১৯৫৪, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)। তিনি আরও বলেন, বাউলের 'মনের মানুষ' তাঁর 'শাস্ত্রভারমুক্ত' জীবনবাদ, 'রাগতত্ত্ব', 'দেহতত্ত্ব', 'আভাস রহস্য' (গুংঃবৎ), 'ভাবের ইঙ্গিতময়তা' (ঝুসনড়ষরংস) এবং 'মরমী সংকেত' (গুংঃরপ সবংংধমব) প্রভৃতির ছায়া

বেদে-উপনিষদেও আছে। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের গানে তারই প্রতিবিম্ব। এই সূত্রেই বৌদ্ধ সহজিয়া ও বাউল সগোত্র।

বাউলের সাধ্যবস্তু 'মনের মানুষ', 'সহজ মানুষ' - তিনি 'কামধেনু', 'কল্পতরু', 'অমূল্য রতন' - তিনি 'নিত্য', 'রূপের ঘরে স্বরূপ'। জীবসত্তায় এই নিত্য স্বরূপকে উপলব্ধি করা সহজধর্ম ও বাউল সাধনার মর্মকথা। বাউলেরা মনে করেন, এই মানুষ 'অধরা' 'আলেক মানুষ' - বৌদ্ধরা বলেন, স্বরূপত সহজ 'অলকখ লকখণ ণ জাই'। কিন্তু অধরা, অলক্ষ্য হলেও বৌদ্ধদের মত বাউলেরাও বলেন, তিনি আছেন এই দেহেই - 'সকল জীবের ঘটে আছে মানুষ বস্তু একজনা' (হারামণি)। উভয় মতেই দেহেই সাধন, কারণ 'ভান্ডই ব্রহ্মান্ড'। এই লক্ষ্যেই তাঁদের কায়-বিচার। তবে দেহস্থ চক্র-পদ্মের কল্পনায় বাউলেরা হিন্দুতন্ত্রের অনুসারী।

রহস্যময় প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকেও বৌদ্ধ সহজিয়া ও বাউল সমধর্মী। বৌদ্ধদের সময় সঙ্কেতের ভাষা 'সন্ধ্যাভাষা', তত্ত্বের ভাষাও আভিপ্রায়িক। সহজিয়া বৌদ্ধদের 'মদন', 'কর্পূর', 'নৌকা' প্রভৃতি শব্দ গূঢ়ার্থ-বোধক, তেমনি বাউলদের 'মণি', 'রস' (=শুক্র), আজর (=মল), রামরস (= মূত্র) প্রভৃতি শব্দ। বাউলদের 'অমাবস্যা', 'জোয়ার', 'মীন' প্রভৃতি শব্দও সাঙ্কেতিক। চর্যায় বিপরীত ভাষণ বা হেঁয়ালী ভাষার সঙ্গেও বাউল-বাণীর মিল লক্ষণীয় -

১. গাই বিয়াল মধ্য গাঙ্গে কুমীর বিয়াল চরে।
দাঁরকার পোনা মাছ সেই কুমীরে ধরে।।
২. একটা কথা শুন্যা আইলাম তিরপিরনীর ঘাটে।
একটা ছেলে জন্ম নিল তিন পোয়াতির প্যাটে।।

এভাবেই দেখা যায়, বঙ্গের একটি চিরকালীন সাধনার ধারা সকল ধারার সঙ্গে এখ হয়ে মিশে গেছে। একই মৃত্তিকার রসে সঞ্জীবিত বলেই এই মিল।

(তথ্যসূত্রঃ চর্যাগীতির ভূমিকা - জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী)

দশম-দ্বাদশ শতকঃ বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন চর্যাগীতি

চর্যাগীতি খ্রিস্টীয় দশম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচিত হয়েছে। অপভ্রংশ-অবহট্ঠ থেকে নব্যভারতীয় আর্যভাষার (একটি ভাষা বাংলা) জন্ম। চর্যাগীতি বাংলায় রচিত। আদিযুগ বলতে দশম দ্বাদশ শতককে বোঝায়। চর্যাগীতি আদিযুগের বাংলার একমাত্র নিদর্শন। এই বইটি দিয়ে বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা শুরু। যেনামে আমরা বইটি পেয়েছি তা হল 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়'।

পুথি আবিষ্কার ও পুথিপরিচয়

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদশাস্ত্রী পুথিপত্রের সন্ধানে বহুবার নেপালে গেছেন। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে নেপালের রাজদরবারের পুথিশালা বা অভিলেখালয় থেকে হাতে লেখা

পুথির আকারে রক্ষিত এই গ্রন্থটি তিনি আবিষ্কার করেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে একটি 'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে নেপার রাজদরবারের পুথিশালায় রক্ষিত চারখানি স্বতন্ত্র পুথি সংকলিত হয় - (১) চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় (২) সরোজবজ্রের দোহাকেষ (৩) কাহ্নপাদের দোহাকোষ এবং (৪) ডাকার্ণব।

চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় হল সবৃত্তিক চর্যাগীতি সংগ্রহ। মূল সংগ্রহটি নাম ছিল 'চর্যাগীতিকোষ'। পরে বৃত্তি বা টীকা লেখা হয়। শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক আবিস্কৃত পুথিটি বৃত্তির পুথি। লিপিকর তাঁর বৃত্তির পুথিটিতে মূল চর্যাগুলিও লিখে রেখেছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় আবিষ্কৃত এই সবৃত্তিক চর্যাগীতি সংগ্রহের পুথির শেষ কয়েকটি পাতা পাওয়া যায়

টিপ্পনী

নি। মাঝের কয়েকটি পাতা নেই। সেইজন্য তিনটি পুরো পদ এবং একটি পদের অংশ বিশেষ (টীকাসহ) লুপ্ত। পরবর্তী সময়ে আবিষ্কৃত তিব্বতি অনুবাদ থেকে জানা গেছে টীকাকারের নাম ছিল মুনি দত্ত। সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ পাওয়া গেছে শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কার থেকে। তিনি চারটি পুথির ভাষাকে বাংলা মনে করে সবগুলিকে এক সঙ্গে প্রকাশ করেন। পরে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষা-বিচার করে প্রমাণ করেছেন যে একমাত্র 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়'-এর ভাষা বাংলা। অন্যগুলির ভাষা অবহট্‌ঠ।

টিপ্পনী

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রাপ্ত খন্ডিত পুথিতে পাতার নম্বর আছে ১ থেকে ৬৯ পর্যন্ত। ৬৯ পাতার পর আর কতগুলি পাতা ছিলি তা জানা যায় না। মাঝখানের ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮ এবং ৬৬ নম্বর চিহ্নিত পাতাগুলি তিনি পান নি। ২৪, ২৫ এবং ৪৮ নং গান পুরোপুরি এবং ২৩নং গানের অর্ধেক অংশ পাওয়া যায় নি যা ঐ সব পাতায় ছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিস্কৃত খন্ডিত পুথিতে ছিল ৬৪টি পাতা আর সাড়ে ছেচল্লিশটি গান। সেগুলিই তিনি তাঁর গ্রন্থে প্রকাশ করেন।

কবি পরিচয়

চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের যে খন্ডিত পুথিটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রকাশ করেছিলেন তাতে ৪৬টি গোটা গান ও একটি গানের ভগ্নাংশ আছে। অধিকাংশ গানেই কবির নামাঙ্কিত ভণিতা আছে, কয়েকটিতে মাত্র নেই। তবে গানের টীকাকার বা পুথির লিপিকর প্রত্যেক কবির নাম উল্লেখ করেছেন। মূল গানে ও টীকায় পদকর্তার নাম যেভাবে উল্লিখিত হয়েছে ততে মোট ২৩ জন কবির সন্ধান পাওয়া যায়। উক্ত কবিদের নাম, প্রত্যেক কবির রচিত পদের মোট সংখ্যা ও ক্রমিক সংখ্যা নিম্নরূপ (এই তালিকায় প্রথম বন্ধনীবদ্ধ নামগুলি মূল গানে নেই, টীকা থেকে উদ্ধৃত, এবং তৃতীয় বন্ধনীবদ্ধ সংখ্যাগুলি পুথির লুপ্তপাতায় লিখিত পদগুলির ক্রমসংখ্যা, এই ক্রমসংখ্যা মূলগানের তিব্বতী অনুবাদ থেকে অনুমিত):

কবিনাম	ক্রমিক সংখ্যা	মোট পদসংখ্যা
১। লুই	১, ২৯	২
২। কুক্কুরীপা	২, ২০, (৪৮)	৩
৩। বিরুআ	৩	১
৪। গুডরী	৪	১
৫। চাটিল	৫	১
৬। ভুসুকু	৬, ২১, (২৩), ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩, ৪৯	৮
৭। কাহ্নূ, কাহ্নু, কান্হ, কাহ্ন, কাহ্নিলা কাহ্নিল	৭, ৯, ১০, ১১ ১২,১৩,১৮,১৯, (২৪), ৩৬, ৪০, ৪২, ৪৫	১৩
৮। কামলি	৮	১
৯। (ডোম্বীপাদ)	১৪	১
১০। শান্তি	১৫, ২৬	২
১১। মহিন্ডা	১৬	১
১২। (বীণাপাদ)	১৭	১
১৩। সরহ	২২, ৩২, ৩৮, ৩৯	৪
১৪। (শবরপাদ)	২৮, ৫০	২
১৫। আজদেব	৩১	১

কবিনাম	ক্রমিক সংখ্যা	মোট পদসংখ্যা
১৬। টেন্টনপা	৩৩	১
১৭। দারিক	৩৪	১
১৮। ভাদে	৩৫	১
১৯। তাড়ক	৩৭	১
২০। কঙ্কণ	৪৪	১
২১। জঅনন্দি	৪৬	১
২২। ধাম	৪৭	১
২৩।(তন্ত্রীপাদ)	(২৫)	১

টিপ্পনী

কিন্তু উল্লিখিত এই সব কবিনাম তেকে কবিদের সঠিক ব্যক্তিপরিচয় উদ্ধারের কিছু অসুবিধা আছে। কেন না, এই নামোল্লেখের ব্যাপারে টীকাকার মাঝে মাঝে ভুল করেছেন। যেমন ১৭ সংখ্যক গানের টীকার পদকর্তা হিসাবে বীণাপাদের উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু মূল গানে বীণা শব্দটি যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে (বাজই আলো সহি হেরুন্ন অবীণা) তাতে সেটিকে গীতিকারের নাম হিসাবে গ্রহণ করা কঠিন, কেন না টীকাকারের উক্তি ছাড়া আর কোথাও এ নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ২৮ ও ৫০ সংখ্যক গানেও 'শবর' পদটি যেভাবে আছে তাতে সেটি ভণিতা বলে মনে হয় না, অথচ টীকায় পদটি কবিনাম হিসাবে উল্লিখিত। দ্বিতীয়ত, কোন কোন ক্ষেত্রে কবিনাম মূলগানে এক প্রকার, টীকায় ভিন্নপ্রকার। তৃতীয়ত, যেসব গানের ভণিতায় 'পা' পদাংশ (কুক্কুরীপা, টেন্টনপা ইত্যাদি) আছে সেগুলিকে কবির নিজের নাম বলে গ্রহণ করায় অসুবিধা আছে। কেননা 'পা' পদাংশ সম্ভ্রমবাচক 'পাদ' শব্দের বিকার, নামের সঙ্গে 'পা'-এর উল্লেখে বোঝা যায় যে এসব ক্ষেত্রে প্রকৃত পদকর্তা ভণিতায় নিজের নাম গোপন করে গুরুর নাম উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ কুক্কুরীপা, টেন্টণপা নামাঙ্কিত গানগুলি কুক্কুরী বা টেন্টনের নিজের রচনা নয়, সম্ভবত এঁদের কোন শিষ্য বা প্রশিষ্যের রচনা। চতুর্থত, ভণিতায় অনেক ক্ষেত্রে চর্যাকারের প্রকৃত নামের পরিবর্তে ছদ্মনাম উল্লিখিত হয়েছে। যেমন ৩৭, ৪৪ সংখ্যক চর্যাগানে যথাক্রমে যে তাড়ক ও কঙ্কণ ভণিতা দুটি ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি কবির প্রকৃত নাম নয়। সেকালে কবিরা অনেক ক্ষেত্রে উপঢৌকন-লব্ধ অলঙ্কারের নামে নিজের ছদ্মনাম গ্রহণ করতেন। তাড়ক ও কঙ্কণ সম্ভবত কবিদের উপহার-লব্ধ ভূষণের নাম, নিজের নাম নয়। আবার টেন্টণপা নামটিকেও ছদ্মনাম বলেই মনে হয়। তাঁর গানে যে টেন্টন (=ধূর্ত)-সুলভ চাতুর্যের পরিচয় আছে, সেটি তাঁর রীতিচরিত্রেরই পরিচায়ক, ব্যক্তিচরিত্রের নয়। ইনি হয়ত এই ধরনের অর্থচাতুর্যপূর্ণ গান লিখতেই অভ্যস্ৰ ছিলেন এবং সেইজন্য তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। পঞ্চমত, কবিরা অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিপরিচয়ের বদলে ভণিতায় নিজেদের জাতি (পধংঃব)-পরিচয় উল্লেখ করেছেন। ১৪ ও ২৫ সংখ্যক গানের ভণিতায় ডোম্বী ও তন্ত্রী সম্ভবত কবির ব্যক্তি-নাম নয়, জাতিবাচক নাম।

ভণিতায় ও টীকায় যে কবি-নামগুলি পাওয়া যায় তাতে মনে হয় গানগুলি সহজিয়া সাধকদের দ্বারা গুরুশিষ্য-পরম্পরায় রচিত, সম্ভবত দু-তিন পুরুষের রচনা। কিন্তু গানগুলির ভাষা ও রচনারীতিতে কালগত বৈষম্য ও বিবর্তনের চিহ্ন তেমন পাওয়া যায় না বলে কবিদের আবির্ভাবের পৌর্বাপর্য বা কালপারম্পর্য সন্ধান করা কঠিন। এ বিষয়ে একমাত্র বাহ্যপ্রমাণ কতকগুলি জনশ্রুতি ও বৌদ্ধ ঐতিহ্য। তিব্বতী বৌদ্ধ ঐতিহ্যে ও অন্যান্য সহজিয়া ঐতিহ্যে যে সব সিদ্ধাচার্যের নাম পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে কবিদের পরিচয়

টিপ্পনী

উদ্ধারের চেষ্টা করা যায়। কিন্তু এই ঐতিহ্য ও জনশ্রুতির ঐতিহাসিক ভিত্তি অত্যন্ত শিথিল হওয়ার এবিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন। কবিদের পৌর্বাপর্য নির্ণয়ের ব্যাপারে ডঃ সুকুমার সেন দুটি অভ্যন্তরীণ নীতি নির্ধারণ করেছেন। প্রথমত যে সব কবির রচনায় যৌন তান্ত্রিকতার ইঙ্গিত অস্পষ্ট বা অনুপস্থিত সেই সব কবি অপেক্ষাকৃত প্রবীণ, দ্বিতীয়ত যে সব রচনায় পারিভাষিক ও আভিপ্রায়িক 'সন্ধ্যা' শব্দের প্রাচুর্য আছে সেগুলির কবি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন। প্রকৃতপক্ষে সহজিয়া সাধনায় যৌনতান্ত্রিকতার অনুপ্রবেশ অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের ঘটনা এবং তন্ত্রাচার কালক্রমে যত জটিল ও গুহ্য হয়ে উঠেছে চর্যাগানের ভাষাও তত আভিপ্রায়িক হয়ে উঠেছে। এই সূত্র দুটি অনেক পরিমাণে নির্ভরযোগ্য।

চর্যাগীতি- সংগ্রহের প্রথম কবি লুই। শুধু পদসংখ্যার ক্রমানুসারেই নয়, তিব্বতী ঐতিহ্যে যে ৮৪ জন সিদ্ধাচার্যের নাম পাওয়া যায় লুই তাঁদের মধ্যেও আদিতম।

নাথ ধর্মের ঐতিহ্যেও এই সিদ্ধগণ স্বীকৃত। সেক্ষেত্রে অবশ্য আদিসিদ্ধ মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ। লুই শব্দটি সম্ভবত রোহিত শব্দ থেকে সৃষ্ট (রোহিত > ররুই > লুই), এই ব্যুৎপত্তি থেকে মীননাথের সঙ্গে লুইয়ের অর্থগত সঙ্গতি পাওয়া যায়। সুমপা-রচিত চধম ংধসলড়হ তধহং (রচনাকাল ১৭৪৭খ্রীঃ)-এ লুইকে শবরীপা-এর শিষ্য ও ধীবর সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মৎস্যের সঙ্গে নামের সংযোগের জন্যই বোধহয় এই সিদ্ধান্ত। তিব্বতী অনুবাদের মাধ্যমে লুইয়ের তিনখানা বইয়ের নাম পাওয়া যায় 'শ্রীভগবদভিসময়', 'অভিসময়বিভঙ্গ' ও 'তত্ত্বস্বভাবদোহাকোষগীতিকাদৃষ্টি নাম'। প্রথম দুটি বই বিশুদ্ধ বৌদ্ধদর্শনের, তৃতীয়টি দোহা ও গানের কোষগ্রন্থ। অন্যান্য চর্যাকারদের মধ্যে কেউ কেউ গান ছাড়াও অন্য বই লিখেছেন, কিন্তু সেগুলি বৌদ্ধ তন্ত্রবিষয়ক, বিশুদ্ধ দর্শনের নয়। তন্ত্রবিষয়ক, বিশুদ্ধ দর্শনের নয়। বাংলাদেশে যখন বৌদ্ধতন্ত্রধর্ম ব্যাপ্তি লাভ করেছিল তখন আচারের চেয়ে বিশুদ্ধ দর্শনচর্চা অনেকটা অপ্রচলিত হয়ে পড়েছিল। এদিক থেকেও বোঝা যায় যে লুই সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের গোড়ার দিককার লোক। তাঁর দুটি গানের (১, ২৯) কোথাও যৌনতান্ত্রিকতার আভাস নেই। দুটি গানেই যোগ-সাধনার মাধ্যমে অনির্বচনীয় নির্বিকল্প মহাসুখতন্ময়তার অন্বেষণকে সাধ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সাধনায় জপতপ-শাস্ত্র অধ্যয়নের পরিবর্তে গুরুনির্দিষ্ট যোগমার্গের শ্রেষ্ঠত্বই স্বীকৃত হয়েছে। "দিঢ় করিঅ মাহসুখ পরিমাণ। /লুই ভণই গুরুপুচ্ছিঅজান" (১) এবং "জাহের বাণচিহ্ন রুব ন জানী/ সো কইসে আগম বেএঁ বাখানী(২৯)"। দ্বিতীয়ত, লুই কোনো পারিভাষিক সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার করেননি, তাঁর রূপক ব্যবহারও খুব স্পষ্টঃ যেমন "কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল" (১) কিংবা তত্ত্বস্বরূপের পরিচয় 'উদক চান্দজিম সাচ ন মিচ্ছা' (২৯)জলের উপর চাঁদের বিম্ব যেমন সত্যও নয় মিথ্যাও নয়। এছাড়া ভণিতা ব্যবহারেও লুইয়ের কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। কয়েকটি গান বাদ দিলে চর্যার অধিকাংশ গানেই রচনার শেষাংশ একবার ভণিতা ব্যবহৃত হয়েছে, লুইয়ের গানে ভণিতার ব্যবহার দুইবার - দ্বিতীয় পদে ও শেষ পদে। ১২শ শতকের মানসোল্লাসে চার ছত্রের চর্যাগানের যে নমুনা উদ্ধৃত আছে তা থেকে মনে হয় আগে চর্যাগানের দুই তিন জোড়া ছত্র-সম্বলিত ক্ষুদ্র আকৃতিই প্রচলিত ছিল, পরে আকার-বৃদ্ধি ঘটে। লুই বা তাঁর শিষ্য দারিক (৩৪) এই প্রাচীন ঐতিহ্যই গ্রহণ করেছিলেন। লুইয়ের গান দুটির প্রত্যেকটি তাই দুটি করে চর্যার যুগ্মক বলে অনুমিত হয়।

কুক্কুরীপার নামাঙ্কিত পদ তিনটিতে নামের সম্ভ্রমসূচক অংশ 'পা' থেকে অনুমিত হয়ে যে এগুলি কক্কুরীপাদের কোন শিষ্য বা অনুশিষ্যের রচনা। কুক্কুরীপার নামে সংস্কৃত রচনা 'মহামায়াসাধন' পাওয়া গিয়েছে, এ থেকে মনে হয় ইনি মহামায়া উপাসক ছিলেন। তারানাথেক মতে কুক্কুরী পা-এর সঙ্গে সব সময় একটি কুক্কুরী থাকত, তাই এই নামকরণ। সুকুমার সেন এই নামের অন্যবিধ ব্যুৎপত্তি কল্পনা করেছেনঃ কুক্কুটীপাদ>কুক্কুরীপা। পুথিতে কুক্কুরীপা-এর দুটি গান পাওয়া যায়, তৃতীয় গানটি (৪৮) পুথির লুপ্ত অংশের মধ্যে ছিল।

তিব্বতী অনুবাদ থেকে এই লুপ্তচর্যার সম্ভাব্য রূপ জানা যায়। প্রাপ্ত দুটি গানের সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, দুটি গানই নারীর উক্তি হিসাবে রচিত এবং দুটি গানেই নারীজীবনের (২য় গানে অসতী গৃহস্থবধূ, ২০ সংখ্যক গানে প্রসূতি নারী) বিভিন্ন আচরণ রূপক হিসাবে গৃহীত। সন্ধ্যা ভাষার আধিক্যের জন্য চর্যাকারকে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন বলে মনে হয়।

বিরূআ ভণিতায় প্রাপ্ত চর্যাটি সম্ভবত বিরূআর নিজের রচনা নয়। ভণিতার ক্রিয়াপদে যে গৌরবসূচক বহুবচনের (ভণন্তি বিরূআ) ব্যবহার আছে, তাতে মনে হয় গানটি বিরূআর কোন শিষ্য বা অনুশিষ্যের লেখা। বিরূআর মূল বোধহয় বিরূপ বা বিরূপক। তিব্বতী অনুবাদে বিরূপের নামে 'কর্মচন্ডালিকানামগীতি', 'দোহাকোষ' ও 'বিরূপ-পদচতুরশীতি' নামক রচনাগুলির সন্ধান পাওয়া যায়, অন্যদিকে তারানাথ বিরূআকে কাহ্নেরই নামান্তর বলেছেন। কাহ্ন নামাঙ্কিত একটি গানে কাহ্ন নিজেকে 'বিরূআ' (১৮) নামেই অভিহিত করেছেন (কেহো কেহো তোহোরে বিরূআ বোলই) এবং ঐ গানেই আবার কাহ্ন কর্তৃক 'কামচন্ডালী' গাওয়ার ইঙ্গিত আছে। এই 'কামচন্ডালী' ও 'কর্মচন্ডালিকা-নামগীতি' এক ও অভিন্ন হতে পারে। এই অনুমান সত্য হলে বিরূআ নামাঙ্কিত গানটিকে কোন এক কাহ্নের শিষ্যরচিত বলে মনে করতে হয়।

৪ সংখ্যক গানের রচয়িতা গুন্ডরী সম্ভবত ব্যক্তিনাম নয়, কবির জাতি অথবা বৃত্তিবাচক নাম (গুন্ডরিক>গুন্ডরী=মশলা ইত্যাদি গুঁড়া করা যায় বৃত্তি)। গানটিতে যৌনতান্ত্রিকতার স্পষ্ট ইঙ্গিত ও পারিভাষিক শব্দের আধিক্য থাকায় পদকর্তাকে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন বলে মনে হয়।

চটিল নামাঙ্কিত গানের শেষ পদে চাটিলকে সশ্রদ্ধভাবে 'অনুত্তরস্বামী' বলা হয়েছে, এজন্য মনে হয় গানটি চাটিলের কোন শিষ্যের রচনা। গানের মধ্যে একজায়গায় 'ধাম'-এর উল্লেখ আছে, ডঃ সুকুমার সেনের অনুমান "মনে হয় এখানে 'ধাম' ব্যক্তি বিশেষের নাম, যিনি চাটিলের শিষ্য, মূখ্যত যাঁহার উত্তরণের জন্যই চাটিল সাঁকো গড়িয়াছেন। সে সাঁকোয় আরও অনেকে স্বচ্ছন্দে ভবসাগর পার হইয়া যাইতে পারে" (প ১৩)। অন্যদিকে ধামের নামে আর একটি চর্যা পাওয়া যায়। দুটি গান একই ব্যক্তির লেখা হতে পারে।

পদকর্তা কামলি (৮) ও সিদ্ধকম্বলাম্বরপাদ সম্ভবত একই ব্যক্তি। ৪৪ সংখ্যক গানের কঙ্কণ কম্বলাচার্যের বংশধর। ১৪ সংখ্যক গানের ডোম্বীপাদ প্রথমে ত্রিপুরার রাজা ছিলেন, পরে কাহ্ন-বিরূআর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বীণাপাদ বিরূআর বংশধর। মহিন্ডানামাঙ্কিত ১৬ সংখ্যক গানের ভণিতায় ক্রিয়াপদ বহুবচনের, এ থেকে মনে হয় গানটি মহিন্ডার শিষ্যানুশিষ্যেরও রচনা হতে পারে। মহিন্ডা বা মহীপাদ ছিলেন কাহ্নের বংশধর। মহিন্ডার এই গানটির সঙ্গে কাহ্ন নামাঙ্কিত নবম চর্যাটির সুগভীর ভাবসাদৃশ্য আছে। ৩১ নং গানের আজদেবের নামে তিব্বতী ঐতিহ্যে তিনটি বইয়ের নাম পাওয়া যায়; এগুলির মধ্যে 'চর্য্যামেলায়ন প্রদীপ' সম্ভবত চর্যাহীতির টীকা। ৩৩ নং গানের টেন্টণের তিব্বতী রূপ ধেতন, এই ধেতন তিব্বতী ঐতিহ্যে কাহ্নের বংশধর। তিব্বতী ঐতিহ্য ভাদে 'আচার্য', এঁর নামান্তর সম্ভবত ভান্ডারিন, ভদ্রচন্দ্র, ভদ্রদত্ত বা ভদ্রোক। এঁর গানে তান্ত্রিকতার ছাপ স্পষ্ট নয়, পারিভাষিক শব্দের সংখ্যাও কম। ৪৬ সংখ্যক গানের জয়নন্দীর পরিচয় কিছু জানা যায় না। এঁর রচনায় তান্ত্রিকতার ইঙ্গিত নেই, সহজিয়া সাধকদের বৌদ্ধদার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীই বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে।

সংগৃহীত গীতের পরিমাণ বিচার করলে চর্যাগীতি-সংগ্রহের প্রধান কবি তিনজন সরহ (৪টি), ভুসুকু (৮টি) ও কাহ্নপাদ (১৩টি)। সরহের আবির্ভাব-কাল আনুমানিক একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ (রচনাকাল দ্রষ্টব্য)। সরহের নামে দোহাকোষ ছাড়াও সংস্কৃত রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। এতেও তাঁর প্রবীণতার পরিচয় স্পষ্ট। সরহের গানে সহজ সাধনার কথা থাকলেও যৌনতান্ত্রিকতার পরিচয় নেই, যোগসাধনা ও পারমার্থিক

টিপ্পনী

ধ্যানধারণাই তাঁর গানগুলির প্রতিপাদ্য বিষয়। ২২ সংখ্যক গানে অচিন্ত্য যোগীর জন্মমরণ-বন্ধন-ছেদের কথা, ৩২ সংখ্যক গানে বাহ্য উপকরণ ও জপতপের পরিবর্তে সাধকের সহজপন্থী আত্মজ্ঞানলাভের কথা, ৩৮ ও ৩৯ সংখ্যক গানে সাধকের পক্ষে গুরুর উপর নির্ভরশীলতা ও সহজ পথ অবলম্বনের নির্দেশ আছে। তাছাড়া গানে পারিভাষিক শব্দের সংখ্যাও অত্যন্ত কম। এতেও পদকর্তার প্রাচীনতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

টিপ্পনী

ভুসুকের জীবৎকালের সম্ভাব্য নিম্নসীমা ১২৯৫খ্রীষ্টাব্দ (রচনাকাল দ্রষ্টব্য)। তিব্বতী ঐতিহ্যে ভুসুক শান্তিদেবের নামান্তর, কিন্তু এই পরিচয় ঠিক নয়। শান্তিদেব ছিলেন মঞ্জুশ্রীর উপাসক, আর ভুসুক ছিলেন সহজপন্থী সাধক। তাছাড়া এই শান্তিদেব ভুসুকুর চেয়ে অনেক প্রাচীন। ভুসুকুর দুটি গানে (৪১, ৪৩) কবি নিজেকে 'রাউত'-বলেছেন। 'রাউতের' মূল 'রাজপুত্র' (রাজপুত্র>রাঅউত্ত>রাউত) অর্থাৎ অশ্বারোহী যুদ্ধব্যবসায়ী বংশের সন্তান। ৬ ও ২৩ সংখ্যক গান দুটিতে হরিণ শিকার ও ৪৯ সংখ্যক চর্যায় দলদস্যু-কর্তৃক লুণ্ঠনের যে রূপক গৃহীত হয়েছে তাতে তাঁর 'রাউত' বৃত্তির সমর্থন পাওয়া যায়। ভুসুকুর গানের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, এই সাংকেতিক রূপকচিত্রের বাহুল্য। এই রূপক চিত্রগুলিতে জীবনের যে প্রত্যক্ষ রূপ ফুটে উঠেছে চর্যাগীতির ধর্মনিরপেক্ষ জীবনরসিক পাঠকের কাছে তার মূল্য কম নয়। এই সাংকেতিক চিত্রের বাহুল্য ও পারিভাষিক সন্ধ্যা শব্দের মাত্রাহীন প্রাচুর্য থেকে পদকর্তা হিসাবে ভুসুকুর আপেক্ষিক অর্বাচীনতাই প্রতিপন্ন হয়।

সবচেয়ে বেশীসংখ্যক গান পাওয়া গেছে কাহ্ন ভণিতায়। তবে কাহ্ন-নামাঙ্কিত সব গানই যে এক ব্যক্তির রচনা নয় এ কথা অনুমানের সঙ্গত কারণ আছে। চর্যাগীতিগুলি বিশ্লেষণ করে ডঃ সুকুমার সেন অন্তত দুজন কাহ্নের অস্তিত্ব অনুমান করেছেন। মোট তেরটি চর্যার মধ্যে - ১০, ১১, ১৮, ১৯, ৩৬, ৪২ সংখ্যক চর্যা ছয়টিতে চর্যাকার কাহ্নের পরিচয় একরকম, আর বাকী ৭, ৯, ১২, ১৩, ২৪, ৪০, ৪৫ সংখ্যক চর্যা সাতটিতে কাহ্নের পরিচয় অন্য রকম। প্রথম ছয়টি গানের কাহ্ন জালন্ধরিপা-এর শিষ্য এবং তাঁর অপর নাম বিরুআ। 'কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই' (১৮) এবং 'শাখি করিব জালন্ধরি পাএ' (৩৬)। ইনি কাপালিক (১০, ১১, ১৮) লাঙ্গা (৩৬) বা নগ্ন সন্ন্যাসী এবং যোগী (৪২); ডোম্বীর সঙ্গে বিবাহ ও অহর্নিশ মিলনে উৎসুক (১৯)। কিন্তু অপর সাতটি গানের কাহ্নের সঙ্গে প্রথমোক্ত কাহ্নের পরিচয়গত পার্থক্য স্পষ্ট। শেষোক্ত সাতটি গানের কাহ্নও মহাসুখলাভের প্রয়াসী বটে, কিন্তু ডোম্বী-বিবাহ বা তজ্জাতীয় কোন যৌনতান্ত্রিক সাধনার ইঙ্গিত তাঁর রচনায় নেই। এঁর রচনায় সহজ স্বরূপের অনির্বচনীয়তা সম্পর্কে এক ধরনের গম্ভীর উপদেশ-প্রবণতা (১৩, ৪০, ৪৫) লক্ষ্য করা যায়, যা প্রথমোক্ত কাহ্নের রচনায় অনুপস্থিত। তাছাড়া পারিভাষিক শব্দের ব্যবহারেও উভয়ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য আছে। প্রথমোক্ত কাহ্ন বৌদ্ধতান্ত্রিক পরিভাষা ব্যবহার করলেও ব্যবহারিক জীবনের শব্দকেও রূপক হিসাবে গ্রহণ করেছেন, যথা, ডোম্বী, পদ্ম, খাট, রবিশশী, সসহর, যৌতুক, দুন্দুভি, পড়হ-মাদলা, কান্ধ ইত্যাদি পক্ষান্তরে দ্বিতীয়োক্ত কাহ্নের রচনায় রূপকার্থে ব্যবহারিক শব্দের ব্যবহার খুব কম, তুলনায় ধর্মীয় পারিভাষিক শব্দই প্রচুর, যথা, জিনউর, এবংকার, সহজ, তথতা, তিশরণ, করুণা, শূন, তথাগত, মহাসুহ, দশবলরত্ন, জিনরত্ন, ইত্যাদি। এই শেষোক্ত পারিভাষিক শব্দগুলির মধ্যে এবংকার, দশবলরত্ন, ত্রিশরণ, তথাগত এবং জিনরত্ন -এই পাঁচটি শব্দ প্রথমোক্ত কাহ্ন কেন, দ্বিতীয়োক্ত কাহ্ন ছাড়া অন্য চর্যাকারের রচনাতেও নেই। তাছাড়া দ্বিতীয়োক্ত কাহ্নের রচনায় শাস্ত্র ও আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনির্বাচ্য সহজস্বরূপকে লাভের প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ একথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে (৪০), ঠিক এই ভাবই দোহাকোষের কোথাও কোথাও আছে। এই বিশ্লেষণ সত্য হলে মনে হয়, শেষোক্ত কাহ্ন ও দোহাকোষের কাহ্ন একই ব্যক্তি। পূর্বের আলোচনায় (রচনাকাল দ্রষ্টব্য) দেখা গিয়েছে যে, কাহ্ন জালন্ধরিপাদের শিষ্য এবং তাঁর আবির্ভাবকালে মোটামুটি দ্বাদশ

শতাব্দী। দ্বিতীয়োক্ত কাহ্নের জীবৎকাল সম্ভবত প্রথমোক্তের কিছু পূর্ববর্তী, দ্বিতীয়োক্তের রচনায় যৌনতন্ত্রাচারের অনুপস্থিতি ও সরাসরি উপদেশ-দানের প্রবণতা থেকেই এই অনুমান করা চলে। তবে এ সমস্তই নিছক অনুমান মাত্র, উপযুক্ত তথ্যাদির অভাবে এ বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন।

চর্যাগীতির নিহিত ধর্মীয় দর্শন ও তত্ত্ব

টিপ্পনী

চর্যাগীতিতে সহজিয়া বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের সাধনপ্রণালী গুরুত্ব পেয়েছে। সাধনপ্রণালীর সঙ্গে সঙ্গে এর দার্শনিক পটভূমি আলোচনা করতে হবে। বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ যেমন নাগার্জুনের শূন্যবাদ বা মাধ্যমিকবাদ এবং মৈত্রেয় অসঙ্গ বসুবন্ধুর বিজ্ঞানবাদ বা যোগাচারবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বুদ্ধদেব মনে করতেন জীবসত্তা পঞ্চস্কন্ধের দ্বারা গঠিত। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পাঁচটি স্কন্ধের দ্বারা ধর্ম নিয়ন্ত্রিত। অবিদ্যার জন্যই জীবের জন্ম-জরা-মৃত্যু চক্রে আবর্তন। অনন্ত দুঃখের মূল এখানেই। দুঃখ থেকে পরিত্রাণ লাভের সাধনা বৌদ্ধদের সাধনা। তাদের কাম্য হল নির্বাণ।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর একশ বছরের মধ্যে দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে বৌদ্ধদের মধ্যে মতবিরোধ শুরু হয়। ধর্মের নীতি নির্ধারণ কল্পে চারবার অধিবেশন হয়। বৌদ্ধধর্ম দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে – হীনযান ও মহাযান। হীনযানীরা ব্যক্তিগত নির্বাণ চান। আর মহাযানীরা সর্বজীবের নির্বাণ চান। হীনযানের দুটি বিভাগ - সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক। সৌত্রান্তিকেরা বুদ্ধের সূত্রকে মান্য করতেন। বিজ্ঞান বা চৈতন্যের বাইরে বস্তুসত্তাকে তাঁরা স্বীকার করেননি। এঁরা ভাববাদী দার্শনিক। অন্যদিকে বৈভাষিকরা মনে করতেন মনোজগৎ ও জড়জগৎ দুয়েরই পরস্পর নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে।

মহাযানও দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে – মাধ্যমিক ও যোগাচার। মাধ্যমিক শূন্যবাদে বিশ্বাসী। তাঁদের কাছে বস্তু ও চৈতন্য কোনোটারই পারমার্থিক সত্তা নেই। সব কিছুই শূন্যস্বভাব। এই মতবাদের প্রবক্তা নাগার্জুন। এই মতবাদে অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব কোনটাকেই চূড়ান্ত বলে মনে করা হয় না। দুয়ের সূক্ষ্ম বিশেস্নষণ করে মধ্যপথ অবলম্বন করা হয়। সেই জন্য এই মতবাদের নাম মাধ্যমিক।

যোগাচারবাদীরা মনে করে বিজ্ঞান বা চেতনাই সব কিছুর মূলে। চৈতন্যের শান্ত অবস্থাই তাঁদের কাছে নির্বান। সেইজন্য তাঁদের মতবাদের আর এক নাম বিজ্ঞানবাদ। বিজ্ঞানবাদীদের শূন্যতা মাধ্যমিকদের মত একেবারে শূন্য নয়। প্রকৃত সত্তা না থাকলেও বস্তুর আছে সাংবৃতিক সত্য। চিত্ত যখন অবিদ্যার প্রভাবে প্রভাবিত হয় তখনই বস্তু সম্বন্ধে বোধ জাগে। বিজ্ঞানের নিবৃত্তিতে এর নিনাশ ঘটে। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক পর্যন্ত মাধ্যমিকবাদের প্রসার ছিল। ঐ সময়ের পরে বিজ্ঞানবাদের আবির্ভাব ঘটে। মন্ত্রতন্ত্রের তিনভাগ - কালচক্রযান, বজ্রযান এবং সহজযান। কালচক্রযানে বলা হয় অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ - এই তিনকালের ভেদলুপ্ত হলে অদ্বয় শূন্যতাবোধের উপলব্ধি হয়। বজ্র কথার অর্থ শূন্য স্বভাব। বজ্রযান সাধকের গুণ অনুসারে পাঁচটি ধর্ম কল্পিত হয়েছে - বজ্র (ডোম্বি), কর্ম (নটী), পদ্ম (রজকী), তথাগত (ব্রহ্মণী) এবং রত্ন (চন্ডালী)। বজ্রযানীরা স্বভাবশূন্য শূন্যতত্ত্বের পথে বিশ্বাসী। সহজযানীরা অদ্বয় মহাসুখে বিশ্বাসী। মহাসুখই নির্বাণ। সুখ চার রকম - আনন্দ, পরমানন্দ, বিরমানন্দ ও সহজানন্দ। সহজানন্দ হল সাধকের উপলব্ধির শেষ স্তর। সেটিই মহাসুখ। খ্রিস্টীয় দশম-দ্বাদশ শতকে সহজযান ধর্ম মগধ, উড়িষ্যা বাংলা ও কামরূপে প্রভাব বিস্তার করে। বাংলার বৌদ্ধধর্ম মন্ত্রযান বৌদ্ধধর্মের অন্তর্গত। চর্যাগীতির কবিরা নানা রূপকের মাধ্যমে চিত্ত নিরোধের কথা বলেছেন। সাধকেরা দেহকে

অবলম্বন করে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। চঞ্চল চিত্তে অবিদ্যার প্রভাব থাকে। চঞ্চলচিত্তকে দৃঢ়চিত্তে পরিণত করে তারা মহাসুখধামে পৌঁছাতে চান। সহজসুখের অধিকারী হয়ে জগৎকে তাঁরা শূন্যময় দেখেন। শরীরের বামা ও দক্ষিণা নাড়ি – ললনা ও রসনার গতি নিম্নমুখী। এগুলি জীবকে ভোগের পথে চালিত করে। জীবন জরা মরণের বশীভূত হয়। সাধক ললনা ও রসনাকে একত্র করে মধ্যগা নাড়ি অবধূতিকার সঙ্গে যুক্ত করেন। অবধূতিকার গতি উর্ধমুখী। নির্মাণকায় থেকে সহজকায়ের দিকে সাধকের যাত্রা। নাভিদেশে নির্মাণকায়। এটি প্রথম চক্র বা পদ্ম। দ্বিতীয় চক্র হৃদয়ে - তার নাম ধর্মচক্র বা ধর্মকায়। তৃতীয় কণ্ঠে - নাম সম্ভোগকায়। চতুর্থ চক্র মস্তকে অবস্থিত - সহজকায় বা মহাসুখকায়। বোধিচিত্ত যখন নির্মাণচক্রে উৎপন্ন হয়, তখন সাধকের আনন্দানুভূতি জাগে। বোধিচিত্ত যখন ধর্মকায়ে অবস্থান করে তখন সাধকের পরমানন্দের অনুভূতি হয়, তখন সাধকের আনন্দানুভূতি জাগে। বোধিচিত্ত যখন ধর্মকায়ে অবস্থান করে তখন সাধকের পরমানন্দের অনুভূতি হয়। সম্ভোগচক্রে বিরমানন্দ এবং মহাসুখচক্রে সহজানন্দের অনুভব ঘটে। গুরু নির্দেশ দিয়ে শিষ্যকে সাধন প্রণালী শেখান। কিন্তু সহজানন্দ ভাষণ শ্রবণের অতীত। সহজের স্বরূপ গুরু ব্যাখ্যা করেন না - আভাসমাত্র দিয়ে থাকেন। সহজানন্দ প্রত্যেক সাধকের নিজস্ব অনুভূতির বিষয়।

চর্যার দেহ সাধনার কথা হরিণ শিকার, নৌচালনা, সাঁকোর সাহায্যে নদী পারাপার, শবর-শবরীর জীবনযাত্রা, ইঁদুরের উৎপাত, মদ-চোলাই ইত্যাদির রূপকে বর্ণনা করা হয়েছে।

টিপ্পনী

গুরুবাদ

সাধনার বিষয়ে গুরুর উপরে আত্যন্তিক নির্ভরশীলতাই গুরুবাদের মূল কথা। এই গুরুবাদ বিশেষ কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের আচরিত প্রথা নয়, ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত ধর্মসাধনাতেই গুরুবাদ বিশেষ স্থান অধিকার করেছেঃ “As a matter of fact, this guru-vada may be regarded as the special characteristic, not of any particular sect or line of Indian religion, it is rather the special feture of Indian religion as a whole” (Dr. S. B. Dasgupta: Obscure religious cults, appendix (A) p. 356)। ভারতীয় ধর্মসাধনায় গুরুবাদের এই প্রাধান্যের কারণ, ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনে পরম সত্যকে সাধারণ বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই অবাঙ্মনসগোচর পরম সত্যকে বাইরে উপলব্ধি করার উপায় নেই, গভীর অনুধ্যান ও বোধির দ্বারা কোন কোন ভাগ্যবান পুরুষ আপন অন্তরে সেই অতীন্দ্রীয় সত্যের সন্ধান পান। সাধারণ মানুষ আপন সীমাবদ্ধতার জন্য এই সত্যের সন্ধান পায় না, এবং সত্যলাভের উপায়ও যেহেতু বহিরঙ্গমূলক নয় সেইজন্য যিনি সত্যের সন্ধান পেয়েছেন তাঁরই উপদেশ-নির্দেশ গ্রহণ করতে হয়। এইভাবে গুরুবাদের উৎপত্তি। ভারতীয় ধর্মসাধনার প্রাচীন যুগ থেকে আরম্ভ করে মধ্যযুগের বিভিন্ন মরমিয়া-সহজিয়া ধর্মসম্প্রদায়ে গুরুকে বিশেষ মর্যাদার আসনে অভিষিক্ত করা হয়েছে। গুরুবাদী ধর্মসম্প্রদায়ের বিশ্বাস, গুরু অদ্বয় সত্যোপলব্ধির দ্বারা শিষ্যের সঙ্গে একীভূত হন এবং অনুগামী শিষ্যকে সত্যলাভারে পথে চালিত করেন। গুরুর প্রতি এই অত্যধিক নির্ভরশীলতার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে গুরু ঈশ্বরেরই প্রতিনিধি বা বিকল্প হিসাবে বিবেচিত হয়েছেন, সেক্ষেত্রে শিষ্য বা ভক্তসম্প্রদায় গুরুকে সেবা করেই ঈশ্বর-সেবার আনন্দ পান।

চর্যাগীতিতেও গুরুবাদের বিশেষ স্বীকৃতি আছে। এই স্বীকৃতির কারণ চর্যাকারগণ যে ধর্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তি তার সাধ্য ও সাধনপদ্ধতি অত্যন্ত গুহ্যসাধানার বিষয়। যে সহজানন্দ তাঁদের সাধ্য তা সাধকের গূঢ় উপলব্ধির বিষয়, বাইরে থেকে তা কেউ কাউকে

দান করতে পারে না, আবার এই সহজানন্দলাভের উপায়ও পূজা-শাক্তপাঠ-জপ-তপ প্রভৃতি বাহ্যনুষ্ঠান-নির্ভর নয়। চর্যাকারদের সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম বহুলাংশেই তান্ত্রিক যোগাচার দ্বারা প্রভাবিত। এই তান্ত্রিক যোগাচারের এমন কতকগুলি দুরূহ শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া আছে যা পূর্ব-অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন কোন ব্যক্তির নির্দেশ ও সহায়তা ছাড়া অভ্যাস করা সম্ভব নয়। কেননা, এই ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার বিচ্যুতিতে শুধু যে সাধ্য-লাভেরই বিঘ্ন ঘটে তা নয়, সাধকের শারীরিক ও মানসিক বিকৃতিরও সম্ভাবনা দেখা দেয়। তাই অন্যান্য তন্ত্রের মত বৌদ্ধতন্ত্রের গ্রন্থাদিতে গুরুকে বিশেষ সম্মান ও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, যথা,

নান্যেন কথ্যতে সহজং ন কস্মিন্নভিলপ্যতে।
আত্মনা জ্ঞায়তে পুণ্যাদ্ গুরুপাদোপসেবয়া।।

হেবজ্রতন্ত্র পুথি, পৃঃ ২২(খ)।

অর্থাৎ পরমসাধ্য 'সহজ' আর কিছুতেই পাওয়া যায় না, গুরুর চরণ-সেবারূপ পুণ্যের দ্বারাই আপনা-আপনি 'সহজ' জ্ঞানলাভ করা যায়। গুরু সম্পর্কে বৌদ্ধতন্ত্রের এই সশ্রদ্ধ মানসিকতা বিভিন্ন চর্যাগীতিতে প্রতিফলিত হয়েছে। পরমসত্য বা সহজানন্দ সম্পর্কে চর্যাকারদের ধারণা এই যে সহজস্বরূপ ইন্দ্রিয়ের অগম্য, শাস্ত্রপাঠে অলভ্যঃ

জাহের বান চিহ্ন রূব ণ জাণী।
সো কইসে আগমবেএঁ বখাণী।।

সুতরাং তাঁদের অন্য পন্থা অনুসরণ করতে হয়েছে এবং সেই পন্থা সদ্গুরু বা সদ্গুরুবচন। প্রথম চর্যাতেই আদিসিদ্ধাচার্য লুইপাদ বলেছেন "দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ। লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ।।" মহাসুখকে পাবার উপায় গুরুকে জিজ্ঞাসা করে জান। এরপর ৫ম চর্যায় "পুচ্ছতু চাটিল অনুত্তর সামী", ৮ম চর্যায় "বাহতু কামলি সদ্গুরু পুচ্ছী", ১২শ চর্যায় "সদ্গুরু বোহেঁ জিতেল ভববল", ২১শ চর্যায় "তাব সে মুষা উঞ্চল পাঞ্চল।/সদ্গুরু বোহেঁ করিহ সো নিচ্চল।।" ২৩শ চর্যায় "সদ্গুরু বোহেঁ বুঝি রে কাসু কহি নি", ৩৫ সংখ্যক চর্যায় "এতকাল হাঁউ অচ্ছিলেসু মোহে।/এবেঁ মই বুঝিল সদ্গুরু বোহেঁ।।", ৩৮ নং চর্যায় "সদ্গুরু বঅণে ধর পতবাল", ৩৯ সংখ্যক চর্যায় "গুরুবঅণ বিহারেঁ রে থাকিব তই ঘুন্ড কইসেঁ", ৪১ নং চর্যায় "জই তো মূঢ়া অচ্ছসি ভান্তি পুচ্ছতু সদ্গুরু পাব", ৪৫ নং চর্যায় "বাঢ়উ সো তরু সুভাসুভ পাণী।/ ছেবই বিদুজন গুরু পরিমাণী।"ঃ সর্বত্রই সাধন-মার্গে গুরুর অপরিহার্যতা বিশেষ ভাবে স্বীকৃত। তবে চর্যাগীতির গরবাদের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে গুরকে 'সহজ' লাভের উপায় হিসাবেই দেখা হয়েছে, উপেয় বা সহজস্বরূপের বিকল্প হিসাবে দেখা হয়নি। কেননা পরম সাধ্য সহজানন্দ প্রত্যেক সাধকের নিজস্ব অনুভূতির বিষয়, প্রত্যেক সাধক নির্দিষ্ট সাধনমার্গে আরূঢ় হয়ে এই অনুভূতি লাভ করেন। এই অনুভূতি তাঁদের মতে 'বাকপথাতীত' বা বাক্যের অগোচর। সুতরাং গুরু তাঁর উপদেশ-বাক্যের দ্বারাই সহজানন্দের উপলব্ধিগত অনুভূতি শিষ্যের মধ্যে সঞ্চার করতে পারেন না। তিনি উপদেশ-বাক্যের দ্বারা শিষ্যকে শুধু ঠিক পথে চালিত করতে পারেন। সুতরাং গুরুর উপদেশ-বাক্য পরম সাধ্য সহজানন্দের স্বরূপ-ব্যাখ্যা নয়, সহজানন্দ-লাভের উপায় নির্দেশ মাত্র। এই সহজানন্দ ভাষণ ও শ্রবণের অতীত- তাই যিনি সদ্গুরু তিনি সহজানন্দের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন না, এবং যিনি উপযুক্ত শিষ্য তিনিও সহজ স্বরূপের আত্মগত উপলব্ধির জন্য শাত্রবাণী বা গুর-বচন শ্রবণ করেন না। এই দিক থেকে চর্যাগীতিতে গুরু বোবা ও শিষ্য কালা (বধির) রূপে বর্ণিতঃ

ভণ কইসেঁ সহজ বোলবা জাঅ।
কাঅবাকচিঅ জসু ণ সমাঅ।।
আলে গুরু উএসই সীস।

টিপ্পনী

বাকপথাতীত কাহিব কীস।।
জেতই বোলী তেতবি টাল।
গুরুন্ন বোব সে সীস কাল।।
ভণই কাহ্ন জিণরঅণ বি কইসা।
কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা।।(৪০)

কায়বাকচিত্ত যেখানে প্রবেশ করে না, বল, সেই সহজের কথা কি ভাবে বলা যায়? গুরুন্ন বৃথাই শিষ্যকে উপদেশ দেন, বাক্যপথাতীত সেই 'সহজ' কি ভাবে বলা যায়? যতই বলা যায় ততই ভুল হয়। গুরুন্ন বোবা শিষ্য কালা। কাহ্ন বলে, সেই জিনরত্ন (=সহজ) কেমন? কালা বোবাকে বোঝায় যেমন।।

টিপ্পনী

দেশ-কাল-সমাজ

কাব্যের উদ্দেশ্য সামাজিক ইতিহাস প্রণয়ন না হলেও কাব্য যেহেতু জীবন-নির্ভর সেইজন্য কাব্যের মধ্যে জীবনের বাস্তব পটভূমি তথা সমাজ-পরিবেশ-সংক্রান্ত তথ্যাদি সন্ধান করলে ইতিহাসবেত্তারা একেবারে বিফল হন না। চর্যাগীতির মূল বিষয় অবশ্য জীবনের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত বা সামাজিক সংস্থানের সঙ্গে অন্বিত নয়, বরং চর্যাকারদের দৃষ্টিভঙ্গী তত্ত্বের দিক থেকে জীবন-বিমুখ ছিল বলেই বলা চলে। সুখ-দুঃখ, আশা- নিরাশায় ভরা এই যে রক্তমাংসের জীবন চর্যাকারদের কাছে তা 'সুইণে অদশ জইসা' - স্বপ্নের ছবি ও দর্পণের প্রতিবিম্বের মতই সত্য বলে মনে হলেও আসলে সত্য নয়। জীবন সম্পর্কে যাঁদের ধারণা এতটা ইহলোক-পরাঙ্মুখ তাঁদের রচনায় সাক্ষাৎভাবে তাঁদের সমসাময়িক সমাজজীবনের রূপ-রসের সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। তবে চর্যাকারদের রচনারীতি সম্পর্কে একটি কৌতুককর সত্য এই যে, তত্ত্বের দিক থেকে তাঁরা যে জীবনরূপকে অস্বীকার করেছেন, তত্ত্বকে পরিস্ফুট করতে গিয়ে তাঁরা আবার সেই জীবনরূপ থেকেই উপমান সংগ্রহ করেছেন। অর্থাৎ জীবন যে মিথ্যা একথা প্রমাণ করতে গিয়ে তাঁরা জীবনের নানা লৌকিক রূপের উপরই সবচেয়ে বেশী নির্ভর করেছেন। তাই সাক্ষাৎভাবে জীবনকে অস্বীকার করেও তাঁরা পরোক্ষভাবে তাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। চর্যাগীতিতেও তাই সমাজের ও জীবনের যে রূপ পাওয়া যায় তা পরোক্ষ, খন্ডিত ও আভাসময়।

ভৌগোলিক পরিবেশঃ চর্যাগীতি মূলত বাংলাদেশের বৌদ্ধ সাধকদের সাধনসঙ্গীত, তাই তাঁদের রচনার উপমানব্যবহারে বাংলাদেশের ভৌগোলিক প্রকৃতির প্রভাব সবচেয়ে বেশী। এই ভৌগোলিক প্রকৃতির মধ্যে আবার প্রাধান্য অনুসারে নাব্য ভূপ্রকৃতির স্থান সর্বাগ্রগণ্য। কেন না, বাংলাদেশ বিশেষভাবে নদীমাতৃক, সমুদ্রনদী খাল বিখালে বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিশেষভাবে স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত। পরমার্থসাধনার ক্ষেত্রে নদী ও সমুদ্রের রূপক অবশ্য ভারতীয় ভক্তিসাহিত্যে বহুদিন থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে, কিন্তু নদী-খাল-নৌকাচালনা ও সাঁকো-নির্মাণের রূপক চর্যাকারেরা যত ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন তার তুলনা অন্য কোথাও নেই। এর কারণ বাংলাদেশের বিশেষ নাব্য প্রকৃতি। চর্যাকার যখন বলেনঃ

ভবণই গহণ গম্ভীর রেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী।।(৫)

তখন ভারতীয় সাহিত্যে ব্যবহৃত সাধারণ নদী-রূপক অতিক্রম করে কর্দম-পিচ্ছিল পাড়বিশিষ্ট বাংলাদেশের অথৈ জলের নদীর প্রতিচ্ছবিই বিশেষভাবে ফুটে ওঠে। শুধু নদীই নয়, এ দেশে বাম-ডাইনে যত্রতত্র খাল-বিখালের যে প্রাচুর্য তারও উল্লেখ আছে বিভিন্ন প্রসঙ্গেঃ

বাম দহিণ জো খালবিখলা।
সবহ ভণই বপা উজুবাট ভাইলা।(৩২)

যেখানে এত গভীর জলাশয়ের প্রাচুর্য সেখানে পারাপারের প্রধান উপায় সাঁকো ও নৌকা। চাটিলপাদের গানে এই সাঁকো নির্মাণের বিস্তৃত বিবরণ আছেঃ

ফাড্ডিঅ মোহতরুন্ন পাটি জোড়িঅ।
আদঅ দিঢ় টাঙ্গী নিবাণে কোহিঅ।।(৫)

টাঙ্গি দিয়ে বড়গাছ ফেড়ে কাঠের পাটাতনে জোড়া দিয়ে বেশ মজবুত সাঁকো তৈরি করা হয়েছে। সাঁকো স্থলপথের সহায়, কিন্তু নদী-খাল-বিল যেখানে প্রচুর সেখানে সব সময় সাঁকোতে কাজ চলে না, তাই সেকালের লোকে জলে ভেলা বা নৌকা ভাসিয়ে যাতায়াত করত। এই নৌকাযাত্রার ছবিও অনেকগুলি গানে বিশদভাবে অঙ্কিত হয়েছে।

খুন্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছী।
বাহতু কামলি সদ্গুরুন্ন পুচ্ছী।।
মাঙ্গত চড়হিলে চউদ্দিস চাহঅ।
কেড়ুআল নাহি কেঁ কি বাহবকে পারঅ।।(৮)

কিংবা ৩৮ সংখ্যক চর্যায়ঃ

কাঅ ণাবডহি খান্টি মণ কেড়ুআল।
সদ্গুরুন্নবঅণে ধর পতবাল।।
চীঅ থির করি ধরহুরে নাহী।
অন উপায়েঁ পার ণ জাই।।
নৌবাহী নৌকা টাণঅ গুণে।
মেলি মেল সহজেঁ জাউ ণ আণেঁ।।

১৪ সংখ্যক চর্যায়ঃ

পাঞ্চ কেড়ুআল পড়ন্তেঁ মাঙ্গে পিটত কাচ্ছী বান্ধী।
গঅণদুখোলেঁ সিংচহু পাণী ন পইসই সান্ধী।।

উদ্ধৃত গীতাংশগুলির তাত্ত্বিক অর্থ যাই হোক, এগুলির মধ্যে নৌকা বাইবার যে বিস্তারিত বর্ণনা, বিভিন্ন প্রকার নৌকার নাম (নাব, নাবড়ি, ভেলা) এবং নৌকার বিভিন্ন অবয়বের নাম আছে তাতে বাংলাদেশের নাব্য ভূপ্রকৃতি বিশেষ সজীবরূপে ফুটে উঠেছে। চর্যাগীতিতে স্থলপথের যানবাহন হিসাবে রথ (১৪) ও হস্তী (৯, ১৬) ব্যবহারের আভাস আছে, কিন্তু রথ অর্থাৎ স্থলযান অপেক্ষা জলযানের শ্রেষ্ঠতা চর্যাগীতির এক জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে ('জো রথে চড়িলা বাহবা ণ জাই কুলেঁ কুল বুড়ই'-১৪)। এ থেকেই বোঝা যায় চর্যাকারদের রূপকচিন্তায় স্থলের চেয়ে জলাশয়ের প্রভাবই বেশী।

নদীপ্রসঙ্গের পরই চর্যাগীতিতে পর্বত ও অরণ্যপ্রসঙ্গ প্রাধান্য পেয়েছে। এই উভয় প্রসঙ্গের উল্লেখে বোঝা যায় চর্যাগীতির বাংলাদেশ ভৌগোলিক সীমার দিক থেকে আজকের বাংলা থেকে অনেক বেশী প্রসারিত ছিল। ২৮ সংখ্যক গানে এই পার্বত্য ও আরণ্য প্রকৃতির ছবি আছেঃ

উঞ্চা উঞ্চা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।।
... .
ণাণাতরুন্নবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলি ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিন্ডই কর্ণ্ণ কুন্‌জলবজ্রধারী।।

টিপ্পনী

শবর-শবরী বা সমাজে যারা সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, পাহাড়ের গুহা বা মালভূমি এবং সংশিস্নষ্ট বনভূমিই ছিল তাদ্দের আবাসস্থল।

সমাজ-সংস্থান

চর্যাগীতিগুলিতে সেকালের সমাজব্যবস্থা ও সামাজিক পরিস্থিতির কিছু কিছু আভাস আছে। যে সময়ে এই গানগুলি রচিত হয়েছিল সে সময়ে বাংলাদেশে সেন-রাজবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত। সেনবংশের পূর্বেকার বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পালবংশীয় রাজারা ধর্ম ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কিছুটা উদারনৈতিক ছিলেন, নিজেরা বৌদ্ধ হলেও

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সম্পর্কে তাঁদ্দের কোন অসহিষ্ণুতার প্রমাণ ইতিহাসে নেই। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মালম্বী সেনরাজগণ পরধর্ম সম্পর্কে বেশ অসহিষ্ণু ছিলেন এবং তাঁদ্দের আমলেই ব্রাহ্মণ্যস্মৃতির প্রসার ও ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রম-প্রথা অনুযায়ী সামাজিক স্তরবিভাগের রীতি বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। এই বর্ণানুযায়ী সমাজব্যবস্থায় বেদাশ্রিত জনগোষ্ঠী ছিল অভিজাত এবং বেদধর্ম ও বেদাচার-বর্হিভূত জনগোষ্ঠী ছিল অনভিজাত, অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য। অভিজাত সমাজ অনভিজাত সমাজ সম্পর্কে সর্বদা একধরনের জুগুপ্সা ও বিরম্নপতা পোষণ করত। সেকালে রচিত নানা শিলালিপি, তাম্রশাসন এবং স্মৃতিগ্রন্থাদি থেকে সেকালের সমাজব্যবস্তার যে ঐতিহাসিক তথ্যাদি পাওয়া যায় চর্যাগীতির বিভিন্ন অংশে তার পরোক্ষ সমর্থন আছে। চর্যাকারগণ ছিলেন তান্ত্রিক বৌদ্ধ, সুতরাং ধর্মাচারের দিক থেকে তাঁরা বেদবহির্ভূত। এই কারণে চর্যাগীতির রচয়িতারা ডোম্বী, কামলি, শবর প্রমূখ অন্ত্যজ শ্রেণীর ব্যক্তি এবং চর্যাগীতির পাত্রপাত্রীগণও ডোমনী, চন্ডালী, শুন্ডিণী, শবরী, শবর, ব্যাধ, জেলে প্রভৃতি অস্পৃশ্য শ্রেণীভুক্ত। সমাজের অভিজাত উচ্চবর্ণীয়েরা যে নিম্নবর্ণীয়দ্দের সম্পর্কে একধরনের শুচিবায়ুগ্রস্থ জুগুপ্সা পোষণ করতেন তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় কাহ্নপাদ্দের একটি চর্যায়ঃ

নগর বাহিরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো বাহ্মনাড়িআ।।

ডোম-চাঁড়াল-শবর প্রভৃতি তথাকথিত নিম্নবর্ণীয়েরা নগরের বাইরে, জনপদ্দের প্রাণকেন্দ্র থেকে বহুদুরে জঙ্গলের মধ্যে, পাহাড়ের গুহায় কিংবা মালভূমির উপরে বাস করত। ব্রাহ্মণেরা তাদ্দের স্পর্শে সমাজজীবন কলুষিত করতে চাইতেন না বলেই এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা। অবশ্য চর্যাগীতির ডোমনী, শবরী, চন্ডালী কেউই প্রকৃত নারীচরিত্র নয়, মহাসুখ বা সহজানন্দ্রে রূপকবিগ্রহ। কিন্তু সহজানন্দ্রে অতীন্দ্রিয় স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে চর্যাকবিগণ যে ভাবে অস্পৃশ্য রমণীর রূপক ব্যবহার করেছেন তাতে বোঝা যায় যে সেকালের সমাজব্যবস্থায় এই স্পর্শযোগ্যতার প্রসঙ্গটি কত প্রত্যক্ষ ছিল।

জীবিকা

বর্ণভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় নিম্নবর্ণীয়েরা শুধু যে নিম্নতর সমাজমানেরই অম্তর্ভুক্ত ছিলেন তাই নয়, তাঁদ্দের আর্থিক মানও অত্যন্ত অনুন্নত ছিল। চর্যাগীতিতে যেকয়টি জীবিকা বা বৃত্তির ইঙ্গিত আছে তা খুব একটা উচ্চমানের নয়। চর্যাগীতিতে ডোম, ব্যাধ, শুঁড়ি, সূত্রধার ইত্যাদি যেসব বৃত্তিনির্ভর চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় তা থেকে বোঝা যায় যে সমাজের নিম্নস্তরের ব্যক্তিদ্দের আর্থিক অবস্থা বিশেষ অনুন্নত ছিল। ডোমদ্দের প্রধান বৃত্তি ছিল তাঁত বোনা ও চাঙাড়ি তৈরি করা (১০), এছাড়া খেয়াপারাপার করাও ডোমদ্দের কাজ ছিল। এই পাটনীবৃত্তি খুব একটা অর্থকরী ছিল না, পারাপারের বিনিময়ে পারর্থীর কাছ থেকে পারিশ্রমিক পাওয়া যেত যৎসামান্য -কড়ি বা বুড়ি (১৪)। তাছাড়া পারিশ্রমিক আদায়ের ব্যাপারটিও সবসময় সহজসাধ্য ছিল না।

টিপ্পনী

অনেক সময় পারার্থীরা পারিশ্রমিক দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করত, তখন তার শরীর তল্লাশি করে তবে পারিশ্রমিক উদ্ধার করতে হত। ডোমপুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ চরণে নূপুর ও কর্ণে কুন্ডল ধারণ করে কাপালিক বেশে নগরের মধ্যে বিহার করত। এই কাপালিক নটবৃত্তিও সেকালের নিম্নবর্ণীয়দের অন্যতম পেশা ছিল। অন্যান্য বৃত্তির মধ্যে মদচোলাই করা (৩), শিকার করা (৬, ২৩), গাছ কেটে কাঠের কাজ করা (৫, ৪৫) তুলো ধোনা ও মোটা-কাপড় বোনার কথা (২৬,২৫) চর্যাগীতিতে উল্লিখিত হয়েছে। এই সব বৃত্তির কথা থেকে বোঝা যায় যে, সমাজের-নিম্নস্তরের ব্যক্তিরা সকলেই ছিল শ্রমজীবী, বুদ্ধিচর্চা অপেক্ষা কায়িক শ্রমই ছিল এদের জীবিকার মুখ্য মূলধন। পক্ষান্তরে সমাজের উচ্চস্তরের ব্যক্তিদের জীবিকার কথা বিশদ ভাবে উল্লিখিত না হলেও তাঁদের জীবনধারা সম্পর্কে যে সব বিচ্ছিন্ন আভাস পাওয়া যায় তাতে মনে হয় আর্থিক অসাচ্ছল্য তাঁদের ছিল না। যাঁদের ঘরে হরি, হর, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবমূর্তির (৪৭) প্রতিষ্ঠা ছিল অর্থাৎ যাঁরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মাচারের সাপেক্ষতা করতেন আর্থিক ব্যাপারে তাঁদের কায়িক শ্রমের উপর নির্ভর করতে হত না। আগম-পুথিপাঠ ইষ্টমালা-জপ ইত্যাদি(৪০) বেদানুকূল বুদ্ধিচর্চাতেই তাঁদের সময় অতিবাহিত হত। রাজা শাসনপড়া (=তাম্রশাসন)র দ্বারা তাঁদের যে নিষ্কর ভূসম্পত্তিভোগের অধিকার দিতেন তাতেই তাঁদের অর্থের সংস্থান হত। রাজানুগ্রহে তাঁদের ঘরে থাকত সোনারূপার ভান্ডার (৪৯)। কায়িক শ্রম ও শাস্ত্রপাঠাদি বুদ্ধিচর্চা - জীবিকার্জনের এই দুটি ঋজু উপায় ছাড়াও অন্য তির্যক উপায়ও সেকালে বেশ প্রচলিত ছিল - চৌর্যবৃত্তি ('কানেট চৌরি নিল অধরাতী'২, 'জো সো চৌর সৌ দুষাধী' - ৩৩) এবং দস্যুবৃত্তি ('বাট অভঅ খান্টা বি বলআ' - ৩৮, 'অদঅ বঙ্গালে দেশ লুড়িউ'-৪৯)। তবে এই তির্যক জীবিকা একেবারে বাধাহীন ছিল না। দস্যুতস্করের উপদ্রব সেকালেও প্রহরীনিয়োগ ('সুণ বাহ তথতা পহারী' - ৩৬) ও তালাচাবি ('কোঞ্চা তাল'৪)র ব্যবস্থা ছিল, এবং চোর ধরার জন্য দারোগা ('দুষাধী' ৩৩) ছিল, পথে ঘাটে থানা (১৫) বা কাছারি ('উআরি' - ১২) ছিল।

জীবনযাপন

চর্যাগীতিতে দৈনন্দিন জীবনের যে ছবি পাওয়া যায় কাপ পটভূমি প্রধানত নিম্নশ্রেণীর জনগণ। কবি ও তাঁদের লক্ষ্য হল (target group) নিম্নশ্রেণীর বলেই বোধহয় নিম্নশ্রেণীর জীবনযাত্রার রূপকই বেশী ব্যবহৃত হয়েছে। সেকালের পারিবারিক কাঠামো ছিল যৌথ প্রকৃতির। শ্বশুর-শাশুড়ী-স্ত্রী পুত্রবধূ ('বহুড়ী') সকলকে নিয়ে এই পারিবারিক সংগঠন। একাধিক চর্যায় (২,৪,১১) এই যৌথ প্রকৃতির-পারিবারিক কাঠামোর ইঙ্গিত আছে। এই পারিবারিক সম্পর্ক সম্ভবত বেশ দৃঢ়বদ্ধ ছিল। পারিবারের মধ্যে থেকে প্রকাশ্যে ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারের তেমন অবকাশ ছিল না। তাই কাহ্ন যখন ডোম্বীর প্রতি আসক্ত হন তখন তাঁকে পরিবারের শাশুড়ী-ননদ-শালী প্রভৃতি সকল পরিজনকে হত্যা করে (১১) গৃহত্যাগী হয়ে তবে প্রেমিকার সঙ্গে মিলিত হতে হয়। অন্যদিকে পুত্রবধূ মনে মনে পরপুরুষের প্রতি আসক্ত হলেও তাকে প্রকাশ্যে পারিবারিক আনুগত্য স্বীকার করতে হয় এবং প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য শ্বশুরের নিদ্রাকর্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এছাড়া, চর্যাগীতিতে জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ প্রসঙ্গে যে আচার-অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে তার সঙ্গে আধুনিক বাঙালি সমাজের সামঞ্জস্য বিদ্যমান, অর্থাৎ আধুনিক কালেও উক্ত উপলক্ষে যে সব সামাজিক অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে, তা আসলে প্রায় হাজার বছরের পুরাতন জীবনাচরণেরই অনুবৃত্তি। সন্তান প্রসবের জন্য একটি পৃথক আঁতুড় বিপন্ন হবার আশঙ্কা ছিল কুক্কুরীপাদের চর্যায় তার ইঙ্গিত আছেঃ

ফেটলেউ গো মাএ অন্তউড়ি চাহি।
জা এথু বাহাম সো এথু নাহি।।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

পহিল বিআণ মোর বাসনযূড়া।
নাড়ি বিআরম্ভে সেব বাপুড়া।।(২০)

বাঙালি হিন্দু সমাজে মৃতদেহ সৎকারের যে রীতি প্রচলিত আছে ৫০ সংখ্যক চর্যায় তারও কিছু আভাস পাওয়া যায়ঃ

চারি বাসে তাভলা রেঁ দিআঁ চঞ্চালী।
তঁহি তোলি শবরো ডাহ কএলা কান্দ সগুণ শিআলী।।
মারিল ভবমত্তা রে দহদিহে দিধলি বলী।
হের সে শবরো নিরেবণ ভঈলা ফিটিলি ষবরালী।।

চার বাঁশের চাঁচরি দিয়ে খাট গড়া হল। তাতে তুলে শবরকে দাহ করা হল, শকুন শিয়াল কাঁদতে লাগল। ভবমত্তকে মারা হল, দশ দিকে পিন্ড দেওয়া হল। শবর নিশ্চিহ্ন হল, তার শবরালিও ঘুচল।

বিবাহের উদ্যোগ ও পদ্ধতির মধ্যেও একালের সঙ্গে সেকালের বেশ মিল ছিল। বাদ্যভান্ড সহযোগে সাড়ম্বর বিবাহযাত্রা, যৌতুক গ্রহণ, যুবতী রমণীদের বাসর জাগা - একালেও যেমন, সেকালেও তেমনি প্রচলিত ছিল। কাহ্নপাদের একটি চর্যায় (১৯) সেকালের বিবাহযাত্রার একটি সুন্দর ছবি পাওয়া যায়ঃ

ভব নির্ব্বাণে পড়হ মাদলা।
মন পবণ বেণি করন্ড কসালা।।
জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উছলিআঁ।
কাহ্ন ডোম্বি বিবাহে চলিআ।।
ডোম্বী বিবাহিআ অহারিউ জাম।
জউতুকে কিঅ আণুতু ধাম।।
অহিণিসি সুরঅ পসংগে জাঅ।
জোইণি জালে রএণি পোহাঅ।।

এই ধরনের আড়ম্বরবহুল বিবাহ ছাড়াও সেকালে ডোম প্রভৃতি তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর সম্প্রদায়ের মধ্যে 'সাঙ্গা' বা বিধবাবিবাহের প্রচলন ছিল, কাহ্নের দুটি চর্যায় 'আলো ডোম্বী তোএ সম করিব ম সাঙ্গ' (১০),'চলিল কাহ্ন মহাসুহ-সাঙ্গে' (১৩) - তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

শবর-পাদের দুটি চর্যায় (২৮,৫০) সেকালের আদিবাসীদের দাম্পত্য জীবনের সুখসমৃদ্ধ চিত্র পাওয়া যায়। পাহাড়ের উপরে টিলায় শবরদম্পতির বাস। বাড়ির পাশেই কাপাস আর ধানের ক্ষেত। কাংনি দানা পেকে উঠলে তার থেকে তৈরি মাদক পানীয় পান করে শবর-শবরী জ্যোৎস্নারাতে প্রমত্ত হয় এবং মিলন সুখে রত হয়ঃ

হেরি যে মেরি তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা।
যুকড় এসে রে কপাসু ফুটিলা।
তইলা বাড়ির পাসেঁর জোহ্না বাড়ি ভাএলা।
ফিটেলি অন্ধারী রে অকাশ ফুলিআ।।
কঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবরাশবরি মাতেলা।
অণুদিণ সবরো কিম্পি ন চেবই মহাসুহেঁ ভেলা।।(৫০)

শবর-শবরীর দাম্পত্য জীবনে সাময়িক ভুল বোঝাবুঝির অবকাশে কখনো আবার মধুরতর বৈচিত্র্য আসে। শবরী বিচিত্র বসনভূষণে সজ্জিত হওয়ায় শবর তাকে চিনতে না পেরে পরনারী বলে ভুল করে উন্মত্ত হয়ে ওঠে, শবরী তখন অনুনয় করে বলেঃ

উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহৌরী।
নিঅ ঘরিণী ণামে সহজ সুন্দরী।(২৮)

তারপর তিনধাতুর খাট পেতে তাতে উভয়ের মিলনশয্যা রচিত হল। তারপর কর্পূরবাসিত তাম্বুল চর্বণ করে শবরদম্পতি নিবিড় মিলনে রজনী অতিবাহিত করল। এই বর্ণনার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা যাই হোক, শবর-শবরীর দাম্পত্য জীবনযাপনের একটি বিশ্বাস্য চিত্র হিসাবে এর বাস্তব মূল্য অপরিসীম।

আমোদ-প্রমোদঃ চর্যাগীতির কতকগুলি অংশে সেকালের বাঙালিরা অবসর সময়ে, উৎসবে ও সামাজিক অনুষ্ঠানে যে ভাবে কালাতিপাত করত তার আভাস পাওয়া যায়। অবসর বিনোদনের অন্যতম প্রধান উপায় ছিল দাবাখেলা ("নয়বল"-১২)। সেকালের দাবাখেলার রীতিপদ্ধতির আভাসও উক্ত চর্যায় (১২) আছেঃ

টিপ্পনী

পহিলেঁও তোড়িআ বড়িআ মারিউ।
গঅবরেঁ তোলিআ পাঞ্চজনা ঘালিউ।।
মতিএঁ ঠাকুরক পরীনিবিত্তা।
অবশ করিআ ভববল জিতা।।

প্রথম তুড়ে বড়ে মারা হল, গজ দিয়ে পাঁচজনকে ঘায়েল করা হল। মন্ত্রীকে দিয়ে ঠাকুরকে (রাজাকে) ঘিরে খেলা জয় করা হল।

অবসরের সময় মদ্যপান সেকালের অন্যতম সামাজিক ব্যসন ছিল। যে সমাজের অধিকাংশ মানুষই ছিল শ্রমজীবী, সেখানে দৈহিক ক্লান্তি অপনোদনের জন্য ব্যাপক মদ্যপানের অভ্যাস প্রচলিত থাকাই স্বাভাবিক। সমাজজীবনে এই ব্যাপক মদ্যাসক্তিকে কেন্দ্র করে মদ চোলাইয়ের কুটিরশিল্প সেকালে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। সেকালের মদ চোয়ানোর পদ্ধতি, মদের পসরা সাজানোর রীতি এবং শুঁড়িবাড়ির বিশেষ চেহারার একটি প্রত্যক্ষ চিত্র বিরুআর চর্যায় (৩) পাওয়া যায়ঃ

এক সে শুণ্ডিনি দুই ঘরে সান্ধঅ।
চীঅণ বাকলঅ বারুণি বান্ধঅ।।
... ...
দশমি দুআরত চিহ্ন দেখইআ।
আইল গরাহক অপণে বহিআ।।
চউশঠী ঘড়িয়ে দেট পসারা।
পইঠেল গরাহকা নাহি নিসারা।।

চর্যাগীতিতে উল্লিখিত বিভিন্ন রাগ-রাগিনীর নাম এবং বাদ্যযন্ত্র ও নাচগানের প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যায় যে সেকালের আনন্দানুষ্ঠানে নৃত্য-গীতাদির বিশেষ প্রাধান্য ছিল। ১৭ সংখ্যক চর্যায় 'হেরিকবীণা' নামে এক শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে। লাউয়ের খোল, তন্ত্রী ও দন্ড দিয়ে এই যন্ত্র নির্মিত, করপার্শ্ব দিয়ে চেপে ধরে এই যন্ত্র বাজালে মধুর ধ্বনি উত্থিত হয়ঃ

সুজলাউ সসি লাগেলি তান্ত্রী।
অণাহা দান্ডী বাকি কিঅ অবধূতি।।
... ...
জবে করহা করহকলে চাপিউ।
বতিশ তান্তি ধনি সএল ব্যাপিউ।

যন্ত্রের গঠন ও বাদন-পদ্ধতি দেখে মনে হয় এটি একতারা বা গোপীযন্ত্র-জাতীয় কোন বাদন-যন্ত্র। এই চর্যারই শেষে আছেঃ

নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।
বুদ্ধনাটক বিসমা হোই।

(পুরুষ) বজ্রাচার্য নাচছেন আর (নারী) দেবী গান করছেন - এর ফলে বুদ্ধনাটক বিপরীতভাবে অনুষ্ঠিত হল। এই পদথেকে বোঝা যায় যে সেকালে উৎসবে বা আনন্দানুষ্ঠানে নাটগীতির পালা অভিনীত হত। সেই পালায় স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই অংশগ্রহণ করত। স্ত্রীলোকের পক্ষে নর্তকীর ভূমিকা ও পুরুষের পক্ষে গায়কের ভূমিকাই ছিল নাটগীতির সাধারণ রীতি।

টিপ্পনী

এছাড়া চর্যাগীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেকালের বাঙালির দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ব্যবহৃত নানা ছোটো-খাটো উপকরণের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। যথা, নিত্য ব্যবহৃত তৈজসপত্রহাঁড়ী, "পিটা" (দুধ দোহনের পাত্র), "ঘড়ি" (ঘড়া) "ঘড়ুলী" (গাড়ু)। শঙ্গারদ্রব্য 'দাপন', 'অদশ' (আরশি), কাপুর (কর্পূর),'তাঁবোলা' (তামুল)। অলঙ্কারদ্রব্য 'কানেট' (কর্ণভূষণ), ঘন্টা-নেউর (নূপুর), কাঞ্চণ (কাঁকন), মুত্তিহার (মুক্তাহার), কুন্ডল। বাদ্যভান্ড ও বাদ্যযন্ত্র - পড়হ (পটহ), মাদলা (মাদল), করন্ড (ঢোল?), কশালা (কাঁসি), ডমরু, ডমরুলি (ছোট ডমরু), বীণা, বাঁশি। অস্ত্রশস্ত্রাদিঅন্যান্য জিনিসপত্র - কুঠার, টাঙ্গি, কোঞ্চাতাল (তালাচাবি), পিন্ডি, পিহাড়ি **(পিঁড়ি)**, ইত্যাদি।।

চর্যার কাব্যমূল্য

চর্যাপদকর্তারা ধর্মীয় চেতনার বশে পদরচনা করেছিলেন। সহজযানপন্থী সাধকদের মহাসুখলাভের কথা চর্যাপদগুলির মূলকথা। তবে তাঁরা সাধারণ মানবজীবনের সুখ-দুঃখের কথাগুলিকে রূপক হিসাবে গ্রহণ করেছেন - সাধারণ মানুষের ভাষাকেও কাব্যে রূপ দিয়েছেন। চর্যাগানগুলি আকারে প্রকারে মধ্যযুগের পদাবলীর মত। মধ্যযুগের পদাবলীর অগ্রদূত হিসাবে এগুলি গণ্য। চর্যাপদকর্তাদের অনেকের মধ্যেই কবিত্বশক্তি ছিল। রূপক প্রতীকের সাহায্যে, চিত্রসৃষ্টি, আখ্যানের ইঙ্গিতদান, সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলনপূর্ণ মানবজীবন ও মানবচরিত্রের বৈচিত্রের প্রকাশ চর্যার দর্শন ও তত্ত্বের নিষ্প্রাণতাকে কাব্যরসের স্পর্শ সজীব করেছে। সাধক-কবিদের ধর্মীয় উপলব্ধি হয়ে উঠেছে গীতকবির স উপলব্ধি। বিশেষ সুরে ও তালে গেয় হওয়ায় এবং রাগ-রাগিনীর উল্লেখে তা গান এবং সুর ও তাল নিরপেক্ষ পাঠে পাঠকের কাছে তা গীতিকবিতা।

তত্ত্বাশ্রয়ী ও রূপকাশ্রয়ী দুই ধরনের কবিতা আছে চর্যা সংগ্রহে। তবে কাব্যমূল্যের নিরিখে তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতাগুলিই বেশ মূল্যবান। তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতায় সাধকের উপলব্ধির বিবরণ যেখানে মন্ময় উপলব্ধি কবির অনুভূতির প্রকাশ হতে পেরেছে সেখানে সার্থক গীতি কবিতায় উন্নীত হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রকৃতি তার মাটি, জল, গাছপালা, মাঠ, খরস্রোতা নদী, কাদামাখা তীর, পাহাড়ের টিলা, অরণ্য ও অরণ্যের জীবজন্তু, মানবসংসার সবকিছুই রসমন্ডিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে চর্যাপদাবলিতে। চিত্রকল্পসৃষ্টিতে, মন্ডণকলায়, ছন্দের বৈচিত্র্যে, অলঙ্কারের ছটায়, শব্দব্যবহারে চর্যাপদকর্তারা অসামান্য কবিত্বশকিক্তর পরিচয় দিয়েছেন।

মহাসুখলাভের পদ্ধতি এবং বিভিন্ন স্তরের অনুভূতির কথা বলতে গিয়ে সাধক কবিরা কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছেন। সুখাভিপ্রায়ীদের কাছে তা মূল্যবান হলেও ধর্মনিরপেক্ষ পাঠকের কাছেও তা কম আনন্দের নয়। যেমন ২নং এবং ৩নং পদের কাহিনি। কাহিনিমূলক গীতিকবিতা মধ্যযুগের একটি বিশিষ্ট সাহিত্য-সম্পদ। তার অগ্রদূত হিসাবে আমরা কবিতাদুটিকে গ্রহণ করতে পারি। প্রথম কবিতাটিতে বধূর আচার-আচরণে এবং চঞ্চলতায় - তার রাত্রি জাগরণের ঘটনায় নারী চরিত্রের একটি বিশেষ দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। পরকীয়া প্রেমের যেসব কাহিনী পরবর্তী সাহিত্যে আমরা পাই তার অগ্রদূত হিসাবে কবিতাটিকে গ্রহণ করতে পারি। দ্বিতীয় কবিতাটি নাটকীয়তার গুণে সমৃদ্ধ। চৌষট্টি ঘড়ার মদের বর্ণনা এবং মদ্যপায়ীদের বিচিত্র আচরণ সাহিত্য-সম্পদে সমৃদ্ধ।

রূপক ও প্রতীকের সাহায্যে চিত্রসৃষ্টি কবিদের আর একটি গুণ। এই ধরণের একটি সুন্দর চিত্র আছে ৬নং পদে। কখন যে ব্যাধের শর এসে গায়ে বেঁধে এই ভয়ে হরিণ ঘাস ছোয় না, জলপান করে না। হরিণ-হরিণীতে কাছ ছাড়াছাড়ি কেউ কারো সন্ধান পায় না। হরিণী একদিন হরিণকে দেখতে পেয়ে বলল সে যেন বন ছেড়ে পালায়। এই কথা শুনে তীরের মত ছুটল হরিণ - তার খুরটুকুও দেখা গেল না। তাত্ত্বিকের কাছে

এর মূল্য যাইহোক না করে কবিতার পাঠক এর মধ্য থেকে রোমান্টিক কবিতার রস আস্বাদন করে। বৈষ্ণবপদাবলির রাসলীলার পদে এক চোখে কাজল লাগিয়ে কৃষ্ণের বাঁশি শুনে দিগবিদিগশূন্য রাধার ছুটে চলা বা আগমনী গানে উমার আগমন বার্তা শুনে উদ্বেলিত হৃদয়ে মা মেনকার ছুটে চলার দৃশ্যের চেয়ে হরিণের ছুটে চলার এই দৃশ্যটি কম উপভোগ্য নয়।

৮ নং পদে আছে সোনা ভর্তি নৌকাকে বেয়ে নিয়ে যাওয়ার চিত্র। সেখানে রূপা রাখার জায়গা ছিল না। প্রায় হাজার বছর পরের রোমান্টিক কবি নৌকাতে জায়গা পান নি তাঁর সোনার ধানেই ভর্তি হয়েছে তা।

প্রেম চিরকালই সর্বদেশের কবিকুলের প্রিয় বিষয়। চর্যাগীতি সংগ্রহের ১০ নং পদের বিষয়বস্তু হল প্রেম। এক কাপালিক যোগী এক ডোম্বীর সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত। নৈরাত্মার সঙ্গে সাধকের মিলনে মহাসুখলাভের যে তত্ত্বই তার মধ্যে থাক না কেন মিলনের জন্য প্রেমিকের তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে তাকে মারতে যাওয়া মানবজীবনের প্রেমেরই একটা বিশেষ রূপ যা কবিত্বে মন্ডিত হয়েছে। ২৮নং পদেও আছে শবর-শবরীর মিলনের কবিত্বমন্ডিত রূপ। এটি উচ্চমানের মানবীয় সম্ভোগের কবিতা।

২১ নং পদে চঞ্চল মূষিকের আচার সম্বন্ধে যেসব কথা বলা হয়েছে সেগুলির অংশ বিশেষকে বস্তুধর্মী খন্ডকবিতা বলা যেতে পারে। এটি মূলত তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতা। হাজার বছর পর ইঁদুর আবার এসেছে বিমল করের, সোমেন চন্দের, সমরেশ বসুর গল্পে - প্রতীক হিসেবে, তবে ধর্মতত্ত্বের নয়, লেখকের সমাজবীক্ষায় মধ্যবিত্ত জীবনের।

সরাসরি তত্ত্বকথা যেখানে বলা হয়েছে সেখানে কাব্যমূল্য কম। তবে ১নং পদে কায়াকে বৃক্ষকে রূপকে গ্রহণ করার জন্য এবং ২৯ নং পদে চাঁদের প্রতিবিম্বের ছবি থাকায় (উপমা হিসাবে) কাব্য চমৎকারিত্বের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রহেলিকা কবিতা ধাঁধার মধ্যেও কাব্য চমৎকারিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। লোকসাহিত্যে ধাঁধার এক বিশেষ মর্যাদা আছে। দরিদ্রের গৃহস্থালির বিবরণের বিষয়টিও সাহিত্য গুণান্বিত (৩৩নং চর্যা)।

চর্যার ভাষা-লক্ষণ

আমরা জেনেছি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিস্তারকাল খ্রিস্টীয় ৯০০ থেকে ১২০০ অব্দ। বাংলা ভাষার প্রাচীন যুগের নিদর্শন পাওয়া যায় চর্যাগীতিগুলিতে। এগুলির ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেন ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। পরের যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরা হলে সুকুমার সেন, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, পরেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ।

মাগধী প্রাকৃতের পরবর্তী স্বরূপ মাগধী অপভ্রংশের খোলস ছেড়ে নব্যভারতীয় আর্যভাষা হিসাবে বাংলার জন্ম হল। তার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা যেতে পারে।

(১) ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

(ক) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বিষম ব্যঞ্জনের মিলনে গঠিত যুক্ত ব্যঞ্জনগুলি মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় সমীভূত হয়ে সমব্যঞ্জনে গঠিত যুগ্মব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছিল।

টিপ্পনী

প্রাচীন বাংলায় এই যুগ্মব্যঞ্জনের মধ্যে একটি লুপ্ত হল এবং তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি দীর্ঘ হল। যেমন প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার 'পর্বত' মধ্যভারতীয় আর্য ভাষায় হয়েছিল 'পর্ব্বত'। চর্যাপদে অর্থাৎ নব্যভারতীয় আর্যভাষায় তথা প্রাচীন বাংলায় আমরা পাচ্ছি 'পাবত'।

(খ) নাসিকা ব্যঞ্জন লোপ পেল এবং তার ফলে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি অনুনাসিক হয়ে গেল। যেমন বেগেন>বেগেঁ।

(গ) পাশাপাশি অবস্থিত একাধিক স্বরধ্বনি বজায় আছে চর্যার ভাষায় বা প্রাচীন বাংলায়। মধ্য বাংলায় এদুটি মিলে একটি স্তরে পরিণত হবে। যেমন ভণতি>ভনই। (মধ্য বাংলায় 'ভণে')

টিপ্পনী

(ঘ) পাশাপাশি অবস্থিত দুই স্বরধ্বনির মাঝখানে শ্রুতিধ্বনি আসত। যেমন - নিকটে>নিঅড্ডী>নিয়ড্ডী

(ঙ) স্বরমধ্যবর্তী একক মহাপ্রাণ ধ্বনি হ-কারে পরিণত হয়েছে। যেমন- মহাসুখ>মহাসুহ

(চ) 'শ' স্থানে 'স' ব্যবহার। যেমন - আশা>আস।

(২) রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

(ক) কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি ব্যবহার। যেমন - চঞ্চল চীত্র পইঠো কাল। কখনো কখনো কর্তায় 'এ' বিভক্তি। যেমন রূক্ষের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ।

(খ) প্রাচীন বাংলা থেকেই গৌণকর্ম ও সম্প্রদান কারকের রূপ একই রকম হতে থাকে। দুই কারকেই শূন্য বিভক্তি 'ক' বিভক্তির প্রয়োগ হতে থাকে। যেমন - লুই ভণই গুরু পুছিঅ জান। (এখানে 'গুরু'তে শূন্য বিভক্তি)। 'মতিএঁ' ঠাকুরক পরিণিবিত্তা। (এখানে 'ঠাকুরক'তে 'ক' বিভক্তি। কোহো কোহো তোহোরে বিরূআ বোলই। (এখানে 'তোহোরে'তে 'রে' বিভক্তি। অর্থ 'তোকে')

(গ) করণ কারকের বহু প্রচলিত বিভক্তি - এঁ (<এন)। যেমন - মতি এঁ ঠাকুরক পরিনিবিত্তা (মতি এঁ - এঁ বিভক্তি) করণ ও অধিকরণ দুই ক্ষেত্রেই এঁ বিভক্তি। অধিকরণ ঘরেঁ (এঁ বিভক্তি)।

(ঘ) অধিকরণে আরত্ত বিভক্তি ছিল। সেগুলি হল - ই, এ, হি, তেঁ, ত।

যেমন - নিঅড়ি, চীত্র, কাহি, সুখদুখেতেঁ, হাঁড়িত

(ঙ) সমৃন্ধ পদের বিভক্তি - 'এর', 'র', 'ক'। যেমন - 'রূক্ষের' (গাছের),'মোহোর' (আমাদের) ছান্দক (ছন্দের)

(চ) অপাদানের বিভক্তি - 'হুঁ'। যেমন - 'রতনহুঁ' (রত্নাৎ - রত্ন থেকে)।

(ছ) ক্রিয়া রূপে বর্তমানকালের বিভক্তি ছিল উত্তম পুরুষে 'মি', হুঁ, মধ্যম পুরুষে 'অ' ও প্রথম পুরুষে 'ই'। যেমন - 'পুছমি', 'লেহুঁ' (উত্তমপুরুষ),'জাণ' (মধ্যমপুরুষ),'ভণই' (প্রথম পুরুষ)

(জ) ধাতুর সঙ্গে 'ল', 'ইল' যোগ করে সাধারণ অতীতকালের ক্রিয়ারূপ গঠন করা হত।

যেমন - গম্ + ল = গেল, ভূ + ইল = ভইল + ঈ(স্ত্রী) = ভইলী

এছাড়া চধংঃ চধৎঃরপরঢ়ষব বা নিষ্ঠান্ত পদ দিয়েও অতীতকালের ক্রিয়ারূপ গঠন করা হত।

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

যেমন - গউ (গম্ + ক্ত = গত > গঅ > গউ)

(ঝ) ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়ারূপ গঠিত হত 'ইব' যোগ করে। যেমন - ভাইব (ভাববো)। চর্যাপদে এমন কিছু কিছু বিশিষ্ট প্রয়োগ আছে যা বাংলা ছাড়া অন্য নব্য ভারতীয় আর্য ভাষায় পাওয়া যায় না। যেমন - গুনিয়া লেহুঁ (গুণে নিই), 'দুহিল দুধু' (দোয়া

দুধ) ইত্যাদি। বাকভঙ্গি ও শব্দযোজনের ক্ষেত্রে মধ্যবাংলার সঙ্গে এর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। শৌরসেনী প্রাকৃত থেকে জাত নব্যভারতীয় আর্যভাষায় অন্তর্গত হিন্দির সঙ্গেও চর্যার ভাষার ক্ষেত্র বিশেষে মিল আছে। তবে বাংলার সঙ্গে যোগই বেশি। দু চারটি ওড়িয়া মৈথিল শব্দও এর মধ্যে আছে। কিন্তু এর ভাষা বাংলা।

১. ১৫. ০৭ চর্যাগানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

টিপ্পনী

বাংলা ভাযা-সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদের গুরুত্ব অপরিসীম। চর্যাপদবাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। সেজন্য বাংলা ভাষার প্রাচীন রূপ কেমন ছিল তা জানবার ক্ষেত্রে চর্যাপদ অপরিহার্য হয়ে ওঠে। বস্তুত, চর্যাপদ আবিষ্কারের ফলে বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া সম্ভব হয়েছে। অনেক বাংলা শব্দের বিবর্তনের পথটিকেও চিনে নেবার জন্য চর্যাপদের শরণাপন্ন হতে হয়। সুতরাং বাংলা ভাষা-সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে চর্যাপদ অত্যন্ত মূল্যবান। আবার চর্যার পুথি যেহেতু প্রাচীন বাংলা ও নেপালি অক্ষরে লেখা, সেজন্য বাংলা লিপির বিবর্তনের ইতিহাসেও চর্যাপদগুরুত্বপূর্ণ। আবার চর্যার পদগুলি বাংলা ভাষার মতো বাংলা সাহিত্যেরও প্রাচীনতম নিদর্শন। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের বিবর্তন জানার জন্য চর্যাপদের গুরুত্বকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। বাংলা কবিতার ছন্দের ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গেলে চর্যাপদ অপরিহার্য। ছান্দসিকের বাংলা ছন্দের গঠনে চর্যাপদের ছন্দের প্রভাবকে স্বীকার করেন। চর্যার পাদাকুলক রীতি থেকে পরবর্তী পয়ার ছন্দরূপের জন্ম। বাংলা কবিতায় যে অন্ত্যমিল পাওয়া যায়, সেই অন্ত্যমিলেরও উৎস বলা যায় চর্যাপদকে। চর্যায় উল্লিখিত রাগ-রাগিণী বাংলা সংগীত রচনার ইতিহাসেও প্রভাব বিস্তার করেছে। সুতরাং বাঙালির সংগীত সাধনার বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য অনুসন্ধানেও চর্যার রাগ-

রাগিণীর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। চর্যাপদেব্যবহৃত কিছু প্রবাদ ও রূপকল্প পরবর্তীকালের বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে। প্রাচীন বাংলার সামাজিক ইতিহাসচর্চায়, বিশেষত লৌকিক জীবনের পরিচয় পাওয়ার জন্য চর্যাপদের দ্বারস্থ হতে হয়, কারণ সে সময়ে বাংলার সমাজ ও জীবনযাত্রার বহু খুঁটিনাটি পরিচয় ছড়িয়ে আছে চর্যাপদে। হাজার বছর আগেকার ধর্মীয় ইতিহাস জানতে গেলেও চর্যাপদের শরণাপন্ন হতে হয়।

১. ১৫. ০৮ অনুবর্তন

যে ধর্মীয় ও সামাজিক পরিবেশের আনুকূল্যে চর্যাগীতিসমূহের সৃষ্টি সেই পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চর্যাগীত রচনার ধারা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এসেছিল, তবে এই ধারা একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি। বাংলাদেশে তুর্কী আক্রমণের পর ধর্মীয় উপপল্লব দেখা দিলে ধর্মচর্চার সঙ্গে এই জাতীয় ধর্মসঙ্গীত রচনার ধারাও এ দেশে ক্রমে লুপ্ত হয়ে এসেছিল, কিন্তু নেপাল ও তিব্বতের বৌদ্ধমঠে এই ধর্মচর্চা অক্ষুণ্ন ছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে চর্যাগীতি রচনার ধারাও অব্যাহত ছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কারের পর রাহুল সাংকৃত্যায়ন প্রমুখ গবেষকগণ নেপাল ও তিব্বত থেকে আরও কিছু চর্যাগীত আবিষ্কার করেছেন। নবাবিষ্কৃত চর্যার ভাষা থেকেই এগুলির অর্বাচীনত্ব প্রতিপন্ন হয়, কিন্তু কালগত নবীনত্বের বিষয়বস্তু ও রচনারীতির বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটেনি, রূপ ও রূপকের দিক থেকে এই নতুন গানগুলি পুরাতন গানগুলিরই অভ্রান্ত অনুবর্তন। যেমন, 'বিনয়শ্রী'-ভণিতাযুক্ত একটি অর্বাচীন চর্যাঃ

মেহলি চন্ডালী ঘরবি বাহ্মণ
জগ বিটালন্তি তে দুই লাম্বন।

হল সহি কামঞ্চি (কা মঞ্জি?) অচাভুঅ দিঠা
ব্রাহ্মণ মনুস চন্ডালিএঁ তুট্ঠা।
অইসি নিরাজ কমাল ণ দিশই
মাউগ চন্ডালী বাহ্মণে পইসই।
দেখু চন্ডালীর বাহ্মণ জার
পাঞ্চ বান্ন ভইল্লা একাকার।
তে দুই নাসন্তি সম সাঁজোএ
ভণই বিনয়শ্রী সদগুরুন্ন বোহেঁ।।
(ডঃ সুকুমার সেন - বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,
প্রথম খন্ড পূর্বার্ধ, পৃঃ ৫৩ থেকে পুনরুদ্ধৃত)

"মহিলা (গৃহিণী) চন্ডাল, গৃহপতি ব্রাহ্মণ। তারা দুইজন (পরস্পর) অবলম্বন করে জগৎকে অশুদ্ধ করেছে। ওলো সই, আমি কি অত্যদ্ভুত (বিষয়) দেখলাম। ব্রাহ্মণ মানুষ চন্ডালীতে তুষ্ট। এমন অরাজক ব্যাপার দেখা যায় না। চন্ডালী স্ত্রীলোক ব্রাহ্মণে প্রবেশ করেছে। দেখুক (বা 'দেখ') চন্ডালীর ব্রাহ্মণ জার, পঞ্চবর্ণ একাকার হল। তারা দুইজন সমসংযোগে নাশ হয়। সদগুরুন্নর উপদেশে বিনয়শ্রী বলে"। রূপ, রূপক ও স্বরূপের দিক থেকে প্রাচীন চর্যাগীতগুলির সঙ্গে এর তেমন কোনো তফাৎ দেখা যায় না। উদ্ধৃত চর্যাটিতে "কাহ্নের দুইটি চর্যাগীতির (১০,১৮) প্রতিধ্বনি শোনা যায়" (ডঃ সুকুমার সেন, তদেব পৃঃ ৭৩)

রাহুল সাংকৃত্যায়নের পর অধ্যাপক আর্নল্ড বাকে ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে নেপালে গিয়ে এক নেপালী সন্ন্যাসীর কাছ থেকে বাইশটি গান সংগ্রহ করেন। অধ্যাপক বাকের সূত্র ধরে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত কয়েক বছর পর (১৯৬৩) নেপালে ও সন্নিহিত অঞ্চল থেকে আরও কতকগুলি সমজাতীয় গান সংগ্রহ করেন। "তাঁহার সংগৃহীত চর্যাগীতিকার মোট সংখ্যা দাঁড়াইল আঠানব্বই। প্রাপ্ত গানগুলিতে তিনি দেখিলেন যে, ব্রজবারাহী, বাশুলী প্রভৃতি দেবদেবীরও উল্লেখ রহিয়াছে। তাঁহার অনুমান, পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে যে শাক্ত সাহিত্যের বিকাশ হয়, তাহার পূর্বসূচনা এই ব্রজগীতিকাগুলিতে পাওয়া যাইবে। নেপালের সাধুসন্ত ও বৌদ্ধসমাজে এগুলি সাধারণতঃ 'চা-চা' গান নামে পরিচিত। ডঃ দাশগুপ্তের মতে এটি বোধহয় 'চর্যা'র অপভ্রংশ। তিনি এই পদগুলিকে ভাষাতাত্ত্বিক ও সাধন সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্য ধরিয়া তিনভাহে সাজাইলেন। তাঁহার অনুমান ইহার উনিশটি পদ দশম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে, চুয়াল্লিশটি পদ ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকের মধ্যে এবং অবশিষ্ট পঁয়ত্রিশটি পদ পঞ্চদশ ও তাহার পরবর্তীকালে রচিত" ('চর্যাগীতিকার নবাবিষ্কৃত উপাদানঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত সংগৃহীত' - বাংলা সাহিত্য পত্রিকা পৃ. ৯, প্রথম বর্ষ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মার্চ ১৯৬৯)। আচার্য শশিভূষণের এই সংগ্রহ ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্য সম্পাদনায় 'নব চর্যাপদ' নামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে (১৯৮৯)। এই সংগ্রহ থেকে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের মধ্যে রচিত বলে অনুমিত একটি গান এখানে নমুনাস্বরূপ উদ্ধার করা গেলঃ

রাগ-রামকরী। তাল - জটি
উর্ধ্ব রক্ত পিঙ্গল কেশা।
নাচই হেরুন্নই উন্মত্ত বেশা।। ধ্রু।।
হেরুন্নও হেরুন্নও দে মোরুন্ন কোলা।
ডোম্বি চন্ডালি লইআ ন ভোলা।।
বামে ডোম্বি দহিনে চন্ডালি।
মাঝে বিলাসই হেরুন্নও বালী।।

টিপ্পনী

স্ব-অধ্যায় সামগ্রী

দহিনে ডমরুরু বামে খট্টাঙ্গ।
অষ্টজোইনি মোর হেরুন্নঅ সঙ্গ।।
গাবন্তি কর্ণ পা হেরুন্নও দাসা।
কায় বাক চিত্ত হেরুন্নও নিরাসা।।

চর্যাগীতির ধরা বাংলা দেশে লুপ্ত হলেও তার ঐতিহাসিক প্রবর্তনা বাংলা সাহিত্যে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়নি। চর্যা-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যেরও মূল ভিত্তি ছিল ধর্ম, এই সব ভিত্তিস্থানীয় ধর্মসাধনার সঙ্গে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের সাক্ষাৎ সম্পর্ক না থাকলেও কোন কোন ক্ষেত্রে অগোচর সংযোগ ছিল। চর্যাসাধকদের ধর্মাচরণের রীতিবৈচিত্র্য অবিকল অনুসত না হলেও তাঁদের ধর্মসাধনার মূল সহজিয়া তান্ত্রিক প্রকৃতিটি পরবর্তী বাংলাদেশের নাথ সম্প্রদায়, বৈষ্ণবধর্মের সহজিয়া শাখায় এবং বাউল-কর্তাভজা সম্প্রদায়ের ধর্মভাবুকতায় গৃহীত হয়েছিল। নাথ সম্প্রদায়ের সাধকেরা অবশ্য চর্যাকারদের মত ক্ষুদ্রাকৃতি গান রচনা করেন নি, তাঁরা আখ্যান-নির্ভর বড় কাহিনীকাব্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু সাধনা ও সাধনপদ্ধতির দিক থেকে চর্যাসাধক ও নাথসাধকদের মধ্যে মিল ও সংযোগ থাকায় নামথপন্থীদের রচনায় রূপক-কল্পনা ও উৎপ্রেক্ষা ব্যবহারে চর্যাকবিদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। চর্যাকবিদের চন্দ্রসূর্য, গঙ্গাযমুনা, দেহনৌকা-মনকেডুয়ালের উপমা নাথপন্থীদের রচনাতেও বহুল পরিমাণে দেখা যায়। যেমন,

১। এদেশিয়া হাড়ী নয় বঙ্গদেশে ঘর।
চান্দ্রসুরুজ রাখেছে দুই কানের কুন্ডল।।
(গোপীচন্দ্রের গান, ক. বি. পৃ. ১)

২। যমরাজা হয় যার নিজের চাকর।
চন্দ্রসূর্য দুইজন কুন্ডল কানের।।
(গোপীচন্দ্রর সন্ন্যাস, ক. বি. পৃ. ৪৪০ - ৪৪১)

নাথপন্থীদের অপর কাব্য 'গোরক্ষ বিজয়ে' ও চর্যার অনুরূপ রূপক-কল্পনা ও প্রহেলিকা ব্যবহারের রীতি লক্ষ্য করা যায়ঃ

১। ইড়া পিঙ্গলা দুই নদীর যে মাঝে।
দশমীতে তালি দিয়া রহিবা সহজে।। (পৃঃ ১৪৪)

২। ডুবিল তোমার নৌকা কাছি গেল ছিঁড়ি।
তোমার সকল ভরা করিলেক চুরি।। (পৃঃ ১০৭)

৩। নগরে মনুষ্য নাহি ঘরে ঘরে চাল।
আন্ধলে দোকান দিয়া খরিদ করে কাল।। (পৃ. ১৩৮)

৪। মৎস্যের প্রহরী তুমি রাখিয়াছ উদ।
বিড়াল প্রহরী দিলা ঘন আউটা দুধ।।
(তুলনীয়ঃ চর্যাঃ ৩৩)

১. নব চর্যাপদ সম্পর্কে বিশদ অবগতির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত 'নব-চর্যাপদ' গ্রন্থটির অন্তর্গত (পৃ. ২২-৯৭) অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদারের 'নব চর্যাপদ ও ভাষাপ্রসঙ্গ'- শীর্ষক নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপক অঞ্চলে যে ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচলিত আছে, সেই ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচলিত আছে, সেই ধর্মঠাকুরের পরিকল্পনা বাংলাদেশে ক্ষীয়মাণ বৌদ্ধ ধর্ম-বিশ্বাসের লৌকিক সংযোগ ছিল, তাই ধর্মমঙ্গলে, ধর্মঠাকুরের গানের ছড়ায় এবং ধর্ম-পূজা সংশিস্নষ্ট শূন্যপুরাণেও চর্যাগীতির রূপক ও ভগ্নাংশ রক্ষিত হতে দেখা যায়। যেমন,

১। মন বৈল নৌকা পবন কেরআল।

টিপ্পনী

সুনার নৌকা রূপার কেরআল।।

(শূন্য পুরাণ, চারম্ন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত পৃ ১০৫)

২। মন কর নৌকা পবন কেরআল।

আপুনি তো নিরঞ্জন হোইলা কান্ডার।।

(তদ্দেব, পৃ ২০৯)

৩। বখুর পাড়েতে সদ্দ-ডোমের কুড়িয়া।

ঘন ঘন আইসে যায় ব্রাহ্মণ বড়ুয়া।।

(ধর্মপূজাপদ্ধতি - তু. চর্যা ১০)।

টিপ্পনী

নাথপন্থী সাধকদ্দের রচনায় চর্যাগীতির অনুরূপ যোগনির্ভর সাধনতত্ত্ব ও রূপক-কল্পনা প্রাধান্য পেলেও চর্যাগানের সাঙ্গীতিক রূপটি সেখানে অনুসৃত হয়নি। সাধনতত্ত্বের গূঢ়তা ও সহজিয়া প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে সাঙ্গীতিক প্রকৃতি অনুসৃত হয়েছে বৈষ্ণব রাগানুগা সাধনার রাগাত্মিক পদ্দাবলীতে এবং তারপর অষ্টাদ্দশ শতাব্দীর কর্তাভজাবাউল সম্প্রদ্দায়েপ সাধনসঙ্গীতে। চৈতন্যদ্দেবের তিরোধানের পর বাংলা দ্দেশের বৈষ্ণব ধর্মসাধনায় নানা শাখাবিস্তার ঘটে এবং সেই সূত্রে লৌকিক তন্ত্রাচারও বৈষ্ণবধর্মের কোন কোন শাখার অঙ্গীভূত হয়। এই বৈষ্ণব সাহিত্যেও পূর্বতন তন্ত্রনির্ভর সাহিত্যের রূপ ও রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়, বৈষ্ণব কবিদ্দের রাগাত্মিক পদ্দাবলীতে রূপক ব্যবহার, সন্ধ্যাবচনের প্রয়োগ ও প্রহেলিকা বিলাসে ঠিক চর্যাগীতির ঐতিহ্যই অনুসৃত হয়েছেঃ

১। গোপন পিরীত গোপনে রাখিবি

সাধিবি মনের কাজ।

সাপের মুখেতে ভেকেবে নাচাবি

তবে ত রসিককাজ।।

যে জন চতুর সুমেরম্ন-শিখর

সূতায় গাঁথিতে পারে।

মাকসার জালে মাতঙ্গ বাঁধিলে

এ রস মিলয়ে তারে।।

২। ফলের উপরে ফুলের বসতি

তাহার উপরে গন্ধ

গন্ধ উপরে এ তিন আখর

এ বড় বুঝিতে ধন্ধ।।

৩। হরিণ দ্দেখিয়া বেয়াধ পলায়

কমল গেল সে ভৃঙ্গ।

যমের ভিতরে আলসের বসতি

রাহুতে গিলিল চন্দ্র।।

সুমেরম্ন উপরে ভ্রমর পসিল

এ কথা বুঝিল কে।

চন্ডীদ্দাস কহে রসিক হইলে

বুঝিতে পারিবে সে।।

বৈষ্ণব সহজিয়াদের কাছে যা 'গোপন পীরিতি', বাউলদের কাছে তা-ই মনের মানুষের সন্ধান দেখা গিয়েছে। অবশ্য নানাদিক থেকেই সহজিয়া বৈষ্ণব ও চর্যাসাধকদের সঙ্গে বাউল সম্প্রদায়ের যথেষ্ট প্রভেদ থাকা সম্ভব। কিন্তু সাধনা, সাধনতত্ত্ব, তত্ত্বপ্রকাশের রূপকভঙ্গী এবং গুরুবাদ - এই সব লক্ষণের দিক থেকে পূর্বগামী সহজিয়া বৈষ্ণব এবং বিশেষত চর্যাসাধকদের সঙ্গে বাউল সাধকদের আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এই সাদৃশ্য একেবারে আকস্মিক না-ও হতে পারে, চর্যাসাধকদের দেহাশ্রয়ী যোগসাধনার ঐতিহ্য পরবর্তীকালে উত্তরাপথে প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, বাউলদের সাধনা হয়ত তারই একটা কালোপযোগী অভিব্যক্তি। তাই বাউলের গানে চর্যাগীতির মতই দেহতত্ত্বের প্রাধান্য, সন্ধ্যাভাষার আলো-আঁধারি প্রচ্ছন্নতা এবং অর্থগূঢ় প্রহেলিকা-বিলাস লক্ষ্য করা যায়। চর্যাগানের মতই জীবনের সহজ, ঘরোয়া ও লৌকিক উপকরণ থেকে তত্ত্বের উপমান সংগৃহীতঃ

টিপ্পনী

১। কুলের বৌ হয়ে মন আর কত দিন থাকবি ঘরে।
ঘোমটা খুলে চলনা রে যাই সাধবাজারে।।
কুলের ভয়ে কাজ হারাবি, কুল কি নিবি সঙ্গে করে।
(লালন-গীতিকা)

২। ওরে আমার মন-গোয়াল।
দুবেলা তুই দুধ যোগাবি একথাটি আটা আটি।
দুধ তুই আমারে দিবি।
ঘরে আছে ধর্ম-গাভী তাহার দুধ লইয়া লবি। (হারামণি)

৩। খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কেমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মনবেড়ী দিতাম তাহার পায়।।
আঠ কুঠুরী নয় দরজা আঁটা,
মধ্যে মধ্যে ঝলক কাঁটা,
তার উপর আছে সদর-কোটা
আয়না মহল তায়।।
(লালন-গীতিকা)

৪। চিনায়ে দে গুরু ধন, চিনায়ে দে।
জলের তলে তালের গাছটি, তারি তলে চিতে
মায়ে পুতে যায় সহমরণে দাঁড়িয়ে দেখে পিতে।
(হারামণি)

কিন্তু চর্যাগীতির ভাগবত উত্তরাধিকার বাউলগানের মধ্যেই নিঃশেষিত হয় নি। বাউল গানের মধ্য দিয়ে তার ধারা আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রবেশ করেছে। রবীন্দ্রসাহিত্য এই প্রাচীন অধ্যাত্মসাহিত্য ও আধুনিক ব্যক্তিচেতন সাহিত্যের মধ্যে যোগসূত্রবিশেষ। রবীন্দ্র-সাহিত্যে যে একধরনের সহজ ও প্রসন্ন অধ্যাত্মভাবুকতা লক্ষ্য করা যায় তার সঙ্গে বাউল সম্প্রদায়ের সহজ অধ্যাত্মভাবুকতার অদ্ভুত মিল আছে। এই সাদৃশ্য একেবারে আকস্মিক নয়। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মভাবনার একদিকে যেমন উপনিষদের অধ্যয়নগত প্রভাব প্রবল অন্যদিকে তেমনি বাউল গায়কদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগের প্রভাবও কম নয়। কবি নিজেই একজায়গায় স্বীকার করেছেন "শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউলদের সঙ্গে আমার সদা-সর্বদাই দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হত। আমার অনেক গানে আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গান অন্য রাগিনীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত-বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিল ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী আমার মনের মধ্যে সহজভাবে বিঁধে গেছে" ভূমিকাঃ হারামণি ১ম খন্ড)। 'বাউলের সুর ও

বাণী' রবীন্দ্রনাথের মনে 'সহজভাবে বিঁধে গেছে' বলেই তাঁর প্রায় প্রতিটি প্রধান নাটকেই বাউল জাতীয় চরিত্রের আবির্ভাব এবং গানেও সেই একই সুরের অনুসরণঃ

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে,
তাই হেরি তায় সকল খানে।।
আছে সে নয়নতারায় আলোক ধারায়, তাই না হারায়
তাই দেখি তায় যেথায় সেথায়
তাকাই আমি যেদিক পানে।

টিপ্পনী

প্রকৃতপক্ষে উপনিষদে ব্রহ্মচিন্তা ও বাউলদের মনের মানুষ সন্ধানের গোষ্ঠীগত মানসিক প্রয়াস রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত অধ্যাত্মচেতনার আধারে সুষ্ঠু সমন্বয় লাভ করেছিল। এই সমন্বিত অধ্যাত্মপলব্ধির সঙ্গে এদেশের প্রাচীনতর সাধনার কোন পদ্ধতিগত সম্পর্ক নেই, তবে মূলগত অনুভূতির দিক থেকে নিগূঢ় সারূপ্য ও সাযুজ্য বিদ্যমান। সুতরাং রাবীন্দ্রিক অধ্যাত্মভাবনাকে এদেশের প্রাচীন অধ্যাত্মভাবনার আধুনিকতর অভিব্যক্তি বললে ভুল করা হয় না এবং সেদিক তেকে চর্যাগীতির মর্ম-সত্যও সেখানে একেবারে অনুপস্থিত নয়।

শুধু ভাবের দিক থেকেই নয়, রূপের (form) দিক থেকেও পরবর্তী সাহিত্যের সঙ্গে চর্যাগীতের পরোক্ষ সংযোগ লক্ষ্য করা যায়। কয়েকটি চরণের সমন্বয়ে একটি ভণিতা-যুক্ত যে কাব্যরূপ চর্যাগীতে পাওয়া যায় পরবর্তীকালের বৈষ্ণব ও শাক্তপদাবলীতে তারই অনুবর্তন ঘটেছে। শুধু তাই নয়, বাংলা সাহিত্যের মূল সুর যে গীতলতা বা ষুৎরপরংস তারও সূচনা এই চর্যাগীতগুলিতে। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে চর্যাগীতি এক মহৎ ঐতিহ্য, পরবর্তী সাহিত্য সেই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারকেই নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে আধুনিক কাল পর্যন্ত বহন করে এনেছে।।

গ্রন্থ পরিচিতি

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খন্ড– সুকুমার সেন, আনন্দ সংস্করণ জানুয়ারী। ১৯৯১

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খন্ড –অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মর্ডান বুক এজেন্সী, কলকাতা

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খন্ড –অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মর্ডান বুক এজেন্সী, তৃতীয় সংস্করণ

৪। বাংলা সাহিত্যের কথা– প্রথম মাওলা ব্রাদার্স সংস্করণ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

৫। বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস – চতুর্থ সংস্করণ, ভূদেব চৌধুরী

৬। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা – প্রথম পর্যায়, পঞ্চম সংস্করণ, ভূদেব চৌধুরী

৭। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা – প্রথম খন্ড, গোপাল হালদার

৮। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস – ক্ষেত্র গুপ্ত, প্রথম সংস্করণ, গ্রন্থনিলয়।

৯। বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, আহমদ শরীফ, বর্ণ মিছিল, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৭৮

দ্বিতীয় একক

ত্রয়োদশ থেকে চতর্দ শ শতাব্দী

উদ্দেশ্য

ত্রয়োদশ শতকের বাংলা ঃ বিদেশি আক্রমণ ঃ রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি

ত্রয়োদশ শতকের বাংলা সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায় না কেন?

এই কাল পর্বকে অন্ধকার যুগ বলা কি সমীচীন?

চতুর্দশ শতকের বাংলা ঃ রাজনৈতিক-সামাজিক পরিস্থিতি

চতুর্দশ শতকের বাংলার সাহিত্যিক নির্দশন ঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

পুঁথি আবিষ্কার

পুঁথি পরিচয়

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঃ কবি পরিচয়

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ঃ কোন্ রীতির রচনা?

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঃ পুরাণ ও লোকায়ত সংস্কৃতির মিশ্রণ

সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গুরুত্ব

অনুশীলনী

টিপ্পনী

উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলার সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি কেমন ছিল তা জানা যাবে। সেই সঙ্গে সাহিত্যের গতিপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা যাবে। তুর্কি আক্রমণ – তাদের বিজয়, বাংলার রাষ্ট্রীয় জীবনের হিন্দুর কর্তৃত্বের অবসান, মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস – এইসব জানা যাবে। তুর্কি আক্রমণ পুরাণ–সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলি ধ্বংস হওয়ার ফলে জাতীয় জীবনে সাময়িকভাবে অন্ধকার নেমে আসে। বাঙালি বৈতসী বৃত্তি অবলম্বন করে বেঁচে থাকে। কিন্তু তার সাংস্কৃতিক জীবন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। বৌদ্ধরা পুথিপত্র নিয়ে আত্মরক্ষার্থে নেপালের দিকে চলে যান। বাহ্মণ্য শক্তিও দুর্বল হয়ে পড়ে। বাহ্মণ্য শক্তির কঠোরতার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার আকাঙ্খায় এবং নবাগত ইসলামের উদারতায় মুগ্ধ হয়ে অন্ত্যজ সমাজের মধ্য থেকে ধর্মান্তরিত হতে শুরু করে। ইসলাম ধর্ম বিস্তারের জন্য আগত তুর্কি ধর্মপ্রচারকরা অনেক ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের দ্বারাও ধর্মান্তরিতকরণের কাজ চালাতে থাকে। সেই দুর্যোগের মধ্যে বাঙালি কেমনভাবে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের পটভূমিকা তৈরি করে টিকে ছিল এবং সমন্বয়ী সংস্কৃতির বীজবপন করেছিল তা আলোচিত হয়েছে এই এককে।

টিপ্পনী

ত্রয়োদশ শতকের বাংলা ঃ বিদেশি আক্রমণ ঃ রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি

১২০১ খিস্টাব্দে ইখতিয়ারুদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী অতর্কিতভাবে নদিয়া আক্রমণ করলেন। বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মনসেন প্রতিরোধে অক্ষম হয়ে পূর্ববঙ্গে চলে গেলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে ইখতিয়ারুদ্দিন রাজধানী গৌড় বা লক্ষ্মণবতী সমেত উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ জায়গা অধিকার করলেন। উত্তরবঙ্গের দেবকোটে নিজের রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন। তিনি ছিলেন মুহম্মদ ঘোরীর অনুচর। দিল্লি থেকে দূরে রাজত্ব করলেও তিনি দিল্লির বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করে চলতেন।

১২০৬ খিস্টাব্দে বখতিয়ার নিহত হলেও তাঁরই একেজন আমীর আলি মর্দানের হাতে। এরপর চলতে থাকল সিংহাসন নিয়ে হত্যার রাজনীতি। ১২১৩ খিস্টাব্দে সুলতান গিয়াসুদ্দিন খলজী বঙ্গের রাজধানী দেবকোট থেকে লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়ে স্থানান্তরিত করলেন। দিল্লির সম্রাটের আনুগত্য অস্বীকার করলেন তিনি। দিল্লির বাদশাহ ইলতুৎমিশ বাংলার বিদ্রোহ দমনের জন্য শাহজাদা নাসিরুদ্দীন মাহমুদকে পাঠালেন। ১২২৭ খিস্টাব্দে নাসিরুদ্দীন মাহমুদের হাতে হলেন গিয়াসুদ্দীন। আমীর-ওমরাহের অধীনে বাংলার শাসনের পর্ব শেষ হল। দিল্লির সুলতানদের আধিকারে বাংলার শাসন শুরু হল। তাঁরা তাঁদের অনুগত শাসনকর্তাদের দ্বারা বাংলাদেশ শাসন করতে থাকেন। দিল্লির সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবন-এর রাজত্বকালে তুগ্রল খান বিদ্রোহী হন। তাঁকে দমন করার জন্য বলবনকে তিন বছর বাংলার যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকতে হয়েছিল। ১২৮২ খিস্টাব্দে তুগ্রলকে যুদ্ধে পরাজিত করে নিজ কনিষ্ঠ পুত্র বুগরা খানকে লক্ষ্মণাবতীতে শাসনকর্তা নিযুক্ত করে চলে যান। পিতার মৃত্যুর পর ১২৮৭ খিস্টাব্দে বুগরা খান সুলতান নাসিরুদ্দীন নাম নিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদের পরে তাঁর পুত্র সুলতান রুকনুদ্দীন কায়কাউস দশ বছর (১২৯১-১৩০১) স্বাধীনভাবে রাজত্ব করে। তিনি বলবন বংশের শেষ সুলতান।

ত্রয়োদশ শতকের রাজনৈতিক ইতিহাসের কথা বলা হল। এবার সমাজ-ইতিহাসের পরিচয় নেওয়া যাক। বাঙালি সমাজে বিবর্তনের পর্যায় শুরু হল। তুর্কি বিজয়ে ভারতীয় পল্লি সমাজ ধ্বংস হল না। ভারতীয় বর্ণভেদ অক্ষুন্ন রইল। গোপাল হালদার দেখিয়েছেন সামাজিক পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ে তুর্কি আক্রমণের ফলে। (বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা)। উচ্চ ও নিম্নবর্গের হিন্দুদের সংযোগ নিকটতর হয়; পরাজিত হিন্দু সমাজ এক সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ রচনা করে আত্মরক্ষা করতে সচেষ্ট হয় এবং ক্রমে মুসলমান বিজেতারা বাঙালি হয়ে ওঠেন। মুসলমান শাসনের গোড়ার দিকে সমাজে ঝাঁকুনির ফলে উঁচুনিচু সমান হবার সুযোগ পায়।

তুর্কি আক্রমণের সময়ে এদেশে চারটি প্রধান ধর্মমত প্রচলিত ছিল ১) গ্রামদেবদেবী পূজা ২) মহাযান বৌদ্ধমতের একটি বিশেষ ও স্থানীয় রূপ ৩) যোগীমত এবং ৪) পৌরাণিক বাহ্মণ্যমত। মুসলমান অধিকারের প্রথম দুই তিন শতাব্দীর মধ্যে এই চারটি ধারার মিশ্রণে সাহিত্য প্রবাহিত দুটি প্রধান ধারার সৃষ্টি হয় - পৌরাণিক ও অপৌরাণিক।

বৌদ্ধতান্ত্রিকেরা মুসলমান অভিযানে বিপন্ন হয়ে অন্যদেশে চলে গেলেন - যাঁরা থেকে গেলেন তাঁরা হীন অবস্থায় লুকিয়ে থাকলেন। রাজপুষ্ট বাহ্মণ কবি-পণ্ডিতেরা অনাথ হলেন।

সেই সময় সাহিত্যচর্চা ও জ্ঞানচর্চার সুযোগ ছিল না।

ত্রয়োদশ শতকের বাংলায় সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায় না কেন? এই কাল পর্বকে অন্ধকার যুগ বলা কি সমীচীন?

দ্বাদশ শতাব্দীর পরে দীর্ঘ দেড়শ বছরের বেশি সময় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চলেছিল এক শূন্যতাময় যুগ। দেড়শ বছর ধরে বাংলায় কিছু লেখা হয়নি এ কথা সহজে মেনে নেওয়া যুক্তি সংগত নয়। আমাদের সান্ত্বনা পেতে হয় এই ভেবে যে, কিছু কিছু অপ্রধান রচনার উদ্ভব হয়তো হয়েছিল কিন্তু কালের হাতে তা নষ্ট হয়ে গেছে। ইউরোপের মধ্যযুগকে ইতিহাসে The Dark Age বলা হয়। তারই নামসাদৃশ্যে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের এই নির্দিষ্ট সময়টিকে 'অন্ধকার যুগ' নামে কেউ কেউ অবিহিত করেছেন। অনেকে এই সময়টিকে 'সন্ধি যুগ'ও বলেছেন। আবার একে বন্ধ্যাযুগও বলা হয়ে থাকে। সে যাই হোক এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে এই সময়ের বাংলাদেশের বৃহত্তর পরিবেশ উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টির উপযোগী ছিল না। বাংলার রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্মজীবনে তখন দুর্যোগের ঘনঘটা প্রায় সীমাহীন হয়েছিল। তার কারণ বিদেশি তুর্কিদের দ্বারা বাংলাদেশের উপর আক্রমণ। ওই সময়ের বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা তা লক্ষ করেছি। সুকুমার সেন বলেছেন - "১২০০ হইতে ১৪৫০ অব্দের মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন নিদর্শন তো নাই-ই বাঙ্গালা ভাষারও কোন হদিশ পাওয়া যায় না।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খন্ড, আনন্দ সংস্করণ ষষ্ঠ মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর, ২০০১, পৃ-৮১)

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন - "বস্তুত মুসলমান অধিকার কাল হইতে এই সময় পর্যন্ত কোনও বাঙ্গালা সাহিত্য আমাদের হস্তগত হয় নাই। আমরা এই ১২০১ হইতে ১৩৫২ খি. পর্যন্ত সময়কে বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যযুগের অন্ধকার বা সন্ধি-যুগ বলিতে পারি।" বাংলা সাহিত্যের কথা, মাওলা বাদার্স সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৯, পৃ-১১)।

দুই বাংলা দুই সাহিত্যের ইতিহাস লেখকের উদ্ধৃতি দিলাম। আর উদ্ধৃতি দেবার প্রয়োজন বোধ করছিনা। সব ঐতিহাসিকই স্বীকার করেছেন যে এই সময় বাংলাদেশে অনিশ্চয়তার ও অরাজকতার ঝড় বয়ে যায়। দেশের মধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতি যেসব প্রধান কেন্দ্র ছিল সেইগুলি আগে বিধ্বস্ত হয় এবং বুদ্ধি-বিদ্যাচর্চা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। এর আগে বাংলা দেশে কোনো বিদেশি শক্তির ব্যাপক আক্রমণ হয়নি। জনসাধারণ এই অতর্কিত আঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিলনা। বিনা প্রতিরোধে বিদেশিরা বাংলা দখল করে। তারপর নবীন শাসক-সমাজে হত্যা ও প্রতিহত্যার পাপচক্র পুনরাবর্তিত হতে থাকে। মন্দির ভেঙে মসজিদ আর পাঠশালা ভেঙে মাদ্রাসা নির্মাণের কাজ আরো পরে হয়েছিল। যাইহোক বনেদি বাঙালিরা বঙ্গের পূর্ব ও উত্তর প্রত্যন্তের দুর্গমভূমিতে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। তাই প্রাচীন বাংলা কাব্য-কবিতার বহু দুর্লভ নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে পূর্ব ও উত্তর প্রত্যন্ত দেশ থেকে। সার্বিক বিধ্বংস ও পলায়ন-এস্ততার মধ্যে শিল্প সৃষ্টি অসম্ভব হওয়াই স্বাভাবিক। পলায়নের পথে বিলুপ্তিও অসম্ভব নয়। "এই সব কারণেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ১২০২ থেকে প্রায় ১৩৫০ খীষ্টাব্দ পর্যন্ত মোটামুটি এই দেড়শ বছর নিষ্ফলা হয়ে আছে বলে মনে করা হয়।"

-বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ভূদেব চৌধুরী, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ-২১।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

পরবর্তীকালের সাহিত্যের গঠন প্রকৃতি ও বস্তু বিচার করে সুকুমার সেন অনুমান করেছেন ওই সময়ে মনসার কাহিনি, ধর্মের কাহিনি চণ্ডীর কাহিনি ইত্যাদি দেশীয় বস্তু এবং রামায়ণ-কাহিনি ও কৃষ্ণলীলা-কাহিনি ইত্যাদি পৌরাণিক বস্তু ছোটোবড়ো গানে অথবা পাঁচালিতে বাদ্য ও নৃত্যের যোগে পরিবেশিত হত গ্রামোৎসব অথবা দেবপূজা উপলক্ষে দেবমন্দিরে। ড. সেন তাঁর অনুমানের ভিত্তি হিসেবে ভাষাতত্ত্বের সাহায্যও নিয়েছেন।

তুর্কি আক্রমণের একটি ভালো ফলের কথা উল্লেখ করেছেন সেন। বাংলাদেশের দুই স্তরের (শিষ্ট এবং দেশীয়) মিলনের জন্য তুর্কি অভিযানের মতো এক আকস্মিক সংঘর্ষের আবশ্যক ছিল। দুই স্তরের সংস্কৃতিগত অর্থাৎ ধর্মবিশ্বাসগত, আচার ব্যবহারগত ও ভাবধারাগত দুস্তর স্তরভেদ দ্রুতগতি বিলুপ্ত হয়ে একটি জমাট বাঙালি জাতি হয়ে ওঠার অন্তরায় ছিল একটি প্রধান বস্তুর অভাব - বাইরের আঘাত অর্থাৎ তৃতীয় পক্ষের সংঘাত। ড. সুকুমার সেন তাই এমন বলেছেন, - "বাঙ্গালা দেশের দুই স্তরের মিলনের জন্য তুর্কি-অভিযানের মতো এক আকস্মিক সংঘর্ষের আবশ্যক ছিল। ইহাই বাঙ্গালা দেশে তুর্কী - অভিযানের একটি ভালো ফল। আর একটি ভালো ফল ভাষায় দ্রুত উন্নতি।

মুসলমান-শক্তির মধ্যস্থতায় বাঙ্গালীজাতি নিজস্ব রূপটি লইয়া আরও সংহত হইতে চলিল। এই জমাট বাঙ্গালী জাতির প্রতিভূ শ্রীচৈতন্য।....... জাতি হিসাবে মূর্তরূপ ধারণ করিবার পক্ষে বাঙ্গালায় বাহ্য সংঘাত যোগাইয়াছিল তুর্কী অভিযান ও মুসলমান শাসন, আর আভ্যন্তর শক্তি বিচ্ছুরিত করিয়াছিলেন শ্রীচৈতন্য।।"

যেহেতু দেড়শ বছরের সৃষ্টিশীলতার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে না - শুধু এই দিক থেকেই যুগটিকে অন্ধকার যুগ বলে স্বীকার করে নেওয়া যায়। তবে সন্ধিযুগ নামটি অনেক বেশি সতর্ক উচ্চারণ। কেননা মধ্যযুগের ইউরোপের বাংলার ওই সময়টি সার্বিকভাবে তুলনীয় নয়। আবার বাংলার ওই সময়ের অব্যবহিত পূর্ববর্তী সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাসও কম অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়।

চতুর্দশ শতকের বাংলা ঃ রাজনৈতিক-সামাজিক পরিস্থিতি

১৩০১ খিস্টাব্দ থেকে ১৩২২ খিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে বাংলা দেশে রাজত্ব করেন সুলতান শামসুদ্দীন ফীরোয শাহ্ দেহ্‌লভী। তাঁর সময়ে বর্তমান ময়মনসিংহ জেলা মুসলমান অধিকারে আসে। ওই সময়েই পীর শাহ্ জালালের উপদেশে সিপাহ্‌সালার নাসিরুদ্দীন ও সিকন্দরগাযী সিলহেটের রাজা গৌরগোবিন্দকে যুদ্ধে পরাজিত করে বক্ষ্মাপুত্রের পূর্ব অঞ্চলে মুসলমান রাজ্য বিস্তৃত করেন।

এই সময় সমগ্র বাংলাদেশ মুসলমান অধিকারভুক্ত হয়। ফিরোযশাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের মধ্যে রাজ্য নিয়ে লড়াই শুরু হয়। সুলতান নাসিরুদ্দীন ইবাহিম লক্ষ্মণাবতীতে থেকে উত্তরবঙ্গে রাজত্ব করতে থাকেন। বাংলাদেশের এই গোলযোগের সুযোগে দিল্লির সুলতান গিয়াসুদ্দীন তুগলুক বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গ দিল্লির সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে বাহ্‌রাম খানে অধিকারে থাকে। তখন পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী ছিল সপ্তগ্রাম। বাহ্‌রাম খানের অন্য নাম ছিল তাতার খান্। তিনি ছিলেন সুলতান গিয়াসুদ্দীন তুগলুকের পালিত পুত্র। বাহ্‌রাম খানের সময়ে বর্তমান ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম দিল্লির সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। সুলতান নাসিরুদ্দীন বাহাদুর

শাহ বিদ্রোহী হয়ে ও পরাজিত হয়ে ধৃত এবং নিহত হন। তখন বাহ্‌রাম খান সোনার গাঁওয়ের পুরোপুরি শাসনকর্তা হন। ফখরুদ্দীন ছিলেন বাহরাম খানের সিলাহ্‌দার (বর্মবাহক)। বাহ্‌রামের মৃত্যুর পর তিনি সুলতান গিয়াসুদ্দীন মুবারক শাহ্ নাম ধারণ করে পূর্ববঙ্গে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে। কদর খানের মৃত্যুর পর তাঁর কর্মচারী আলী মুবারক 'আলাউদ্দীন' আলী শাহ্ নাম ধারণ করে লক্ষ্মীবতীর স্বাধীন বাদশাহ হয়ে বসেন (১৩৪০ খ্রি.)। তিনি পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তখন পাণ্ডুয়ার নাম ছিল ফীরোযাবাদ। এই সময়ে আলী শাহের ধাত্রীপুত্র হাজী ইলিয়াস কোনও কারণে দিল্লি থেকে পালিয়ে বাংলা দেশে আসেন। ইলিয়াস আলী শাহকে হত্যা করে উত্তরবঙ্গ অধিকার করে সুলতান শাম্‌সুদ্দীন ইলিয়াস শাহ নাম নিয়ে রাজত্ব করতে শুরু করেন, (১৩৪২ খ্রি.)।

শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ উত্তরবঙ্গের নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি বিরাট সৈন্যদল নিয়ে উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। উড়িষ্যার রাজা পরাজিত হয়ে তাঁকে কর দিতে বাধ্য হন। এরপর তিনি ত্রিহুত দখল করেন। তিনি কাশী পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। সোনারগাঁও অধিকার করে পূর্ববঙ্গে রাজ্যবিস্তার করেন। তিনি কামরূপ জয় করেছিলেন। পূর্বে শ্রীহট্ট থেকে পশ্চিমে বারানসী এবং সমগ্র উত্তর ও পূর্ববঙ্গ জুড়ে শাম্‌সুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ বাংলায় স্বাধীন ইলিয়াস শাহী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন (১৩৫৩ খ্রি.)।

মুহম্মদ তুগলুকের মৃত্যুর পর দিল্লির সুলতান হলেন ফিরোযশাহ্ তুগলুগ। তিনি ইলিয়াস শাহের বিদ্রোহ দমন করার জন্যে এক বিরাট সৈন্যদল নিয়ে ১৩৫৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর রাজধানী আক্রমণ করলেন। কয়েক মাস ধরে একডালা দুর্গ ঘিরে রাখার পর বর্ষাকালে বাধ্য হয়ে ফীরোযশাহ দিল্লি ফিরে গেলেন। ১৩৫৭ খ্রি. অব্দে ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর পুত্র সিকন্দর শাহ সুলতান হলেন। ১৩৫৯ খ্রিস্টাব্দে ফীরোজ শাহ পুণরায় বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। কিন্তু অবারেও ব্যর্থ হন। এরপর দুশ বছর ধরে কোনো দিল্লির বাদশাহ বাংলাদেশ আক্রমণ করতে সাহস করেননি। ১৩৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সিকন্দর রাজত্ব করেন। তাঁর পুত্র গিয়াসুদ্দীন আজমশাহ ন্যায়পরায়ণ, প্রতাপশালী ও বিদ্যোৎসাহী রাজা ছিলেন। ১৪১০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

চতুর্দশ শতকের বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের কথা বলা হল। এবার সামাজিক পরিস্থিতি উল্লেখ করছি। সামাজিক ইতিহাসের আলোচনায় চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধের আলোচনা আগেই হয়েছে। এখন শুধু ইলিয়াসশাহী বংশের প্রতিষ্ঠার সময় থেকে অর্ধশতাব্দীর কথা বললেই হবে। ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াস শাহী বংশ প্রতিষ্ঠিত হলে শক্তিশালী এই রাজবংশ উপলব্ধি করলেন যে দিল্লির রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও দেশের সুশাসন রক্ষার জন্য দেশের অগণিত হিন্দু প্রজাকে জানা ও তাদের সহানুভূতি লাভ করা প্রয়োজন। ঐতিহাসিক যিয়াউদ্দীন বর্‌নী তাঁর তারীখ ই-ফীরোযশাহী'তে ইলিয়াস শাহের জমিদারদের মৈত্রীর কথা বলছেন। এই উদ্দেশ্যেই তাঁরা দেশীয় সাহিত্যের উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক হয়েছিলেন। অন্যদিকে রাজশক্তি হারিয়ে হিন্দুসমাজ প্রাণপণ প্রয়াসে নিজের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরল – সমাজ সংরক্ষণে প্রয়াসী হল। এর ভার গ্রহণ করলেন হিন্দু উচ্চবর্ণ বিশেষ করে স্মার্ত পণ্ডিতেরা। তাঁরা হিন্দুর জাতিভেদ ও আচার ধর্মের গণ্ডীর মধ্যে হিন্দু সমাজকে আরও অনমনীয়, আরও রক্ষণশীল এবং আরো সংকীর্ণ করে তুলল। বর্ণাশ্রম প্রথা আরও জোরাল হল। ম্লেচ্ছ-সংসর্গ হলেই তখন জাতিচ্যুত হতে হত। যদুর কিংবদন্তি সত্য হলে রাজপরিবারও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল না। বলা হয়ে থাকে এইরকম বজ্র বন্ধনে সমাজকে না বাঁধলে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজ সেদিন ইসলামের প্লাবনে তলিয়ে যেত।

টিপ্পনী

কারণ তখন দুদিক থেকে বিপদ আসত ১) রাজধর্ম হিসেবে ইসলামের প্রতিপত্তি এবং ২) সুফি, পীর, ফকির ও দরবেশদের প্রচারে ইসলামের সহজ লোকপ্রিয়তা।

সামাজিক পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। হিন্দু বান্দ্মণেরা সংস্কৃত চর্চা পুনরুজ্জীবিত করেন। টোল চতুষ্পাঠীতে শাস্ত্রাধ্যয়ন দর্শন ও স্মৃতির অনুশীলন চলতে থাকে। এই সাংস্কৃতিক প্রয়াসের ফসল হিসেবে পঞ্চদশ শতকে রচিত হয় ভাগবত ও রামায়ণের অনুবাদ। অন্যদিকে উচ্চবর্গ ক্ষমতাচ্যুত হয়ে নিম্নবর্গের কাছাকাছি হওয়ায় নিচের মানুষদের পূজা মনসা প্রভৃতি লৌকিক দেবী, – এবং কৃষ্ণের মতো প্রণয়লোলুপ দেবতা উপরতলার হিন্দুদের মধ্যে গৃহীত হল। পঞ্চদশ শতকের মনসামঙ্গলে দেখি মনসা পৌরাণিক দেবীতে উন্নীত হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দেখি কৃষ্ণ পৌরাণিক আদর্শ থেকে নেমে এসেছেন। প্রস্তুতি হিসেবে চতুর্দশ শতকের গুরুত্ব কম নয়। বৌদ্ধধর্ম পশ্চিমবঙ্গ থেকে লোপ পায়। শশিভূষণ দাশগুপ্ত আবিষ্কৃত এবং অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত 'নবচর্যাপদ'-এর পদগুলি ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে রচিত বলে অনুমিত হলেও তা বাংলার বাইরের ফসল।

টিপ্পনী

চতুর্দশ শতকের বাংলার সাহিত্যিক নির্দশন ঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

চর্যাগীতি রচনার পর দেড়শ বছরেরও বেশি সময় পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় নি। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে আবিষ্কৃত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর পুথি থেকে আদি মধ্যযুগের বাংলা ভাষার নিদর্শন পাওয়া গেল। বলাবাহুল্য আদি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একমাত্র দৃষ্টান্ত বড়ু চন্ডীদাস রচিত এবং সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ নামাঙ্কিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। বিবর্তনের ধারায় চর্যাগীতির পরের বাংলা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা। আবার জয়দেবের কৃষ্ণকথার পরের কৃষ্ণকথা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এর কৃষ্ণকথা। আদর্শগত যে বিচ্যুতিটুকু আছে তাতে সময়ের চিহ্ন ধরা পড়ে। চতুর্দশ শতকের শেষ ভাগের ইলিয়াস শাহী রাজবংশের প্রতিষ্ঠার পরের সাহিত্যিক নিদর্শন হিসেবেই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-কে উল্লেখ করা হয়। বিদ্যাপতির আবির্ভাবকাল হিসেবে চতুর্দশ শতকের শেষভাগকে চিহ্নিত করা হলেও তাঁর রচনাগুলিকে পঞ্চদশ শতকের রচনা বলে ধরা হয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মানবতা ও বাস্তবতা আমাদের প্রাচীন কাব্যসাহিত্যের একটি সম্পদ। এই মানবতা মানবগুণসার কোনো ভাবনির্যাস নহে, তাহা সীমাবদ্ধ আশা-আকৃতির মর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত। কোনো উচ্চতর ভাবলোকের কলাকৌতূহল নহে, যে-মানুষকে জানি, যাহাকে বুকে জড়াইয়া অনুভব করি, যাহার মধ্য দিয়া সাধারণ জীবনের উৎকণ্ঠা মূর্তিমান হইয়া উঠে – শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সেই মনুষ্যত্বকে অভিবাদন জানান হইয়াছে। এই মানবতা বা মনুষ্যত্ব দেহ এবং প্রাণ উভয়কে বেষ্টন করিয়া আছে।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু ঃ মধ্যযুগের কবি ও কাব্য

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আদি মধ্যযুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নির্দশন। এটা বড়ু চন্ডীদাসের লেখা। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই গ্রন্থটি রচিত হয়।

পুঁথি আবিষ্কার

১৩১৬ বঙ্গাব্দে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বাঁকুড়া জেলার বনবিষ্ণুপুরের সন্নিকটস্থ কাঁকিল্যা গ্রাম নিবাসী শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র বংশোদ্ভূত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে (গোয়াল ঘরের মাচায় রক্ষিত) বাসলী সেবক বড়ু চণ্ডীদাস রচিত কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক একটি কাব্যের পুথি আবিষ্কার করেন। ১৩১৮ বঙ্গাব্দের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার ২য় সংখ্যায় বসন্তরঞ্জন ওই কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে সাহিত্যামোদী জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু গ্রন্থটি মুদ্রিত না হওয়ায় বিশেষ কেউ এর সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করেননি। ১৩২২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় বসন্তরঞ্জন এবং লিপিবিশারদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় – দুজনে মিলে প্রাপ্ত পুথির লিপি বিচার করে এটিকে অতিশয় প্রাচীন কাব্য এবং এর বড়ু চণ্ডীদাসকে আদিতম চণ্ডীদাস বলে ঘোষণা করেন। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে বসন্তরঞ্জনের সম্পাদনায় এটি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়। এই আবিষ্কার চণ্ডীদাস সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটায় এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চণ্ডীদাস সমস্যা নামে এক সংশয়ের জন্ম দেয়। এখনও পর্যন্ত সেই সমস্যার কোনো নির্ভরযোগ্য মীমাংসা হয়নি।

এই আবিষ্কারের আগে বাঙালি পাঠক চণ্ডীদাসকে এক ও অভিন্ন বলে জেনেছে। অবশ্য কারো কারো মনে যে সংশয় জাগেনি তা নয় – কিন্তু কেউ কোনো সিদ্ধান্ত নেননি। ১৩০৫ বঙ্গাব্দে সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রথম সংশয় প্রকাশ করেছিলেন নীলরতন মুখোপাধ্যায়। তিনি চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত রাসলীলার পদে কবিত্বের অভাব লক্ষ করেছিলেন। তাঁকে অন্য চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব কল্পনা করতে হয়েছিল। আরো দুজন গবেষক পৃথক পৃথক চণ্ডীদাসের কথা ভেবেছিলেন। তাঁরা হলেন ব্যোমকেশ মুস্তফী এবং মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ।

পুঁথি পরিচয়

প্রাচীন বাংলার তুলোট কাগজে লিখিত আদি-মধ্য-অন্ত খন্ডিত অতিশয় প্রাচীন ধরনের পুঁথি। পুঁথির নাম, রচনাকাল কিছুই জানা যায় নি। রচয়িতার ভণিতা ছাড়া অন্য কোনো তথ্য পাওয়া যায় নি। সম্পাদক জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নাম দিয়ে বইটি ছেপেছেন। অনেকে বলে থাকেন বইটির আসল নাম ছিল শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ। আবিষ্কৃত পুথির মধ্যে প্রাপ্ত একটি কাগজের চিরকুটকে তাঁরা প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত করেন। চিরকুটটিতে লেখা আছে –

"শ্রীকৃষ্ণসন্দর্বের ৯৫ পচানইপত্র একশত দশপত্র পর্যন্ত একুনে ১৬ শোলপত্র শ্রীকৃষ্ণপঞ্চাননে শ্রী শ্রী মহারাজার হুজুরকে লইয়া গেলেন পুনশ্চ আনিয়া দিবেন – সন ১০৮৯, ২৬ আসীন

সন ১০৮৯ তাং ২১ অগ্রহায়ণ

শ্রীকৃষ্ণপঞ্চানন শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ব্ব

১৬ পত্র দাখিল হইল।"

(দ্র. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খন্ড – অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

টিপ্পনী

বোঝা যাচ্ছে বনবিষ্ণুপুরের গ্রন্থাগারে এই পুথি রক্ষিত ছিল ১০৮৯ সনে অর্থাৎ ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দে। কোনো একজন কৃষ্ণপঞ্চানন এই পুথির ৯৫ থেকে ১১০ পত্র মোট ১৬ খানি পত্র ১০৮৯ সনের ২৬ আশ্বিন নিয়ে যান। গ্রন্থাগারের কোনো কর্মচারী সম্ভবত একটি চিরকুট পুথি থেকে পেয়েছিলেন। চিরকুটের লেখাতে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ব্ব' আখ্যা পাওয়া যাচ্ছে। ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দে আখ্যাপত্র নষ্ট হয়নি।

টিপ্পনী

অবশ্য ওই নামটিও মেনে নেওয়া কঠিন। চিরকুটের তথ্য অন্য গ্রন্থ কংক্রান্ত হতে পারে। 'ষট্সন্দর্ভ' গ্রন্থের একটি সন্দর্ভের নাম 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ'। এইসব বিতর্কের মধ্যে যাবার কোনো প্রয়োজন নেই। সম্পাদক প্রদত্ত নামটি প্রায় এক শতাব্দী ধরে ব্যবহৃত হতে হতে আমাদের মজ্জাগত হয়ে গেছে।

পুথির লিপির কথায় আসা যাক। ঐতিহাসিক ও প্রাচীন লিপিবিশারদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বসন্তরঞ্জন বাবুর অনুরোধে লিপি বিশ্লেষণের সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনাকাল নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। তাঁর মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথির তিন ধরনের হস্তাক্ষর আছে। ১) প্রাচীন হস্তাক্ষর ২) প্রাচীন হস্তাক্ষরের অনুকরণ এবং ৩) আধুনিক হস্তাক্ষর। কালপরম্পরায় কিছু কিছু বর্ণের পরিবর্তন এবং কিছু কিছু বর্ণের ছাঁদ দীর্ঘকাল ধরে বজায় থাকার কারণে এই ব্যাপার ঘটেছে। অন্যান্য প্রাচীন পুথির লিপির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বর্ণমালার তুলনামূলক আলোচনা করে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে সম্ভবত চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধে এই পুথি লিখিত হয়েছিল।

নলিনীকান্ত ভট্টশালী পরে এর লিপিবিচার করে বলেছিলেন এই বর্ণমালা ১৪৬৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্ববর্তী সময়ের। রাধাগোবিন্দ বসাক মনে করেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথিটি ১৪৫০ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অনুলিখিত।

এই তিনজনের বক্তব্য থেকে আমাদের পক্ষে অনুমান করতে অসুবিধা হয়না যে মূল গ্রন্থটি চতুর্দশ শতকেই লেখা হয়েছে। অনুলিপিটি চতুর্দশ বা পঞ্চদশ যে শতকেরই হোক না কেন। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এবং সুকুমার সেন যথাক্রমে ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতকের কথা বলেছেন। তাঁরা যাই বলুন না কেন অনুলিপি সম্বন্ধেই বলেছেন।

পুথির লিপি বিচারের পরে আসতে হয় ভাষা বিচারে। সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকায় বসন্তরঞ্জনবাবু বৈজ্ঞানিক ভাষাতত্ত্ব অনুসারে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন কী ভাবে মূল তৎসম শব্দ ধীরে ধীরে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তদ্ভব শব্দে পরিণত হয়েছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমাণ সহযোগে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে মধ্যযুগের বাংলা ভাষার আদিপর্বে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচিত হয়েছে। তিনি বাংলা ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্ব আলোচনা করে দেখিয়েছেন প্রাচীন বাংলার অপভ্রংশ প্রভাব (চর্যাগীতিতে যা আছে) তার দু-আড়াইশো বছরের মধ্যে বিলুপ্ত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বাংলায় এই পরিবর্তনের চিহ্ন বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। তিনি মনে করেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর পুথির ভাষা পঞ্চদশ শতাব্দীর কিছু পূর্ববর্তী। সুকুমার সেন অবশ্য গ্রন্থটিকে এত প্রাচীন বলে মানতে চান না। আলোচ্য গ্রন্থে ইসলামী শব্দের প্রয়োগ, অন্যান্য জনপ্রিয় গ্রন্থের ভাষার পরিবর্তন ইত্যাদি কারণের জন্য এটিকে ষোড়শ শতকের আগে স্থান দিতে তিনি রাজি নন। তা ছাড়া অস্থানে অনুনাসিক ধ্বনির ব্যবহারকে তিনি বাঁকুড়া-ধলভূম-মানভূমের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেন। এতে ভাষার প্রাচীনতা প্রমাণ হয় না। সেনের মতামতের কিছু যৌক্তিকতা অবশ্যই আছে। কিন্তু আমরা মধ্যপন্থী। তাই পঞ্চদশ

শতকের সামান্য পূর্ববর্তী বলে পুথির ভাষাকে আমরা গ্রহণ করেছি। তা ছাড়া ষোড়শ শতকের বৈষ্ণব পদাবলির আদর্শ ও চরিত্রের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আদর্শ ও চরিত্রের মিল না থাকায় এই পুথিকে ষোড়শ শতকের বলে মানা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঃ কবি পরিচয়

টিপ্পনী

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের কবি বড়ু চন্ডীদাস নামে পরিচিত। তিনি বাসলী সেবক ছিলেন। তাঁর নামের আগে অনন্ত কথাটি কোথাও কোথাও ব্যবহৃত হয়েছে। এর বাইরে আর কিছু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' থেকে জানা যায় না। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে বড়ু চন্ডীদাসের ভণিতা আছে তেতাল্লিশবার। তার মধ্যে 'অনন্ত' কথাটি নামের আগে যুক্ত হয়ে আছে সাতবার। যেখানে ছন্দের অনুরোধে 'বড়ু' ব্যবহার করা চলে না শুধু সেখানেই 'চন্ডীদাস' ভণিতা আছে। বেশিরভাগ ভণিতায় বাসলীর নাম যুক্ত আছে। 'বাসলী বন্দী', 'বাসলী গণ' এই ধরনের প্রয়োগ আছে। বড়ু-চন্ডীদাস ভণিতা পাওয়া যায় সবচেয়ে বেশি। পন্ডিতদের অনুমান কবির আসল নাম বড়ু চন্ডীদাস। অনন্ত সম্ভবত কোনো গায়েনের নাম। শুধু অনন্ত নামে কোনো ভণিতা পাওয়া যায় নি। সুতরাং এটি গায়নের প্রক্ষেপ।

কবির ব্যক্তিপরিচয় সম্বন্ধে কিছু বলা কঠিন। তিনি ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন (বড়ু)। তাঁর কাব্যের পুথি বাঁকুড়া অঞ্চলে পাওয়া গেছে। বাঁকুড়ার ছাতনায় বাসলীর মন্দির আছে। সুতরাং তিনি বাঁকুড়া জেলার ছাতনার লোক এমন অনুমান করা যেতে পারে এই পর্যন্ত। বড়ু চন্ডীদাসের ব্যক্তিগত পরিচয়সম্বন্ধে কোনো প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় নি। সুকুমার সেন তাঁর 'নট নাট্য নাটক' গ্রন্থে বলেছেন যে চন্ডীদাস পুতুলবাজির নাটুয়া ছিলেন এবং গৌড়ের নিকটবর্তী কানাই নাটশাল গ্রামে তাঁর পুতুল পাটের রঙ্গমঞ্চ ছিল। তিনি বাশুলীর (চন্ডী) সেবক ছিলেন। এটা তাঁর বংশগত কিংবা ব্যবসায়গত ব্যাপার হতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কাহিনি ঃ

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য' তেরোটি খন্ডে বিন্যস্ত। এর ভিত্তি রাধা ও কৃষ্ণের প্রণয় কথা। গ্রন্থের প্রতিটি খন্ডের নাম আছে। যেমন 'জন্মখন্ড', 'তাম্বুলখন্ড', 'দানখন্ড', 'নৌকাখন্ড', 'ভারখন্ড', 'ছত্রখন্ড', 'বৃন্দাবনখন্ড', 'কালীয়দমনখন্ড', 'যমুনাখন্ড', 'হারখন্ড', 'বাণখন্ড', 'বংশীখন্ড', 'রাধাবিরহ' ইত্যাদি। কিন্তু শেষ অংশের পুথির পাতা পাওয়া যায় নি। এই অংশটি খন্ডরূপে অভিহিত হয় নি। এই পর্বের নাম 'রাধাবিরহ'। এটাই শেষ পর্ব যা কাহিনির সমাপ্তি এনেছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের প্রথম খন্ড জন্মখন্ড যা দেবলোকে স্থাপিত। কংসের অত্যাচার থেকে মানুষকে বাঁচাবার জন্য কৃষ্ণের আবির্ভাব। সে বিভিন্ন লীলা করে মর্ত্যে গোপালক রূপে এসে গোরু চরাতে লাগল। লক্ষ্মী জন্মগ্রহণ করল রাধা রূপে। **তাম্বুলখন্ড**-এ রূপলাবণ্যময়ী রাধাকে দেখে কৃষ্ণ মুগ্ধ আত্মহারা। রাধার বিবাহ হয়েছিল নপুংসক আইহন বা আয়ানের সঙ্গে যে রাধাকে দেখাশোনার জন্য রাধার মাতামহীর মতো রাধার মায়ের পিসী বৃদ্ধা বড়াইকে নিযুক্ত করে। কৃষ্ণ বড়াইয়ের মাধ্যমে রাধাকে সুপারি পান ও ফুল দিয়ে তাকে তার প্রণয় জানায়। কিন্তু রাধা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সেসব প্রত্যাখ্যান করে। **দানখন্ডে** রাধা মথুরার হাটে দই বিক্রি করতে গেলে কৃষ্ণ রাধার দেহ দাবি করে কর হিসেবে। তর্কবিতর্কের পর, বাদ প্রতিবাদের পর রাধা বাধ্য

হয়ে নিজেকে সমর্পণ করে। **নৌকাখন্ড**–এ প্রায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। দধি বিক্রয়ার্থে রাধা নৌকায় ওঠে যে নৌকায় কৃষ্ণ মাঝি সেজে বসেছিল। নদীতে ভয় দেখিয়ে কৃষ্ণ রাধার সঙ্গে মিলিত হয়।

ক্রমে রাধা আকৃষ্ট হয় কৃষ্ণের প্রতি। **ভারখন্ড**–এ কৃষ্ণের প্রতি রাধার অনুরাগ প্রকাশিত হয়। মথুরার পথে কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার নিকট সম্পর্ক গড়ে ওঠে। **ছত্রখন্ড**–এ কৃষ্ণ রাধার মাথায় ছাতা ধরে মিলনের প্রত্যাশায়। **বৃন্দাবনখন্ড**–এ কৃষ্ণ মিলিত হয় রাধার সঙ্গে বৃন্দাবনের সুন্দর কুঞ্জবনে। **কালীয়দমন বা যমুনা খন্ড**–এ কৃষ্ণ কালীয় নাগ দমন করে গোপীদের পানের জন্য দহের জল শুদ্ধ করেন। **হারখন্ড**–এ কৃষ্ণ রাধার হার চুরি করায় রাধা যশোদাকে তা জানালে মা যশোদা কৃষ্ণকে তিরস্কার করে। কৃষ্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয় ও **বাণখন্ড**–এ রাধাকে মূর্ছিত করে মদনবাণে। রাধা এবার কৃষ্ণের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে। **বংশীখন্ড**–এ কৃষ্ণ এক অপূর্ব বাঁশী নির্মাণ করলেন যে বংশীর ধ্বনি বিশ্বসংসারকে ভুলিয়ে দেয়। রাধাও এই বাঁশীর সুর শুনে অত্যন্ত ব্যাকুল হল ও বড়ায়িকে বলল –

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।।
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন।।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা।।....
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী।। (বংশীখন্ড)

রাধাবিরহ পর্বে কাহিনির শেষ। কৃষ্ণ রাধার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। কিন্তু রাধা কৃষ্ণর জন্যে ব্যাকুল। দুজনের মিলন ঘটে বৃন্দাবনে। আনন্দিত রাধা ঘুমিয়ে পড়ে। তাকে ছেড়ে কৃষ্ণ চলে যায় মথুরায়, আর সে ফেরে না। রাধার হাহাকার ভরা কান্নায় কাহিনি শেষ হয়। রাধার বেদনা তীব্র ও মর্মস্পর্শী হয়ে প্রকাশ পায় যা কেবল প্রেমবঞ্চিত নারীর বেদনা নয়, এক অসহায় নির্যাতিত নারীর আর্তনাদ –

যে কাহ্নু লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ
বড়ায়ি
না মানিলোঁ লঘু গুরু জনে।
হেন মনে পড়িহাসে অহ্মা উপেখিআঁ রোষে
আন লআঁ বঞ্চে বৃন্দাবনে।।
বড়ায়ি গো
কত দুখ কহিব কাঁহিনী।
দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল
মোঞঁ নারী বড় অভাগিনী।। (রাধাবিরহ)

টিপ্পনী

‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ ঃ কোন্ রীতির রচনা ?

রীতির দিক থেকে ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ নাটগীতিকাব্য ধারার অন্তর্গত। এটি কতকগুলি ছোট ছোট নাট্যগীতির মালা। এটি আসলে ছিল পাঞ্চালিকা-নাট্য অর্থাৎ পুতুলনাচের কতগুলি পালা। পুতুলনাচের সঙ্গে অভিনয়-গীত রীতির নির্দেশ দেওয়ার জন্য গানগুলির মাথায় রাগ-তাল ছাড়াও অন্য কিছু নির্দেশ আছে। নাচ গানের মধ্যে শ্লোকগুলি কাহিনির ধারা অবিচ্ছিন্ন রেখেছে। সুকুমার সেন তাঁর ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’ গ্রন্থে উদ্ধৃতিসহ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’-এর আধিকাংশ পদই কৃষ্ণ-রাধা-বড়াই-এর সংলাপ। কোনো কোনো পদ দু-জনের উক্তি-প্রত্যুক্তি। পৃথকভাবে বিচার করলে অধিকাংশ পদ রাধা ও কৃষ্ণের মনোভাব প্রকাশ করে তাই গীতিকবিতা জাতীয়। আবার কথোপকথনে মনোভাবের ঘাত-প্রতিঘাত প্রকাশ পাওয়ায় গানে রচিত নাটকীয় সংলাপ বলা যেতে পারে। বড়ু লোকপ্রচলিত যাত্রাপালাকে কাহিনিকাব্যের রূপ দিয়েছেন। নাট্যরসও অনেকটা রক্ষিত হয়েছে।

জয়দেবের কাব্যে যেমন গানগুলি শ্লোকের দ্বারা কাহিনিশৃঙ্খলে গাঁথা এবং বারো সর্গে বাঁধা তেমনি বড়ু চন্ডীদাসের কাব্যের গানগুলিও শ্লোক দ্বারা সংযুক্ত এবং কয়েকটি খন্ডে বিভক্ত।

১৩টি খন্ডের মধ্য দিয়ে এই কাহিনি কাব্যের আখ্যান বিকশিত হয়ে উঠেছে। খন্ডগুলির নাম – জন্মখন্ড, তাম্বুলখন্ড, দানখন্ড, নৌকাখন্ড, ভারখন্ড, ছত্রখন্ড, বৃন্দাবনখন্ড, কালিয়দমনখন্ড, যমুনাখন্ড, হারখন্ড, বাণখন্ড, বংশীখন্ড ও রাধাবিরহ।

জন্মখন্ডে রাধা, কৃষ্ণ ও বড়ায়ি – এই তিন চরিত্রের পরিচয় দিয়ে কংস-বিনাশের জন্য কৃষ্ণাবতারের আবির্ভাবের কারণ নির্দেশ করা হয়েছে। তাম্বুলখন্ডে কৃষ্ণ রাধার দেহ কামনা করে বড়ায়ির হাত দিয়ে তাম্বুল প্রেরণ করেছে। এখান থেকেই প্রেমকাহিনি শুরু। রাধা বড়ায়িকে চড় মেরেছে এবং তাম্বুল ফেলে দিয়েছে। দানখন্ডে ও নৌকাখন্ডে যথাক্রমে দানী ও মাঝি সেজে কৃষ্ণ রাধার উপর বলাৎকার করেছে। ভারখন্ডে দেখা যায় রাধা কৃষ্ণকে দিয়ে ভার বহন করিয়ে নিচ্ছে। ছত্রখন্ডে ছাতা ধরিয়ে নিছে। বৃন্দাবনখন্ডে রাধা ও কৃষ্ণের মিলন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কালিয়াদমনখন্ডে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যলীলা কালিনাগ দমনের বিবরণ আছে। যমুনাখন্ডে আছে জলবিহার ও বস্ত্রহরণ লীলার বর্ণনা। হারখন্ডের বিষয় কৃষ্ণ কর্তৃক রাধার হার অপহরণ এবং যশোদার নিকট রাধার অভিযোগ। বাণখন্ডে কৃষ্ণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণে (সম্মোহন) বিদ্ধ হয়ে রাধা সংসার-সমাজের সব বাধা ডিঙিয়ে প্রকাশ্যে কৃষ্ণকে কামনা করেছে। বংশীখন্ডে দেখি, বাঁশির শব্দের উৎকণ্ঠিত রাধা কৃষ্ণের বাঁশি চুরি করেছে। বড়ায়ির পরামর্শ অনুযায়ী এই কাজ হয়েছে। এই নিয়ে কলহ জমে উঠেছে। কৃষ্ণের অনুনয়ে রাধা তা ফিরিয়েও দিয়েছে। রাধাবিরহে আছে রাধার বিরহ, বিরহের পর মিলন, রাধার শ্রান্তিজনিত নিদ্রা সেই অবকাশে কৃষ্ণের মথুরাযাত্রা। রাধার বিরহ-ক্রন্দনের বর্ণনার পর কাব্যটি খন্ডিত।

আখ্যানকাব্যটির মধ্যে গীতিধর্মিতা আছে। পরবর্তীসময়ের বৈষ্ণবপদাবলির বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের পূর্বরাগ আক্ষেপানুরাগ ও বিরহের অনেক পদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বংশীখন্ড ও রাধাবিরহ অংশের অনেক উক্তির (রাধার) মিল আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যেখানে শেষ, বৈষ্ণব পদাবলির সেইখানে শুরু এমন কথা কাব্য রসিকেরা বলে থাকেন। নাট্যগীতির ধর্ম নিয়ে সুকুমার সেন

টিপ্পনী

বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। (দ্র. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, আনন্দ সংস্করণ ১৯৭৮, ষষ্ঠ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর, ২০০১, পৃ.-১২৮)

টিপ্পনী

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঃ পুরাণ ও লোকায়ত সংস্কৃতির মিশ্রণ

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের কাহিনি ভাবগতপুরাণ অনুসারী নয়। তবে কিছুটা যোগ আছে। এর কোনো কোনো কাহিনি বিষ্ণুপুরাণের অনুসারী। দানখন্ড ও নৌকাখন্ড কাহিনি কোনো পুরাণ নেই। এদুটি লোকসাহিত্যে প্রচলিত। 'হরিবংশ' এর মূল যা লৌকিক ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত। ছত্রখন্ড ও ভারতখন্ড দানলীলারই পোষক। বংশীখন্ড প্রচলিত অপৌরাণিক আখ্যান। হারখন্ড, বাণখন্ড ইত্যাদিও লৌকিক কাহিনি থেকে নেওয়া হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আধ্যাত্মিক মহিমা নেই - স্থূল, অমার্জিত গ্রাম্যরুচির অভিব্যক্তি আছে। পৌরাণিক আদর্শ ও লৌকিক জীবনরসের সংমিশ্রণে এই কাব্য রচিত হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের সাহিত্যমূল্য

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অনন্য মহিমায় অধিষ্ঠিত। আদি-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একমাত্র প্রামাণ্য নিদর্শন এই গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণপ্রেমমূলক বৈষ্ণব সাহিত্যের যথাযথ প্রকাশ ঘটেছে। বাংলায় রাধাকৃষ্ণের প্রণয় নির্ভর সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। এই কাব্যের বিরুদ্ধে যতই রুচিহীনতার বা অমার্জিত ভাবভঙ্গিমার অভিযোগ আনা হোক, তত্ত্বের দিক থেকে বা শিল্পের বিচারে এই কাব্যের গুরুত্ব অস্বীকার করা যাবে না।

বড়ু চন্ডীদাস সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যে পন্ডিত ছিলেন। রাধাকৃষ্ণের সম্পর্ক চিত্রণে কবির বহু জ্ঞান ও পঠনশীলতার পরিচয় স্পষ্ট। কংসের অত্যাচার, সৃষ্টির দুরবস্থা, দেবতাদের আশঙ্কা, দেবকীর গর্ভে কৃষ্ণের আবির্ভাব, কংসাসুরের বিনাশ ইত্যাদি পৌরাণিক ভাবনার রুপায়ণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে। এই কাব্যেও কৃষ্ণের গোপগৃহে জন্ম এবং লক্ষ্মীর গোয়ালার ঘরে রাধারূপে জন্মগ্রহণের কথা বলা হয়েছে। কালীয় দমন, বলরামের কৃষ্ণের উদ্দেশে দশাবতার স্তব পাঠ, রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের সম্পর্ক ইত্যাদির মধ্যে কবির 'ভাগবতী' চেতনা প্রকাশ পেয়েছে। তবে কৃষ্ণের পরাক্রম বা বীর্যবত্তার থেকে তার প্রণয় বাসনাই কাব্যে অনেক বড় হয়েছে। ঐশী ভাব পরিণত হয়েছে লৌকিক ভাবে। তবে সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যে বড়ু চন্ডীদাসের পারঙ্গমতার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থমধ্যে সংস্কৃত বিভিন্ন শ্লোক উদ্ধৃত করা হয়েছে, নায়ক ও নায়িকার বিন্যাস ও উপস্থাপনা, নায়িকার রূপবর্ণনা ইত্যাদির মধ্যে লেখক সংস্কৃতজ্ঞানের বিশেষ পরিচয় দিয়েছেন। লেখক ভাগবত পড়েছিলেন তার প্রভাব আছে গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের বৃন্দাবন ভ্রমণের প্রসঙ্গে।

বড়ু চন্ডীদাস সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। অলংকার শাস্ত্রেও তাঁর ছিল অ-পরিসীম নৈপুণ্য। একটা অংশের কথা বলা যায়। বড়ায়ি কৃষ্ণের কাছে রাধার রূপ বর্ণনা করছে যার মধ্যে আছে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের ভঙ্গি - অলংকারের নিপুণ প্রয়োগে এসব অত্যন্ত স্বাদু হয়ে উঠেছে : রাধার কেশরাশি তার মধ্যে উজ্জ্বল সিঁদুরের শোভা, মনে হয় যেন সজল জলদের মধ্যে সূর্যোদয়। বিমল বদনে স্বর্ণকমলের কান্তি দেখে লজ্জায় চাঁদ দুলক্ষ যোজন দূরে চলে গেছে।

....অলস চোখে কাজলমণ্ডন দেখে নীলপদ্ম জলের মধ্যে গিয়ে তপস্যা করছে।

অগ্রজ সংস্কৃত কবি জয়দেবের প্রভাব আছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে –

১. তোর রতি আশোআশেঁ গেলা আভিসারে।
সকল শরীর বেশ করী মনোহরে।। (বৃন্দাবন খন্ড)

২. যদি কিছু বোল বোলসি তবেঁ
দশনরুচি তোহ্মারে।
হবে দুরুবার ভয় আন্ধকার
সুন্দরি রাধা আহ্মারে।। (বৃন্দাবন খন্ড)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য নাটকের লক্ষণাক্রান্ত। নাটক এসেছে চরিত্রের সংলাপে, কাহিনির নাটকীয় গঠনে এবং ভাবনার গভীরতায়। তিনটি চরিত্র কৃষ্ণ, রাধা এবং বড়াই-এর সংলাপ ও কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নাটক গড়ে উঠেছে। কাব্যের কাহিনিও নাট্যধর্মী – ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে কাহিনি, নাটকের মতো এগিয়ে চলেছে; চরিত্রের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব নির্মাণ করেছে নাটক। এক বিদেশি নাট্যকারের (পিরানদেল্লো) একটি চরিত্র বলেছে – Drama is action, Sir, action, not confounded philosophy. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অনেকটাই অ্যাকশন-ধর্মী এবং এতে একটি ভাবনাও আছে তা হল তদানীন্তন সমাজে জীবনের জটিলতা, নারীত্বের অপমানের কথা এবং মানবজীবনের কদর্যতার মধ্যে ভাগবতভাবনার প্রকাশ যদিও তা কাহিনিতে স্পষ্ট প্রকাশ পায় নি। আধুনিক ভাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে নাট্যগীতি (dramatic poem) বলা যায়। সুদূর অতীত থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত গীতময় নাটকের যে ধারা আছে তাতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিদ্যমান তা অস্বীকার করা যাবে না।

তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে ঝুমুরের নৈকট্য বেশি। ঝুমুরগান গীতিবহুল লোকনাট্যশ্রেণির অন্তর্গত। এটা নাট্যকাব্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনও তাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে কবির সংগীত চেতনার প্রকাশ দুর্নিরীক্ষ্য নয়। এতে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিনীর উল্লেখ আছে। যেমন আহের, মালব, বসন্ত, গৌড়ী, বেলাবলী ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্যে অলংকার সুপ্রযুক্ত। ছন্দেরও সুন্দর প্রয়োগ আছে। এতে পয়ার আছে, ত্রিপদী আছে অনেকটাই সুবিন্যস্তভাবে। 'উপঙ্গ' জাতীয় স্তবকও গঠিত হয়েছে পয়ারের চারটি ছত্র নিয়ে। পয়ারের বিভিন্ন রূপ আছে। প্রচলিত চোদ্দ অক্ষরের পয়ার হল –

কোন সুখেঁ কংশ তোর মুখে উঠে হাস।
নাহিঁ জান এবেঁ তোঁ আপণার নাশ।। (জন্মখন্ড)
বা
রাধিকা থাকিলী বসি আপণার ঘরে।
তোহ্মে থাকিলা আসি মথুরা নগরে।।
আমি জাই করী মোর আকুল পরাণ।... (রাধা বিরহ)

টিপ্পনী

লঘু ত্রিপদী নিদর্শন হল –

তোর মুখে সুণী রাধিকার রূপ
আওর নব যৌবনে।
অহোনিশি দহে সকল পরাণ
আর ধীর নাহি মনে।। (তাম্বুল খন্ড)

টিপ্পনী

দীর্ঘ ত্রিপদীর উদাহরণ –

দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী
সব কথা কহিআরোঁ তোহ্মারে হে।
বসিআঁ কদমতলে সে কাহ্ন করিল কোলে
চুম্বন বদন আহ্মারে হো। (রাধাবিরহ)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে অলংকারের নিপুণ প্রয়োগ আছে। রাধার রূপবর্ণনায় তার নিদর্শন পাওয়া যায়। উপমাজাতীয় কিছু অলংকারের নিদর্শন দেওয়া হল –

ক. মেঘ যেহ্ন আষাঢ় শ্রাবণে
ঝরে তার পাণী নয়নে গো। (বংশীখন্ড)

খ. নীল জলদ সম কুন্তলভারা। (দানখন্ড)

গ. আষাঢ় শ্রাবণ মাসে মেঘ করিষে যেহ্ন
ঝরএ নয়নের পাণী। (বংশীখন্ড)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য নাট্যধর্মীয় কথা। তাই নাটকের নিয়ম অনুযায়ী এতে চরিত্র আছে। চরিত্রের বিশিষ্টতাও খুঁজে পাওয়া যায় সার্থকভাবে। চরিত্রের সংলাপের মধ্য দিয়ে নাটক গড়ে উঠেছে এবং চরিত্রও প্রাণধর্মে রূপায়িত হয়েছে। নাটকের চরিত্রের মধ্যে থাকে সৃষ্টির বৈচিত্র্য – চরিত্রদের পারস্পরিক সম্পর্ক, দ্বন্দ্ব, অন্তর্দ্বন্দ্ব; চরিত্রের অন্তরলোকের পরিতয়ও সেখানে প্রকাশ পায়। চরিত্র চিত্রণে বড়ু চন্ডীদাস সফল হয়েছেন। কৃষ্ণ হয়ে উঠেছে একটা টাইপ চরিত্র। চরিত্রের পূর্ণ রূপ তার মধ্যে প্রকাশ পায়নি, হৃদয়ের গভীরতা ও দ্বন্দ্ব তার মধ্যে নেই; তদানীন্তন সমাজ ব্যবস্থায় অর্থাৎ তুর্কি আক্রমণোত্তর বাংলায় মানুষের মধ্যে যে নীতিহীনতা আদর্শহীনতা প্রকট হয়ে উঠেছিল কৃষ্ণ যেন তারই প্রতীকী রূপ। সে জোর করে রাধাকে পেতে চায়, তাকে ভোগ করে এবং শেষ পর্যন্ত রাধাকে পরিত্যাগ করে প্রায় পলায়ন করে। বড়াই চরিত্র মোটামুটি সুপরিকল্পিত। সে প্রথমাবধি যেন এক কুট্টনী বা কুটনী, রাধার আত্মীয় হলেও সে রাধাকে কৃষ্ণের হাতে তুলে দিতে চায়। তার চরিত্রের মধ্যে প্রাচীন সাহিত্য দামোদর গুপ্তর 'কুটিনীমতম', বাৎসায়নের 'কামসূত্র' ও জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরের 'বর্ণরত্নাকর' –এর প্রভাব আছে। কিন্তু বড়াই কেবল নায়ক-নায়িকার অবৈধ মিলন সঙ্ঘটিকায় ব্রতী নয়, সে মানব ভাবনায়ও গভীর হয়ে উঠেছে। তাই শেষ পর্যায় রাধার জন্যও তার হৃদয় ব্যাকুল হয়। রাধার চরিত্র সুগঠিত ও সুগভীর। প্রথমে রাধা ছিল অল্পবয়স্ক সংসার-অনভিজ্ঞা প্রেম বিষয়ে অনভিজ্ঞা এক সামান্য নারী। কিন্তু আঘাতে ও বেদনায় তার চিত্ত উন্মীলিত হয়, তার মনের পাপড়ীগুলো আস্তে আস্তে খুলে যায় ও তার প্রেমনিবিড় পরিপূর্ণ হৃদয়ের ছবি অপরূপ দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়। শেষ সময়ে সামান্য

গোপদুহিতা রাধা গভীর হৃদয়বোধসম্পন্ন চিরন্তনী নারীতে পরিণত হয়। রাধার চিত্রণে, তার মনের বিকাশ ও পরিণতিতে বড়ু চণ্ডীদাস অত্যন্ত শিল্পদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

বেদনাই সৃষ্টির উৎস। আদি কবি একথাই বলেছিলেন যে শোক থেকেই জাত হয় শ্লোক। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যও শেষ পর্যন্ত দুঃখের বোধেই নিবিড় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কাহিনির স্থূলত্ব, প্রেমের দেহকেন্দ্রিক বর্বরতা, প্রণয়ের নামে পৌরুষের অবনমন ও নারীর লাঞ্ছনা – কাব্যে এসব মূল্যহীন হয়ে গিয়ে ভালবাসার মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। গভীর ভালবাসার সঙ্গে মিশেছিল অপরিসীম বেদনা। এই প্রেম, এই বেদনার কেন্দ্রে আছে কাব্যের প্রধান চরিত্র রাধা। সে অত্যাচারিত হয়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছে, শেষ পর্যন্ত যখন তার হৃদয় উন্মোচিত হল, জেগে উঠল তার মন, তখনই অবহেলা অপমান প্রত্যাখ্যানে তার হৃদয় খান খান হয়ে গেল। সে অপরিসীম বেদনায় বলল –

যে কাহ্নু লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ
বড়ায়ি
না মানিলোঁ লঘু গুরু জানে।
হেন মনে পড়িহাসে আহ্মা উপেখিআঁ রোষে
আন লআঁ বঞ্চে বৃন্দাবনে।
বড়ায়ি গো
কত দুখ কহিব কাঁহিণী।
দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল
মোঞঁ নারী বড় অভাগিনী।। (রাধাবিরহ)

আর আছে বংশীধ্বনি। বাঁশির সুর। বাঁশি বাজে রাধার অঙ্গে অঙ্গে। তার বুকের মাঝখানে। এই বাঁশিতে ঝরে পড়ে কান্না, প্রকট হয় বিষাদ, আর তা অনন্তের বার্তা নিয়ে আসে। একটু অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও বলি – শোনা যায় স্বামী বিবেকানন্দ যখন রবীন্দ্রনাথের এই গানটা শুনতেন 'মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে', তখন বিবেকানন্দ স্থির থাকতে পারতেন না, তাঁর মন অস্থির উন্মথিত হয়ে উঠত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে বংশীধ্বনি শুনে রাধার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকেরও মনে হয় – 'আকুল শরীর মোর বেআকুল মন'। ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতার প্রকাশ আছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে – তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জেগে ওঠে মানুষের মনে। এখানেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য সাহিত্যরূপে সার্থক।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের সমাজচেতনা

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে সমকালীন সমাজ জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়।

১. কৃষ্ণ এবং রাধা স্বর্গের দেবদেবী হলেও তাঁদের প্রণয়কাহিনি চিত্রণে লেখক তাদের জাগতিক কামনা-বাসনার চিত্র এঁকেছেন, যে জৈবিক প্রবৃত্তির আতিশয্যকে তুলে ধরেছেন তা তুর্কি আক্রমণোত্তর বাংলার সমাজ জীবনের তুচ্ছতা, রুচিবিকৃতি এবং অবক্ষয়িত আদর্শের চিত্র।

২. বড়াই, নারদ প্রভৃতি চরিত্র সে যুগের গ্রাম বাংলার দুই পরিচিত হাস্যকর বৃদ্ধা ও বৃদ্ধ।

টিপ্পনী

কৃষ্ণ যেন কামপরায়ণ নীতিহীন এক গ্রাম্য যুবক। বঙ্গনারীর চিরায়ত পবিত্রতার মহিমা প্রস্ফুটিত হয়েছে রাধা চরিত্রে। প্রতিটি চরিত্রই প্রবলভাবে সামাজিক – আমাদের পরিচিত গ্রামের চেনা মানুষ।

৩. শ্রীরাধার মধ্য দিয়ে বাংলার গৃহজীবনের রূপ ফুটে ওঠে। সে অতি সাধারণ পরিবারের বধূ, ঘরের কাজকর্ম তাকে করতে হয়। তার রান্নার মধ্য দিয়ে সাধারণ গৃহস্থ বাড়ির খাওয়া দাওয়ার একটা চিত্র পাই। শাক-ভাজা-ঝোল-অম্বল প্রভৃতি ছিল সে যুগের রান্নার অঙ্গ।

টিপ্পনী

৪. বাঙালি মেয়েরা বিশেষত নিম্নবর্গীয় সমাজের মেয়েরা পর্দানশীল ছিল না। তারা বাইরে বেরোত এবং জীবিকার জন্য হাটে যাওয়া ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শ্রীরাধা দধি বিক্রয়ের জন্য মথুরার হাটে যেত।

৫. সে সময় আইন কানুন, নীতি নিয়মের কোনো কঠোরতা ছিল না। শ্রীরাধা মথুরার হাটে দধি বিক্রয় করতে গেলে কৃষ্ণর 'কর' চাওয়া বা 'খেয়াঘাটের মাঝি' রূপে কৃষ্ণের দাবি এবং প্রতিক্ষেত্রেই ঘটত রাধার লাঞ্ছনা। ঘরে বাইরে এই বলশালী আহীর যুবকটির রাধার প্রতি অন্যায় দাবি, সে যুগের সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার ছবি তুলে ধরে।

৬. গ্রাম্য লোকায়ত আচার ব্যবহার, সংস্কার বিশ্বাস ইত্যাদির প্রকাশ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে আছে। হাঁচি, টিকটিকি, শুকনো ডালে কাকস্বর, শূন্য কলসী কাঁখে নারী, ডানদিকে শৃগাল ইত্যাদি ছিল অশুভ লক্ষণ। শুভ কাজের জন্য তিথি বার ইত্যাদি দেখা হত। তন্ত্রমন্ত্রর প্রতিও লোকের আস্থা ছিল। দেবী চন্ডী তখন বাঙালির জীবনে এসে গেছেন। লোকে মনে করত 'চন্ডীর পূজা করলে কামনা পূর্ব হবে', কৃষ্ণর সন্ধান পাবার জন্য বড়াই রাধাকে বলেছেন যত্ন করে চন্ডীর পূজা করতে –

বড় যতন করিআঁ চন্ডীরে পূজা মানিআঁ
তবেঁ তার পাইবেঁ দরশনে। (রাধাবিরহ)

৭. নারীদের সাজসজ্জার প্রতি তখনো ছিল অনুরাগ। নারীরা প্রসাধন করে নিজেদের রূপময়ী করে তুলতে চাইত। অলংকারও তারা পরিধান করত। কিঙ্কিনী, আঙ্গুরী, গজমুকুতার হার ইত্যাদি ছিল প্রিয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য ঃ বাংলা সাহিত্যের গুরুত্ব

১. বাংলা ভাষায় রচিত রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক প্রথম কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। যে রাধাকৃষ্ণর কথা অবলম্বন করে বাংলায় বৈষ্ণব পদসাহিত্য অপরূপ সমৃদ্ধ ও বাঙালির প্রাণ অনন্য বিকশিত হয়ে উঠেছে এই গ্রন্থে তার প্রথম প্রকাশ। জয়দেবের গীতগোবিন্দ বাঙালির লেখা হলেও বাংলায় লেখা নয়।

২. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ভাষা আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষার (১২০০-১৫০০ খিস্টাব্দ) একমাত্র আদর্শ নিদর্শন। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর Origin and Development of the Bengali Language গ্রন্থে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ড. সুকুমার সেন-ও এই কথা বলেছেন।

৩. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের অশ্লীলতা ও রুচিবিকার এবং তার পর্যালোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ত্রয়োদশ খন্ডে বিন্যস্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য বাংলা সাহিত্যে প্রবল আলোড়ন আনে। এই কাব্য আবিষ্কৃত হওয়ায় চন্ডীদাস সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে যার সম্পূর্ণ মীমাংসা আজও হয় নি। এবং রাধাকৃষ্ণ প্রণয়ের অশ্লীল অমার্জিত রুচিহীন গ্রাম্যকথা ভক্তবৈষ্ণবের কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক তো বটেই, সাধারণ পাঠকের কাছেও তা অত্যন্ত অশালীন মনে হয়েছে। কাব্যটিতে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু রাধাকৃষ্ণ কথা আমাদের কাছে যে শুদ্ধ পবিত্র অলৌকিক আবেদন যে মহিমান্বিত প্রেমমাধুর্য বহন করে আনে, এখানে তা পাই না। তার পরিবর্তে স্থূল জৈবিক কামনা-বাসনার উৎকট ছবি অঙ্কিত হয়েছে। প্রথমত, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের অশ্লীলতা বা রুচিবিকার সম্বন্ধে বলা যায় যে এটা ছিল যেন সে যুগেরই প্রতিচ্ছবি। তুর্কি আক্রমণোত্তর বঙ্গ জীবনের নীতিহীন রুচিহীনতা বিকার-বিকৃতির ছাপ পড়েছে এই কাব্যে। দ্বিতীয়ত, লেখক এক লোককাহিনি রচনা করতে চেয়েছেন যাতে ভক্তিবাদ ও ভক্তিধর্মের ভাবনা প্রধান হয়ে ওঠেনি। তৃতীয়ত, বলিষ্ঠ জীবনভোগের কথা দেহনির্ভর প্রেমবাসনার চিত্রণ, বাসনা কামনার তীব রাগরক্তিম পরিচয় সাহিত্যে যুগে যুগে এসেছে। বাংলায় ভারতচন্দ্র, ইংরেজিতে ডি. এইচ. লরেন্স, ফরাসিতে এমিল জোলা প্রমুখের রচনার কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়বে। চতুর্থত কেবল দৈহিক প্রেম বা ভোগবাসনা নির্ভর জীবনকথা নয়, নরনারীর হৃদয়ের গভীর রহস্যও উন্মোচিত হয়েছে কাব্যে। বিশেষ করে যেভাবে রাধার হৃদয়কমলের দলগুলো একে একে বিকশিত হয়েছে ক্রুদ্ধ আত্মমর্যাদারক্ষায় নিষ্ঠ রাধা কৃষ্ণপ্রেমে ব্যাকুল ও নিবেদিত প্রাণ হয়েছে তা লেখকের প্রেমমনস্তত্ত্বের গভীর পরিচয় বহন করে। তাই বলা যায় প্রবৃত্তির লীলা বা লালসাপঙ্কিল জীবনচিত্র অঙ্কিত হলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য প্রেমের তীব অনুভবে হৃদয়ের গভীর আকুতিতে অশ্রুর অবিরাম প্রবাহে এক মহৎ গভীর ভাবদ্যোতনায় পরিসমাপ্ত হয়েছে।

৪. **শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে চরিত্রচিত্রণে লেখক বিস্ময়কর দক্ষতা দেখিয়েছেন**

ক. **রাধা ঃ** এই কাব্যে রাধা চরিত্র সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয়। মধ্যযুগের এক বাঙালি বধূর চিত্র রাধার মধ্য দিয়ে সার্থক প্রকাশিত হয়েছে। সে সামান্য গৃহবধূ - গৃহকর্মেই সে ব্যাপৃত। আবার সংসার পালনের জন্য তাকে দুধ দই বিক্রী করতে হয়। নপুংসক আইহনের স্ত্রী হয়েও সে তার জীবনকে মেনে নিয়েছে স্বাভাবিকভাবে। কিন্তু এই সামান্য নারী আত্মসম্মানে ও আত্মমর্যাদা রক্ষায় তৎপর। বড়াই যখন কৃষ্ণের কুপ্রস্তাব নিয়ে তার কাছে আসে তখন রাধা ক্রুদ্ধ হয়ে বড়াইকে প্রহার করে ও কৃষ্ণের অন্যায় প্রস্তাবের প্রবল বিরোধিতা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার বঞ্চিত ব্যর্থ নারীত্ব কৃষ্ণপ্রেমেই জীবনের সার্থকতা অন্বেষণ করতে পেরেছে। তার দৈবীস্বরূপ উপলব্ধির জন্য নয়, তার জীবনবোধের পূর্ণতা সে নির্ণয় করেছে কৃষ্ণের মধ্যে। অবশ্য তার জীবন দুঃখের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ। তাই কৃষ্ণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পিতা হবার পর আবার তীব বিচ্ছেদ-বেদনায় রাধার জীবন ভেঙে পড়ে। তার আকুল হাহাকারে ব্যাকুল ক্রন্দনে কাহিনির শেষ হয়। চরিত্রের বাস্তবতা অক্ষুন্ন রেখে তার মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ও হৃদয়ধর্মের গভীরতার প্রকাশে লেখক

টিপ্পনী

সার্থক। রাধার চরিত্রচিত্রণের অনন্যতা বিষয়ে সমালোচকের মতামত আমরা স্মরণ করতে পারি – 'একেবারে প্রথমাবধি প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি দিনক্ষণটির পুংখানুপুংখ চিত্রায়নের মধ্য দিয়ে একটি জীবন-কোরককে ধীর-সংযত শিল্পীর মতোই মুক্ত বিকশিত করেছেন কবি অনন্ত বড়ু চন্ডীদাস। আর সেই সামাজিক নারীত্বের বিকশিত জীবন শতদলকেই অভিহিত করেছেন রাধা নামে। বস্তুতঃ আদ্যন্ত রাধা চরিত্রটি মধ্যযুগীয় লোক-জীবন-ট্রাজেডির একটি অনবদ্য রস-মূর্তি। কেবল বহিরঙ্গ জটিলতার ঊষর কাঠিন্যই নয়,সেকালের স্থূল সমাজ-জীবনাচারের অন্তরালবর্তী প্রেমভাবের ফল্গুধারাটিকেও কবি আবষ্কার করেছেন আশ্চর্য সহৃদয়তার সঙ্গে' (ভূদেব চৌধুরী)।

টিপ্পনী

খ. **শ্রীকৃষ্ণ ঃ** শ্রীকৃষ্ণ এক অনুদার সংকীর্ণ ভোগী পুরুষ। কৃষ্ণ স্বয়ং নারায়ণ, অত্যাচারী কংসের অত্যাচার বন্ধ করার জন্য তার মর্ত্যে নরদেহে আবির্ভাব। কিন্তু তার চরিত্রে দেবোচিত মহিমা মর্যাদা বা পবিত্রতার কোনো ছাপ নেই। এক গ্রাম্য অমার্জিত লুব্ধ যুবকরূপেই সে উপস্থাপিত হয়েছে। নারীর হৃদয় জয় করার মতো সমুন্নত পৌরুষ বা সহৃদয় মহত্ত্ব কিছুই তার নেই। এক লোভী লোলুপ কামপরায়ণ মানুষই উপস্থাপিত হয়েছে কৃষ্ণের মাধ্যমে। সে রাধাকে লাভ করে কিন্তু তারপরই সে মথুরায় চলে যায় রাধাকে পরিত্যাগ করে আরো বৃহৎ কার্যের জন্য। এতে কৃষ্ণর কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ঐশ্বরিক তাৎপর্য বাদ দিলে সামাজিক বিচারে এই কাজ ন্যায়নীতি ও বিবেক বর্জিত। এক ন্যায়নীতিবোধবর্জিত বাস্তব চরিত্রের রূপায়ণ কবি দক্ষতার সঙ্গে দেখিয়েছেন।

গ. **বড়ায়ি ঃ** বড়ায়ি কুটনী বা ব্যাভিচারের দূতীরূপেই অঙ্কিত। সে সম্পর্কে রাধার মায়ের পিসী, রাধাকে দেখাশোনার জন্য আইহন তাকে নিযুক্ত করেছিল। কিন্তু সে রাধাকৃষ্ণের মিলনের দৌত্যকার্য করেছে। সে কৃষ্ণর কাছে রাধার রূপযৌবনের কথা বলেছে এবং রাধার কাছে করেছে কৃষ্ণগুণগান। অবশ্য বড়ায়ি একে অবৈধ বা অন্যায় মনে করেনি, কারণ সে জানে কৃষ্ণ স্বয়ং নারায়ণ এবং রাধা তারই আত্মবিস্মৃতা স্ত্রী। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী মর্ত্যে রাধারূপে জন্মগ্রহণ করেছে। এই দৈবী প্রেক্ষাপট বড়ায়ির কার্যকে সমর্থনযোগ্য করায়। কিন্তু তা বাদ দিলেও গ্রাম্য কুটনীর নিখুঁত রূপ তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এর দেহবর্ণনা কথাবার্তা ও মানসিকতার মধ্য দিয়ে গ্রামের এক নিম্ন প্রবৃত্তির নারীর রূপ স্পষ্ট হয়েছে। "তবুও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বড়ায়ি শেষ পর্যন্ত কুট্টনীই রহিয়া যায় নাই। গোড়ায় সে কৃষ্ণের দূতী কিন্তু পরিণামে সে রাধারই বড় মা, রাধার জন্য 'আমি যাই করি মোর আকুল পরাণ' – তাহার অন্তরের কথা" (ড. সুকুমার সেন)।

৫. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মোটাদাগের কাব্যরূপে বিবেচিত হলেও এর মধ্যে কোনো কোনো জায়গায় কব্যিকতা চরমসীমায় পৌঁছেছে বিশেষত গীতিকাব্যের অতি উচ্চ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। রাধার বেদনা ও তীব্র আকূতির প্রকাশে লেখক অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। বৈষ্ণব পদাবলি যে সীমার মধ্য দিয়ে অসীমের সন্ধান দেয়, ক্ষুদ্র সীমাসংবৃত জীবনকে অতিক্রম করে অনন্তের মহাজীবনের বার্তা আনে বংশীখন্ড ও বিরহখন্ডে তার পরিচয় পাওয়া যায়। দুটি বহুল পরিচিত অংশ এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হল –

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।।
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন।।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা।।...
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী।।

টিপ্পনী

বংশীর মধ্য দিয়ে যে অনাহত সুর ঝংকৃত হয় তার মধ্য দিয়ে অনন্তের আহ্বান ধ্বনিত হয়। সে ডাক যে শোনে এই খন্ডিত ক্ষুদ্রপরিসর জীবনের অচলায়তনের গন্ডিকে অতিক্রম করে সে পরমের অভিসারী হয়। পদটি সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন – 'কালিন্দী নদীর কূলে, গোকুলের গোঠে অবিরত যে বংশীধ্বনি হইতেছে, বিশ্বব্রহ্মান্ডকে তাহা গোলক অভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে। বড়ু চন্ডীদাস বাঙ্গালী জাতিকে তার দূরাগত প্রতিধ্বনি শুনাইয়া গিয়াছেন; সেই বাঁশীর স্বরের নিকটে সকল তত্ত্বকথা শস্ত্রকথা মিলাইয়া যায়।'

রাধাবিরহেও রাধার বেদনা তীব্র মর্মস্পর্শী হয়ে প্রকাশ পায় –

এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ আসার।
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার।।
মুছিআঁ পেলায়িবোঁ য়ে সিসের সিন্দুর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শংখচুর।।
দারুণী বড়ায়ি গো দেহ প্রাণদান।
আপনার দৈব দোষে হারায়িলোঁ কাহ্ন।।
মুণ্ডিয়া পেলাইবোঁ কেশ জাইবোঁ সাগর।
যোগিনীরূপ ধরী লইবোঁ দেশান্তর।।
যবেঁ কাহ্ন না মিলিহে করমের ফলে।
হাথে তুলিআ মো খাইবোঁ গরলে।।

বিরহের অনন্ত সাগরে রাধা নিজেকে বিলীন করে দিয়েছেন। এইসব অংশ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ধূলিমলিনতা মুছিয়ে দিয়ে তাকে শুদ্ধ স্নাত করে সৌন্দর্যের উৎসারণে অপরূপদীপ্ত করেছে।

৬. বড়ু চন্ডীদাসের জ্ঞান ও পান্ডিত্যের পরিচয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে বিশেষভাবেই দেখা যায়। লেখকের পুরাণজ্ঞানের পরিচয় গ্রন্থে আদ্যন্ত পরিব্যপ্ত। পুরাণ কথা অনুসারেই লেখক কাহিনির কাঠামো নির্মাণ করেছেন। রাধাকৃষ্ণের জন্মকথা, কংসের নিধনের জন্য কৃষ্ণর আবির্ভাব, বৃন্দাবন খন্ডের রাসলীলা কালীয়দমন ইত্যাদির প্রকাশ, বিবিধ চরিত্রের অবতারণা ইত্যাদিতে পৌরাণিক প্রভাব আছে। লেখক সংস্কৃত শাস্ত্র সাহিত্যেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি জয়দেবের গীতগোবিন্দ বিশেষভাবে পড়েছেন ও তদনুযায়ী কাব্যের প্রকরণকে সজ্জিত করেছেন। সর্গের বিন্যাস, সর্গের নামকরণ, খন্ডশেষে সমাপ্তিসূচক সংস্কৃতবাক্য ইত্যাদিতে জয়দেব প্রভাবিত করেছেন

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকার বড়ু চণ্ডীদাসকে। বড়ু চণ্ডীদাস গীতগোবিন্দর কয়েকটি পদ অনুবাদও করেছেন যার একটি নিদর্শন দেওয়া হল –

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহর বেশম

গীতগোবিন্দর এই অংশকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এইভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে –

তোর রতি আশোআশেঁ গেলা আভিসারে।
সকল শরীর বেশ করী মনোহরে।। (বৃন্দাবন খন্ড)

টিপ্পনী

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কাহিনির সূচনায় ও শেষে কাহিনির সংগতিরক্ষাসূচক সংস্কৃত শ্লোকের ব্যবহার দেখা যায়। অনুষ্টুপ ছন্দে কয়েকটি শ্লোক রচিত হয়েছে। তোটক মালিনী প্রভৃতি ছন্দেরও সুপ্রয়োগ দেখা যায়।

৭. কাহিনিকাব্যরূপে বা গীতিকাব্যরূপে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বিবেচিত হয়। কিন্তু এটির মধ্যে নাটকেরও উপাদান আছে। রাধা কৃষ্ণ ও বড়াই – এই তিনজনের সংলাপের মধ্য দিয়ে নাটক নির্মিত হয়েছে। বলা যেতে পারে বাংলা নাট্যরীতির প্রথম নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন–এ পাওয়া যায়। অন্তত লৌকিক নাট্যরীতির সুন্দর উদাহরণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাওয়া যায় তা অনস্বীকার্য।

৮. লেখকের সংস্কৃত রসশাস্ত্র অলংকার শাস্ত্রের জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে। রাধার চরিত্র নির্মাণে এই শাস্ত্র পাঠের সুন্দর প্রয়োগ আছে। কীভাবে প্রণয় অনভিজ্ঞ এক সাধারণ নারী অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে 'প্রৌঢ়া পারাবর্তী'তে যেন রূপান্তরিত হয়েছে স্তরপরম্পরায় মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে অলংকার শাস্ত্রানুযায়ী কথিত হয়েছে। নায়ক–নায়িকার রূপবর্ণনায় লেখক অলংকারশাস্ত্রের নির্দেশ মেনেছেন।

৯. কাব্যং গ্রাহ্যম অলংকারাৎ। উৎকৃষ্ট অলংকার প্রয়োগে লেখকের গভীর রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। অজস্র উপমা অলংকার প্রযুক্ত হয়েছে। উৎপ্রেক্ষা অলংকার আছে, বিষম ইত্যাদি অলংকারও সুন্দর ব্যবহৃত হয়েছে। অলংকারের নিপুণ ব্যবহারে কাব্যসরস্বতীর কায়া অপরূপ সুন্দর লাবণ্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

১০. ড. সুকুমার সেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের অনন্যতা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন যে 'সমসাময়িক বাঙ্গালা সাহিত্যের মানদন্ডে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মহাকাব্য' (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খন্ড)।

অনুশীলনী

বড়ো প্রশ্ন

১) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' –এর পুথি আবিষ্কার ও প্রকাশের ইতিহাস লিখুন। প্রসঙ্গত পুথি–বিচার করুন।

২) যেখানে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সমাপ্তি, সেইখান থেকে বাংলা বৈষ্ণব পদাবলির আরম্ভ – আলোচনা করুন।

করুন।

৩) দ্বাদশ শতাব্দীর পর থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভ ভাগ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে বন্ধ্যাযুগ বলবার কারণ আলোচনা করুন।

৪) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর গুরুত্ব আলোচনা করুন।

টিপ্পনী

ছোট প্রশ্ন ঃ

১) প্রাক্-চৈতন্যযুগের কৃষ্ণলীলাবিষয়ক রচনায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন।

২) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর রচনাকাল সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কোন্ রীতির রচনা?

৪) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' -এর কবির পরিচয় দিন।

গ্রন্থ পরিচিতি

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খন্ড – সুকুমার সেন, আনন্দ সংস্করণ জানুয়ারী। ১৯৯১

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খন্ড –অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মর্ডান বুক এজেন্সী, কলকাতা

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খন্ড –অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মর্ডান বুক এজেন্সী, তৃতীয় সংস্করণ

৪। বাংলা সাহিত্যের কথা– প্রথম মাওলা বাদার্স সংস্করণ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

৫। বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস – চতুর্থ সংস্করণ, ভূদেব চৌধুরী

৬। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা – প্রথম পর্যায়, পঞ্চম সংস্করণ, ভূদেব চৌধুরী

৭। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা – প্রথম খন্ড, গোপাল হালদার

৮। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস – ক্ষেত্র গুপ্ত, প্রথম সংস্করণ, গ্রন্থনিলয়।

৯। বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, আহমদ শরীফ, বর্ণ মিছিল, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৭৮

১০। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খন্ড, সুকুমার সেন, আনন্দ, ষষ্ঠ সংস্করণ, অষ্টম মুদ্রণ, ২০০৭

১১। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস – ক্ষেত্রগুপ্ত গ্রন্থনিলয়, ত্রয়োদশ সংস্করণ, জুলাই – ২০০৯

১২। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ পরিচয়, ড. দিলীপকুমার মিত্র, দিশারি প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৩

১৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, আদি ও মধ্যযুগ, ড. দেবেশকুমার আচার্য্য, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, জুন, ২০১৩

১৪। বৈষ্ণব পদাবলীর নবমূল্যায়ন, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, পুস্তক বিপণি, মার্চ, ২০১০

১৫। উচ্চমাধ্যমিক বাংলা ভাষা প্রকাশ, অমিতাভ দাস, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, মার্চ, ২০১২

তৃতীয় একক

পঞ্চদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী

উদ্দেশ্য
পঞ্চদশ শতক ঃ বাংলার প্রধান রাজনৈতিক ঘটনাবলি
পঞ্চদশ শতক ঃ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাতাবরণ
পদাবলি সাহিত্য ঃ বিদ্যাপতি
    জীবন
    রচনা
    বাংলা সাহিত্যে কেন গুরুত্বপূর্ণ?
    বিদ্যাপতি ও তাঁর কবি প্রতিভার মূল্যায়ন।
পদাবলি সাহিত্য ঃ চণ্ডীদাস
    চণ্ডীদাস সমস্যা
    পদকর্তা চণ্ডীদাস
    চণ্ডীদাস ও তাঁর বিভিন্ন রসপর্যায়ের পদে কবি কৃতির মূল্যায়ন
    দীন চণ্ডীদাস
    সহজিয়া চণ্ডীদাস
    অন্যান্য কবি
ভাগবত অনুবাদ ঃ মালাধর বসু ও শ্রীকৃষ্ণবিজয়
    কবির জীবন
    সাহিত্য পরিচিতি ও কাব্যের গুরুত্ব
রামায়ণ অনুসারী সাহিত্য
    কৃত্তিবাস ঃ জীবন
    কাব্য পরিচয়
    সাহিত্য ও সমাজে এই অনুবাদের গুরুত্ব
অনুশীলনী

উদ্দেশ্য

পঞ্চদশ শতকের বিভিন্ন সাহিত্যধারার সঙ্গে পরিচয় দান এই এককের উদ্দেশ্য। পঞ্চদশ শতকে বিভিন্ন ধারায় বাংলা সাহিত্য প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। আদিযুগে 'পদ' রীতির সাহিত্য চর্যাপদ। চতুর্দশ শতকে নাট্যগীতি পাঞ্চালীর নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। পঞ্চদশ শতকে 'পদ' রীতিতে পাচ্ছি বৈষ্ণবপদাবলি। 'পাঞ্চালী' রীতির দুই ধরনের সাহিত্য আছে পঞ্চদশ শতকে – পৌরাণিক পাঞ্চালী ও অ-পৌরাণিক পাঞ্চালী। অ-পৌরাণিক ঐতিহ্যে যে নতুন দেবতা পরিকল্পনা করা হয়েছে সেই দেবতার মাহাত্ম্যজ্ঞাপক যে গান তাই হল অ-পৌরাণিক পাঞ্চালী। অবশ্য ওই দেবতাকে পৌরাণিক দেবতায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সুতরাং এ ধরনের বিভাজন বিতর্কিত বিষয়। কেবল পাঞ্চালী বলাই নিরাপদ। পৌরাণিক পাঁচালির অন্তর্ভুক্ত করতে পারি ভাগবতের

অনুবাদ ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’কে এবং রামায়ণ অনুসারী কাব্য ‘শ্রীরামপাঁঞ্চালী’কে। অ-পৌরাণিক ঐতিহ্যে পরিকল্পিত পঞ্চদশ শতকের দেবতা মনসা। মনসাকে নিয়ে লোকজীবন-স্পর্শী সাহিত্য মনসামঙ্গল রচনা শুরু হয়েছে। রাধাকৃষ্ণ কাহিনি এবং রামায়ণ কাহিনি দুটিই ‘সংস্কৃতের বস্তু’। ‘বাংলার জিনিস’ নিয়ে পঞ্চদশ শতকে যা রচিত হয়েছে তার মধ্যে আমরা পাই মনসামঙ্গলের কয়েকখানা প্রাচীন পুথি।

টিপ্পনী

পাঞ্চালী কাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুকুমার সেন বলেছেন – ‘পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্য ত্রিধারায় প্রবাহিত। প্রথম গীতিকবিতা, দ্বিতীয় পৌরাণিক গেয় অথবা পাঠ্য আখ্যায়িকা, তৃতীয় অ-পৌরাণিক গেয় কবিতা আখ্যায়িকা। শেষ দুই ধারার রচনার রূপ বা ফর্ম প্রায় একই রকম বেং সে ফর্মের নামও এক “পাঞ্চালী”। দেবতার আখ্যানময় পাঞ্চালী কাব্যের নামে নায়ক দেবতার নামের পরে “মঙ্গল” কথাটি যুক্ত থাকে (কখনও কখনও “বিজয়”)। মঙ্গল শব্দটির অর্থ গৃহকল্যাণ। অতএব বোঝা যাইতেছে যে গোড়ার দিকে এই আখ্যায়িকাগুলি গার্হস্থ্য মাঙ্গল্য কর্মের (অথবা বতের) সঙ্গে যুক্ত ছিল। প্রাচীন কবিরাও তাই অনেকে নিজেদের রচনাকে ‘বতগীত’ বলিয়াছেন। “বিজয়” মানে দেবতার জয়যাত্রা অর্থাৎ জয়কাহিনি। কল্যাণের দিক দিয়া দেখিলে “মঙ্গল”, ভক্তির চোখে দেখিলে “বিজয়”। . ... দেবপূজা প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষ্যে এসব কাহিনী দীর্ঘদিন ধরিয়া গীত-প্রযুক্ত হইত। কতক অংশ গানের মতো নাচের তালে গাওয়া হইতে (“নাচাড়ি”)। বাকি অংশ সুরে তালে গাওয়া হইত (“পয়ার” বা “শিকলি”)। গ্রাম্যদেবদেবীর পূজা উপলক্ষ্যে তাঁহাদের মাহাত্ম-কাহিনী গীত হইবার সময়ে আসরে একটি অথবা দুইটি ঘট রাখিয়া তাহাতে দেবাধিষ্ঠান কল্পিত হইতে। যিনি অধিকারী তিনি “মূল গায়ক”। তাঁহার হাতে থাকিত কঙ্কণ (তোড়া) এবং চামর, এক অথবা দুই পায়ে নূপুর। তাঁহার সহকারীরা “দোহার” বা “পালি”। ইঁহারা ধুয়া গাহিতেন এবং প্রয়োজন মতো মৃদঙ্গ ও মন্দিরা বাজাইতেন। “(পাঞ্চালীতে থাকিত নাচ। পটদেখানো হইলে আখ্যায়িকা অংশ থাকিত না।)”

– ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’ প্রথম খন্ড, ষষ্ঠ আনন্দ সংস্করণ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, পৃ.-১০৩।

‘পদ’ শব্দের সর্বপ্রাচীন উল্লেখ আছে ভারতের নাট্যসূত্রে। বাক্য ও সংগীত – দুই অর্থে পদ শব্দের উল্লেখ করেছেন আচার্য ভরত। কালিদাস ‘মেঘদূতম্’ কাব্যে ‘সংগীত’ অর্থে ‘পদ’ শব্দ ব্যবহার করেছেন। চর্যাগীতির টীকাতে পদ শব্দের অর্থ ধরা হয়েছে দুই ছত্রের কবিতাংশ।
“পদাবলী” শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন জয়দেব। “মধুর কোমলকান্ত পদাবলী” বলতে তিনি সম্ভবত দুই ছত্রযুক্ত কয়েকটি পদের সমষ্টি একটি পূর্ণাঙ্গ কবিতা বুঝেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ‘পদ’ শব্দটিই একটি পূর্ণাঙ্গ সংহত সংগীতরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। ‘পদাবলী’র অর্থ দাঁড়িয়েছে এইরূপ অনেকগুলি সংগীতের সমষ্টি। ‘বৈষ্ণবপদাবলী’র পদাবলি শব্দটি এই অর্থেই প্রযুক্ত। বৈষ্ণব ধর্মভিত্তিক রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে অবলম্বন করে রচিত পদাবলি হল ‘বৈষ্ণবপদাবলি’। সাধারণভাবে বিষ্ণুর ভক্ত বা উপাসকদের বৈষ্ণব বলা হয়। এখানে শুধু কৃষ্ণ বাসুদেবরূপী বিষ্ণুর উপাসকদের বৈষ্ণব বলা হয়েছে।

বৈষ্ণব পদাবলির ত্রিস্তর। প্রথম স্তর – চৈতন্য-পূর্ববর্তী, দ্বিতীয় স্তর – চৈতন্য-সমকালীন এবং তৃতীয় স্তর – চৈতন্য-পরবর্তী। পঞ্চদশ শতকের বৈষ্ণব পদাবলি বলতে আমরা প্রথম স্তরের বৈষ্ণব পদাবলি বুঝি। জয়দেব ছাড়া চৈতন্য-পূর্ববর্তী স্তরে আছেন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। প্রাক্‌চৈতন্য যুগের কবিদের ধর্মচেতনা ও কাব্যাদর্শ আলাদা ছিল। কিন্তু পরবর্তী কবিদের রচনায়

রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বের আদর্শ ব্যাখ্যা মুখ্য। প্রাক্-চৈতন্য পদাবলি সাহিত্যে কেবল রাধাকৃষ্ণলীলা। পরবর্তী কবিদের সাহিত্য আছে এর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ও গৌরাঙ্গলীলা। চৈতন্য-পূর্বযুগে অলংকার শাস্ত্রোক্ত লীলাপর্যায় অনুসৃত হয়। পরবর্তীকালে উজ্জ্বল নীলমণি অনুসৃত হয়।

পঞ্চদশ শতক ঃ বাংলার প্রধান রাজনৈতিক ঘটনাবলি

টিপ্পনী

সিকন্দরের (রাজত্বকাল ১৩৫৭-১৩৯৩) পুত্র গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ (মৃত্যু - ১৪১০ খি.) ন্যায়পরায়ণ, প্রতাপশালী ও বিদ্যোৎসাহী রাজা ছিলেন। মৈথিল কবি বিদ্যাপতি তাঁর প্রশংসা করেছেন।

১৪১৪ খিস্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীনভাবে ইলিয়াস শাহের বংশধরেরা রাজত্ব করে গেছেন। এই বংশের এক সন্তানকে কৌশলে হত্যা করে দিনাজপুরের ভাতুড়িয়া পরগনার জমিদার রাজা গণেশ সিংহাসন অধিকার করেন (১৪১৬ খি.)। তাঁর পুত্র পিতার মৃত্যুর পর জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহ (১৪০৮-১৪৩১ খি.) নাম নিয়ে বাংলার সিংহাসনে বসেন। তিনি শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রেখে বাংলাদেশ শাসন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অপদার্থ পুত্র আহম্মদ শাহ কিছুকাল রাজত্ব করেন। তাঁর অত্যাচারে সকলে বিরক্ত হয়। তাঁর এক ক্রীতদাস তাঁকে হত্যা করে। তাঁর সঙ্গেই বাংলায় রাজা গণেশের বংশের রাজত্বকাল শেষ হয় এবং ইলিয়াস শাহের বংশের মাহমুদ শাহ বাংলার সুলতানি পদ লাভ করেন (১৪৪২ খি.)। এই বংশে শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহ (১৪৭৮-৮২) বিদ্যোৎসাহী সুলতান ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ বিজয় -এর (১৪৭৩-৮০) কবি মালাধর বসুকে 'গুনরাজ খান' উপাধি দেন। সামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহের আগে রকনুদ্দীন বারকশাহ (১৪৫৬-১৪৭৪) বাংলাদেশ শাসন করেন। য়ুসুফ শাহের পরে রাজত্ব করেন জালালুদ্দীন ফতেশাহ। ইদিন ১৪৮৭ খিস্টাব্দে একজন হাবসি ক্রীতদাসের হাতে নিহত হন। ইলিয়াস শাহী সুলতানেরা আফিকা থেকে হাবসী ক্রীতদাস এনেছিলেন। এরা সুলতানদের অনুগ্রহে বড়ো বড়ো পদ লাভ করত। কিন্তু পরে এরা দেশের শান্তি নষ্ট করে। মুজফ্‌ফর শাহ নাম নিয়ে এদেরই একজন বাংলার সুলতানি পদ অধিকার করেছিলেন। তাঁর অত্যাচারে রাজ্যের সমস্ত প্রজা তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। সৈয়দ হুসায়ন নামে তাঁর এক মন্ত্রী ছিল। প্রজারা মুজফ্‌ফর শাহকে হত্যা করে হুসায়নকে বাংলার সুলতান করে সিংহাসনে বসান (১৪৯৩ খি.)। তিনি বাল্য জীবনে সুবুদ্ধি রায় নামে এক হিন্দুর ভৃত্য ছিলেন। হুসায়ন শাহের মতো উপযুক্ত সুলতান বাংলা দেশে খুব কমই রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর সিংহাসন লাভের কিছু আগে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন (১৪৮৬)। রূপ ও সনাতন হুসেন (হুমায়ন) শাহের কর্মচারী ছিলেন। তাঁর সময়ে বাংলা সাহিত্যের উন্নতি হয়। ১৫১৯ খিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর বংশধারা ১৫৩৮ খিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ওই বছর শেরশাহ বঙ্গদেশ অধিকার করেন।

পঞ্চদশ শতক ঃ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাতাবরণ

হিন্দু সমাজ প্রাণপণ প্রয়াসে নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরেছিল। তারই সাহায্য সমাজ সংরক্ষণ করতে চাইল। স্মার্ত পণ্ডিতরা জাতিভেদ ও আচারধর্মের গণ্ডির মধ্যে হিন্দু সমাজকে আরও সংকীর্ণ আরও রক্ষণশীল করে তুললেন। ম্লেচ্ছ-সংযোগ হলেই সমাজ থেকে বর্জন - এই ছিল নিয়ম। যদুকে তাঁর পিতা গণেশ হিন্দুধর্ম ফিরিয়ে আনতে পারেন নি। এ থেকে

কঠোরতা কতটা ছিল তা অনুমান করা যায়। আসলে এই রকম বজ্রবন্ধনে সমাজকে না বাঁচালে সেদিন হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সমাজ ইসলামের প্লাবনে ভেসে যেত।

সুলতানরা ক্রমশ বাঙালিতে পরিণত হচ্ছিলেন। ইলিয়াস শাহি বংশের রাজাদের কেউ কেউ এবং হুসেন শাহ ও তার পুত্র বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণা করেছেন। পির-ফকিররা এদেশে এসে হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিরোধ জিইয়ে তুলতেন। হিন্দু সমাজও কঠোর প্রতিরোধ বিন্দুমাত্র শৈথিল্য করেনি। অবশ্য হিন্দুরা মুসলমান রাজশক্তির বিরুদ্ধতা করেনি। তাই রাজশক্তিও হিন্দুদের সাংস্কৃতিক আত্মরক্ষার চেষ্টায় অর্থাৎ তাদের মুসলমানের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলার চেষ্টায় বিশেষ বাধা দেয়নি। ষোড়শ শতকের গোড়ায় এসে দেখা যাচ্ছে এক দেশে বসবাস করে একই রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জীবনযাপন করে, একই ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির বাতাবরণে থেকে হিন্দু-মুসলমান বাঙালি হয়ে গিয়েছিল। এই সময়ের বাংলা সাহিত্য হিন্দু ও মুসলমান বাঙালির সমবেত সৃষ্টি। অবশ্য মুসলমান বিষয়বস্তু বা মুসলমান রচনাশৈলীর ছাপ এই সময়ের রচনায় নেই। এগুলি এসেছে অনেক পরে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুসলমানরা সংস্কৃত বিষয়বস্তুতে আগ্রহী ছিলেন।

টিপ্পনী

সামাজিক পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ চলছিল। টোলে, চতুষ্পাঠীতে দর্শন ও স্মৃতির অনুশীলন হত। চৈতন্যদেবের জন্মের আগে থেকেই নবদ্বীপ নব্যন্যায়ের তীর্থক্ষেত্র। মুসলমান সুলতানদের নিযুক্ত কর্মচারীরাও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। এই সাংস্কৃতিক প্রয়াসের অন্য অর্থ ছিল বাংলা ভাষায় রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতির প্রচার।

পদাবলি সাহিত্য ঃ বিদ্যাপতি

মূলত রাধা-কৃষ্ণের লীলাকথা পদাবলির বিষয়বস্তু। সখ্য ও বাৎসল্যরসের পদ পদাবলি সাহিত্যে বেশি নেই। রাধাকৃষ্ণের জন্ম ও বাল্যলীলার পদের সংখ্যাও কম। মধুররসের অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের লীলারসের পদের সংখ্যাই প্রচুর। রাধাকৃষ্ণ লীলাকথা অনেক পুরোনো। হালের 'গাথাসপ্তশতী'তে রাই, কানু ও গোপীদের কথা আছে। আলংকারিক আনন্দ বর্ধন তাঁর 'ধ্বন্য-লোক' গ্রন্থে রাধা- কৃষ্ণ লীলাবিষয়ক রচনা থেকে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। ক্ষেমেন্দ্রের 'দশাবতারচরিত' -এ রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত আছে। তারপর জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-র অব্যবহিত পরে 'সদুক্তিকর্ণামৃত' ও 'কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়'-নামে দুখানি কোশকাব্যে রাধা-কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কবিতা আছে। হুসেনশাহের সিংহাসন প্রাপ্তির অব্যবহিত পূর্বে হাবসিদের কুশাসনের সময় চতুর্ভুজ নামে এক পণ্ডিত রচনা করেন 'হরিচরিত' নামে গ্রন্থ। পঞ্চদশ শতাব্দীর পদাবলি সাহিত্যের দুজন কবি - বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস।

বিদ্যাপতি সংস্কৃত পণ্ডিত এবং মৈথিল কবি। বাঙালি ছাত্ররা ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য মিথিলায় যেতেন। তরুণ ছাত্ররা বিদ্যাপতির প্রেম কবিতা শুনতেন এবং নিজেরাও কেউ কেউ গাইতেন। তাঁরা অধ্যয়ন শেষে দেশে ফেরার সময় বিদ্যাপতির পদাবলি নিয়ে আসতেন। চৈতন্যদেব বাল্যে লোকমুখে বিদ্যাপতির পদাবলি শুনেছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পরেও ঈশ্বর প্রেমে উন্মত্ত অবস্থায় তিনি বিদ্যাপতির পদাবলি শুনতেন।

জীবন

বিদ্যাপতির জন্মস্থান দ্বারভাঙা জেলার মিথিলার অন্তর্গত বিসফি গ্রাম। পিতার নাম গণপতি ঠাকুর। দীর্ঘজীবী কবি মিথিলার, রাজা কীর্তিসিংহ, দেবসিংহ, শিবসিংহ ও লছিমাদেবী, পদ্মসিংহ ও বিশ্বাসদেবী, নরসিংহ ও ধীরমতী, ভৈরবসিংহ প্রমুখের পৃষ্ঠপোষকায় সংস্কৃত ও অবহট্‌ঠ ভাষায় নানা গ্রন্থ রচনা করেন। মৈথিলী ভাষায় তিনি রাধা-কৃষ্ণলীলা বিষয়ক অজস্র উৎকৃষ্ট পদ, হরগৌরী বিষয়ক পদ, এমনকী রাম-সীতা ও গণেশ বিষয়ক অনেকগুলি পদ রচনা করেন। রাজা শিবসিংহ কবিকে ২৯৩ লক্ষণ সংবতে (১৪১২ খিস্টাব্দে) বিসফি গ্রাম দান করেন। বিদ্যাপতির আবির্ভাব ও মৃত্যু সম্বন্ধে ঠিক কথা বলা সম্ভব নয়। পণ্ডিতদের মতে তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর অষ্টম বা নবম দশকের কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৬০ খিস্টাব্দে তিনি সুস্থ শরীরে জীবিত ছিলেন। এরপর কোনো এক সময়ে তাঁর মৃত্যু হয়। মিথিলার প্রবাদ অনুসারে কবি নব্বই বছর বেঁচে ছিলেন।

রচনা

বিদ্যাপতি ছিলেন বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী। বিভিন্ন ভাষাতে তাঁর অধিকার ছিল। স্মৃতিশাস্ত্র ও সাধনগ্রন্থ লিখেছেন সংস্কৃত ভাষায়। 'পুরুষপরীক্ষা' নামক কথাসাহিত্য লিখেছেন সংস্কৃততেই। 'কীর্তিলতা' ও 'কীর্তিপতাকা' নামে দুখানি ইতিহাস গ্রন্থ লিখেছেন অবহট্‌ঠ ভাষায়। হরগৌরী-বিষয়ক পদ লিখেছেন মৈথিল ভাষায়। মৈথিল ভাষায় রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কিছু পদ মিথিলায় পাওয়া গেছে। মধুররস বিষয়ক যে পদাবলির জন্য বিদ্যাপতির কবি-খ্যাতি সেগুলি পাওয়া গেছে বাংলাদেশে। সেগুলির ভাষা মৈথিল নয় – বজবুলি। বাংলা-মৈথিল ভাষার মিশ্রণে এবং অবহট্‌ঠের ঠাটে বজবুলি ভাষার উৎপত্তি। এই মিশ্র ভাষাকে আশ্রয় করে বিদ্যাপতি অধিক সংখ্যক বৈষ্ণব কবিতা লিখেছিলেন।

সংস্কৃত অলংকার এবং কাব্যশাস্ত্রে বিদ্যাপতির প্রগাঢ় অধিকার ছিল। প্রণয় কলা বিষয়ে সংস্কৃত অলংকার ও সৌন্দর্যক্রম এবং প্রাকৃত নরনারীর হৃদয়ার্তির জীবন্ত রূপবিন্যাস তাঁর রচনাকে অতুল্য সম্পদে ভরে তুলেছে। তাঁর কবিতায় মর্ত্যজীবন চেতনা নির্ভর প্রেমের উন্নীত পরিণাম লক্ষ করা যায় যা পরবর্তী সময়ের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের পরিরুন্থী হয়নি।

বয়ঃসন্ধি, পূর্বরাগ, অভিসার, মিলন, মান, প্রেমবৈচিত্র্য, মাথুর ও ভাব-সম্মিলনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিদ্যাপতির নায়িকার ক্রমবিকাশ ও পরিণতি ঘটেছে। রাধাচরিত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তাকে অমর্ত্য লোকের বাসিন্দা করে তুলেছেন কবি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন – "বিদ্যাপতির রাধা অঙ্গে অঙ্গে মুকুলিত বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, সৌন্দর্য ঢল ঢল করিতেছে।" রহস্যচপল প্রণয়কলা কুতূহলের একটি ছবি –

মুখরুচি মনোহর অধর সুরঙ্গ।
ফুটল বান্ধুলি কমলক সঙ্গ।।
লোচন যুগল ভৃঙ্গ আকার।
মধু মাতল কিয়ে উড়ন ন পার।।

টিপ্পনী

শুধু চপলতার রূপসজ্জাতেই নয় – বিপ্রলব্ধ প্রেমের গভীর বেদনার্তিরও শিল্পরূপ দিয়েছেন কবি –

জনম অবধি হাম রূপ নেহারল
নয়ন না তিরপিত ভেল।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় – "যাঁহার রাধা সদা হাস্যময়ী, সদাচঞ্চল, দুঃখের ছায়াও যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তিনিও বিরহে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন। রাধার সেই কলহাস্য, সেই গীতি-চাঞ্চল্য স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।... যে মুহূর্তে শ্যামসুন্দর বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিলেন – তাহার গতিবেগ অবরুদ্ধ হইল, সমস্ত সঙ্গীত, সমস্ত চাঞ্চল্য পলকে থামিয়া গেল।" ('পদাবলি পরিচয়', দে'জ, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ১০১)

টিপ্পনী

আবার প্রার্থনার পদে বিদ্যাপতির আত্মনিবেদন নিরাভরণ ব্যক্তিক রূপে অভিব্যক্তি পেয়েছে –

"মাধব বহুত মিনতি বিদ্যাপতির করি তোয়
দেই তুলসী তিল এ দেহ সোপলু
দয়া জনু ছোড়বি মোয়।"

এই পর্যায়ে উপলব্ধির গভীরতায় তিনি বৈষ্ণব – যদিও ইতিহাসের উপাদানের বিচারে কবি শৈব।

আদিরসকে ভিত্তি করে বিদ্যাপতি শৃঙ্গারকে ভক্তির উচ্চমার্গে তুলে সমর্থ হন। বিষয়বস্তু, ছন্দ, সংগীতধর্ম ও ভাববৈচিত্র্যে তিনি বিশিষ্ট কবি। প্রাকৃত প্রণয়ের মধ্যে ভক্তির আকৃতি ফুটিয়ে বিদ্যাপতি বাংলা কাব্যের একটা প্রধান বিবর্তন ধারার সূচনা করেন। কবি রাধাকৃষ্ণের ভাগবতী সত্তা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। মর্ত্য জীবনের রসরুচির দ্বারা প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও তা খাঁটি প্রাকৃত প্রেমের কবিতা হয়ে ওঠেনি। বরং প্রাকৃত কবিতা তাঁর অবলম্বন হওয়ায় রাধা-কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কবিতায় কবিকৃতির চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়েছে।

বিদ্যাপতি বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যের পথিকৃৎ। পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলি তাঁর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। বিদ্যাপতি প্রদর্শিত পথে পরবর্তী অনেক কবি যাত্রা করে সফল হয়েছেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম গোবিন্দদাস কবিরাজ। ইনি দ্বিতীয় বিদ্যাপতি নামে খ্যাত।

বাংলা সাহিত্যে কেন গুরুত্বপূর্ণ?

বিদ্যাপতি বাঙালি কবি নন। তাঁর জন্মস্থান মিথিলা। তিনি যেমন বাংলার মাটিতে জন্মগ্রহণ করেননি, তেমনই বাংলা ভাষায় পদও লেখেননি। তবুও বাঙালি তাঁর কবিপ্রতিভাকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। বাঙালির হৃদয়রাজ্যে তিনি চিরন্তন প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। তিনি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ লিখেছেন। সেই পদাবলি বাঙালির প্রাণের সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। স্বয়ং মহাপ্রভু বিদ্যাপতির পদাবলি আস্বাদন করে পরম আনন্দ লাভ করতেন।

বাংলাদেশের সঙ্গে একসময় মিথিলার নিবিড় সাংস্কৃতিক ঐক্য ছিল। বাংলা ও মিথিলা সংস্কৃত চর্চার প্রধান কেন্দ্র বা পীঠস্থান ছিল। উভয় স্থান থেকে ছাত্ররা উভয় প্রদেশের যাতায়াত

করত। ফলে বাঙালি ও মিথিলাবাসীদের মধ্যে একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্' ও বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে বাঙালি প্রথম রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার রসানন্দ উপভোগ করে। বিদ্যাপতির পদে মধুর রসের বিচিত্র অভিব্যক্তি ঘটে। ফলে রসিক বাঙালি বিদ্যাপতিকে বরণ করে নেয়। বৈষ্ণব পদসংকলনগুলিতে বিদ্যাপতির পদগুলি সমাদর স্থানলাভ করেছে। বিদ্যাপতিকে বাদ দিয়ে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের আলোচনা সম্ভব নয়। মধ্যযুগের শ্রীচৈতন্য থেকে আধুনিক কালের রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সাধক ও কবিরা এবং সাধারণ মানুষও বিদ্যাপতিকে আত্মীয়জ্ঞানে গ্রহণ করেছেন। চৈতন্যোত্তর পদকর্তাদের রচনায় বিদ্যাপতির প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। ভাব, ভাষা, ছন্দ – সবদিক থেকেই বাংলা সাহিত্যকে বিদ্যাপতি দীর্ঘদিন ধরে প্রভাবিত করে এসেছেন।

বিদ্যাপতি বজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেছেন। সেই ভাষার ছন্দোলালিত্যে মুগ্ধ হয়ে বাঙালি কবিরা তার চর্চা করে এসেছেন। বজবুলি হল মৈথিল ও অবহট্ঠের মিশ্রণে সৃষ্ট শ্রুতিমধুর কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা। বিদ্যাপতিকে অনেক বাঙালি কবি অনুসরণ করেছেন।

রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলি বাঙালির প্রিয় এবং তার চর্চার বিষয়। বিশেষ করে বিদ্যাপতির বিরহের, ভাবসম্মিলনের ও প্রার্থনার পদে বাঙালি মুগ্ধ হয়েছে। বাঙালির মানসপ্রবণতার সঙ্গে বিদ্যাপতির সাযুজ্য ঘটেছে।

এই সমস্ত কারণে বিদ্যাপতি বাংলা সাহিত্যে একছত্র আসন করে নিয়েছেন।

টিপ্পনী

বিদ্যাপতি ও তাঁর কবি প্রতিভার মূল্যায়ন

প্রাক্‌চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন বিদ্যাপতি। তিনি মিথিলায় জন্মগ্রহণ করলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত মিথিলাবাসীর কাছে উপেক্ষার পাত্র ছিলেন, শেষ পর্যন্ত বাঙালি বিদ্যাপতির পদাবলিকে গুরুত্ব দিলে মিথিলাবাসীর কাছে তিনি গৃহীত হন। বিদ্যাপতির প্রধান পরিচয় রাধা-কৃষ্ণবিষয়ক পদাবলি বজবুলি ভাষায় রচিত। বিদ্যাপতির পদে প্রেমের অর্থাৎ মধুররসের বিচিত্র অভিব্যক্তি ঘটে অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্মের যে আদর্শ 'কান্তাপ্রেম' তারই পরিচয় বাঙালি পেয়ে তাঁকে বরণ করেন। তিনি রাজসভার নাগরিক কবি। পাণ্ডিত্য, রসচর্চা ও স্মৃতি-সংহিতার অনুশীলনের দ্বারা বিদ্যাপতি জীবিতকালেই 'অভিনব জয়দেব' ও 'মৈথিল কোকিল' নামে রাজন্যবর্গ ও মিথিলাবাসীর কাছে বিশেষ শ্রদ্ধাশীল হন। রামগতি ন্যায়রত্ন বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে বিদ্যাপতির সম্বন্ধ নির্ণয় করতে গিয়ে বিবৃত করেছেনঃ "বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী হইলেও তাঁহাকে আমরা বাঙ্গলার প্রাচীন কবিশ্রেণীভূক্ত বলিয়া দাবী করিতে ছাড়িব না, যেহেতু বিদ্যাপতির সময়ে মিথিলা ও বঙ্গদেশে এখনকার অপেক্ষা অধিকতর ঘনিষ্ঠতা ছিল। তৎকালে অনেক মৈথিল ছাত্র বঙ্গদেশে আসিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যয়ন করিতেন এবং .... অনেকের মতে, বাঙ্গালার সেনবংশীয় রাজাদিগের সময়ে বঙ্গদেশ ও মিথিলা অভিন্ন রাজ্য ছিল, এবং সম্ভবত উভয় দেশের ভাষাও অনেকাংশে একবিধ ছিল" ... ।

বিদ্যাপতির কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অধ্যাপক শ্রীধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ

"প্রাকৃতরসের সহিত ধর্মসাধনার ব্যঞ্জনা মিশাইয়া, প্রণয়ক্ষোভের মধ্যে ভক্তির আকৃতি

ফুটাইয়া, রূপাকুলতার মধ্যে রূপাতীতের অতীন্দ্রিয় আবেদন ধ্বনিত করিয়া তিনি বাংলা কাব্যের একটা প্রধান বিবর্তনধারার প্রথম সূচনা করিলেন। তিনি চৈতন্যদেবের দিব্যভাবমগ্ন অলৌকিক জীবনলীলা দর্শন করেন নাই, বৈষ্ণবতত্ত্ব ও ভাবাদর্শের স্থির আশ্রয়ও পান নাই, তথাপি তিনি নিজ প্রতিভা ও কাব্যানুভূতি বলে বৈষ্ণবকাব্যের আদি স্রষ্টারূপে পরিচিত হইয়াছেন। ইহাতেই তাঁহার অসামান্য ক্রান্তদর্শিতা প্রতিপন্ন হইয়াছে"।

টিপ্পনী

সমালোচকের মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, মিথিলার রাজসভার কবি হয়েও বাঙালির অন্তর্লোকে যিনি সু-প্রতিষ্ঠিত এবং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য থেকে শুরু করে রসিক বাঙালি সমাজ যে কবিকে অন্তরের আত্মীয়রূপে বরণ করেছেন – তিনি মৈথিল কোকিল, এবং 'অভিনব জয়দেব' বিদ্যাপতি।

তরুন বয়স থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত মিথিলার রাজসভার সঙ্গে বিদ্যাপতি নিজেকে ব্যাপৃত রাখার মিথিলারাজ কীর্তিসিংহ, রাজাশিবসিংহ, দেবীসিংহ প্রমুখ রাজা এবং রানি লছিমা দেবীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। দীর্ঘকাল রাজসভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল বলে তাঁর মনে একটা দরবারী আদর্শের মার্জিত পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল। মণ্ডন কলাসিদ্ধ যে সৌকুমার্য ও বাক্‌নির্মিতির বিস্ময়কর পরিমার্জনা বিদ্যাপতি কণ্ঠের মুখ্য রাগিনী, তা এই রাজসভারই পরিবেশ-শাসিত রুচি নিষ্ঠার ফসল। ভাষা-ভঙ্গিমাকে শান্‌ দিয়ে পালিশ করে ঘষেমেজে "রাজকণ্ঠে মণিমালার মত" দ্যুতিময় করে তোলা নাগর বৃত্তিচারী রাজসভার এই কবির বাক্‌রীতির বৈশিষ্ট্য।

বিদ্যাপতি শুধু কবি নন, স্মৃতি সংহিতা ও নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে এবং পৌরাণিক ও স্মৃতি গ্রন্থাদি রচনা করে পাণ্ডিত্যের খ্যাতি লাভ করেছিলেন। যেমন, 'ভূপরিক্রমা' আনুমানিক (১৪০০), 'পুরুষপরীক্ষা' ও 'কীর্তিবিলাস' (১৪১০), 'লিখনাবলী' (১৪১৮), 'শৈবসর্বস্বহার' ও 'গঙ্গাবাক্যাবলি' (১৪৩০-৪০), 'বিভাগসার', 'দানবাক্যাবলী' ও 'গঙ্গভক্তিতরঙ্গিনী' (১৪৪০-৬০)। ধর্মমতে, তিনি কুলরীতি অনুযায়ী ছিলেন শৈব ও 'পঞ্চোপাসক' হিন্দু। তবু তাঁর অন্তরের নিবিড় আকুতি বৈষ্ণব পদেই যেন বেশি করে ফুটে উঠেছে।

বিদ্যাপতির প্রধান পরিচয় তাঁর রাধাকৃষ্ণ পদাবলি। রাধাকৃষ্ণের স্পষ্ট উল্লেখ আছে এমন পদের সংখ্যা ৫০০টিরও বেশি। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে বর্ণিত নায়ক-নায়িকার প্রকরণ অনুসারে তিনি রাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগ, প্রথমমিলন, রাধার বয়ঃসন্ধি, বাসক-সজ্জা, অভিসার, বিপ্রলব্ধ, খণ্ডিতা, মান, বিরহ বা মাথুর, ভাবসম্মিলন প্রভৃতি বিভিন্ন লীলাপর্যায়ের মধ্য দিয়ে রাধাকৃষ্ণের বিরহ ও মিলনলীলা বর্ণনা করেছেন। এই বিষয়ে তিনি উপকরণ আহরণ করেছেন। বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীজয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্‌', 'অমরুশতক', 'গাহাসওসঈ' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে। প্রসঙ্গ ও প্রকরণের সমন্বয়ে, কল্পনা ও বাক্‌নির্মিতির সমতায় তাঁর সৃষ্ট পদগুলি হয়েছে দীপ্তিময়। কিন্তু কেবল হঠাৎ আলোর ঝলকানিতেই তাঁর কাব্যের সীমা আদিগন্ত আলোকিত হয়নি। জীবনরসের চিত্রণই তাঁর স্বভাবধর্ম। তাই তাঁর পদাবলি প্রাণের গভীর রসে দ্রবীভূত। আর এই কারণেই তাঁর কাব্যপাঠে মহাপ্রভু শান্তি পেতেন। এই কারণেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন বৈষ্ণবদের গুরুস্থানীয় এবং রসিক বাঙালির "কবি সার্বভৌম"।

বয়ঃসন্ধি থেকে মাথুর বিরহের আর্তি পর্যন্ত পদগুলির মধ্যে রাধা চরিত্রের যে স্বরূপটি সঙ্গীতায়িত হয়েছে তার অভিনবত্ব বিদ্যাপতিকে দান করেছে অমরত্বের সিংহাসন। চণ্ডীদাসের রাধার যৌবন-সমাগমের দুর্লভ মুহূর্তটুকু পাঠকের অগোচরেই সমাপ্ত হয়েছে। পাঠকের সঙ্গে রাধার যখন পরিচয় হল তখন তিনি যোগিনী। জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাসের রাধা সম্বন্ধেও একথা

প্রযোজ্য। একমাত্র বিদ্যাপতিই রাধার অখন্ড জীবনপ্রবাহকে বর্ণাঢ্য কল্পনার আলোক সম্পাতে বিমূর্ত করেছেন। বয়ঃসন্ধির নৃত্যচপল মুহূর্ত থেকে ভাব সম্মিলন পর্যন্ত এই দীর্ঘসময়ে তাঁর রাধা ধীরে ধীরে কোরক থেকে পূর্ণযৌবন বিকশিত কমলিনীতে পরিণত হয়েছে।

রাধার প্রথম যৌবনের ভীতিমিশ্রিত কোতুক, অবাধবাসনার প্রচ্ছন্ন উল্লাস, শৈশব-স্রোতস্বিনীর কুলুকুলু ধ্বনির সঙ্গে যৌবন-সমুদ্রের দূরাগত কল্লোল সংঘাত এমন চিত্রকল্পে ও মণ্ডন কলায় বিদ্যাপতি চিত্রিত করেছেন যে তা তাঁর ভাবশিষ্য গোবিন্দদাস ছাড়া অন্যত্র বিরলদৃষ্ট।

পূর্বরাগের পদে বিদ্যাপতির রূপবিভোরতা আছে, আত্মবিস্মৃত ভাব নেই। কবি যেন স্বয়ং কৃষ্ণ হয়ে রাধার রূপ সুন্দর দেহ-কান্তি অবলোকন করেছেন। 'অভিসার' পর্বে বিদ্যাপতি আর রূপের অন্দর মহলে বন্দি নন, তার মুক্তি ঘটল অসীম রসলোকে। 'মাথুর' বা বিরহ পর্বে দেখি দুঃখ বেদানার অগ্নিতাপে লীলাবিলাসের ছলাকলা রাধাচরিত্র থেকে কিংশুক মঞ্জরীর মতো ঝরে পড়েছে –

"এ নবযৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়ালহে।"

এ যেন মধ্যাহ্নের বিরল স্তব্ধতায় পত্রপল্লবে আছাড় খাওয়া বিরহী সমীকরণের মর্মরিত দীর্ঘশ্বাস। ঘনবরষায় রাধা যখন কৃষ্ণের জন্য উন্মুখ-মুখর তখন শুনি তার মর্মভেদী হাহাকার –

"এ সখী হামারি দুখের নাহি ওর/এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।"

ভরা বাদরের পরিস্থিতিতে যখন চারদিক যুগল-মিলনের আবেশ, তখন বিদ্যাপতির রাধা নিঃসঙ্গ। ভরা বাদরের পূর্ণতাই রাধার শূন্য মনের হাহাকারকে আরও অতলস্পর্শী করে তুলেছে।

–এ পদের তুলানা বিশ্ব সাহিত্যে বিরল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পুরস্কার' কবিতায় উচ্চারণ করেছেন : "অতিদুর্গম সৃষ্টি-শিখরে / অসীমকালের মহাকন্দরে / সতত বিশ্বনির্ঝর ঝরে / ঝর্ঝর সংগীতে / স্বরতরঙ্গ যত গ্রহ তারা / ছুটিতে শূন্যে উদ্দেশহারা / সেথা হতে টানি লব গীতধারা / ছোট এই বাঁশরীতে" -বিদ্যাপতির বিরহের পদগুলি সম্পর্কেও তিনি একই কথা বলতে পারেন। কারণ বিরহের পদে কবির যে বিশেষ কণ্ঠস্বর শোনা যায় তা যেন মানবজীবনের অনাদি হৃদয় উৎস হতে উঠে আসা অনন্ত হৃদয়রাগিনী।

বিদ্যাপতির পদে অনুপ্রাস, যমক প্রভৃতি শব্দালঙ্কার এবং উপমা রূপক উৎপ্রেক্ষা, স্বভাবোক্তি, অতিশয়োক্তি, দৃষ্টান্ত, প্রতিবস্তুপমা, নিদর্শনা, সমাসোক্তি ইত্যাদি বহুবিধ সংস্কৃত অলংকার তিন জাতীয় –

ক) চিত্রাত্মক অলঙ্কার – "চিকুর গলায় জলধারা।"
খ) ভাবাত্মক অলঙ্কার – "তিল এক লাগি রহল অছ জীবে।"
গ) সঙ্গীতাত্মক অলঙ্কার – "কাকুতি করত কামিনী পায়।"

এই আলংকারিক কবি হিসেবে বিদ্যাপতির জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ রাজসভার কবিসুলভ নাগরবৈদগ্ধ্য। বিদ্যাপতির কাব্য যেন একদিকে রাজসভার অলংকৃত ঐশ্বর্যের রত্নচ্ছটা, অন্যদিকে কবিমর্মের মৃণালে জীবনবেদনায় আন্দোলিত ঊর্ধ্বলোকগামী আলোকপিপাসু রক্তকমল। দেহ এবং দেহাতীত, মর্ত্য বেং অমর্ত্যের মিলন সম্পাদনে বিদ্যাপতি যেন মৃৎপ্রোথিত কৈলাসে চন্দ্রচূড়।

টিপ্পনী

এ সকল কারণেই তাঁকে বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করতেই হয়।

মিথিলার রাজসভার কবি হয়েও বাঙালির অন্তর্লোকে যিনি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য থেকে শুরু করে রসিক বাঙালি সমাজ যে কবিকে অন্তরের আত্মীয় রূপে বরণ করে নিয়েছেন তিনি মৈথিল, কোকিল এবং ‘অভিনব জয়দেব’ বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতি বাঙালি না হয়েও বাংলা ভাষায় তাঁর কাব্য রচিত না হলেও সাহিত্যের ঐতিহাসিক তাঁকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। এই অন্তর্ভুক্তির স্বপক্ষে কয়েকটি যুক্তি নিম্নরূপ ঃ

টিপ্পনী

প্রথমতঃ সুদূর মধ্যযুগ থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত রাধাকৃষ্ণলীলার কবিরা তাঁদের প্রেরণা হিসেবে বিদ্যাপতিকে নিঃসংশয়ে স্বীকার করে নিয়েছেন। আর এই ঐতিহ্যাগত স্বীকৃতি অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই কবিকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, বিদ্যাপতি প্রবর্তিত কৃত্রিম কাব্যভাষা শুধু মধ্যযুগের নয়, আধুনিক কবির দ্বারাও রাধাকৃষ্ণ পদ রচনায় প্রযুক্ত হয়েছে। ফলে এই ভাষার প্রথম প্রবক্তা এবং এই ধারার উৎসস্বরূপ কবি বিদ্যাপতি বাংলার সারস্বত সমাজে স্বচ্ছন্দে গৃহীত হয়ে গেছেন।

তৃতীয়ত, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য থেকে শুরু করে একালের বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন এমনকী রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিদ্যাপতির কাব্যসাধনায় স্নাত হয়েছেন।

চতুর্থত, প্রকীর্ণ কবিতার ধূসর অনামিকতা থেকে শ্রীরাধাকে নায়িকারূপে কৃষ্ণের বিপরীতে প্রতিষ্ঠা করে জয়দেব বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনে যে নবতম ঐতিহ্যের সংযোগ করেছিলেন, তারই সার্থক উত্তরসূরী হিসেবে বিদ্যাপতি সহজেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কবিপ্রতিভা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ঃ

“প্রাকৃত রসের সহিত ধর্মসাধনার ব্যঞ্জনা মিশাইয়া, প্রণয়ক্ষোভের মধ্যে ভক্তির আকৃতি ফুটাইয়া, রূপকূলতার মধ্যে রূপাতীতের অতীন্দ্রিয় আবেদন ধ্বনিত করিয়া তিনি বাংলা কাব্যের একটা প্রধান বিবর্তন-ধারার প্রথম সূচনা করিলেন। তিনি চৈতন্যদেবের দিব্যভাবমগ্ন অলৌকিক জীবনলীলা দর্শন করেন নাই, ... তথাপি তিনি নিজ প্রতিভা ও কাব্যানুভূতির বলে বৈষ্ণবকাব্যের আদিস্রষ্টারূপে পরিচিত হইয়াছেন।”

বিদ্যাপতি কুলরীতি অনুযায়ী শৈব ও পঞ্চোপাসক হলেও তাঁর অন্তরের নিবিড় আকৃতি বৈষ্ণব পদেই বেশি করে ফুটে উঠেছে। তাই বলা যায়, বিদ্যাপতির প্রধান পরিচয় তাঁর রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী (৫০০টিরও বেশি পদসংখ্যা)। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে বর্ণিত নায়ক-নায়িকার প্রকরণ অনুসারে তিনি রাধাকৃষ্ণের ‘পূর্বরাগ’, প্রথম মিলন, রাধার বয়ঃসন্ধি, ‘বাসকসজ্জা’, ‘অভিসার’, ‘বিপ্রলব্ধা’, ‘খণ্ডিতা’, ‘মান’, ‘মাথুর’, ‘ভাবসম্মিলন’ প্রভৃতি বিবিধ লীলা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে রাধাকৃষ্ণের বিরহ ও মিলনলীলা বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাব্যপাঠে মহাপ্রভু শান্তি পেতেন। তার প্রমাণ আছে ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ -এ

“চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দে
স্বরূপ রামানন্দসনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরমানন্দ।।”

এ কারণেই তিনি বৈষ্ণবদেব গুরুস্থানীয় এবং রাসিক বাঙালির "কবি সার্বভৌম"।

বয়ঃসন্ধি থেকে মাথুর বিরহের আর্তি পর্যন্ত পদগুলির মধ্যে দিয়ে রাধা চরিত্রের যে স্বরূপটি সঙ্গীতায়িত হয়েছে তার অভিনবত্ব বিদ্যাপতিকে দিয়েছে অমরত্ব। একমাত্র বিদ্যাপতিই রাধার অখণ্ড জীবনপ্রবাহকে বর্ণাঢ্য কল্পনার আলোক সম্পাতে বিমূঢ় করেছেন। বয়ঃসন্ধির নৃত্যচপল মুহূর্ত থেকে ভাবসম্মিলন পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ে তাঁর রাধা কোরক থেকে পূর্ণযৌবন বিকশিত কমলিনীতে রূপান্তরিত হয়েছে। পূর্বরাগের পদে বিদ্যাপতির রূপবিভোরতা আছে, আত্মবিস্মৃত ভাব নেই। কবি যেন স্বয়ং কৃষ্ণ হয়ে রাধার রূপ সুন্দর দেহকান্তি অবলোকন করেছেন। 'অভিসার' পর্বে বিদ্যাপতি আর রূপের অন্দরমহলে বন্দী নন, তার মুক্তি ঘটল অসীম রসলোকে। তাই এই রাধা অভিসারের দুর্গম পথ অতিক্রম করেছে ঃ

"নব অনুরাগিনী রাধা, / কিছু নাহি মানএ বাধা।। /
একলি কএলঁ পয়ান। / পথ বিপথ নাহি মান।। /
...জামিনী ঘন আন্ধিয়ার, / মনমথ হিয় উজিয়ার।
বিঘিনি বিথারিল বাট। / প্রেমক আয়ুধ কাট।।"

অতঃপর রাধা দুর্জয় মান অতিক্রম করেছে, খণ্ডিতা নায়িকার চিত্তক্ষোভ বোধ করেছে, এবং 'প্রেমবৈচিত্ত্যে' বা 'আক্ষেপানুরাগের' শেষে বিরহের নিঃসীমতায় মিলে গেছে। 'মাথুর' বা বিরহে বিদ্যাপতি রাধাচিত্তের সঙ্গে মানব প্রকৃতির ও প্রাণীজগতের আশ্চর্য সংযোগ সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন ঃ

"এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর।।"

এ যেন মধ্যাহ্নের বিরল স্তব্ধতার পত্র পল্লবে আছাড় খাওয়া বিরহী সমীরণের মর্মরিত দীর্ঘশ্বাস। এছাড়া 'ভাবসম্মিলনে' রাধার মিলনোৎকণ্ঠাকেও তিনি ঐশ্বর্যময়ীরূপে প্রকাশ করেছেন ঃ

"আজু রজনী হাম
ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়া মুখচন্দা।
জীবন যৌবন
সফল করি মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরদ্বন্দ্বা।"

এই স্তরে বিদ্যাপতি ছন্দ, অলংকার, ও মন্ডনকলার কারুকার্য লক্ষ করে – তাঁকে আমরা রূপতন্ময় কবি হিসেবেই গ্রহণ করতে পারি।

দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ 'প্রার্থনা' ও 'নিবেদনের' পদে যে বিদ্যাপতিকে পাই, তিনি যেন তাঁর বাণীর সকল অলংকার পরিত্যাগ করে এক শান্ত সংযত ও বিনম্র রূপে ধরা দিয়েছেন। এখানে তিনি একান্তভাবেই এক ভাবতন্ময় কবি। এই কবির মাধবের কাছে প্রার্থনা ঃ

"মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল   দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনু ছোড়বি মোয়।"

বিদ্যাপতি স্মার্ত না শৈব – বাঙালির কাছে তা অর্থহীন। তাদের কাছে বিদ্যাপতি কেবল রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক পদের অমর স্রষ্টা। তাই মিথিলা অঞ্চলে যখন বিদ্যাপতির কাব্যের অবলুপ্তি ঘটে গেল, তখন বাংলাদেশে তাঁর সমাদর ও পরিচিতি ছিল। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের ভাষায় বলতে পারি ঃ

"বিদ্যাপতির কুর্তা পাগড়ি খুলিয়া ধুতি চাদর পরাইয়াছি"।

টিপ্পনী

তথ্যসূত্র ঃ

১. রামগতি ন্যায়রত্ন – 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'

২. ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় – 'বাংলা সাহিত্যের কথা'

৩. অধ্যাপক শ্রী খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীসুকুমার সেন, শ্রী বিশ্বপতি চৌধুরী, শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্তী – বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন) সম্পাদিত ত্রয়োদশ সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৬, পৃ. ৯৩

৪. তদেব, পৃ. ৯১

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর – 'সঞ্চয়িতা', 'সোনার তরী' / 'পুরস্কার' কবিতা, বিশ্বভারতী ১৯৭২, পৃ. ১৮৩

৬. ড. বিমানবিহারী মজুমদার 'পাঁচশত বৎসরের পদাবলী'

৭. ৩, ৪ তদেব, পৃ. ১০২

৮. তদেব, পৃ. ১০৪

৯. ড. দীনেশচন্দ্র সেন – 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'

বিভিন্ন রসপর্যায়ের পদে বিদ্যাপতির অবস্থাগত মূল্যায়ন ঃ

চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগ হতে চৈতন্য পরবর্তীযুগের সপ্তদশ শতক পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল ধরে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখ কবির কবিপ্রতিভায় অবগাহিত হয়ে রাধাকৃষ্ণের প্রেমচেতনা ও প্রেমভাবনার যে রসধারা আমাদের সঞ্জীবিত করেছে তা আজও বিস্ময়মিশ্রিত সৌন্দর্যচেতনায় স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মানবিক মনস্তত্ত্বের জীবনধারার একটি ক্রমপরিণতি যেখানে লক্ষিত হয় তার এক একটি স্তরে ঝরে পড়েছে পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, আক্ষেপানুরাগ বা প্রেমবৈচিত্ত্য, মাথুর ভাবোল্লাস, নিবেদন, প্রার্থনা প্রভৃতি স্তরের পদগুলি। এই স্তরের পদগুলি রচনায় প্রত্যেক বৈষ্ণব কবি সমান জনপ্রিয়তা লাভ করেন নি। এক একজন বৈষ্ণব কবি এক একটি রসপর্যায়ের পদে স্বতন্ত্র রূপ, দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করে বিশিষ্টতা লাভ করেছেন। বিদ্যাপতির রসগত পর্যায়ের স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে অনায়াসেই জানা যায়, তিনি মাথুর, রাধার বয়ঃসন্ধি, শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ, প্রার্থনা পর্যায়ের পদে সর্বাধিক উৎকর্ষ ও স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন।

বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধি পর্যায়ের পদগুলি দেখতে পাই কৈশোর ও যৌবনের এই সম্মিলনকে কবিতার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করায় বিদ্যাপতির মৌল উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয়। সমালোচক শঙ্করীপ্রসাদ বসু মন্তব্য করেছেন ঃ

"বিদ্যাপতি শিক্ষিত কবি, বিদগ্ধ কবি এবং রাজসভার কবি। তাঁহার কাব্যে কেবল বুদ্ধির কসরৎ নয়, মননের অনস্বীকার্য অঙ্গীকার ঘটিয়াছে। ইহার ফলে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গিতে রসপিপাসার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক কৌতুহল যুক্ত হইয়াছে। এই পিপাসা এবং সেই কৌতুহল –

উভয়ে মিলিয়া তাঁহার বয়ঃসন্ধির পদগুলিকে এমন উৎকৃষ্ট করিয়াছে"

বিদ্যাপতির রাধার বয়ঃসন্ধির পদগুলির কাব্যোৎকর্ষ প্রশংসনীয়। চিত্রকল্প ও মন্ড কলার রাজযোটক ঘটেছে এই পদগুলিতে। কারণ রাধার প্রথম যৌবনের ভীতিমিশ্রিত কৌতুক, অবাধ বাসনার প্রচ্ছন্ন উল্লাস, শৈশব স্রোতস্বিনীর কুলুকুলু ধ্বনির সঙ্গে যৌবন-সমুদ্রের দুরাগত কল্লোল সংঘাত এমন চিত্রকল্পে ও মণ্ডনকলার বিদ্যাপতি চিত্রিত করেছেন যে তা তাঁর ভাবশিষ্য গোবিন্দদাস ছাড়া অন্যত্র বিরলদৃষ্ট।

টিপ্পনী

বিদ্যাপতি ধীরে ধীরে কুশলী শিল্পীর মতো কিশোরী রাধার নবযুবতীতে পরিণত হওয়া সুন্দর চিত্র এঁকেছেন। বিদ্যাপতির কিশোরী রাধা অকস্মাৎ আবিষ্কার করলেন যে – "আওলো যৌবন, শৈশব গেলা"। বালিকা মূর্তির অন্তরালে যে যৌবন লুকিয়ে ছিল, তার আবির্ভাবে রাধা উন্মনা হয়ে পড়লেন। শৈশবের মন আর যৌবনের মনে, শৈশবের দেহ ও যৌবনের দেহের মধ্যে দ্বন্দ্ব সূচনা হয়েছে –

"খনে খনে নয়ন অনুসরঙ্গ।
খনে খনে বসন ধূলি তনুতরঙ্গ।।
খনে খনে দসন ছটাছুট হাস,
খনে খনে অধর আগে করুবাস।"

–এখানে রাধার বালিকাসুলভ চাঞ্চল্য ও কিশোরীসুলভ কৌতূহল মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যক্ত হয়েছে। তার দেহের নবাগত যৌবনের আলো-আঁধারি পূর্ণ রহস্যময় ইঙ্গিত অপূর্ব বাণীরূপ লাভ করেছে। রাধার শৈশব ও যৌবনের দেহ মনের দ্বন্দ্বকে কবি যেন বিভোর হয়ে দেখেছেন এবং পাঠককে দেখিয়েছেন। একটু দেখালে বিষয়টি স্পষ্ট হবে রাধার যৌবন যেও সবে আরম্ভ হয়েছে। তখন সকলই রহস্য পরিপূর্ণ। সদ্য বিকচ হৃদয় সহানা আপনার সৌরভ আপনি অনুভব করছে। নিজের সম্বন্ধে নিজেই সবেমাত্র সচেতন হয়ে উঠছে। সেইলজ্জায় ভয়ে আনন্দে সংশয়ে নিজেকে গোপন করবে কি প্রকাশ করবে রাধা তা ভেবে পাচ্ছে না। বিদ্যাপতির ভাষায়

"কবহুঁ বান্ধয়ে কচ কবহুঁ বিথারি।
কবহুঁ ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহুঁ উষারি।।"

এই পদচির বাংলা অনুবাদসহ এখানে অংশত এই রকম – থির নয়ন অথির কছু ভেল উরজ-উদয়-থল লালিম দেন। পয়োধরের (উরনের) উদয় স্থলে লালিমা দেখা দিল।

বয়ঃসন্ধি হাসিকান্নার লীলা। কৌশোরের চাঞ্চল্য মথিত করে যৌবন আসছে, দেহমনে কী তার উল্লাস, অথচ কতই না বেদনা! – এ বেদনা দুর্নিরীক্ষা অথচ সর্বমানব সাধারণ কৃষ্ণের জন্য রাধার বেদনা হওয়ার প্রয়োজন নেই – ওই বসন্ত বর্ষার মিলন। বাল্য ও প্রথম যৌবন – এ দুয়ের সন্ধি অর্থাৎ কিশোর চেতনাকে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে বয়ঃসন্ধি বলা হয়েছে। দেহ ও মন উভয়ের পরিবর্তন এবং বিকাশ তার সঙ্গে কৈশোর থেকে যৌবন উন্মেষের একটি চমৎকার ক্রমিক চিত্র পাই বিদ্যাপতির পদে। যেমন কিছু দৃষ্টান্ত –

টিপ্পনী

১. "শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহু দলবলে দ্বন্দ্ব পড়ি গেল।।
কবহু বাঁধয় কুচ কবহু বিথারি।
কবহু ঝাঁপয় অঙ্গ কবহু উঘারি।।"

২. "শৈশব যৌবন দুহু মিলি গেল।
শ্রবণক পথ দুহু লোচন লেল।।
বচনক চাতুরী লহলহু হাস।
ধরণী এ চাঁদ কত্রল পরগাস।।"

পদগুলি উৎকৃষ্ট বয়ঃসন্ধির পর্যায়ে রাধার রূপলিপ্সু কৃষ্ণের চোখ দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। কৈশোর ও যৌবনের এই দ্বন্দ্বে উন্মথিত চিত্ততরুণী কখনো চুল বেঁধে রাখে, আবার কখনো খুলে ফেলে। কখনো দেহ আবৃত করে, আবার কখনো অভ্যাস না থাকায় পরমুহূর্তেই অনাবৃত করে। কৃষ্ণ নয়, রাজসভাসদ্ কবিই যেন সপ্রেম, সাকাঙ্ক্ষা কৌতূহলে একটি বালিকার যুবতী হয়ে ওঠার স্তরান্তর লক্ষ করেছেন। তাঁর এই রাধাকৃষ্ণ একটি বিশেষ কালের, বিশেষ পরিবেশের মানব-মানবী হয়েও নিত্যকালের রূপলিপ্সু প্রেমিক ও উদ্ভিন্নযৌবনা তরুণী। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির এই আঁকা রাধার সম্পর্কে লিখেছেন – "বিদ্যাপতির রাধা অল্পে অল্পে মুকুলিত বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। সৌন্দর্য ঢল ঢল করিতেছে। শ্যামের সহিত দেখা হয় এবং চারিদিকে যৌবনের কম্পন হিল্লোলিত হইয়া উঠে। খানিকটা হাসি, খানিকটা ছলনা, খানিকটা আড়চক্ষে দৃষ্টি। আপনাকে আধখানা প্রকাশ এবং আধখানা গোপন; কেবল উদ্দাম বাতাসের একটা আন্দোলনে অমনি খানিকটা উন্মেষিত হইয়া পড়ে। বিদ্যাপতির রাধা নবীনা লীলাময়ী, নিকটে কম্পিত, শঙ্কিত, বিহ্বল। কেবল চম্পক আঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া অতি সাবধানে অপরিচিত প্রেমকে একটুমাত্র স্পর্শ করিয়া অমনি পলায়নপর হইতেছে।....যৌবন সে-ও সবে আরম্ভ হইতেছে, –তখন সকলই রহস্যপরিপূর্ণ"

'সদুক্তি কর্ণামৃত' –এ রাজশেখরের একটি শ্লোকে উদ্ভিন্নযৌবনা নারীর বর্ণনায় বলা হয়েছে – "পদ্ভ্যাং মুক্তাস্তরলগতয়ঃ সংশ্রিতা লোচনাভ্যাং"। রাজশেখরকে অনুসরণ করে বিদ্যাপতি রচনা করলেন – "চরণ চপল গতি লোচন লেল"। শতানন্দের একটি পদেও এই বয়ঃসন্ধির নায়িকার চমৎকার বর্ণনা আছে –

"গতবাল্যে চেতঃ কুসুমধনুষা সায়কহতং।
ভয়াদ্বীক্ষবাস্যাঃ স্তনযুগভূন্নিজিগমিষু।
সকম্পা ভ্রূবল্লী চলতি নয়নং কর্ণকুহরং।
কৃশং মধ্যং ভূগ্না বলিরলসিতঃ শ্রোনিফলকঃ।।"

বিদ্যাপতির 'শৈশব যৌবন দুহু মিলি গেল' –এই দ্বিতীয় পদটির সঙ্গেই উপযুক্ত শ্লোকের সাদৃশ্য বেশি। কবি রাধা সম্পর্কে বলেছেন –

"কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
ইহ্নিকে খীন উন্‌কে অবলম্ব।
....

চরণ চপল গতি লোচন পাব,
লোচনক ধৈরজ পদতলে জাব।।"

সাহিত্য দর্পণের একটি শ্লোকের সঙ্গেও এর সাদৃশ্য আছে – "মধ্যস্য প্রথিমানমেতি জঘনং বক্ষোজয়র্ন্মন্দতা" কিন্তু শুধু শরীর নয়, রাধার মনোলোকের সূক্ষ্ম পরিবর্তনেরও একটি চমৎকার ছবি উদ্ভাসিত করেছেন কবি। সঙ্গীতমুগ্ধা হরিণীর মতো রসকথা অর্থাৎ নরনারীর প্রেমের কথা একাগ্র হয়ে শোনে –

"শুনইতে রসকথা থাপয়ে চিত।
যৈসে কুরঙ্গিনী সুনয়ে সঙ্গীত।।"

বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধির পদ মুগ্ধ মাধবের চোখ দিয়ে দেখা বালিকা রাধার যৌবনে পদার্পণের মধুর ছবি। এই যৌবন মন আর শরীর উভয়েরই। আর তারই সঙ্গে তখনও বর্তমান কিশোরীর সারল্য রাধার ক্রমবর্ধমান যৌবনলাবণ্যের অপরূপত্বকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। রাধার এই ক্রমাসমাগত যৌবন সৌন্দর্যের বর্ণনায় কবি বিদ্যাপতি কালিদাসের কাব্যের ঋণও একসময়ে গ্রহণ করেছেন। কুমারসম্ভবে উমার যৌবন সমাগমের বর্ণনায় দেখি –

"দিনে দিনে সা পরিবর্দ্ধমানা।
লব্ধোময়া চান্দ্রমসীব লেখা।।
পুপোষ লাবণ্যময়ান্ বিশেষান্।
জ্যোৎস্নান্তরানীব কলান্তরানি।।"

বিদ্যাপতি তাঁর বয়ঃসন্ধির রাধারূপ বর্ণনায় কালিদাসের এই পদটিকে আরও সার্থকভাবে অনুসরণ করেছেন –

আজ দেখলিসি কালি দেখলিসি

"আজি কালি কতভেদ।
সৈসব বাপুড়ে সীমা ছাড়ল
জউবনে বাঁধল ফেদ।।"

কালিদাসের তুলনায় বিদ্যাপতির পদটিতে সজীব মনের ছোঁয়া, কাব্য সৌন্দর্যকেও বাড়িয়ে তুলেছে। কালিদাস সশ্রদ্ধভাবে পার্বতীর রূপ নিরীক্ষণ করেছেন। অন্যদিকে বিদ্যাপতি সস্নেহে ও মুগ্ধতায় রাধারূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। কবি বালিকা ও তরুণী সত্তার দ্বন্দ্বের আভাসটুকু রাখলেও রসকথা মুগ্ধতায় তারুণ্যেরই অবিসংবাদী জয় ঘটেছে। এইভাবে কবি অনাড়ম্বর ভাষায় অথচ সুনির্বাচিত অলংকারে মনস্তত্ত্বের একটি স্বাভাবিক সত্যকে পর্যবেক্ষণ করে তাঁর রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথার মধ্যে বাস্তবজীবনের ও রক্তমাংসের মানুষের উত্তাপ সঞ্চার করতে পেরেছেন। এই জীবনানুগামিতাই বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ লীলাকথার প্রাণ।

সংস্কৃত সাহিত্য ও অলংকার শাস্ত্রের উত্তরাধিকারী কবি বিদ্যাপতি তাঁর বয়ঃসন্ধির পদে নববিকশত নারীদেহের অপূর্ব মধুরিমাকে ইন্দ্রিয়বিলাস হিসেবেই আস্বাদন করেছেন। কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় বিলাস নয়, কবি সেই সঙ্গে আয়ত্ত করেছেন সৌন্দর্য দৃষ্টিও। তাই বয়ঃসন্ধির পদে আমরা যে রাধাকে দেখতে পাই সেই রাধাকৃষ্ণের মনের মাধুরী মেশানো লাবণ্য প্রতিমা। কিছু কিছু সংস্কৃত ও প্রাকৃত শ্লোকে বয়ঃসন্ধি সময়ের নায়িকার দেহমনের ছবি রসোত্তীর্ণভাবে পরিস্ফুট

টিপ্পনী

হয়েছে। বিদ্যাপতি এই সমস্ত কবিতার ধারা অনুসরণ করেও তাঁর নিজস্ব সৌন্দর্যসৃষ্টি এবং চিত্র রচনার কুশলতায় আগেকার সেইসব দৃষ্টান্ত ছাড়িয়ে গিয়েছেন। তাই বলা যায়, – "বিদ্যাপতি অদ্বিতীয় বয়ঃসন্ধির পদে, সম্ভবত অধুনাপর্ব সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে। এ বিষয়ে বিদ্যাপতির সমতুল কবির সন্ধান পাই নাই। অন্যান্য কবির তুলনায় বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠত্ব এইখানে – তিনি দৈহিক পরিবর্তনের কতক অবস্থাকে যথার্থ রসচিত্রে রূপান্তরিত করিতে পারিয়াছেন।"

টিপ্পনী

মাথুর বা বিরহ পর্যায়ের পদে কবি বিদ্যাপতি দ্বিতীয়রহিত। কারণ বিরহের তীব্রতা ও শূন্যতাবোধের হাহাকারকে বিদ্যাপতি সার্থক বাণীরূপ দান করেছেন। বিরহ যন্ত্রণাদিগ্ধ রাধার জ্যোতির্ময়ী মূর্তি ফুটে উঠেছে 'মাথুর' পর্যায়ের পদে। বঙ্কিমচন্দ্রের "বাঙ্গালা সাহিত্যের আর যে দুঃখই থাকুক, উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের অভাব নেই।...একা বৈষ্ণব কবিগণই ইহার সমুদ্র বিশেষ" –এই উক্তির তাৎপর্য অনুধাবন করা যায় বিদ্যাপতির মাথুর পর্যায়ের পদগুলি পাঠ করলে। কারণ প্রেমচেতনার ও সৌন্দর্যচেতনার বৈশিষ্ট্য এই পর্যায়ের পদগুলি শুধু অন্তরের বেদনায় দ্রবই নয়, গীতিধর্মের ছোঁয়ায় রস সমুজ্জ্বল।

একজন সমালোচক বিদ্যাপতির মাথুর পর্যায়ের পদগুলি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ঃ

"বিদ্যাপতির বিরহের পদসমূহে অভিনব কলাকৃতির সঙ্গে অসীম অন্তরাবেগ একীভূত। তাঁর কমলিনী রাধা সেই সুদূর অতীতের বয়ঃসন্দি থেকে অল্পে অল্পে মুকুলিত হতে হতে অভিসার স্তরে অপরিসম বর্ণগরিমায় পরিপূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠেছেন। দেহের ভারে এখন আর তিনি গরবিনী নন; এখন হতে শুরু হয়েছে অন্তরের বিরামবিহীন ক্রন্দন সুরঝঙ্কার।" শ্যামের সঙ্গে কয়েকদিন মাত্র মিলন, কিন্তু সেই মিলন মহিমার 'নানারঙের দিনগুলি' জীবনের সোনার খাঁচা থেকে অন্তর্হিত। তাই মাথুর পর্বে দেখি দুঃখ বেদনার – অগ্নিতাপে লীলা বিলাসর ছলাকলা রাধাচরিত্র থেকে কিংশুক মঞ্জরীর মতো ঝরে পড়ল –

"অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
এ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া নেহে।
সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠশুকায়ব
কোদুর করব পিপাসা।"

–এ যেন মধ্যাহ্নের বিরল স্তব্ধতায় পত্রপল্লবে আছাড় খাওয়া বিরহী সমীকরণের মর্মরিত দীর্ঘশ্বাস। জীবরে আনন্দঘন মুহূর্ত যে রাধার কাছে দেহের ভাগ অধিক ছিল, আজ তা লপ্ত। শূন্যতা আর হাহাকারই তার একমাত্র অবলম্বন। এরকম আরো দু'একটি পদে পাই –

১) "অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল মাণিক কো হরি নিল।।
গোকুলে উছলল করুণাক রোল।
নয়ন জলে দেখ বহয়ে হিল্লোল।।"

২) "চির চন্দন উরে হার ন দেলা।
সো এব নদী-গিরি আঁতর ভেলা।।

পিয়াক গরবে হম কাহুক ন গণলা।
সো পিয়া বিনা মোহে কো কিন কহলা।।"

৩) "হরি গেও মধুপুর হম কুলবালা।
বিপথে পড়ল যৈছে মালতী মালা।।"

-এই সমস্ত পদে বিদ্যাপতির রাধা প্রেমের গভীরতায় লৌকিক বাসনার উর্দ্ধে এক জ্যোতির্ময়ী দীপশিখা। কলাবতী রাধা এখানে অশ্রু সাগরের রক্তপদ্মে বিকশিত। রাধার বিরহ বেদনা বিশ্বব্যাপ্ত হাহাকার মন্দ্রিত। রাধা এখানে বিশ্ব প্রকৃতির বিরাট পটভূমির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের উক্তি এ প্রসঙ্গে প্রাণিধানযোগ্য -

"বিরহে পৌঁছিয়া কবি ভক্তি ও প্রেমের গীতি গাহিয়াছেন। তাঁহার ফ্রেমে বাঁধা বিলাসকলাময়ী নায়িকার চিত্রপটখানা সহসা সজীব রাধিকা হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার উপমা ও কবিতার সৌন্দর্য চোখের জলে ভিজিয়া নব লাবণ্য ধারণ করিল।"

বিদ্যাপতির বিরহের আর একটি পদে দেখা যায়, "তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী"তে ডাহুকীর ডাক, মত্ত দাদুরী, ময়ূরের উন্মত্ত নৃত্যলীলায় রাধা হৃদয় যেন শতধা বিদীর্ণ। চারিদিকে মিলন সমারোহ, দয়িত-দয়িতার আবেশবিহ্বল আহ্বান ঃ

"কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া।"

তৃষ্ণাকাতর আর্তি 'ফাটি যাওত ছাতিয়া' -আমাদের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে দামিনীর শিহরণময় উক্তিকেই মনে আনে : "সাধ মিটিল না"। এমন ঘন ঘোর বরষায় রাধা মনের স্বগতোক্তি যেন - "আমিও একাকী, তুমিও একাকী আজি এ বাদল রাতে/নিদ্‌ নাহি আঁখি পাতে" (অতুলপ্রসাদ)। তাই রাধা চিত্তের ব্যাকুল ক্রন্দন :

"এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।।"

এ প্রেম কি কামজ? না প্রেম স্বভাবজ, এ প্রেম 'নিকষিত হেমতুল্য'। এ বিরহবাণী মুখের নয়, হৃদয়ের, এ যেন নিখিল মনপ্রাণের বেদন মহোৎসবের অত্যুজ্জ্বল বাণীবন্দনা। বিদ্যাপতির এই বেদনার স্তোত্রগাথার সঙ্গে টেনিসনের কবিতার যেন কিঞ্চিৎ সাক্ষাৎ পাই :

"Oh well for the fisherman's boy
That he shouts with his sisters at play
oh, well for the sailor lad
That he sings in his boat on the boy.
oh, for the touch of a vanished hand
And the sound of voice that is still."

অর্থাৎ যে বেদনা বাক্‌পথাতীত, অনুভব বেদ্য - তাকেই বিদ্যাপতি তাঁর অপূর্ববস্তু নির্মাণক্ষম

টিপ্পনী

প্রতিভায় রূপদান করেছেন।

বিরহের আর একটি অতুলনীয় পদ রচনা করে বিদ্যাপতি অর্জন করেছেন মৃত্যুহীন কবি খ্যাতি :

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
....
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তব হিয়া জুড়ন না গেল।"

টিপ্পনী

–এই লাখ লাখ যুগের কল্পনাই হল – "cosmic imagination"। কবি জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কবিতার "হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে" পঙ্‌ক্তিগুলির মতোই এই পদেও আছে শিল্পের অনন্তলাবণ্য যার সমকক্ষ বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ। এই কবিতাটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য – "নায়ক নায়িকার যে প্রেম কেবলমাত্র দর্শন স্পর্শনের মধ্যেই গাহিয়া উঠে জনম... তার সেই মুহূর্ত কালের দেখাশোনা কেবল সেই মুহূর্তটুকুর মধ্যে নিজেকে ধারণ করিতে পারে না, বলিয়া লক্ষ লক্ষ যুগের আকাঙ্ক্ষা সংগীতের মধ্যে সৃষ্টি না করিয়া বাঁচে না।।"

এটাই তো সর্বজীবনের দুর্ভেদ্য সমস্যা। চিরন্তন নারী সেই যে একবার মিলন মুহূর্তে চিরন্তন পুরুষের অনাদি রূপ রহস্য হৃদয়গোচর করেছিল, তারপর সেই রতির দাহ থেকে আরতির দীপশিখা জ্বালিয়ে সে যে অনন্তকাল হৃদয়দেবতার অর্চনা করে চলেছে তার শেষ নেই। এই একটি পদই বিদ্যাপতির কবিত্ব শক্তির সীমা নির্দেশক। ড. শঙ্করীপ্রসাদ বসু বলেছেন : "বিরহপর্যায়ে বিদ্যাপতির কবি শক্তি শ্রেষ্ঠত্বের সীমালগ্ন। .... ইহা বাহ্যত বেদনার্তির রূপ ধরিলেও কোথাও যেন আনন্দ সাগরে কল্লোলধ্বনিত হইয়া ওঠে" আসলে বিদ্যাপতি এই শ্রেণীর পদে কন্টেন্টের সঙ্গে আর্টিস্ট–এর দূরত্ব শেষ পর্যন্ত বজায় রাখতে পেরেছেন। রূপ রসের কবি বিদ্যাপতির এই পদের প্রথম দিকে দেহচেতনা থাকলেও ধীরে ধীরে তা ঊর্ধ্বায়ত মহিমা লাভ করেছে। বিদ্যাপতি তাঁর রাধাকে বিরহানলে দগ্ধ করে তাঁর দেহসৌন্দর্যকে দেহাতীত আত্মিক সৌন্দর্যে উন্নীত করেছেন। তার ফলে রাধার বিরহ বেদনা যে কাব্য আধারের আশ্রয় প্রকাশ লাভ করেছে তা সম্পূর্ণ সার্থক সুন্দর হয়ে উঠেছে। এককথায় মানব জীবনের গভীরতম রহস্য উদ্‌ঘাটনে এবং ট্র্যাজেডির সকরুণ বিলাপে বিদ্যাপতির মাথুর বিষয়ক পদাবলী অনন্য সুন্দর।

'প্রার্থনা' বিষয়ক পদেও বিদ্যাপতির কবিকৃতি তুলনারাহিত। এই পর্যায়ের পদ রচনায় কবি অন্যান্য পদের তুলনায় নতুনত্বের আস্বাদ আনতে সক্ষম হয়েছেন। কারণ একমাত্র এই বিষয়ক পদে বিদ্যাপতির আত্মসমীক্ষা ভাবাবিষ্টতার গাম্ভীর্যে আধ্যাত্মিকতায় উত্তীর্ণ হয়েছে। সমালোচকের ভাষায় : "রূপমুগ্ধতা ও প্রেমাকুলতার প্রাথমিক স্তর থেকে পাদপীঠের পর্যায়গুলি অতিক্রম করে বিদ্যাপতি ভক্তিভাবুকতার উচ্চস্তরে উন্নীত হয়েছেন।"

ফুলের পরিণতি যেমন ফলে, নারীত্বের পরিণতি যেমন জননীত্বে, তেমনই বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের তারুণ্যের কুঁড়ি–ফোটা জীবনে আগুন রাঙা পূর্বরাগরঞ্জিত প্রেমের পরিণতি ও সার্থকতাই হল 'প্রার্থনা'র আকৃতিতে। শুধু সুনিপুণ প্রেমমনস্তত্ত্বেই নয়, যথার্থ জীবনদর্শনের

ক্রমপরিণতির আলোকেও বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের সঙ্কলন ও সম্পাদকবৃন্দ 'পরম যতনে, কুসুম রতনে' জীবনের এই মহার্ঘ্য রচনা করেছেন। তার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সার্থকতায় পাই –

"মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠুক জ্বলিয়া।
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহুক ফলিয়া।।"

শ্রীকৃষ্ণকে সর্বৈশ্বর্য্যশালী নিত্যবস্তুরূপে জেনে ভক্ত বিষয়বাসনা বর্জনপূর্বক ঐকান্তিক নিষ্ঠায় তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করতে পারেন। এ অবস্থায় ভক্ত-ভগবানে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে না। এতে স্থায়ী ভাব 'কাম' নামে রতি। এই রতিতে 'সুতমিত রমনী সমাজে' 'তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম' ক্ষণস্থায়ী। এই অনিত্যবস্তু থেকে মনকে প্রত্যাহৃত করে ভক্ত সমর্পণ করেন নিত্যভগবানে –

"কত চতুরানন মরি মরি যাওয়ত নহি তুয় আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমায়ত সাগর লহরী সমানা।।"

বিদ্যাপতির এই প্রার্থনাখানিতে রস 'শান্ত' হলেও এতে গৌড়ীয় বিরোধী মুক্তি কামনা আছে – 'তারণভার তহারা'। প্রাক্-চৈতন্যযুগের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক।

বিদ্যাপতির প্রার্থনা বিষয়ক পদগুলিতে কবির আন্তরিক আবেগ উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে। প্রকাশিত হয়েছে ভক্ত হৃদয়ের এক ঐকান্তিক আর্তি। তপ্ত বালুর মতো সংসার নিঃশেষে জীবনের মাধুর্যকে শোষণ করে। নিঃস্ব করে দেয় মানুষকে। তখন ঈশ্বরের পায়েই একমাত্র আশ্রয় –

"মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমার্পিলুঁ
দয়া জনু ছোড়বি মোয়।।"

–এমন আকুল প্রার্থনা বিদ্যাপতিকে শুধু কবি হিসাবেই নয় পরমভক্ত সাধকরূপেও সাহিত্য অমরত্ব দান করেছে। সংসারের মায়াজালে আবদ্ধ জীবনের প্রান্তে এসে কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে নৈরাশ্যের হাহাকার।

কোনো রকম সাম্প্রদায়িক বন্দনারীতির বশবর্তী না হয়ে, বিদ্যাপতি মাধবরূপী সত্যস্বরূপের কাছে যেভাবে আত্ম-উদ্ঘাটন করেছেন তা বৈষ্ণব সাহিত্যে অভিনব। যেমন কিছু দৃষ্টান্ত –

"যতন যতেক ধন পাপে বটোরলোঁ
মেলি পরিজন খায়।
মরণক বেরি হেরি কোঙ্ঈন পুছত
করম সঙ্গে চলি যায়।।"

–এ কবিভাবনায় কবির ব্যক্তি ও সমাজরূপের ছায়াপাত ঘটেছে। ব্যক্তিজীবনের নৈরাশ্য ও বেদনার প্রতিফলনে সমুজ্জ্বল এই পদগুলি। নাগরিক পরিবেশের বিলাস উচ্ছল প্রমত্ততায় বিদ্যাপতির ভোগজীবন অতিবাহিত হয়েছে। জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় তিনি অনুশোচনার তুষানলে জ্বলেছেন –

১) "আধজনম হাম নিদে গোমায়লুঁ

টিপ্পনী

জরা শিশু কতদিন গেলা।

নিধুবনে রমনী রসরঙ্গে মাতলুঁ

তোহে ভজব কোন বেলা।"

অর্থাৎ প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে এসে বিদ্যাপতি রাজা ও রাজ পরিবারে বহু উত্থান পতনের সাক্ষ্য নিজের জীবনে বহন করে শান্ত সমাহিত ভক্তির পরম সান্ত্বনায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন মাধবের পায়ে নিধুবনে রমনী রসরঙ্গের জ্বালাময় স্মৃতিতে বেদনামথিত কবিচিত্তের আন্তরিক উৎসারণ ঘটেছে বিদ্যাপতির প্রার্থনা পদে।

টিপ্পনী

'প্রার্থনা'র পদে রাধার নয়, বিদ্যাপতির আত্মগত খেদোক্তি প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ পার্থিব নৈরাশ্য নিজ জীবনাভিজ্ঞতা ভিন্ন উৎপন্ন হওয়া দুরূহ। রাজসভাশ্রিত পণ্ডিত অভিজাত বিদ্যাপতির লৌকিক জীবন স্মরণ করলে দেখা যায় সেই ঐশ্বর্য বিলাসের প্রভূত আড়ম্বর – অবশ্যই অতৃপ্তি আসতে পারে। সে অতৃপ্তি আসতে পারে। সে অতৃপ্তির আক্ষেপ তার আর একটি পদে ধ্বনিত –

"কত বিদগধজন রসে অনুগমন

অনুভব কাহু না পেখ।"

সুতরাং 'প্রার্থনা'র পদে বিদ্যাপতির যে আত্মগত খেদোক্তি প্রকাশিত হয়েছে, মধুসূদনের আত্মবিলাপের মতো তা বিদ্যাপতির আত্মবিলাপ –

"রে প্রমত্ত মন মম! কবে পোহাইবে রাতি

জাগিবিরে কবে;

জীবন উদ্যানে তোর যৌবন কুসুম ভাতি

কতদিন রবে?"

বিদ্যাপতিরও এই সুর, আত্মসম্বিতের আচম্বিত জাগরণ। বিদ্যাপতি ভোগী কবি। তবে ভোগবদ্ধ কবি নন। মানস ভোগের অতৃপ্তি ও বস্তুভোগের নৈরাশ্য তাঁকে ঊর্ধ্বতর অনুভূতির জগতে তুলে দিয়েছে। বিদ্যাপতির পদে প্রথম থেকে আত্মদানের ব্যাকুলতা নেই সে হিসেবে বিদ্যাপতি প্রথম জীবনে ছিলেন অগভীর, কিন্তু ভোগজনিত জীবন রস উপলব্ধির একটা বিস্তৃতি আছে। তার মাধ্যমেই পরবর্তী আত্মসমর্পণের কাব্যে সমুদ্রের সুর লেগেছে।

বিদ্যাপতির 'প্রার্থনা'র পদে জ্ঞানের একটি দৃঢ় বহিরাবরণ আছে। তাই তা এতো অপূর্ব। 'প্রার্থনা'র পদে বিদ্যাপতিকে নিছক ভক্ত কবি বলা ঠিক নয়, তবু মনে হয় প্রার্থনার এমন ভাবঐশ্বর্য নিছক আবেগ থেকে আসেনি। কবি শিবভক্ত। মনে হয় তাঁর একটা বৈদান্তিক দীক্ষা ছিল। ঐ জ্ঞানই আত্মসমর্পনের আবেশে বিচলিত হয়ে রসরূপ ধরেছে –

"কত চতুরানন মরি মরি যাওত

নতুয়া আদি অবসানা।

তোহে জনমি পুণ তোহে সমাওত

সাগর লহরী সমানা।।"

প্রার্থনার অন্যান্য পদে জীর্ণ বার্ধক্যের প্রতি, যৌবনের অদম্য ভোগস্পৃহার প্রতি যে তীব্র

ঘৃণা "মাধব বহুত মিনতি করি তোয়" এই পদে অনুপস্থিত হলেও জীবনের অন্তিম প্রান্তে অবসন্ন পরমায়ুর প্রহরে ব্যাথা রক্তিম গোধূলি আলোয় করুণ বিষণ্ণ এই পদটি। তাঁর রাধা দেহকে পূজাবেদী করে মাধবের অর্চনা করেন। তাঁর বেদনার অশ্রু সরোবরে ফুটে থাকে তপস্যার অমেয়-লাবণ্য। ঠিক তেমনি করে এই কবিও তাঁর সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় আর পাপ-পুণ্য নিয়ে শরণাগত, দান ও আর্তচিত্ত নিয়ে পরিত্রাণ-পরায়ণ মাধবের চরণে আপন সত্তাকে পূজাপুষ্পের মতো অঞ্জলি দিয়েছেন।

অসন্তুষ্ট আত্মক্ষুব্দ মনোবৃত্তি প্রার্থনার পদগুলিতে আত্মসমর্পণে অপূর্ব নিবিড়তা লাভ করেছে। শঙ্করী প্রসাদ বসুর মন্তব্য – "প্রার্থনার পদে বিদ্যাপতি ভক্ত হইতে পারেন, কিন্তু তাহার ভক্তি সাধারণ ভক্ত বৈষ্ণবের মুহ্যমান দীনতা বুদ্ধির সমরূপ নয় – তাহাতে আছে আত্মদর্শনের মহিমা। অসীম শূন্যতাবোধে সে কাব্য গৌরবান্বিত; জীবনকে নিঃশেষে পান করিবার পরেও রস শূন্য তৃষ্ণার্ত জিহ্বার আর্তনাদ সেখানে শোনা যায়।।"

বিদ্যাপতির প্রার্থনাবিষয়ক পদের আরো কিছু দৃষ্টান্ত –

১) "তোঁহ প্রভু ত্রিভুবন নাথে। হে হর
হম নিরদীস অনাথে।।
করম ধরম তপহীনে।
পড়লহুঁ পাপ অধীনে।।"

২) "হরজনি বিসবর মো মমিতা।
হমনর অধম পরম পতিতা।
তুঅ সন অধম উধার না দোসর।
হম সন জগ নহি পতিতা।।...."

পদগুলি আন্তরিক ভক্তি ব্যাকুলতায় স্পন্দিত। আত্মনিবেদনের সুরে সুরে ঝঙ্কৃত। ভক্তি যেখানে বাহুল্য নাশ করে শুধু হৃদয় বিগলনে চরিতার্থ হয়, এখানে সেই ভক্তি। ৭৭১ পদে বলা হয়েছে –

"কখন হরব দুখমোর
হে ভোলানাথ
দুখহি জনম ভেল দুখহি গমাএব
সুখ স্বপনহু নহি ভেল
হে ভোলানাথ!"

সেই সম্বোধন কীভাবে না অনুযোগ, আবদার, আক্ষেপ, আবেগের মিশ্রণ-এককথায় মূঢ় ভালোবাসা এবং গূঢ় অভিমানের রসায়ন। ৭৭৫ নং পদের অপূর্ব শিব সঙ্গীতটির শুরুতে আছে – "প্রভু তুমি সুরধুনীর ধারা" -এখানে গঙ্গাধরের পতিত পাবনী গঙ্গা রূপ – পিতার পিতৃরূপ।

তাহলে প্রার্থনার পদের দুটি বিভাজন – শিবের নিকট প্রার্থনা এবং মাধবের নিকট প্রার্থনা। মহামায়া বা গঙ্গাদিবিষয়ক পদের শেষেও প্রার্থনার সুর আছে।

উপসংহারে স্বীকার করতেই হয়, বিদ্যাপতির কাব্যে প্রার্থনার পদগুলিই প্রমাণ করে দেয়, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ভোগোল্লাসের মাঝে যে স্নিগ্ধ ভক্তি রসপ্রবাহ প্রচ্ছন্ন ছিল, তা শেষ

টিপ্পনী

জীবনে শান্ত সমাহিত, আত্মনিবেদনময় 'প্রার্থনা'র পদে পরিণতি লাভ করেছে।

'অভিসার' পর্যায়ের পদ রচনাতেও বিদ্যাপতির কিঞ্চিৎ প্রতিভার উৎকর্ষ দেখা যায়। 'অভিসার' -পর্বে বিদ্যাপতির মুক্তি ঘটে অসীম রূপ লোকে। তাই এ পর্বে তাঁর রাধা অভিসারের দুর্গম পথ অতিক্রম করেছে :

"নব অনুরাগিনী রাধা।
কিছু নাহি মানএ বাধা।।
একলি কএলঁ পয়ান।
পথবিপথ নাহি মান।।"

পথের বিঘ্নবাধাকে অতিক্রম করে সে প্রিয় মিলনের আকাঙ্ক্ষায় পথে বের হয়। সে প্রিয়কে দেবতা করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "যেখানে মানুষ ভালোবাসে, সাধনা করে, সেখানে সে আপনাকে ছাড়াইয়া যায়, সীমার মাঝে অসীমের স্পর্শ লাভ করে।" বিদ্যাপতির 'অভিসারে'র পদে রাধা সেই সুদূরের আহ্বানে শঙ্কিত মনে কম্পিত দেহে অভিসারিকা হয়ে ওঠেন।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের বর্ণনায়ও বিদ্যাপতির সমধিক কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্যাপতিতে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের অতি প্রাধান্য, রাধার পূর্বরাগ নেই বললেই চলে। অথচ প্রেমের বিচিত্র সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রকাশে শ্রীরাধিকার পূর্বরাগ গ্রহণই কবির পক্ষে বাঞ্ছিত ছিল। বিদ্যাপতি এ সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণকেই প্রাধান্য দিলেন। বিদ্যাপতির সমাজ মনস্কতা এবং ব্যবহারিক জ্ঞানই সম্ভবত এর মুখ্য কারণ। যে সমাজে গৌরীদানের প্রথা প্রচলিত যৌবনাগমের পূর্বেই সেখানে দাম্পত্য জীবনের সূচনা ঘটে – সেখানে পুরুষের প্রতি নারীর রূপমুগ্ধতার অবকাশ কম। হয়তো, সে কারণেই শ্রীকৃষ্ণের রাধিকার প্রতি রূপমুগ্ধতা বিদ্যাপতির কাব্যে এত তীব্রতর। কিন্তু বিদ্যাপতির এ জাতীয় অধিকাংশ পদে যা পাওয়া যায়, তাকে কি শুধু রূপমুগ্ধতা বলা সমীচীন হবে? অধিকাংশ পদেই সুতীব্র ভোগবাসনা ও নারীদেহ মন্থনের প্রবল কামনা ধ্বনিত হয়েছে। কাব্যমধ্যে প্রবেশ করলে দেখা যায়, শুধু প্রবল কামনায় তা আরক্তিম নয়, ভোগ্যের স্থূলতায় তা অধিকাংশ স্থলেই ম্লান। সুতরাং ওই জাতীয় পদকে আদৌ পূর্বরাগের মধ্যে সন্নিবেশিত করা যায় কিনা সন্দেহ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক রাধার দেহ মন্থনের আনুপূর্বিক বিবরণে তা পূর্ণ। বিরল কয়েকটি ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটেছে –

"কোমলাঙ্গী কমলমুখীকে দেখিলাম, এক তিলের জন্য কত স্নেহ জাগিল। মনসিজ নূতন, গুরুলজ্জা, প্রেম ব্যক্ত অথচ কত ছলনা। ক্ষণে পরিত্যাগ করে আবার ক্ষণে নিকটে আসে, মন ভরিয়া মিলে না, আবার উদাসও হয় না, চক্ষুর দৃষ্টি স্থির হয় না, হাত ধরিলে ধনী মুখ লুকায়।"

শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শনের একটি পদে সৌন্দর্যের চকিত প্রকাশ ঘটেছে – অবশ্য শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের মনে মদনজ্বালা প্রজ্জ্বলনে কম সহায়তা করেনি –

"যব গোধূলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহির ভেলি,
নব জলধরে বিজুরি রেহা দ্বন্দ্ব পসারি গেলি।
ধনি অল্প বয়সীবালা
জনু গাথনি পহুপ মালা

থোরি দরশনে, আশা না পূরল বাঢ়ল মদনজ্বালা।”

–অবশ্য শিল্পী বিদ্যাপতি এখানে ভাষাচিত্রের সার্থক বিন্যাসে, ছন্দের সৌন্দর্যে প্রত্যক্ষ একটি ঘটনাকে মূল বিষয়ের অতীতলোকে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তথ্য ও সত্যের পার্থক্য নির্দেশ প্রসঙ্গে এই পদটির প্রথম তিনটি চরণ উদ্ধার করেছেন এবং তাঁর সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন – “গোধূলি বেলায় পূজা শেষ করে বালিকা মন্দির থেকে বাহির হয়ে ঘরে ফেরে আমাদের দেশে সংসার ব্যাপারে এ ঘটনা প্রত্যহই ঘটে। ....এই বিষয়টি এই কবিতার প্রধান বস্তু নয়। এই বিষয়টিকে উপলক্ষ মাত্র করে ছন্দে বন্ধে বাক্য বিন্যাস উপমা সংযোগে যে একটি সমগ্র বস্তু তৈরী হয়ে উঠেছে সেইটেই হচ্ছে আসল জিনিস। সে জিনিসটি মূল বিষয়ের অতীত, তা অনির্বচনীয়।”

প্রকৃতপক্ষে, বিদ্যাপতির এই পর্যায়ের পদ প্রধানত শৃঙ্গার রসাত্মক। এদিক থেকে ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে’র বড়ু চণ্ডীদাসের সঙ্গে বিদ্যাপতির তেমন কোনো পার্থক্য নেই। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যেও শ্রীকৃষ্ণের যে পূর্বরাগ মেলে তাতেও কামদহনের চিত্রই ফুটে উঠেছে –

“তোর মুখে রাধিকার রূপকথা শুনি।
ধরিবারে না পাঁরো পরাণি।।
দারুণ কুসুমশর সুদৃঢ় সন্ধানে।
আতিশয়ে মোর মনে হানে।।
আতিশয় বাঢ়ে মোর মদনবিকার।
তাতে কর মোর উপকার।।”

এই আসঙ্গ লিপ্সা এত প্রবল যে রাত্রে স্বপ্নঘোরে শ্রীরাধিকার সঙ্গে রতিলীলায় শ্রীকৃষ্ণ উদ্দাম হয়ে উঠেছিল। ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ নারীদেহ উপভোগের বর্ণনা বিদ্যাপতির তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। অবশ্য মানসিকতা ও মনস্তত্ত্বের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে বহুলাংশে সাম্য লক্ষ করা যায়। বলাবাহুল্য, প্রাকৃত রতিবিলাসের বর্ণনাই বড়ু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কাব্যে – অন্তত এই পর্যায়ে, বিশেষভাবে লক্ষ করা গেছে।

জ্ঞানদাসও শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ বিষয়ক যে কয়েকটি পদ রচনা করেছেন সেখানে কোনো অসাধারণত্ব নেই, কোথাও কাব্যত্ব নেই, কেবল বক্তব্যের তির্যকতা আছে মাত্র, রাধার অর্ধঅনাবৃত অঙ্গ কৃষ্ণের চিত্তে যে লৌকিক কামনার অগ্নিদহন করেছে, তার উত্তাপ তিনি সঞ্চারিত করেছেন মাত্র –

“হাসিবদনে আধ অঞ্চল দেল।
অঙ্গ মোড়ি পদ দুই তিন গেল।।
পাশ উদাসল পালটি নেহারি।
তঁহি চলল মন বাহু পসারি।।”

অর্থাৎ এখানে কৃষ্ণের সম্ভোগবাসনাই প্রবল। পূর্বরাগের এই কবিতায় বিদ্যাপতি চাতুর্য ও চিত্র যোজনায় যে অনিবার্যতার পরিচয় দিয়েছেন, জ্ঞানদাসের এই শ্রেণীর পদে তাও লক্ষ করা যায় না। এসব ক্ষেত্রে তিনি বিদ্যাপতি ও প্রচলিত ধারার অনুবতী মাত্র। তবে বিদ্যাপতি বা জ্ঞানদাস শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগে কেউই প্রবল দেহাকুলতাকে অতিক্রম করতে পারেননি। আবার

টিপ্পনী

গোবিন্দদাসের শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগে এক চিরন্তন সৌন্দর্য দৃষ্টি নবরূপে রঞ্জিত হয়েছে :

"যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি।।
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল কমল দল খলই।।"

টিপ্পনী

লক্ষণীয়, বিদ্যাপতি শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ বর্ণনায় অধিকতর কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। কেননা এখানে কৃষ্ণের রূপোল্লাসে কেবল বাসনা-কামনার জৈব প্রেরণা নেই, এক সূক্ষ্ম সৌন্দর্য চেতনার ভাবরস অনবদ্য হয়ে উঠেছে অনেক পদে। কৃষ্ণ রাধার রূপ বর্ণনা সম্পর্কে বলেছেন যে, যেখানে রাধার পদযুগল পড়ে সেখানে দুটি পদ্মফুল ফুটে ওঠে। যেখানে যেখানে তাঁর দেহের জ্যোতি পড়ে, সেখানে বিদ্যুতের তরঙ্গ ওঠে –

"জঁহা জঁহা পদযুগ ধরঈ।
তঁহি তঁহি সরোরুহ ভরঈ।।
জঁহা জঁহা ঝলকত অঙ্গ।
তঁহি তঁহি বিজুরি তরঙ্গ।।

জঁহা জঁহা নয়ন বিকাস
তঁহি তঁহি কমল পরকাশ।।"

তুনীয় রবীন্দ্রনাথ ঃ

"দুখানি চরণ পড়ে ধরণীর গায়।
দুখানি অলসরাঙা কোমল চরণ।।
শত বসন্তের স্মৃতি জাগিছে ধরায়।
শত লক্ষ কুসুমের পরশ স্বপন।।"

মনে হয় শ্রীকৃষ্ণের মাধ্যমে স্বয়ং বিদ্যাপতি আরাধ্য সৌন্দর্য প্রতিমার বন্দনা করেছেন –

"অপরূপ পেখল বামা।
কণকলতা অবলম্বনে উঅল
হরিণীহীন হীম ধামা।"

আর গোধূলি সময়ে রাধা ঘরের বাইরে পদার্পণ করলে শ্রীকৃষ্ণের মনে হয়েছে –

"জব গোধূলি সময় বেলি।
ধনি মন্দির বাহির ভেলি।।
নব জলধর বিজুরি রেহা।
দ্বন্দ্ব পসারি গেলা।"

তুলনীয় বুদ্ধদেব বসু / বন্দীর বন্দনা

"সেই মোর গোধূলির সুরভি আঁধারে

যার সাথে দেখা নেত্রের মুকুরে তার দেখেছি
আপন প্রতিচ্ছবি

হিরণ্যদ্যুতি রাধার অপরূপ দেহের সৌন্দর্যে কৃষ্ণ মুগ্ধ হয়েছেন, 'থির বিজুরী বরণ গৌরী' –রাধার 'রূপ লাবণ্য শ্রীকৃষ্ণকে একান্ত বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত করে। রাধার রূপসৌন্দর্য এক অপার্থিব বস্তু – অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় কৃষ্ণের চিত্ত বিমোহিত তাই তিনি দূতীর মাধ্যমে রাধাকে প্রেমনিবেদন করলেও রাধা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ, তাঁর মনে তখনো অনুরাগের ছোঁয়া লাগেনি। তাই নব যৌবনপ্রাপ্তা কৈশোর উত্তীর্ণ রাধার অনেক সময়ই বিরক্তির উদ্রেক হয়েছে। কৃষ্ণের উক্তিতেচতুর কামকলার তথা রূপভোক্তা চিত্তের প্রাধান্যের ফলে হৃদয় বৃত্তি পাঠকের কাছে প্রায়ই ধরা পড়ে না। যেমন :

"কামিনি করএ সিনানে।
হেরি তহি হৃদয় হনএ পাঁচবাণে।।
চিকুর গলয়ে জলধারা।
জনু মুখসসি ডরে রোএ আঁধারা।।
....
তিতল বসন তনু লাগু।
মুনিহুক মানস মনমথ জাগু।।"

এ ধরনের নিছক অনঙ্গ উদ্দীপক আরও কিছু পদ বিদ্যাপতি রচনা করেছেন। পদগুলিতে একদিকে রাধার প্রতি কৃষ্ণের নিছক রূপমুগ্ধতাজনিত লালসা ও রাধার প্রেম সম্পর্কে কৃষ্ণের সংশয়ের প্রকাশ ঘটেছে।

কৃষ্ণের কামনা অনাবৃতভাবেই প্রকাশিত হয়েছে রাধার স্নানের একটি পদে। স্নানান্তে রাধার সিক্ত বসন থেকে নির্গলিত জলধারা দেখে কৃষ্ণের মনে হয়েছে এখন রাধা ঐ সিক্ত বসন ত্যাগ করে অন্য একটি বসন পরিধান করবেন। সেই শোকেই সিক্তবসন যেন জলধারা ঝরিয়ে ক্রন্দন করছে। কখনো কৃষ্ণের রূপানুরাগের ও তাঁর প্রেমের তৃষ্ণাতুর অতৃপ্তি উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের সাহায্যে প্রকাশিত হয় –

"সজনী ভল কএ পেখল ন ভেল।
মেঘ-মাল-সঁয় তড়িত-লতা জনি
হিরদেয় সেল দেঈ গেল।।
আধ আঁচর আধ বদন হাসি।
আধহি নয়ন-তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি
তবধরি দগধে অনঙ্গ।।"

–এখানে কৃষ্ণের সৌন্দর্য রসরসিকতা ও তীব্র দেহনির্ভর প্রেমাকাঙ্ক্ষাই শুধু বিবৃত হয়নি; এখানে যেন কবি শুচিস্নিগ্ধ পূজামন্ত্রই উচ্চারণ করেছেন বলে মনে হয়। রাধার স্তনযুগল সম্পর্কে কবির কৃষ্ণ বলেন –

"কাম কম্বুভরি কনক সম্ভুপরি

টিপ্পনী

চারত সুরধনি-ধারা।।
পয়সি পয়াগে জাগ সত জাগই
সোই পাব এ বহুভাগা।।'”

এখানে মণ্ডনকলার সঙ্গে ধর্মীয় প্রবণতার ইঙ্গিত বিদ্যমান। পূর্বরাগ পর্যায়ে বিদ্যাপতির কৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য হল – তিনি কামজর্জর হলেও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র নায়কের মতো রাধার ওপর বল প্রয়োগের এষণা যেমন নেই, তেমনি নিজের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করে রাধাকে অভিভূত করার প্রয়াসও নেই। তাঁর রক্তমাংসের শরীরের তীব কামনা যেমন সত্য, সেই কামনার সঙ্গে জড়িত সৌন্দর্যমুগ্ধতাও তেমনি সত্য। এই খানেই শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ পর্যায়ে বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাতিস্বিকতা।

টিপ্পনী

তথ্যসূত্র ঃ

১. ড. শঙ্করীপ্রসাদ বসু : 'মধ্যযুগের কবি ও কাব্য', পৃ. ১১।
২. খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার (সম্পাদিত) – বিদ্যাপতির পদাবলী
৩-৪ তদেব
৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর – 'বিদ্যাপতির রাধিকা' : আধুনিক সাহিত্য
৬. ড. শঙ্করীপ্রসাদ বসু : 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি', দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ১৯৯৯, মাঘ ১৪০৫, পৃ. ১৮৭
৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – 'গীতিকাব্য', বিবিধ প্রবন্ধ
৮. ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায় – 'প্রবন্ধ পরিচয়', তুলসী প্রকাশনী, মার্চ ১৯৯৫, পৃ. ১১৭
৯. অধ্যাপক শ্রী খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রী সুকুমার সেন, শ্রী বিশ্বপতি চৌধুরী, শ্রী শ্যামাপদ চক্রবর্তী (সম্পাদিত) – বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন), ত্রয়োদশ সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৬, পৃ. ৯৩
১০. (২) – তদেব
১১. (১২), (২) তদেব
১৩. দীনেশচন্দ্র সেন – 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'
১৪. (৯) – তদেব, পৃ. ৯১
১৫. তদেব, পৃ. ৪৬
১৬. ড. শঙ্করীপ্রসাদ বসু : মধ্যযুগের কবি ও কাব্য
১৭. ড. শ্রীমন্তকুমার জানা : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ), পুনর্মুদ্রণ : জুন ২০০৯, পৃ. ১০৭
১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সঞ্চয়িতা, “নৈবেদ্য” কাব্যগ্রন্থ / 'মুক্তি' কবিতা, বিশ্বভারতী ১৯৭২, পৃ. ৪৩৭
১৯. (৯), – তদেব, পৃ. ১০৪
২০. (১৯), (৯) – তদেব, পৃ. ১০৫
২১. তদেব, পৃ. ৪৬
২২. মধুসূদন দত্ত – 'আত্মবিলাপ'
২৩. (২১) – তদেব, পৃ. ১০৬

২৪. ড. শঙ্করাপ্রসাদ বসু – ‘চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি’
২৫. (২৬), (২) – তদেব
২৭. খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমান বিহারী মজুমদার – ২৮৬ সংখ্যক পদ বিদ্যাপতির পদাবলী, মিত্র মজুমদার সংস্করণ।
২৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর – রবীন্দ্ররচনাবলী, তথ্য ও সত্য, ১৪শ খন্ড, পঃ বঃ সরকার সংস্করণ, পৃ. ৩১২।
২৯. (৯) – তদেব, পৃ. ৩৫
৩০. (২) – তদেব।

টিপ্পনী

পদাবলী সাহিত্য ঃ চণ্ডীদাস

মধ্যযুগের কৃষ্ণদাস কবিরাজের ‘চৈতন্যচরিতামৃত’, জয়ানন্দের ‘চৈতন্যমঙ্গল’, নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাস, রহরি চক্রবর্তীর ‘ভক্তিরত্নাকর’ প্রভৃতি গ্রন্থে চণ্ডীদাসের উল্লেখ আছে। আধুনিক যুগের রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ‘বিবিধার্থ সংগ্রহ’ –এ চণ্ডীদাসের পদ সম্পর্কে কিছু তথ্য আছে। উনিশ শতকের আরও কয়েকটি গ্রন্থে (যেমন – হরিমোহন মুখোপাধ্যায় –এর ‘কবিচরিত’ মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ‘বঙ্গভাষার ইতিহাস’ প্রভৃতি) চণ্ডীদাসের কথা আছে। রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর ‘বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব’ গ্রন্থে চণ্ডীদাসের কবিপ্রতিভার সবিস্তার আলোচনা করেছেন।

অন্যদিকে অষ্টাদশ শতকের বৈষ্ণব পদসংকলন গ্রন্থ ‘পদামৃত সমুদ্র’ (রাধামোহন ঠাকুর) –এর আগের সংকলন গ্রন্থে চণ্ডীদাসের পদ সংকলিত হয়নি। পরে বৈষ্ণব দাসের ‘পদকল্পতরু’তে চণ্ডীদাসের পদ সংকলিত হয়েছে। আধুনিক যুগের জগদ্বন্ধু ভদ্রের ‘মহাজন পদাবলী’, অক্ষয়চন্দ্র সরকারের ‘প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘পদরত্নাবলী’ প্রভৃতি গ্রন্থে চণ্ডীদাসের পদ সংকলিত হয়েছে। এই সব সংকলনের দ্বারা আধুনিক বাঙালি চণ্ডীদাসের কথা জেনেছে। কিন্তু চণ্ডীদাসকে এক ও অভিন্ন বলেই জেনেছে উনিশ শতকের বাঙালি। ওই শতকের শেষের দিকের এবং বিশ শতকের বাঙালিদের মনে চণ্ডীদাসের অভিন্নতা সম্পর্কে সংশয় দেখা দিয়েছে। বিশেষত ১৩২৩ বঙ্গাব্দে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ –এর সম্পাদনায় ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ‘চণ্ডীদাস সমস্যা’ নামে এক বিতর্ক উপস্থিত হয়েছে।

চণ্ডীদাস সমস্যা

১৩০৫ বঙ্গাব্দ থেকে চণ্ডীদাস কয়জন এই নিয়ে সংশয় জাগতে শুরু করে। সেই সংশয় প্রবল হয় ১৩২৩ বঙ্গাব্দে। ১৩০৫ বঙ্গাব্দে নীলরতন মুখোপাধ্যায় চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত কিছু পদ প্রকাশ করেছিলেন যেগুলিকে কোনো ভাবেই পদকর্তা চণ্ডীদাসের পদ বলে মেনে নেওয়া যায় না। ১৩২১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ব্যোমকেশ মুস্তাফী প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদ সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়।

অনেক পণ্ডিত দুই চণ্ডীদাসের মধ্যে সমন্বয় আনার চেষ্টা করলেন। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন বললেন যে অপরিণত বয়সে বড়ু চণ্ডীদাস ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যে রচনা করেন আর পরিণত

বয়সে পদাবলি রচনা করেন। এরপর ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের পর আর একবার বিতর্ক উঠল। অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু দীন চণ্ডীদাসের পুথি আবিষ্কার করলেন। পালার আকারে লেখা পুথি। এতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বের অনুসরণ লক্ষ করা যায়। এবার মানতে হল দুজন চণ্ডীদাস ছিলেন। একজন চৈতন্য পূর্ববর্তী, অন্যজন চৈতন্য পরবর্তী। দীর্ঘদিন ধরে বাঙালি পাঠক চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত যেসব পদের সঙ্গে পরিচিত সেগুলির রচনারীতির সঙ্গে মিল নেই মণীন্দ্রবাবু আবিষ্কৃত পদগুলির। রামপুরহাট কলেজের অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরে বর্ধমান জেলার বনপাশ গ্রাম থেকে চণ্ডীদাসের পদাবলির একটি বিস্তৃত পুথি আবিষ্কার করেন। সেগুলিতে দীন চণ্ডীদাস ও দীনক্ষীণ চণ্ডীদাসের ভণিতা আছে যা মনীন্দ্রবাবু আবিষ্কৃত পুথিতেও ছিল। এতে বড়ু উপাধি নেই – বাসুলীর উল্লেখ নেই। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন যে চৈতন্যপূর্ব যুগে ছিলেন বড়ু চণ্ডীদাস আর চৈতন্যপরবর্তী যুগে আর একজন চণ্ডীদাস নানা ভণিতায় পদ লিখেছেন। একজন কবির সব পদই সমান হওয়া সম্ভব নয়। তাঁর মতে চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, দীনক্ষণ চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস একই ব্যক্তি। বিমানবিহারী মজুমদার এবং মুখময় মুখোপাধ্যায় দ্বিজ চণ্ডীদাসকে দীন চণ্ডীদাস থেকে পৃথক করেছেন এবং দুজনকেই চৈতন্যপরবর্তী যুগের কবি বলেছেন। মণীন্দ্রমোহন বসু পদাবলির চণ্ডীদাস থেকে দীন চণ্ডীদাসের পার্থক্য দেখাননি। কিন্তু বৈষ্ণবীয় রসের ধারা অনুযায়ী প্রচলিত পদকর্তা চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয় যিনি প্রথম শ্রেণীর পদ রচনা করেছেন এবং যার মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ছিটে ফোঁটা নেই। তাছাড়া আর একজন সহজিয়া মতের বৈষ্ণব পদকর্তাকে মেনে নিতে হয়।

টিপ্পনী

চণ্ডীদাস সমস্যা সমাধান হয়নি। তবে মোটামুটিভাবে চারজন চণ্ডীদাসকে স্বীকার করতে হয় বড়ু চণ্ডীদাস, পদকর্তা চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস ও সহজিয়া চণ্ডীদাস। শেষের দুজন চৈতন্য পরবর্তীযুগের কবি। চৈতন্যদেব পদকর্তা চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করতেন – বড়ু চণ্ডীদাস –এর নয়।

চণ্ডীদাসের বাসস্থান নিয়েও সমস্যা আছে। তবে তার মোটামুটি সমাধানও আছে। পদকর্তা চণ্ডীদাসের বাড়ি ছিল বীরভূম জেলার নানুর গ্রামে আর বড়ু চণ্ডীদাসের বাড়ি ছিল বাঁকুড়া জেলার ছাতনায়। তবে এসব কথার পিছনে কোন পাথুরে প্রমাণ নেই। দীন ও সহজিয়ার বাড়ি কোথায় ছিল জানা যায় না।

পদকর্তা চণ্ডীদাস

পদকর্তা চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করে চৈতন্যদেব থেকে শুরু করে আপামর বাঙালি মুগ্ধ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাসের মূল্যায়ন করেছেন এইভাবে –

"চণ্ডীদাস সহজভাষার সহজভাবের কবি – এই গুণে তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি।"

চণ্ডীদাসের রাধার প্রেম হল জীবনবোধের নির্যাস। দুঃখবোধের নিবিড়তার মধ্য দিয়ে চণ্ডীদাসের পদাবলিতে প্রেমের জগৎ তৈরি হয়েছে। অজস্র দুঃখ বেদনার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছেন নায়িকা পরম প্রার্থিতকে পাবার জন্য। অনুভূতির নিবিড় আনন্দ আছে রাধার প্রেমসাধনায়। পদে রূপসৌন্দর্যের দিকটি উপেক্ষিত – আধ্যাত্মিক ভাবুকতার দিকটি প্রধান।

প্রথম থেকেই রাধা যোগিনী। তাঁর শারীরিক চেতনা নেই। তাঁর মধ্যে চাঞ্চল্য নেই – আছে উপলব্ধির গভীরতা, নাম শুনেই তিনি আকুল। নাম জপ করেই তাঁর শরীর অবশ। পার্থিব যে সব বস্তুর সঙ্গে কৃষ্ণের সাদৃশ্য আছে সেইসব বস্তু দেখে তিনি বিহুল হয়ে পড়েন। তাই কালো জল দেখলে তার কৃষ্ণের কথা মনে পড়ে –

যমুনার জল করে ঝলমল
তাহে কি পরাণ রয়।

কুলশীল জাতিমান সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে কলঙ্কের ডালি মাথায় নিয়ে তিনি কৃষ্ণপ্রেমের নৈবেদ্য হিসেবে নিজেকে কৃষ্ণের চরণতলে সমর্পণ করতে চেয়েছেন। তাঁর ঐকান্তিক আত্মনিবেদনে প্রেম ও ভক্তি বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। তাঁর বক্তব্য –

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি।

মিলনেও সুখ নেই। অহেতুক বিচ্ছেদ ভাবনার শিল্পরূপ চণ্ডীদাসের কবিতা –

দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া
তিলে আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া।

তবু কৃষ্ণ প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না –

রাতি কৈনু দিবস কৈনু রাতি
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পীরিতি।

চণ্ডীদাসের রাধাকে অভিসারে যাবার সময় সমাজের কথা ভাবতে হয়। সমাজ ও ব্যক্তির দ্বন্দ্বে রাধাপ্রেম কন্টাকিত – রক্তাক্ত।

ঘরে গুরুজন ননদী দারুন
বিলম্বে বাহির হৈনু।
আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া
কতনা যাতনা দিনু।

শেষ পর্যন্ত রাধা কৃষ্ণকেই আপনজন বলে গ্রহণ করেছেন। পূর্বরাগ থেকে ভাবসম্মিলিন পর্যন্ত সমস্ত পদেই চণ্ডীদাস রাধার তপস্বিনী মূর্তি গড়েছেন। অবশ্য সব পর্যায়েই যে কবি শ্রেষ্ঠ এমন কথা বলা যাবে না। পূর্বরাগ ও আক্ষেপানুরাগের পদে কবির শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত কিন্তু অন্যান্য পর্যায়ে তেমন নয়। তাঁর কবিতায় আছে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠের বেদনার্ত বাণী ও উদাস কারুণ্যের মাধুর্য। যেসব রসপর্যায় তাঁর প্রতিভার অনুকূলে সেইসব রসপর্যায়ে তিনি শ্রেষ্ঠ – অন্যগুলিতে নয়।

চণ্ডীদাসের ভাষা-ছন্দ-অলংকার আড়ম্বর নেই। সহজ সরল সুরে জীবনের শাশ্বত আনন্দবেদনার বাণী ধ্বনিত হয়েছে তার কাব্যে। দীনেশচন্দ্র সেনের মতে চণ্ডীদাসের পদে শব্দের ঐশ্বর্য অপেক্ষা ইন্দ্রিয়ময়তা বেশি। কবি নিজে একছত্র লিখে পাঠককে দুছত্র লিখিয়ে নেন। পদ

টিপ্পনী

পাঠ করা মাত্র পাঠক নিজের চিত্তে একটি রসমূর্তি গড়ে তোলেন। পাঠক তাঁর অনুভবে, ভাবব্যঞ্জনায় অনির্বচনীয় রসলোকে পৌঁছে যান।

চণ্ডীদাস ও তাঁর বিভিন্ন রসপর্যায়ের পদে কবিকৃতির মূল্যায়ন

টিপ্পনী

বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যে চণ্ডীদাস চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা। রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাস সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন : "চণ্ডীদাস সহজ ভাষার সহজভাবের কবি – এই গুণে তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি।" বাস্তবিকই হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতির সহজতম প্রকাশের সার্থক কবি তিনি। সেই সঙ্গে প্রেমের এক অদ্বিতীয় কবিশিল্পী ছিলেন তিনি। কারণ চণ্ডীদাসের কবিতায় রাধার যে প্রেম তা এক গভীরতম জীবনবোধের নির্যাস। নিজ জীবনের দুঃখবোধের গভীরতার মধ্য দিয়েই তাঁর পদাবলীতে প্রেমের জগৎ তৈরী হয়েছে।

১) "সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

২) "বঁধু কি আর বলিব আমি
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি।।"

সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাষায় রচিত এই পদগুলি চিরপুরাতন অথচ চিরনতুন প্রেমগীতের অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর। আসলে রামীকে কেন্দ্র করে নানুরের কবি কামগন্ধহীন নিকষিত হেমসদৃশ যে প্রেমামৃতের সন্ধান পেয়েছিলেন কৃষ্ণপ্রিয়ার চিত্রাঙ্কনে সেই বৈরাগিনী যোগিনী প্রেমসাধিকাকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। এ যুগের কবিভাষায় চণ্ডীদাসের মর্মকথাটি যেন ব্যক্ত হয়েছে –

"আর পাব কোথা?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।"

–চণ্ডীদাসের এই প্রণয় ব্যাপার পার্থিব নর-নারীর দেহভাবমূলক প্রণয়ের মধ্যে বিদেহী সত্যের অনুসন্ধান। অর্থাৎ এ প্রেম বাহ্যজগতের দর্শন স্পর্শনের অতিরিক্ত, অতীন্দ্রিয় রসলোকে আমাদের আহ্বান করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'সুরদাসের প্রার্থনা' -র মতোই কবির প্রার্থনা :

"আমার বাহিরে দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতরে দুয়ার খোলা।
তোরা নিসাড়া হইয়া আইলো সজনি
আঁধার পেরিয়ে আলা।।"

কত স্বাভাবিক ভাবেই না চণ্ডীদাসের কাব্যে রতি থেকে আরতিতে উত্তরণ, দেহ থেকে দেহাতীতে পরিক্রমণ, ইন্দ্রিয় থেকে অতীন্দ্রিয় রসলেকে সংক্রমণ সম্ভব হয়েছে। দেহের চেতনা দিয়ে তো মনোলোকের প্রদীপ জ্বালিয়ে তোলা সম্ভব নয়, চোখের আলো নিভলে তবে তো মনের আলো জ্বলবে :

"রজনী দিবসে হব পরবশে

স্বপনে রাখিব লেহা।
একত্র থাকিব নাহি পরশিব
ভবানী ভাবের দেহা।।”

–এই হলো চণ্ডীদাসের প্রেমচেতনার বাণী বিগ্রহ।

চণ্ডীদাস বিভিন্ন রসপর্যায়ের মধ্যে পূর্বরাগ অনুরাগ, আক্ষেপানুরাগ ও নিবেদন পর্যায়ের পদে সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তবে চণ্ডীদাস ‘পূর্বরাগ’ থেকে ভাবসম্মিলন পর্যন্ত প্রতিটি রস পর্যায়ে বিপ্রলম্ভ রসের মাধুর্য সঞ্চার করে চিরকালীন Sweetest Songs রচনা করেছেন। প্রথমে যদি চণ্ডীদাসের ‘পূর্বরাগ’ পর্যায়ের পরে দিকে দৃষ্টি দিই তাহলে দেখতে পাব তাঁর রাধার প্রণয়োপলব্ধি রোমান্টিকতা ছাড়িয়ে আধ্যাত্মিক সৃষ্টিস্তরে গিয়ে পৌঁছেছে। যথা –

“জপিতে তোমার নাম বংশীধরি অনুপাম
তোমার বরণের পরিবাস।”

কিংবা

“জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে।”

–এই প্রেমকে পূজামূর্তি দান করার মধ্যে দিয়েই পূর্বরাগ পর্যায়ে কবি চণ্ডীদাস হয়ে উঠছেন মিস্টিক বা মরমী কবি। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন তাই মন্তব্য করেছেন, – “....পূর্বরাগের অবস্থা চিত্রিত করিয়া চণ্ডীদাস যে ধ্যানপরায়ণা রাধিকার মূর্তিটি দেখাইয়াছেন, তাহার সাশ্রুনেত্র ..... সেই মূর্তি ভাষার পুষ্পপল্লবের বহু ঊর্ধ্ব নির্মল আধ্যাত্মরাজ্য স্পর্শ করিয়া অমর হইয়া রি হয়াছেন।”

“বাঙ্‌লা সাহিত্যের আর যে দুঃখই থাকুক, উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের অভাব নাই। ..... একা বৈষ্ণব কবিগণই ইহার সমুদ্রবিশেষ।” বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি তাৎপর্যে জয়দেব, বিদ্যাপতি হতে অর্থাৎ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক থেকে ষোড়শ-সপ্তদশ শতক পর্যন্ত আমরা সেই গীতিধর্মী কাব্য কবিতার ভাবসমুদ্রে আজও অবগাহন করছি। বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যের যে অমৃত রসসাগর, তার যে বিচিত্র তরঙ্গমালা সেই তরঙ্গমালায় উদ্বেলিত হ’য়ে উঠেছে সামাজিক ও লৌকিক জীবনের প্রেমমনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবতরঙ্গরাজি। তারই প্রথমপর্বের এক বিচিত্র ভাবতরঙ্গরূপে আমরা পাই ‘পূর্বরাগ’ পর্যায়ের পদাবলি সাহিত্যকে।

এই পূর্বরাগ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিরূপে আমরা পাই চৈতন্যপূর্ববর্তীযুগের কবি চণ্ডীদাসকে। শুধু রূপের ভাবজগতে নয়, অন্তরের ভাবানুভূতিতে এবং হৃদয়ের আকুলতা ও ব্যাকুলতায় চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকার অন্তর এই পর্যায়ের পদে নানাভাবে, নানারূপে, ও নানাবোধে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তাঁর বিখ্যাত একটি পদে, –

“সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।।”

শুধু রূপ দর্শণে ও নামশ্রবণেই নয়, হৃদয় মন্থন করা তার যে বিচিত্র অনুভূতি তার স্পন্দনের সূক্ষ্ম অনুকম্পনে পাই চণ্ডীদাসের আর একটি বিখ্যাত পদ –

টিপ্পনী

টিপ্পনী

"রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা।।
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ান তারা।।
বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমত যোগিনী পারা।।"

পূর্বরাগের আধারে এখানে শ্রীরাধিকা আত্মনিবেদনের যোগসাধনাই করেছেন। এই রাধা কৃষ্ণকে হয়তো চকিতের জন্য দর্শন করেছেন, আর তাতেই সারা বিশ্বের শ্যামল সৌন্দর্য তাঁর চোখে কৃষ্ণময় হয়ে গেছে। এই পদে চণ্ডীদাস যেন ভালোবাসার আধ্যাত্মিক উৎকণ্ঠার একটি অবিস্মরণীয় ছবি এঁকেছেন। রাধা এখানে পরিণত হয়েছে যথার্থ সাধিকায়। যে কৃষ্ণ একবারের জন্য দেখা দিয়েছেন, কিন্তু ধরা দেননি, তাঁকে পাওয়ার জন্য একাগ্র-চিত্ত যোগিনীর এই ধ্যানতন্ময়তা যেন কুমারসম্ভবের উমার চন্দ্রশেখর লাভের তপস্যা। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধের ঊর্ধ্বে অন্তরের গভীর অনুরাগবশত শ্রীরাধিকা এখানে ভাবতন্ময় হয়ে উঠেছেন।

আবার কখনো বা অন্তরের সীমাহীন ব্যাকুলতায়, উৎকণ্ঠায়, ও চঞ্চলতায় চণ্ডীদাসের শ্রীরাধিকার পরিচয় পাই –

"ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায়।।"

এই চেতনার বেদনায় শ্রীরাধিকার চিত্রে পাই –

i) পুছয়ে কানুর কথা ছলছল আঁখি
ii) যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়,

শ্যামনাম শুনেই রাধার মর্মমূলে পূর্বরাগের উন্মেষ :

"জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে।"

–এ পদ সবরকম স্থূলতা, নগ্নতা ও কলুষতা অতিক্রম করে যেন সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় লোকের দিকহারা দিগন্ত স্পর্শ করেছে। তাঁর রাধা বাস্তবিকই প্রেম-মহাসাগরের তলদেশে নিমজ্জমান ধ্যানগম্ভীর স্বর্ণপ্রতিমা। তবে – "....নান্নুরের কবি পূর্বরাগের যে চিত্র উন্মুক্ত করিয়া আমাদিগকে দেখাইলেন, তাহাতে যৌবনাবেগের প্রসঙ্গ নাই। তাহা ক্লিষ্টকর্মা তপস্বীর –'জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো" –

চণ্ডীদাসের রাধা যে অনুরাগিনী অপেক্ষা বৈরাগিনী, –একথা শুধু আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন বা খগেন্দ্রনাথ মিত্রই বলেছেন এমন নয়। বৈষ্ণব সাহিত্য তত্ত্বেরও সমস্ত পাঠক ও সমালোচকেরও এই মত। এমনকি একালের সুবিখ্যাত পণ্ডিত অধ্যাপক শিশির কুমার দাশ তাঁর একটি সাম্প্রতিক

গ্রন্থে চণ্ডীদাসের রাধা প্রসঙ্গে প্রচলিত মতকেই স্বীকার করেছেন :

"In the lyrics of chsndidas.... Radha is surrounded by a spiritual halo."

চণ্ডীদাসের "সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম" পদটি সম্পর্কে উমেশচন্দ্র বটব্যাল "ভারতী" পত্রিকায় (১৩০২) জানিয়েছিলেন, –"কবিতার শেষ অংশটুকু পূর্বের ন্যায় মনোহর নয়।" কারণ, "ঈশ্বরকে দেখিয়া আমরা ধর্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হইব এ যেন একটা কিম্ভূত কিমাকার কথা"। ভক্তের কাছে এই পদের শেষাংশ তাই বর্জনীয়। কিন্তু আমরা যারা কাব্যাস্বাদ চাই, তারা জানি এখানেই চণ্ডীদাস রসিকমনের কাছে আবেদন রেখেছে "একটুকু ছোঁয়া লাগে একটুকু কথা শুনি" -চিরকাল এইভাবেই রচিত হয়েছে ফাল্গুনিগাথা। সুতরাং চণ্ডীদাসের পূর্বরাগের যোগিনী রাধার রাঙাবাস নিতান্তই বাহ্য; অন্তরে সে রঙীন – কামনায়, প্রেমে। তাই ভোলা অসম্ভব। ঈশ্বর নয়, প্রেমিক কৃষ্ণকে মানবী রাধা বড় অভিমানে ভুলতে চায়। আসলে সেই ভোলার তলে আছে তীব্রভাবে মনে করা। এই জন্যই বিকিয়ে দিতে হয় যৌবন; নারীর চরম সম্পদ –

"আমি তোমারে করিব নিবেদন
আমার হৃদয় প্রাণ-মন"

এ হল সবদেশে, সব কালের প্রেমিকের ভাষা।

চণ্ডীদাসের পূর্বরাগের আরেকটি পদ –

"একে কুলবতী ধনি তাহে সে অবলা।
ঠেকিল বিষম প্রেমে কত সবে জ্বালা।।
অকথন বেয়াধি কহন নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়।।"

এই 'ধনি' রাধা না হয়ে রামী হলেও ক্ষতি ছিল না। আর ওই 'অকথনবেয়াধি' প্রেম? নাকি সমাজ অননুমোদিত? হয়ত দুইই। সেই কারণেই এত জ্বালা। ঈশ্বরকে ভালোবেসে তা কি ব্যাধি হতে পারে? না কি বলা এতই অসম্ভব? শ্রীরামকৃষ্ণাদি একালের ভক্তসাধকেরা বড় জোর 'পাগল' ব'লে চিহ্নিত হয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরকে ভালোবাসার কথা বলতে কেউ থেমে থাকেননি। যাই হোক পদটি যে বিপ্রলম্ভ রসের সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। চণ্ডীদাসের এই রাধা বর্ণনার মধ্যে দিব্যোন্মাদের বেদনামাধুরী ফুটে উঠেছে।

চণ্ডীদাসের পদাবলির সমস্ত পর্যায়েই ছড়িয়ে আছে কৃষ্ণপ্রেমের জন্য রাধাহৃদয়ের ব্যাকুল আর্তি আর যন্ত্রণা। সামন্ত সমাজের পটভূমিতে এক বাঙালি গৃহবধূর গণ্ডীবদ্ধ জীবনের নিরুপায় বন্দীত্বে, পরিবার পরিজনের অরণ্যে একাকিনী রাধা কখনো প্রেমের বেদনায়, কখনো গৌরবে, আবার কখনো বা নিজের দ্বিধান্দোলিত সত্তার ব্যাকুলতায় বেদনাদীর্ণ। চণ্ডীদাসের সমগ্র পদাবলি যেন সেই রাধার হৃদয় নিঙড়ানো অশ্রুবিন্দু দিয়ে গাঁথা মুক্তামালা। ধূসর গোধূলির ম্লান বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন।

চণ্ডীদাসের পদের নিরাভরণ সারল্য, আর সেই সারল্য সুষমায় লাবণ্যময়ী রাধার পদগুলিকে অসাধারণ সৌন্দর্যময়ী করে তুলেছেন। বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, এমনকি জ্ঞানদাসের পূর্বরাগের পদে প্রেমানুভবের যে আনন্দোচ্ছল প্রবল তরঙ্গ চাঞ্চল্য লক্ষ করা যায়, এখানে তা অনুপস্থিত।

টিপ্পনী

অথচ শান্ত, নম্র ঘোষণায় রাধার গভীরতম প্রেমের স্তরপারম্পর্যও এখানে উন্মোচিত। এই বেদনামাধুরী চণ্ডীদাসের একান্তই নিজস্ব। তাই পূর্বরাগের পদে কবি চণ্ডীদাস শুধু সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবিই নন, তিনি এক্ষেত্রে এক ও অদ্বিতীয়। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়, –"বিদ্যাপতির রাধিকা, চণ্ডীদাসের রাধিকা দুইজনেই রূপে মুগ্ধ, দুইজনেই বংশীধরের বাঁশির সুরে আকুল। কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধার কথায় এই আকুলতা যেমন ব্যক্ত হইয়াছে, বিদ্যাপতির রাধার তেমন হয় নাই"

টিপ্পনী

চণ্ডীদাসের আক্ষেপানুরাগ পর্যায়ের পদে কৃতিত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে আক্ষেপানুরাগের ও প্রেমবৈচিত্ত্যের স্বরূপটি বিবৃত করে এই পর্যায়ের পদে শ্রেষ্ঠ কবির মূল্যায়নে মনোনিবেশ করব।

বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যে 'আক্ষেপানুরাগ' পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য হ'ল – কৃষ্ণপ্রেমের প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ। 'আক্ষেপানুরাগ' তো অনুরাগেরই নামান্তরই। বরং তা গভীর অনুরাগকেই দ্যোতিত করে। বৈষ্ণবীয় তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে রাধা এবং কৃষ্ণ অরূপ ভাবনার রসোজ্জ্বল মূর্তি হলেও এই পর্যায়ের পদগুলিতে তারা কাব্যসৌন্দর্যের জগতে প্রাণময়ী ও প্রাণময় মানব-মানবীর হৃদয় সংবেদনাতেই মর্ত্যভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তত্ত্বের কোনো সৌন্দর্য নেই, কিন্তু সেই তত্ত্ব যখন কাব্যিক রসমূর্তি লাভ করে তখনই তা সুন্দর হয়ে ওঠে। রাধাকৃষ্ণের মানবিক রসমূর্তিরও ঘটেছে সেই রসসৌন্দর্য লাভ। তাই তত্ত্ব এখানে কাব্যরসে ঝরে পড়েছে শ্রীরাধিকার অন্তর বেদনায়। অনুরাগের মাধ্যমে প্রেমচেতনার সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম অনুভূতি পরমপ্রিয়ের সঙ্গে মিলনের যে আর্তি জাগায়, অভিসারের দুশ্চর ও দুর্গম পথ পরিক্রমায় তার যে ব্যাকুলতা প্রকাশ পায়, মিলনের আনন্দঘন মানসিক তৃপ্তিতে যে পরম আশ্বাসের বাণী অন্তরে জেগে ওঠে, তার পরে ক্ষণিকের বিরহে সেই প্রিয়মিলনের সুখস্মৃতি রোমন্থনের মাধ্যমে দুঃখ-বেদনার যে হৃদয়-ক্রন্দন তারই প্রকাশ ঘটেছে 'আক্ষেপানুরাগ' ও 'প্রেমবৈচিত্ত্যের' পদগুলিতে।

'আক্ষেপানুরাগ' পর্যায়ের পদকর্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস। আর দু-জনের মধ্যে শ্রীরাধিকার অন্তরের মর্মবেদনার কাব্যিক প্রকাশে প্রাক্ চৈতন্য যুগের কবি চণ্ডীদাসই এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ পদকর্তারূপে সম্মানিত ও প্রতিষ্ঠিত। চণ্ডীদাসের আক্ষেপানুরাগের পদে আছে ব্যক্তি জীবনের প্রভাব, সমাজসচেতনতা, স্বতন্ত্র রসদৃষ্টি ও ধর্মবোধ। এই স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তি সমাজ প্রাধান্য। অপর বৈষ্ণব কবি অপেক্ষা চণ্ডীদাস অনেক বেশি মান্য করেছেন লোকগঞ্জনা ও সামাজিক সংস্কারকে। সমাজ চায় না, গুরুজনে নিন্দে করে, ভুবনে কলঙ্ক ঘোষিত হয়, তবু প্রেম আনন্দের অক্ষয় উৎস। সংসার মরুতে এই প্রেম নিত্যতৃপ্তির রস সঞ্চার করে। পরবর্তী বৈষ্ণব পদে চণ্ডীদাসের মতো এতখানি সমাজ মান্যতা দেখা যায় না, সেখানে কুটিল লোকালোচনার কথা আছে, কিন্তু সেই নয়নগ্লানিকে তুচ্ছতায় নিক্ষেপ করে সর্বজয়ী প্রেমের গরিমা অনেক বেশি উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত। কিন্তু সমাজ সম্বন্ধে চণ্ডীদাসের আচরণ অধিকতর মৃদু, কুণ্ঠিত ও ভীত। গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসাদর্শের শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাসের একটি প্রতিনিধিমূলক পদের সঙ্গে চণ্ডীদাসের পদের সঙ্গে তুলনা করা যায়। গোবিন্দদাসের পদ :

"রূপেভরল দিঠি সোঙরি পরশ বিঠি
পুলক না তেজেই অঙ্গ।
মোহন মুরলী-রবে শ্রুতি পরিপূরিত
না শুনে আন পরসঙ্গ।।"

চণ্ডীদাসের পদ :

"যত নিবারিতে চাই নিবারত্ত না যায় রে।
আনপথে যাইসে কানু পথে ধায়রে।।
এ ছার রসনা মোর হইলো কি বামরে।
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে।।"

চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাসের পদ দু'টি দুটি ভিন্ন চরিত্র নিয়ে উপস্থিত। গোবিন্দদাসের রাধা খুশিতে উচ্ছ্বাসিত। কারণ, তার ইন্দ্রিয় পথে কৃষ্ণ প্রবেশ করেছে, রূপে নয়নপূর্ণ, স্পর্শ স্মৃতিতে রোমাঞ্চপূর্ণ দেহ, মোহন মুরলিতে শ্রবণপূর্ণ, আর নাসিকাপূর্ণ দেহসৌরভ। গৌড়ীয় রসাদর্শের সমর্থনে গোবিন্দদাসের এই রাধার কাছে ধর্মের বা আত্মসংযমের উপদেশ নিতান্ত ব্যর্থ। কিন্তু সংস্কারের ক্লেশ কঠিন সংগ্রামের কথা চণ্ডীদাস বারবার জানিয়েছেন।

টিপ্পনী

প্রত্যাশার অপূরজনিত ক্ষোভ আক্ষেপানুরাগের প্রধান উপজীব্য। একদিকে আছে রাধিকার অসংবৃত অপরিণামদর্শী অন্তর, ও প্রবঞ্চক প্রেমিক, অন্যদিকে বিরূপ সমাজ। এদের সকলের বিরুদ্ধে রাধার আক্ষেপ প্রিয় সম্বোধনে, বংশীনিন্দনে, স্বগত কথনে, পিরীতি গুঞ্জনে, গুরুজন নিন্দনে। রাধা যখন মন্তব্য করেন :

"পিরীতি পাবক কে জানে এত।"

–তখন প্রেমের অগ্নিস্পর্শকেই দোষারোপ করেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"তোমরা যে বল দিবস রজনী ভালোবাসা ভালোবাসা
সখী ভালোবাসা কারে কয়
সে কি যাতনাময়"

–বলা বাহুল্য এই যাতনা প্রেমিকা নারীর তৃপ্তির অতৃপ্তির টানাপোড়েন থেকেই সঞ্জাত হয় এবং চণ্ডীদাসের পদেও এই যাতনা রাধার ব্যক্তিগত হৃদয় থেকেই আবির্ভূত হয়েছে। প্রেম হৃদয়েকে আকুল করে, অথচ তা যন্ত্রণাদায়ক – এ দুটি স্ববিপোধী উপলব্ধির মধ্যে একটি সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব আছে। রাধা প্রশ্ন করেন ঃ

"পিরীতি বলিয়া এ তিন আখার
না জানি আছিল কোথা।
পিরীতি কন্টক হিয়ায় ফুটিল
পরান পুতলী যথা।।"

যে প্রেম হৃদয়ের কাছে কন্টকস্বরূপ, সেই প্রেমই আবার রাধার হিয়ার পুতলী। চণ্ডীদাসের আক্ষেপানুরাগে একটি পদ উন্নীত হয়েছে নিখিল প্রেমসাধনার অমৃত কাব্যে ঃ

"কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন।।
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।।
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।

বুঝিতে নারিলুঁ বঁধু তোমার পিরীত।।”

‘আক্ষেপানুরাগ’ পর্যায়ের পদাবলীতে বিপ্রলম্ভ রসের বেদনা মাধুরীর স্পর্শ থাকায় চণ্ডীদাস এই শ্রেণীর পদরচনায় বাংলা সাহিত্যে সোনার ফসল ফলিয়েছেন। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু বলেছেন –

“চণ্ডীদাসের সর্বস্ব আক্ষেপানুরাগ, এবং আক্ষেপানুরাগের সর্বস্ব চণ্ডীদাস”

টিপ্পনী

–ভাবের ব্যঞ্জনায়, শব্দের শ্রুতিমাধুর্যে, ছন্দের দোলায়, উপমার মনোহারিত্বে উৎকৃষ্ট কবিত্ব শক্তি প্রকটিত হয়েছিল। তাই তাঁর কবিতা বা পদগুলি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তিকে স্মরণ করতে পারি – “সায়াহ্ন সমীরণের দীর্ঘশ্বাস”।

আক্ষেপানুরাগ পর্যায়ের পদকর্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস। আবার দু’জনের মধ্যে শ্রীরাধিকার অন্তরের মর্মবেদনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ চণ্ডীদাসের রচনায় দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ক্ষণিক বিরহজনিত অনুরাগ মিশ্রিত দুঃখবেগনায় শ্রীরাধিকা যে আক্ষেপবাণী উচ্চারণ করেছেন তার অন্তরঘন তাৎপর্যে তার দুঃখ বেদনা ও আক্ষেপই যেন সুখস্মৃতির আনন্দঘন প্রকাশরূপেই ফুটে উঠেছে। যথা –

“বঁধু কি আর বলিব তোরে।
অল্প বয়সে পিরীতি করিয়া
রহিতে না দিলি ঘরে।
কামনা করিয়া সাগরে মরিব
সাধিব মনেরই সাধা।
মরিয়া হইবো শ্রীনন্দের নন্দন
তোমারে করিব রাধা।।”

–এই আক্ষেপানুরাগের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধিকার গভীর অনুরাগ প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্য আত্মীয় স্বজন, ঘর পরিজন সবই তিনি পরিত্যাগ করেছেন। লোকনিন্দা ও কলঙ্কের ডালিকে প্রেমের স্বর্ণমুকুটরূপে দুহাতে মাথায় তুলে নিয়েছেন। সেই কৃষ্ণপ্রেমের যে কি মহিমা তা তিনি আজও বুঝে উঠতে পারেননি। তাই শ্রীরাধিকার কণ্ঠে ঝরে পড়েছে –

“কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।”

এই আক্ষেপের মাধ্যমে শ্রীরাধার অন্তরে কৃষ্ণ প্রেমের অনুভূতি যে কত গভীর ও নিবিড়ভাবে উপলব্ধি হয়েছে তারই একটি রসমুজ্জ্বল অংশে পাই যে কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে শ্রীরাধিকা যেন কৃষ্ণধ্যান, কৃষ্ণগান ও কৃষ্ণনামে বিভোর হয়ে উঠেছেন। তাই তিনি বলেছেন ঃ “যত নিবারিতে চাই নিবার না যায় রে।”

চণ্ডীদাসের আক্ষেপানুরাগ পদগুলিতে সমাজসচেতনতা, ধর্মবোধ, আত্মানুসন্ধান ও পরিবেশচেতনা বেশ চমৎকারভাবে রূপায়িত হয়েছে।

এই সমস্ত পদে রাধার যে বিমুগ্ধ প্রেমের ও নিবিড় তন্ময়তার ছবি চণ্ডীদাস এঁকেছেন তাতে মনে হয় প্রাণের পরিপূর্ণ অনুভব, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনাকে গলিয়ে তিনি রাধার প্রেমময়ী মূর্তি নির্মাণ করেছেন। তাই বলা যায় যে রাধার এই অনুরাগ অনুভূতির আক্ষেপ বর্ণনায় অন্য

যত কবি পদ রচনা করেছেন তাঁদের সঙ্গে তুলনায় চণ্ডীদাসই শ্রেষ্ঠ।

'নিবেদন' পর্যায়ের পদেও কবি চণ্ডীদাস কৃতিত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। কারণ চণ্ডীদাসের এই পর্যায়ের কবিতাগুলি বিশিষ্ট ভাবকল্পনার বাহন। অন্যান্য কবিদের কাব্যে প্রেমিকা রাধার মধ্যে কিছুটা আত্মভাব বা অহং থেকে যায়। কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধা এই বোধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঁর সারা দেহমন যেন সমাচ্ছন্ন হয়ে আছে কৃষ্ণপ্রেমের সুরভিতে।

এই নিবেদন পর্যায়ে চণ্ডীদাসের কৃতিত্ব অবিসংবাদিত, কেননা তাঁর মতো এমন পবিত্র আত্মনিবেদন বৈষ্ণব সাহিত্যে বিরলদৃষ্ট। তাঁর এই পদগুলি যেন স্তোত্রে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী পর্যায়ে (আক্ষেপানুরাগ, বিরহ) রাধার যে বেদনামথিত যন্ত্রণা, আর্তি, দ্বিধান্দোলিত সত্তার দ্বন্দ্বে হাহাকার, সমাজ পরিবারের বিরুদ্ধে আক্ষেপোক্তি প্রকাশিত হয়েছে, নিবেদনের পদে এসে রাধার সেই অশ্রু স্রোতস্বিনী বেদনাধারা কৃষ্ণ সমুদ্রের মাঝে বায়বীয় রূপ পরিগ্রহ করেছে। আর এই আত্মস্বাতন্ত্র্য বিসর্জনময়ী রাধারে প্রিয়ের কাছে নিবেদন করে চণ্ডীদাস হৃদয়ের সুধা উজার করেই শুধু দেননি, তা সর্বজন হৃদয় সংবেদ্য করে পাঠককুলকে অনাস্বাদিত পূর্ব আনন্দের মীড় মূর্চ্ছনায় মাতোয়ারা করে দিয়েছেন।

'নিবেদন' পর্যায়ে কৃষ্ণপ্রেমসর্বস্বা মহাভাবরূপিণী রাধিকা কৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করে বলেছেন –

১) "বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোমারে সঁপেছি
কুলশীল জাতি মান
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপগোয়ালিনী হাম অতি হীনা
না জানি ভজন-পূজন।।"

২) "কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সবলোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ।।
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভালো মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্যসম
তোমার চরণ খানি।"

–চণ্ডীদাসের এই পদগুলিতে অধ্যাত্ম অনুভূতির এক নিবিড় স্বাদ পাওয়া যায়। কারণ, এ প্রেমে কোনো আবিলতা নেই, বাংসনার উত্তাপ নেই, নেই ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার "আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছা" অর্থাৎ নিজের সুখ লাভের ইচ্ছও সেই আত্মবিলোপী প্রেমের মূলক ধ্যানস্তব্ধতা রাধারিত্রে শতদলের মতো গন্ধমাধুরী নিয়ে ফুটে উঠেছে। ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর "শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ : দর্শন ও সাহিত্য" গ্রন্থে বলেছেন, –"সোনাকে যেমন পোড়াইয়া পোড়াইয়া নিখাদ

টিপ্পনী

করিয়া তুলিতে হয়, তেমনি মর্ত্যের প্রকৃত দেহকমনকেও পোড়াইয়া পোড়াইয়া নিখাদ করিয়া তুলিতে হয়, তেমনি মর্ত্যের প্রকৃত দেহমনকেও পোড়াইয়া পোড়াইয়া বিশুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। বিশুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। বিশুদ্ধতম দেহ-মনকে অবলম্বন করিয়া যে প্রেম, তাহা তখন হইয়া ওঠে নিকষিত প্রেম। চণ্ডীদাসের পদে যে অপার্থিব ব্যঞ্জনা, তাহা একটি আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা।''

টিপ্পনী

বাঞ্ছিত শ্রীকৃষ্ণকে পেয়েও রাধার কোনো আত্মঅহমিকা জাগে না। একমন হয়ে কৃষ্ণ চরণে সবকিছু সমর্পন করে তাঁর দাসী হওয়ার আকাঙ্ক্ষাই কাম্যবস্তু –

''বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি।।
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া এক মন হইয়া
নিশ্চল হইলাম দাসী।।''

এখানে – চণ্ডীদাসের ''তোমার চরণে আমার পরাণে / বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি'' এই চরণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ''আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরের বাঁধনে'' –এই লাইনের কথা স্মরণে আসে। চণ্ডীদাসের রাধা শুধু মৃত্যুকালে নয়, জীবনের প্রতিমুহূর্তে কৃষ্ণকে প্রাণপ্রিয় বলে জেনেছেন যেহেতু কৃষ্ণের সঙ্গে তিনি হৃদয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। –এ ভাষায় কোনো কৃত্রিম কাব্যকলা নেই, ছন্দ যেন প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার মতো ঝঙ্কারহীন স্বাভাবিক। এর কোথাও রাজসভার কবি, বিদগ্ধ পণ্ডিত বিদ্যাপতির শব্দ ঝঙ্কার ও অলঙ্কারের কারুকর্ম নেই, এ যেন দরিদ্র বাঙালি বধূর শঙ্খ শুভ্র দেবীমূর্তি। তাই চণ্ডীদাসের আত্মনিবেদন নিঃসন্দেহেই 'ভক্তিস্তোত্র'।

চণ্ডীদাসের আরো একটি 'নিবেদনে'র পদে ভক্তি বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত হ'য়ে উঠেছে।

যেমন –

''জপিতে তোমার নাম বংশীধরি অনুপাম
তোমার বরণের পরিবাস।
তুয়া প্রেমসাধিগোরি আইনু গোকুল পুরী
বরজ মণ্ডলে পরকাশ।।''

এ প্রেম রাধার গভীরতম জীবনাবোধের নির্যাস বলা যেতে পারে। এখানে বিদ্যাপতির মতো চণ্ডীদাসের ব্যকিত্তগত কোনো অনুভূতির স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেনি, তবে রাধার অনুভূতির সঙ্গে চণ্ডীদাসের ব্যক্তিমন একাত্ম হয়ে গেছে। তাই তা অনবদ্য হ'য়ে উঠেছে। প্রেমের চরম পরিণতি বোঝাবার জন্য রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, –''আমার এ দেহখানি তুলে ধর। তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ কর''। চণ্ডীদাসের রাধার উক্তি রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি বললে অত্যুক্তি হয় না –

''কি দিব কি দিব বঁধূ মনে করি আমি।
যে ধন তোমার দিব সেই ধন তুমি।।
তুমি আমার প্রাণ বঁধু আমি হে তোমার।
তোমার ধন তোমারে দিতে ক্ষতি কি আমার।।''

-হৃদয়ের গভীর বন্দর থেকে এ ভাষা নির্ঝরের মতো উৎসারিত। তাই তা পবিত্র ও সাত্ত্বিক গুণান্বিত। যে গানে স্বর্গ ও মর্ত্য, প্রেম ও ভক্তি, দেবী ও মানবী মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়, এ সেই গান – যা রামধনুর মতো দিক চক্রবালের দুই প্রান্তকে স্পর্শ করে।

তত্ত্বগত দিক দিয়ে বললে, শ্রীভগবান ভক্তের আবেদনে সাড়া না দিয়ে পারেন না, এক অর্থে ভগবানও ভক্তের অধীন, প্রেমভক্তির বন্ধনে আবদ্ধ। "আমারে তো যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে। তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে।" কিন্তু ভগবান সবচেয়ে বেশি আনন্দ পান এই মাধুর রসের ভজনায়, 'ঐশ্বর্য শিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীত'। আর ভক্তকে না হ'লে ভগবানের চলে না, কেননা একাকী লীলা হয় না। ভক্তের কথা – "আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হোত যে মিছে"। এই প্রেমেরই দুরন্ত আকর্ষণে ভগবান ভক্তের কাছে আসেন। বলেন :

"রাই তুমি যে আমার গতি।
তোমারই কারণে রসতত্ত্ব লাগি
গোকুলে আমার স্থিতি।।"

ভক্তের কাছে ভগবানের আগমন -ভক্তেরই প্রেমভক্তির তীব্রতা সূচিত করে। নিবেদনের পদগুলিতে রাধার সেই গভীরতম হৃদয়াকূতির বাঙ্ময় প্রকাশ।

চণ্ডীদাসের 'নিবেদন' পর্যায়ের কবিতাগুলি বিশিষ্ট ভাবকল্পনার বাহন। রাধার আত্মনিবেদনমূলক এই কবিতাগুলির মধ্যে সমস্ত দেহমন প্রাণকে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দেওয়ার আন্তরিক সুরটি চমৎকার বেজে উঠেছে। গীতায় কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, – "যৎ করোষি যদশ্নাষি যজ্জু-হোসি দদাসি যৎ / যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুস্ব মদর্পণম্।" চণ্ডীদাসের রাধাও একইভাবে একাগ্রচিত্তে কৃষ্ণের কাছে তাঁর সমস্ত কিছুই অর্পন করেছেন। এবং তার মধ্যেই চণ্ডীদাস ফুটিয়ে তুলেছেন অনবদ্য ভাবকুসুম। এই হিসেবে নিবেদনের পদে চণ্ডীদাসের উৎকর্ষ।

তথ্যসূত্র ঃ

১. অধ্যাপক শ্রী খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীসুকুমার সেন, শ্রী বিশ্বপতি চৌধুরী, শ্রী শ্যামাপদ চক্রবর্তী – বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন), ত্রয়োদশ সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৬, পৃ. ২৮
২. তদেব, পৃ. ৮২
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : "সোনার তরী" কাব্যগ্রন্থ, 'বৈষ্ণব কবিতা'
৪. শ্রী বিমানবিহারী মজুমদার : চণ্ডীদাসের পদাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, সং রথযাত্রা, ১৪০৩
৫. তদেব
৬. তদেব, পৃ. ২৮
৭. (১) – তদেব, পৃ. ২৮
৮. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বিবিধপ্রবন্ধ, গীতিকাব্য
৯. (১) – তদেব, পৃ. ২৮
১০. (১) – তদেব, পৃ. ২৯
১১. (১) – তদেব, পৃ. ৩০

টিপ্পনী

১২. (১) – তদেব বৈষ্ণব পদাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম সংস্করণের ভূমিকা
১৩. অধ্যাপক শিশির কুমার দাশ : "The Mad lover", পৃ. ৭৬।
১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চিত্রাঙ্গদা
১৫. (৪) – তদেব
১৬. বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর : বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস
১৭. (১) – তদেব, পৃ. ৪২
১৮. তদেব, পৃ. ৭৫
১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতবিতান
২০. ড. বিমানবিহারী মজুমদার : পাঁচশত বৎসরের পদাবলী,
২১. (১) – তদেব, পৃ. ৭৬
২২. ড. শঙ্করীপ্রসাদ বসু : চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি, সং মাঘ ১৪০৫, দেজ পাবলিশিং, পৃ. ৭৬
২৩. (১) – তদেব পৃ. ৭৫
২৪. তদেব, পৃ. ৮৩
২৫. তদেব, পৃ. ৮৩
২৬. তদেব, পৃ. ৮২
২৭. (৪) – তদেব।

টিপ্পনী

দীন চণ্ডীদাস ঃ

বিরাট পালাগানের লেখক দীন চণ্ডীদাসের অধিকাংশ পদেই বিশেষ বোনো কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। পালাগানে কাহিনিচাতুর্য ও রচনাচাতুর্য পাই, ভাবের ঐকান্তিক গভীরতা নেই। মণ্ডণকলায় কোনো উজ্জ্বলতা নেই। তাঁর সৃষ্ট ছন্দ অলংকার ভাবের সঙ্গে অদ্বয়-সম্পর্ক লাভ করতে পারেনি। প্রাক-চৈতন্যযুগের পদাবলির চণ্ডীদাসের সঙ্গে তাঁর তুলনাই চলেনা।

সহজিয়া চণ্ডীদাস ঃ

সহজিয়া চণ্ডীদাসের নামে প্রচারিত রাগাত্মিকা, প্রহেলিকা ও প্রচ্ছন্ন তাৎপর্যপূর্ণ কিছু কিছু পদ বুদ্ধির ঝলকে উজ্জ্বল, কোনো কোনো পদের রূপক প্রতীক প্রশংসার যোগ্য আবার কোনো কোনো পদে কবির কল্পনা শক্তি শিল্পরূপ লাভ করেছে। 'শুনহে মানুষ ভাই', 'শুন রজরিনী রানি', 'গোপন পিরীতি গোপন রাখিবি', 'সুমেরু উপরে ভ্রমর পশিল' ইত্যাদি পদ সহজিয়া চণ্ডীদাসের। সহজিয়া মতের পরিভাষার অর্থ না জানলে তার পদ সবসময় হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

অন্যান্য কবি ঃ

পঞ্চদশ শতকে এই ধারার অন্য কোনো কবির পরিচয় পাওয়া যায় নি। তবে যশেরাজ খান নাম বিশিষ্ট একজন কবির পদ পাওয়া গেছে। দুসেন শাহের রাজত্বকালে পদ রচনা করেছিলেন এই কবি। পীতাম্বর দাসের 'রামমঞ্জরী' নামক অলঙ্কার গ্রন্থে যশোরাজ খানের পদ উদ্বৃত হয়েছে।

কবির কোন পরিচয় পাওয়া যায় নি। হুসেন শাহের উল্লেখ থেকে বোঝা যায় ('শ্রীযুক্ত দুসন জগত ভূষণ') ইনি ১৪৯৩ থেকে ১৫১৯ খিষ্টাব্দের মধ্যে যে কোনো সময় পদ লিখেছিলেন। তবে পঞ্চদশ শতাব্দীতেই যে লিখেছিলেন এমন কথা বলার মতে প্রমাণ নেই।

ভাবগত অনুবাদ ঃ মালাধর বসু ও শ্রীকৃষ্ণবিজয়

সংস্কৃত ভাষায় 'শ্রীমদ্ভাগবত' একাধারে পুরাণ, কাব্য এবং ধর্মগ্রন্থ। গ্রন্থটি বারোটি স্কন্ধে বিভক্ত। দশম থেকে দ্বাদশ স্কন্ধে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী নয়টি স্কন্ধে আছে কৃষ্ণলীলা বহির্ভূত গল্প-আখ্যান ও তত্ত্বকথা।

ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায় বর্ণিত আছে যে স্ত্রী, শূত্র এবং অধম পতিত বাহ্মণদের বেদে অধিকার না থাকায় সকলের মঙ্গলের জন্য ব্যাসদেব কৃপা করে মহাভারত রচনা করেন। কিন্তু তাতে তার মন তুষ্ট হয়নি। মহর্ষি নারদ তাঁর আশ্রমে এসে তাঁকে ভগবানের যশ বর্ণনা করে গ্রন্থ রচনায় উদ্বুদ্ধ করলেন। তার ফলে ভাগবতপুরাণ রচিত হল। গ্রন্থ রচনা করে ব্যাসদেব প্রথমে তাঁর পুত্র শুকদেবকে শিক্ষা করান। তারপর পরীক্ষিতের নিকট তা বিবৃত হয়। এইভাবে ভাগবত প্রচারিত হয়েছে।

বাংলা ভাষায় ভাগবতের প্রথম অনুবাদক গুণরাজ খান উপাধিবিশিষ্ট কবি মালাধর বসু। আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের যত অনুবাদ হয়েছে সেগুলির পথিকৃৎ তিনিই। গ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'। কাব্যটি রচিত হয়েছে ১৪৭৩-১৪৮০ খিস্টাব্দে মধ্যে। পাঠান সুলতান রুকনুদ্দিন বারবক শাহের (১৪৫৯-১৪৭৪) আমলে শুরু, আর সামসুদ্দিন ইউসুফ শাহের (১৪৭৪-১৪৮১) রাজত্বকালে শেষ। কাব্যের একেবারে গোড়াতেই 'গুণরাজ খান' উপাধির ব্যবহার আছে যা গৌড়েশ্বর প্রদত্ত। সুতরাং রুকনুদ্দিন বারবক শাহ উপাধি দিয়েছিলেন।

কবির জীবন

বর্ধমান জেলার কুলীন গ্রামে ছিল মালাধর বসুর বাসভূমি। বাবার নাম ভগীরথ বসু। মাতা ইন্দুমতী। কবির বংশের উল্লেখযোগ্য আদিপুরুষ দশরথ বসু। কান্যকুব্জ থেকে আদিশূর সে পাঁচজন সৎকায়স্থকে আনিয়েছিলেন - দশরথ ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। বল্লাল সেন এই বংশকে 'কুলীন' এর মর্যদা দিয়েছিলেন বলে কথিত আছে।

সাহিত্য পরিচিতি ও কাব্যের গুরুত্ব

মালাধর বসু সমগ্র ভাগবতের অনুবাদ করেন নি। কেবল দশম ও একাদশ স্কন্দের অনুবাদ করেছেন। এই অংশের কৃষ্ণের শৌর্য - তাঁর ঐশ্বর্য শক্তির বিশেষ ক্রকাশ ঘটেছে। তুর্কি আক্রমণের পরবর্তীকালের ত্রস্ত বাঙালির সামনে মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণকে শৌর্যের বিগ্রহরূপে মূর্ত করে তুলেছিলেন - এখানেই তাঁর সৃষ্টির ঐতিহাসিক উৎকর্ষ।

দশম স্কন্দের প্রথমেই দেখা যায় যে দৈত্যপদভারে আক্রান্ত পৃথিবী বহ্মার নিকট উপস্থিত হয়েছেন। আকাশ বাণীতে ভগবানের আশ্বাসের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। পূর্বে কালনেমি নামে

টিপ্পনী

দৈত্য বিষ্ণুর হাতে নিহত হয়েছিল। পরে সেই কালনেমি কংসরূপে জন্মগ্রহণ করে। উগ্রসেনের এক ভ্রাতার নাম দেবক। তাঁর কন্যার নাম দৈবকী। শূরবংশীয় বসুদেবের সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। পূর্বজন্মে বসুদেব ছিলেন কশ্যপমুনি। বরুণের যজ্ঞে দিতি ও সুরভি নামে দুই গাভীর অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনে প্রলুব্ধ কশ্যপ তাদের আত্মসাৎ করেন। এজন্য বহ্মার শাপে ঐ গাভীদ্বয় দৈবকী ও রোহিনী এবং কশ্যম বসুদেব রূপে জন্মগ্রহণ করেন। কংস আকাশবাণী থেকে জানতে পারে যে দৈবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানের হাতে তার নিধন হবে। দৈবকীকে বিনষ্ট করতে উদ্যত হয় কংস। তখন বসুদেব বিভিন্ন যুক্তি দেখিয়ে তাকে নিবারিত করেন। দশম স্কন্ধে আছে কৃষ্ণের জন্ম থেকে দেহত্যাগ পর্যন্ত কৃষ্ণলীলার কাহিনিকে অবলম্বন করে কাব্য রচনা করেছেন। তিন হুবহু আক্ষরিক অনুবাদ করেননি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূল বিষয়ের সারানুবাদ করেছেন। ভাগবত ছাড়াও মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি থেকে কাহিনী নিয়েছেন। সেইসব কাহিনীকে স্বকীয়ভাব ও কল্পনার রসে নিষিক্ত করে নবরূপ দান করেছেন। মাঝে মাঝে জড়িয়ে দিয়েছেন বাংলা দেশের কিছু কিছু ঘরের কথা। তাই তাঁর কাব্য হয়েছে বাঙালির মনোরঞ্জক।

টিপ্পনী

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যে কৃষ্ণের মহিমা তিনভাগে বিভক্ত ১) আদ্যকাহিনি বা বৃন্দাবনলীলা। বাসুদেব ও দৈবকীর বিবাহ, কৃষ্ণের জন্ম, নন্দালয়ে কৃষ্ণে অবস্থান, কংসের চক্রান্ত, কৃষ্ণ ও বলরামের মথুরা গমন প্রভৃতি এখানে বর্ণিত হয়েছে। ২) মধ্যকাহিনি বা মথুরালীলা। কংসবধ থেকে কৃষ্ণের দ্বারকা গমন পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। ৩) অন্ত্যলীলা বা শেষপর্ব। দ্বারকার ঘটনা কৃষ্ণের রুক্মিনী হরণ, সত্যভামার সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহ, সুভদ্রা হরণ, জরাসন্ধ বধ, দ্বারকাপুরী ধ্বংস ও কৃষ্ণের দেহত্যাগ বর্ণিত হয়েছে শেষপর্বে।

গ্রন্থের গুরুত্ব – ১) তুর্কি আক্রমণের পরবর্তীকালের এস্ত বাঙালির কাছে শ্রীকৃষ্ণ শৌর্যের বিগ্রহ রূপে উপস্থিত হয়েছেন। এর একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে।

২) ভাগবতপুরাণের প্রথম অনুবাদ নব্য ভারতীয় আর্যভাষায়।

৩) প্রথম সন তারিখ যুক্ত রচনা –

তেরশ পচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।

চতুর্দশ দুই শকে হৈল সমাপন।।

৪) মহাপ্রভু স্বীকৃতি –

'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।' এই কথার জন্য মহাপ্রভু কবির বংশের নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন। পরবর্তী বৈষ্ণবেরাও প্রেমভক্তিময় এই কথার জন্য এবং মহাপ্রভুর স্বীকৃতির জন্য মধুর রসের প্রদর্শক হিসাবে কবিকে মান্য করেন।

রামায়ণ অনুযায়ী সাহিত্য

কৃত্তিবাসের রামায়ণ পৌরাণিক পাঁচালী শ্রেণীভুক্ত। কবি বাল্মীকি-রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদ করেননি। তবে মূলকে শ্রদ্ধা সহকারে অনুসরণ করেছেন। সেইজন্য এটিকে রামায়ণ-অনুসারী সাহিত্য বলাই যুক্তিযুক্ত।

কৃত্তিবাস জীবন

কৃত্তিবাসের জীবনকথা লিপিবদ্ধ আছে তাঁর আত্মজীবনীতে। এই আত্মবিবরণী আংশিকভাবে প্রথম প্রকাশ করেন ১৩০৫ সালে নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' গ্রন্থের প্রথম খন্ডে। তাঁর কাছ থেকে সংগ্রহ করে দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯০১) সমগ্র অংশ প্রকাশ করেন। বদনগঞ্জ নিবাসী হারাধন দত্তের কাছে এটি পেয়েছিলেন নগেন্দ্রনাথ বসু। হারাধনবাবু পেয়েছিলেন গ্রামের এক বৃদ্ধ কথকের কাছ থেকে। হারাধনবাবুর কাছে যা ছিল তা নকল। পরে সেটিও তাঁর কাছ থেকে হারিয়ে যায়। তাই এই আত্মবিবরণীর প্রামাণিকতায় অনেকে সন্দেহ পোষণ করেন। পরে নলিনীকান্ত ভট্টশালী বিভিন্ন পুথির সাহায্যে প্রমাণ করেন যে আত্মবিবরণী মিথ্যা নয়।

টিপ্পনী

কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণী থেকে জানা যায় যে, কবির পূর্বপুরুষেরা পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। সেখানে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটলে একজন পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা গঙ্গারতীরে ফুলিয়ায় এসে বসবাস করতে শুরু করেন। ১৩০১ খিষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে সামসুদ্দীন ফীরোজশাহের রাজত্বকালে (১৩০১-১৩২২) পূর্ববঙ্গ মুসলমান অধিকারে আসে।

সন্তানসন্ততিক্রমে নরসিংহের উত্তরপুরুষেরা সেখানেই থেকে যান। কৃত্তিবাসের পিতামহের নাম মুরারী ওঝা,পিতার নাম বনমালী আর মায়ের নাম মেনকা। কবিরা সাত ভাই (মতান্তরে ছয়) এবং এক বোন। কবি মাঘ মাসের রবিবার শ্রীপঞ্চমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। বার বছর বয়সে কবি উত্তরবঙ্গের পদ্মাতীরে বিদ্যার্জনের জন্য যাত্রা করেন। সেখানে দশ বছর পড়াশোনা করে যৌবনে গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়ে সম্মান লাভ করেন। তারপর পিতামাতা ও গুরুর আদেশে রামায়ণ পাঁচালী রচনা করেন।

আত্মবিবরণীতে উল্লিখিত হয়েছে জন্মমাস,জন্মতিথি ও জন্মবার-কিন্তু জন্মসাল সম্বন্ধে কবি নীরব।

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণমাঘ মাস।
তথিমধ্য জন্মলইলাম কৃত্তিবাস ।।

এ থেকে কবির জন্মসাল আবিষ্কার করা কঠিন কাজ। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি গণনার দ্বারা নিরুপণ করেছেন ১৩৫৪ শক (১৪৩২-৩৩ খিষ্টাব্দ) ২৯ মাঘ ছিল রবিবার,শ্রীপঞ্চমী ও মাঘীসংক্রান্তি। ওই সময়টিকে একসময় কবির জন্মসন বলে স্বীকার করা হয়। অল্পকিছুদিনের মধ্যে ওই মতের বিরুদ্ধতা করা হয়। আত্মবিবরণীর গৌড়েশ্বরপুরীর বর্ণনা থেকে গৌড়েশ্বরকে হিন্দুরাজা বলে অনুমান করে শ্রীযুক্ত বিদ্যানিধির প্রথমবারের গণনার সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করা হয়। মুসলমান আক্রমণের পর একজন হিন্দুই গৌড়েশ্বর হয়েছিলেন ১৪১৪খিষ্টাব্দের পরে এবং রাজত্ব করেছিলেন ১৪১৮খিষ্টাব্দ পর্যন্ত। তিনি রাজা গণেশ।

প্রাচীন বাংলা পুথিতে 'পুণ্য' কথাটি লেখা হত 'পুন্ন' বানানে। নতুন যুক্তির অবতারণা করে বলা হল যে লিপিকরেরা ভুল করে 'পুণ্য' না লিখে 'পুণ' লিখেছেন। 'পুণ্য'(পুন্ন) পাঠ ধরে গণনা করলেন যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। পাওয়া গেল ১৩২০ শকের (১৩৯৮-১৩৯৯) ১৬ মাঘ রবিবার শ্রীপঞ্চমীর দিনটিকে। রাজা গণেশের রাজাসভায় কৃত্তিবাসের আর্বিভাবের সময়টি মিলে গেল, গণেশের শাসনকালে কবির বয়স ১৫ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে। ওই সময়ই বিদ্যাচর্চার

শেষে কবি বাড়ী ফিরেছিলেন এবং গৌড়েশ্বরের দরবারে হাজির হয়েছিলেন।

কিন্তু আবার নতুন করে সংশয় দেখা দেয়। কেননা গৌড়েশ্বর যে হিন্দু ছিলেন এমন মনে করার যুক্তিসংগত কারণ নেই। আত্মবিবরণীতে বর্ণিত গৌড়েশ্বরের প্রাসাদ হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে যে কোন শাসকের হওয়া সম্ভব। সেকালের প্রাসাদের গঠনশৈলী দেখে পার্থক্য করা সম্ভব নয়। কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের নাম করেননি। কবি এগারোজন হিন্দু পাত্রের নাম করেছেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে এঁদের মধ্যে কয়েকজন পঞ্চদশ শতকে বর্তমান ছিলেন।

টিপ্পনী

সুখময় মুখোপাধ্যায় প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে আত্মজীবনীর গৌড়েশ্বর হলেন রুকনুদ্দিন বারবক শাহ (রাজত্বকাল ১৪৫৯-৭৪ খী:) আত্মজীবনীতে উল্লিখিত কেদার রায়,গন্ধর্ব রায় প্রমুখের সময় বিচার করে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৩৯৯ খিষ্টাব্দের ১৩ ই জানুয়ারীকে কৃত্তিবাসের জন্মতারিখ মনে করেন। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্রের গণনাকে তিনি ভিত্তি করেছেন। তিনি গণেশকে আত্মবিবরণীর গৌড়েশ্বর বলে মনে করেন না। তাঁর মতে –"এই গৌড়েশ্বর সম্ভবত রাজা গণেশ নন,কিন্তু তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ।" শহীদুল্লাহ বলেছেন যে জালালুদ্দীন দীর্ঘকাল শান্তিতে রাজত্ব করেন (১৪০৮-১৪৩১খিষ্টাব্দ)। তংার রাজত্বকালে পন্ডিত বৃহস্পতি মিশ্র বিদ্যমান ছিলেন।তাঁকে উপাধি দিয়েছিলেন জালালুদ্দীন।অন্যদিকে গণেশের স্বল্পসময় রাজত্বকাল অশান্তিপূর্ণ। তিনি সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণা করতে পারেন না। তাছাড়া গণেশের রাজত্বের শেষ বৎসর কৃত্তিবাসের বয়স ছিল উনিশ বছর। কিন্তু আত্মজীবনী অনুসারে এগার বছর পূর্ণ করে কৃত্তিবাস গুরুগৃহে যান। পাঠ শেষ করে বার বছর পরে ফিরলে কবির বয়স চব্বিশের কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। তখন জালালুদ্দীনের রাজত্বকাল।

কাব্য পরিচয়

কৃত্তিবাসের কাব্য সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয় শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে (১৮০২-০৩ খী:)। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল ১৮৩০-৩৪ খিষ্টাব্দ। অনেকে মনে করেন সম্পূর্ণ কাব্য কৃত্তিবাসের লেখা নয়। ১৩০১ বঙ্গাব্দে এই অভিমত যুক্তিসহ উপস্থাপিত করেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ১৩০৭ ও ১৩১০ বঙ্গাব্দে কৃত্তিবাসী রামায়ণের অযোধ্যাকান্ড এবং উত্তরকান্ড প্রকাশিত হয়। ওদুটিও কৃত্তিবাসী রামায়ণের অকৃত্রিম নির্দশন নয় বলে পন্ডিতেরা মনে করেন। ১৩৩৬ খিষ্টাব্দ কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদি কান্ডের একটি সম্ভাব্য রূপের সম্পাদনা করেন নলিনীকান্ত ভট্টশালী। এটিকেও প্রামাণিক বলে সকলে একবাক্যে মেনে নেন নি। আত্মবিবরণীটিই কৃত্তিবাসের নিজের রচনা-অধিকাংশ পন্ডিত একথা মনে করেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণ অনুসন্ধান বাংলা সাহিত্যের একটি সমস্যা।

সাহিত্য ও সমাজে এই অনুবাদের গুরুত্ব

অনুসারী সাহিত্য সৃজ্যমান সাহিত্যকে পুষ্ট করে। বাংলা সাহিত্য সংস্কৃত সাহিত্যের অনুসরণের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে। রামায়ণের অনুসরণে কাব্য রচনা করে কৃত্তিবাস পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর প্রদর্শিত পথে ভাগবতপুরাণ মহাভারত প্রভৃতি সাহিত্যের অনুসরণ ও অনুবাদ হয়েছে। আধুনিক কালের সাহিত্যেও পুরাণের নবরূপায়ন লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং অনুসারী

সাহিত্যের পথ উন্মুক্ত করে কৃত্তিবাস বাংলা সাহিত্যের এক বিরাট সম্ভাবনাকে তুলে ধরেছেন।

সমাজের আসোচনায় দেখেছি ধর্মের সংরক্ষণের দিকটি সে সময় সক্রিয় ছিল। সাধারণের কাছে পুরাণ ঐতিহ্যের মহিমা তুলে ধরার দরকার ছিল। আগে লোকভাষায় এগুলি তুলে ধরতে কেউ সাহসী হননি। শাস্ত্রীয় অনুশাসনে বাধা ছিল। নরকে যেতে কেউ রাজি ছিলেন না। কৃত্তিবাস প্রথম সেই বাধা জয় করে এগিয়ে আসেন। লোকসাধারণের উপযোগী করে সংস্কৃত রামায়ণের কাহিনীকে তিনি পরিবেশন করেন। মহাকাব্যের বিশালতা ও গভীরতা এতে নেই। লোকভাষার কাঠামোয় লোকজীবনের কাছাকাছি পৌঁছে দিতে চেয়েছেন রামায়ণের কাহিনী ও চরিত্রকে। তাই কৃত্তিবাসের অঙ্কিত চরিত্রগুলি বাঙালীর জীবনের প্রতিনিধিত্ব করেছে। মানবজীবনের পরিচিত সুখ-দুখে:র কাহিনীতে পরিণত হয়েছে সংস্কৃত মহাকাব্যের বিশালতাধর্মী আখ্যান। রামায়ণের যেসব গল্পে বাঙালী জীবনের অনুমোদন নেই সেগুলিকে কৃত্তিবাস বাদ দিয়েছেন। একটি বিশেষ যুগে ভক্তিবাদ প্রচার করাও কবির উদ্দেশ্য।কৃত্তিবাস বাঙালীর ভক্তিভাব ও হৃদয়োচ্ছাসকে রামায়ণে পরিপুষ্ট করেছেন। বাঙালীর জীবনকেভাগবৎ মহিমার দ্বারা পরিশুদ্ধ করতে চেয়েছেন।

কৃত্তিবাসকে অনুসরণ করে বহু কবি রামায়ণ অনুবাদে হাত দিয়েছেন। অনেকের রচনা কৃত্তিবাসের রচনার সঙ্গে মিশে গেছে। বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালীর জীবনে কৃত্তিবাসের রচনার গুরুত্ব অপরিসীম। 'কৃত্তিবাস কীর্তিবাস কবি।'

টিপ্পনী

বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের তুলনা

মহাকবির কবিত্বে থাকে সৃষ্টিশীল কল্পনাশক্তির বিশলতা, ভাবের সমুন্নত মহিমা ও ত্রিলোকসঞ্চারী গতিবিধি। বাল্মীকির আলোকসামান্য প্রতিভা কল্পনার প্রসারে,ভাবের গাম্ভীর্যে ও ভাষার ওজস্বিতায় তাঁর রচিত রামায়ণকে মহাকাব্য পদবাচ্য করে তুলেছে। অন্যদিকে সংকীর্ণ কল্পনা ও সীমিত অভিজ্ঞতা কৃত্তিবাসের রামায়ণের পাঁচালী কাব্যের গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ রেখেছে। তাই বাল্মীকির মহাকাব্যিক কল্পনা যখন সমুদ্র,পর্বত ও সীমাহীন আকাশে বিচরণ করে ফিরেছে, কৃত্তিবাসের কল্পনা তখন পল্লীর কুটির প্রাঙ্গণ ও পানাপুকুরের সীমানা ছাড়াতে পারেনি। সমুদ্র-পর্বত-অরণ্য বা বনচর পশুপাখি বাল্মীকির অরণ্যকান্ড,কিষ্কিন্ধ্যা বা সুন্দরকান্ডে বারবার এসেছে। কিন্তু সমুদ্র,পর্বত বা অরণ্য যেহেতু বাঙালী শ্রোতাদের অভিজ্ঞতার বাইরে তাই স্বভাবত:ই সে সম্পর্কে তাদের আগ্রহ জাগেনি,কৃত্তিবাসও তা বর্ণনা করতে পারেননি।

স্বত:স্ফূর্ত কবিত্বশক্তির উল্লাসে বাল্মীকি প্রকৃতি-জগৎকে দেখেছেন এবং দন্ডকারণ্যের শোভা, বর্ষাগমে ও শরৎকালে মাল্যবান পর্বতের সৌন্দর্য্য ইত্যাদি বর্ণনায় শ্লোকের পর শ্লোক রচনা করেছেন। আবার মানবমনের সঙ্গে তার সম্পর্ক,সেকালের মানুষের আচার-আচরণ,প্রমোদ ও সম্ভোগ,অযোধ্যাপুর ও স্বর্ণালঙ্কাপুরীর অতুল বৈভব ইত্যাদিও সমান দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলে সমগ্রভাবে একটা রসঘন সাহিত্যরূপ সৃষ্টি করেছেন। এই রসসৃষ্টি ও বর্ণনৈপুণ্য কৃত্তিবাসের কাছে আশা করা যায় না। সেইজন্য কৃত্তিবাসের বর্ণনায় চিত্রকূট পাহাড় সমতল বাংলার ধানক্ষেতের পাশে নেমে আসে,কল্লোলিত সমুদ্র বাংলা দেশের খাল-বিল-জলাশয়ে পরিণত হয় আর রাম রাবণের যুদ্ধ দুই জমিদারের কলহদ্বন্দ্বে গিয়ে দাঁড়ায়।

আসলে কবিত্বময় সৌন্দর্য্যসৃষ্টি কৃত্তিবাসের লক্ষ্য ছিল না। তিনি বাঙালীয়ানার সঙ্কীর্ণ বাতায়ন থেকে দেখে রামকাহিনীর অন্তর্গত ঘটনার জাল বুনে গেছেন। তাই বাল্মীকি-রামায়ণে কুণ্ঠাহীন

দৃষ্টিতে দেখা বৈদিক ক্রিয়াকর্ম-সমন্বিত এক উদার সর্বভারতীয় সমাজের ছবি দেখতে পাই। আর কৃত্তিবাসে পাই বাঙালীর প্রথা ও সংস্কারবদ্ধ আচার-অনুষ্ঠানের যথাযথ সমাজচিত্র।বাঙালীর নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধগুলি তাতে সযত্নে রক্ষা করা হয়েছে। অহল্যার বৃত্তান্ত বা লক্ষ্মণের গন্ডিদান ইত্যাদি প্রসঙ্গে পাই তার প্রতিফলন।

টিপ্পনী

বাল্মীকি রামায়ণে দেখি রামের জীবিতকালে বাল্মীকি ছিলেন এবং রামের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার (বনবাস,সীতাহরণ ও উদ্ধার ইত্যাদি) অব্যবহিত পরেই সম্ভবত: রামায়ণ রচনা করেছিলেন।আর কৃত্তিবাসী রামায়ণে দেখি রামজন্মের ষাট হাজার বছর আগেই বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেছিলেন-

রামজন্ম পূর্বে ষাটি সহস্র বৎসর।
অনাগত পুরাণ বচিল মুনিবর ।।

রাম না হতেই রামায়ণ ইত্যাদি প্রবাদবাক্যও একথা সমর্থন করে।তবে এগুলি নিতান্তই জনশ্রুতি যার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

রামায়ণে বর্ণিত চরিত্রগুলির চিত্রণে বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য চোখে পড়ে। বাল্মীকির রাম 'নরচন্দ্রমা' বা নরশ্রেষ্ঠ কিন্তু তিনি দেবতা নন। তাই সর্বগুণাধার হয়েও তিনি মানবিক দুর্বলতার অতীত নন।তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ হলে মারীচের রাক্ষসী মায়ায় কেন ভুলবেন? অসহ্য কষ্ট স্বীকার করে সীতার উদ্ধার সাধনের পর কোন মনোবিকারের বশে সীতাকে দেখে তাঁর মনে হবে 'নেত্ররোগীর সামনে দীপশিখার মতো অসহনীয়!' মানুষী অবমাননা থেকেও মুক্তি নেই বলে তাঁকে স্বীকার করতে হয় বালীহত্যার হীনতা,সীতাবর্জনের কলঙ্ক,শঙ্কুকবধের অপরাধ। কিন্তু এগুলিই প্রমাণ করে যে তিনি নিতান্তই মানুষ। কিন্তু কৃত্তিবাসের ভক্তবৎসল রাম স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার। ঘটনার দিক দিয়ে তিনি বাল্মীকির অনুসরণ করলেওতাঁর করুণাময় পতিতপাবন মূর্তিকেই কৃত্তিবাস উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করেছেন। রামের হাতে নিহত হওয়ার সুযোগ পাওয়ার জন্যই তরণীসেন,বীরবাহু এমন কি রাবণ পর্যন্ত স্বেচ্ছায় যুদ্ধে গেছেন।আবার কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণে অকারণে রামনামের মাহাত্ম্য কীর্তন করে রামের অবতারত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

বস্তুত: কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রধান হয়েছে দুটি রস - ভক্তিরস আর কৌতুক রস।ভক্তিরসের উপাদান সম্ভবত: বিভিন্ন সময়ে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে এসেছে। আর শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্যে কৃত্তিবাস কখনও উদ্ভট ও অতিরঞ্জিত উপাদান প্রয়োগ করে। কখনও বক্র মন্তব্যে সরস করে,কখনও বা বাঙালী সমাজসুলভ স্থূল রঙ্গরসিকতার মধ্য দিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন।তবে সংস্কৃত শব্দ ও বাক্যে উদাত্ত ওজস্বিতায় বাল্মীকি যখন বীর ও রৌদ্ররসের ব্যঞ্জনাসৃষ্টিতে সার্থক হয়ে ওঠেন তখন কৃত্তিবাস যুদ্ধ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবে, বাংলা বাগ্‌ভান্ডারে রৌদ্ররস পরিবেশনের উপযোগী শব্দভান্ডারের দীনতায় ও পয়ার ছন্দের একটানা সুরের আবেশের ফলে বীররস সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়ে যান। তাই যথেষ্ট হুঙ্কার ও আস্ফালন সত্ত্বেও বীরঝসের উপযুক্ত পরিবেশ তিনি তৈরী করে উঠতে পারেন নি।তেমনি বাংলা ভাষার পেলব ও নমনীয় শব্দযোজনায় ও সকরুণ তানে কৃত্তিবাস অশ্রুর প্রবাহ বইয়ে দিলেও বাল্মীকির মতো শোকের অন্তর্দাহ ও বিষাদের স্তব্ধ গাম্ভীর্য সৃষ্টি করতে পারেননি।

বাল্মীকির প্রতিটি শ্লোকই প্রায় অলঙ্কার ভূষিত কিন্তু সেই অলঙ্কার স্বচ্ছন্দ ও সংক্ষিপ্ত।

উপমা অলঙ্কারই বেশী। আর তিনি সমুদ্র,পর্বত বা আকাশ থেকে উপমান আহরণ করেছেন। কিন্তু কৃত্তিবাস তাঁর অতি চেনা পল্লীর দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে 'কলার বাগুড়ি' কিংবা 'কুমোরের চাক' থেকে উপমান সংগ্রহ করে ফেরেন। অবশ্য প্রথাসিদ্ধ সংস্কৃত অলঙ্কারও তিনি ব্যবহার করেছেন। -

চরণে নুপুর বাজে রুনুঝুনু শুনি ।
নীলপদ্ম কোলে যেন হংস করে ধ্বনি ।।

কিন্তু দেশীয় উপমা ব্যবহারেই তিনি বেশী স্বচ্ছন্দ। ধ্বনাত্মক শব্দ ও অনুপ্রাসের ব্যবহার কৃত্তিবাসে প্রচুর। যেমন-

শ্রীরাম আইল দেশে পড়ে গেল সাড়া।
ঝা গুড়গুড় বাদ্য বাজে নাচে চন্ডাল পাড়া।।
কিংবা- ডাল ভাঙ্গে হনুমান শব্দ মড়মড়ি।
আতঙ্কে রাক্ষস সব উঠে দড়বড়ি।।

শব্দ ও বাক্য ব্যবহারে বাল্মীকির অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য চোখে পড়ার মতো। বাল্মীকির সরল প্রাঞ্জল ভাষায় প্রসাদগুণ কিশোর রবীন্দ্রনাথেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল (মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা)। অবশ্য কৃত্তিবাসের ভাষাও সহজ ও সরল। তবে তাতে মহাকাব্যিক মহিমা নেই। তাঁর রামায়ণে ছড়া-পাঁচালীতে ব্যবহৃত শব্দ প্রয়োগরীতি অনেক সময়েই চোখে পড়ে। যেমন- 'সুবুদ্ধি পরশুরামের কুবুদ্ধি লাগিল' ইত্যাদি।

রামায়ণের প্রতিটি কান্ড অবলম্বনে বিষয়বিন্যাস,চরিত্রচিত্রণ বা কাব্যসৌন্দর্য সৃষ্টির দিক দিয়ে বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের তুলনা করা যেতে পারে। পরবর্তী কাহিনীবিন্যাস,চরিত্রসৃষ্টি,রসবিচার ও বাঙালীয়ানা অধ্যায়গুলিতে এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা দেওয়া আছে। এখানে তার পুনরুক্তি না করে মোটের উপর বলা যায় যে কৃত্তিবাস আর্য রামায়ণের বিশাল ও ব্যাপক কাহিনীর মহাকাব্যোচিত গতিময়তার মর্যাদা রাখতে পারেননি। অনেক জায়গাতেই তিনি মূল কাহিনীকে সংকুচিত করে নিয়েছেন। কৃত্তিবাসের আঁকা চরিত্রগুলিও ভাবাদর্শের মহনীয়তা বা অমানুষিক বর্বরতা কোনদিক দিয়েই মহাকাব্যের যোগ্য হয়ে ওঠেনি। সৌন্দর্য্যসৃষ্টি সম্বন্ধে উদাসীন কৃত্তিবাসের রচনায় বাল্মীকি বর্ণিত নিসর্গসৌন্দর্য্যের কোন জায়গা হয়নি। ভাষা এবং অলংকার প্রয়োগেওকৃত্তিবাসের সীমাবদ্ধতা তাঁর রামায়ণকে মহাকাব্যের গৌরব থেকে বিচ্যুত করেছে। তবে কৃত্তিবাস যে নিখুঁত নৈপুণ্যে বাঙালীর মনোভাবের অনুকূল করে বাঙালী সমাজকে ,তার জাতীয় জীবনের ভাবাদর্শকে তুলে ধরেছেন তাতে তা বাঙালীর জীবনকাব্য হয়ে উঠেছে।কৃত্তিবাসী রামায়ণের আসল গৌরব এইখানেই।

অঙ্গদের রায়বার

কৃত্তিবাস যে রামায়ণ রচনা করেছিলেন তা পাঁচালী বা রাময়ণ গান রূপে গীত হয়। সেই কারণে গায়কের মুখে মুখে রামায়ণে ক্রমে ক্রমে নতুন নতুন বিষয় সংযোজিত হতে থাকে। আসলে শ্রোতাদের রুচি ও চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে গায়কেরা বিষয়,চরিত্র ও রসের অবতারণা করতেন। তাই দরকার মতো এইসব গায়েনরা অন্য রামায়ণকারের রচনাংশ,যেগুলি দর্শকশ্রোতাদের মনোরঞ্জন করত সেগুলিকে কৃত্তিবাসী রামায়ণের অন্তর্ভুক্ত করে নিতেন। 'অঙ্গদের

টিপ্পনী

রায়বার' এইরকম একটি জনপ্রিয় রচনাংশ। এ প্রসঙ্গে আসার আগে শব্দটির উদ্ভব ও অর্থ জানা দরকার।

অধ্যাপক সুকুমার সেন মনে করেন 'রাজদ্বার' শব্দ থেকে রায়বার শব্দেব উৎপত্তি। অভিধানকার হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' গ্রন্থে শব্দটির পাঁচরকম অর্থ ও পুরানো বাংলা সাহিত্যে তার প্রয়োগের উদাহরণ দেখিয়েছেন। তঁর মতে 'রাজ' থেকে রায় এবং 'বার্তা' বা 'বারতা' থেকে বার শব্দের উৎপত্তি। তাই কৃত্তিবাসী রামায়ণের অঙ্গদের রায়বার শব্দের মানে হল রাজবার্তা বা রাজদূত কথিত সংবাদ। এছাড়া রাজদূত, দৌত্য,রাজার স্তুতি বা যশোগাথা এবং ভাট বা স্তুতিপাঠক অর্থেও শব্দটি পুরনো বাংলা সাহিত্যে ব্যবহৃত হত। অঙ্গদের রায়বার নামক উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গ-রসাত্মক রচনাটি,যা কিছু কিছু পরিবর্তন সহ পুঁথিতে বা কৃত্তিবাসের প্রথম মুদ্রিত সংস্করণে স্থান পেয়েছে তা সম্ভবত: শঙ্কর কবিচন্দ্রের রচনা বলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার মনে করেছেন (দ্র: অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ' বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' ১ম খন্ড ১৯৬৩,কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঁচালী পৃ ৫১০)। ১৭৫৪ খ্রীস্টাব্দে অনুলিখিত লঙ্কাকান্ডের একটি কৃত্তিবাসী পুঁথিতে (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত ১৬৩ নং পুঁথি) এবং ১৮০২-০৩ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত শ্রীরামপুরী সংস্করণে অঙ্গদের রায়বার ধরনের কিছু বর্ণনা দেখা যায়।-

টিপ্পনী

অঙ্গদ বলে মর তুই পাগল রাবণে
কিসের বড়াই তুই করিস আমা বিদ্যামানে।
আরবার গিয়াছিলি মোর পিতার নিকট
আমার বাপের আগে করিলি মুনি ষট।
সন্ধ্যা হেতু মোর বাপ না করিল রণ
যত অস্ত্র ছিল তোর কৈলি বরিষণ।
সন্ধ্যা সাঙ্গ করি বাবা তোরে বাঁধিল লেজে
লেজে বান্ধি ডুবাইল পানীর ভিতর
পানী খাইয়া রাবণ তুই হইলি ফাঁপর।
আপন মুখে রাবণ তুই পাইলি পরাজয়
তবে সে বাপুর ঠাঞি পাইলি বিদায়।

এই রচনাংশের সঙ্গে প্রচলিত অঙ্গদের রায়বারের বিষয়গত মিল থাকলেও ভাষা ও ছন্দোগত অমিল যথেষ্ট। মনে হয় মূল কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই জাতীয় কোনো রচনা ছিল। পরে কবিচন্দ্র তার উপরে কিছু রঙ চড়িয়েছিলেন। তখন এই অংশটি এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে গায়েন-কথকরা কৃত্তিবাসের রায়বার বাদ দিয়ে কবিচন্দ্রের রায়বারকেই কৃত্তিবাসের বলে চালিয়ে দিয়েছিলেন। ধামালীর মতো লঘুছন্দে রচিত এই রায়বারে দেখা যায় লঙ্কাযুদ্ধের আগে-

শ্রীরাম বলেন শুন হে অঙ্গদ বলী
রাবণ রাজাকে কিছু দিয়া এস গালি।

রামচন্দ্রের আজ্ঞা শিরোধার্য করে অঙ্গদ তখন রাবণের রাজসভায় হাজির হয়ে রাবণকে সূতীক্ষ্ণ বাক্যবাণে বিদ্ধ করতে থাকে। এ ব্যাপারে বাক্পটু বাঙালীর দক্ষতা সহজাত। রাবণও যোগ্য জবাব দিতে ছাড়ে না। তবে এগুলি নিছক গালিগালাজ হয়নি। তর্জাজাতীয় এইসব উক্তি-প্রতুক্তি থেকে বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুকরস ফুটে উঠেছে যা একসময় বাঙালী শ্রোতাকে মাতিয়ে তুলতো। যেমন অঙ্গদের ভয়ে রাবণ ও অন্যান্য সভাসদরা সকলে শতশত রাবণ মূর্তি ধারণ করে অঙ্গদকে ছলনা করতে চাইল।-

অঙ্গদে দেখি রাবণ ছলে মায়া পাতে।
শত শত রাবণ হয়ে বসিল সভাতে।।
যেদিকে অঙ্গদ চাহে সেদিকে রাবণ।

দশ মুন্ড কুড়ি বাহু বিংশতি লোচন।।
সবাই রাবণ ভেদ নাই একজনে।
অঙ্গদ কবে কথা কোন রাবণ সনে।।

শুধু ইন্দ্রজিৎ কোন মুখে পিতার ছদ্মবেশ ধারণ করবে? তাই সে স্বমূর্তিতেই ছিল। তখন যুবরাজ অঙ্গদ যে বিদ্রূপাত্মক ভাষায় তাকে আক্রমণ করেছে তা কিছুটা অমার্জিত হলেও তার অন্তর্নিহিত কৌতুকরস পরম উপভোগ্য।-

টিপ্পনী

অঙ্গদ বলে সত্য করে কও রে ইন্দ্রজিতা।
এই যত বসিয়াছে সব কি তোর পিতা।।
ধন্য নারী মন্দোদরী ধন্য রে তোর মাকে।
এক যুবতী এত পতি ভাব কেমনে রাখে।।
কোন বাপ ধনুক ভাঙতে গেছিল মিছিলা।
কোন বাপ তোর কৈলাস তুলিতে গিয়াছিলা।।
কোন বাপ সে পরের বধূ হরে হয়ে মত্ত।
তোর কোন বাপের ভগ্নী হরিল মধু দৈত্য।।
কোন বাপ তোর জব্দ হইল জামদগ্ন্য তেজে।
মোর বাপ তোর কোন বাপে বেঁধেছিল লেজে।।
একে একে কৈলাম তোর সব বাপের কথা।
সবারে কাজ নেই তোর যোগী বাপটি কোথা।।

গালির জ্বালায় রাবণ শেষ পর্যন্ত মায়াজাল ছেড়ে নিজের মূর্তি ধরতে বাধ্য হল:-

সহিতে না পারে রাবণ অঙ্গদের কথা।
লজ্জা পাইয়া রাবণ হেঁট কৈল মাথা।।
দু:খিত হৈয়া রাবণ করে মায়া ভঙ্গ।
দুইজনে লেগে গেল বাক্যের তরঙ্গ।।

রাবণ অঙ্গদকে প্রস্তাব দেয় যে রাম যদি স্বহস্তে সেতু ভেঙে দেয়,বিভীষণ এসে রাবণের পায়ে পড়ে,রাম নারে খত দেয় এবং দগ্ধ লঙ্কাপুরী নতুন করে তৈরী করে দেয়, তবে সে রামের দলকে ক্ষমা করতে পারে। তাই শুনে অঙ্গদের সকৌতুক জিজ্ঞাসা-

নির্মাইয়া দিব লঙ্কা যত গেছে পোড়া।
সূর্পণখার নাক কান কিসে যাবে জোড়া।।

সেইসঙ্গে রাবণের প্রতি অঙ্গদের ব্যঙ্গোক্তি-

যে তোর দারুণ পণ তেমন করে কে।
কবে বলবি আমার বধূর স্বামী এনে দে।।

এরপর অঙ্গদ গালির মাত্রা চড়িয়ে বলতে থাকে-

হিতোপদেশ কি বুঝিবি শোন রে বেটা গরু।
তুই বাঁচিলে মোর বাপের কীর্তি কল্পতরু।।
নৈলি তোকে বেঁচে থাকতে সাধ করে বলি।
লোকে বলবে এই ব্যাটারে বেঁধেছিল বালী।।
ঘুষিবে আমার বাপের কীর্তি জগময়।
তাই বলি দিনকতক বাঁচলে ভালো হয়।।

এই জাতীয় কবির লড়াই সে যুগের বাঙালী পরমানন্দে উপভোগ করত। তাই এই রায়বারের রচয়িতা যিনিই হোন, গায়েন কথকদের কল্যাণে সে গৌরব আরোপিত হয়েছে কৃত্তিবাসের

ওপর এবং তা কৃত্তিবাসী রামায়ণের অন্তর্গত হয়ে গেছে।

কাহিনীবিন্যাসে কৃত্তিবাসের ঋণ ও মৌলিকতা

টিপ্পনী

মূল বাল্মীকি রামায়ণ ও কৃত্তিবাস-বর্ণিত রামায়ণ কাহিনীর মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য চোখে পড়ে। অবশ্য তার মানে এই নয় যে বাল্মীকির রামায়ণের সঙ্গে কৃত্তিবাস পরিচিত ছিলেন না এবং গায়ক বা কথকের মুখে শুনেই রামায়ণ রচনা করেছিলেন। আসলে কৃত্তিবাস মূল রামায়ণের অবিকল অনুসরণ করেননি। মধ্যযুগে অনুবাদের অর্থই ছিল ভাবানুবাদ- আক্ষরিক অনুবাদের রীতি প্রচলিত ছিল না। তার প্রযোজনীয়তাও কেউ অনুভব করতেন না। তবে কৃত্তিবাস যে বাল্মীকি রামায়ণ পড়েছিলেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। অনেক জায়গাতেই তিনি পূর্বসুরীর প্রতিশ্রদ্ধা জানিয়েছেন।-

বাল্মীকি বন্দিয়া কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।
শুভক্ষণে বিরচিল ভাষা রামায়ণ।।

-রামায়ণ ১৯৮৩ সাহিত্য সংসদ, কিষ্কিন্ধ্যাকান্ড

আবার কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীটি সত্য হলে তাঁকে তো সংস্কৃত ভাষার পরম পন্ডিত বলে ধরে নিতে হবে। প্রাচীন কুলজী গ্রন্থেও তাঁকে সর্বদা পন্ডিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রামায়ণের ভণিতাতেও তিনি নিজের নামের সঙ্গে পন্ডিত বিশেষণটি ব্যবহার করেছেন।

যাইহোক রামায়ণ রচনা করতে বসে কৃত্তিবাস মূল বাল্মীকি থেকে কাহিনীর সারভাগটুকু নিয়ে, পুরাণ বা অন্যান্য রামায়ণের ঘটনা এবং নিজের কল্পনা মিশিয়ে পুরানো রামকথাকে বাংলাদেশের অনুকূল করে পরিবেশন করেছিলেন। সুতরাং বাল্মীকি রচিত কাহিনীর কিছু কিছু অমশ তিনি বর্জন করেছিলেন। সেই বর্জিত অংশগুলির মধ্যে-

১. কার্তিকের জন্ম ২. বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র বিরোধ ৩. বিশ্বামিত্র কথা ৪. অম্বরীষ রাজার যজ্ঞ ৫.রামের আদিত্য-হৃদয় স্তব পাঠ।

কখনও কখনও কৃত্তিবাস বাল্মীকির বদলে বিভিন্ন পুরান বা রামায়ণ থেকে কাহিনী চয়ন করেছেন। এবার কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া হল।

আদিকান্ড:

১. বাল্মীকি রামায়ণে বালকান্ডের শুরুতেই দেখি নারদ বাল্মীকিকে রামায়ণ রচনার আদেশ দিচ্ছেন। এ গ্রন্থে রত্নাকর দস্যুর প্রসঙ্গ নেই। আর ঋষ্যশৃঙ্গমুনি দশরথের পুত্র কামনায় যখন পুত্রেষ্ঠি যজ্ঞ শুরু করেন তখন দেবতাদের অনুরোধে বিষ্ণু রাবণ বধের জন্য দশরথের পুত্রত্ব স্বীকার করেন। কৃত্তিবাস তাঁর আদি কান্ডের সূচনায় বাল্মীকির অনুসরণ করেননি। তিনি অধ্যাত্ম রামায়ণের অযোধ্যাকান্ডের বর্ণনা অনুসারে বিষ্ণুর স্বেচ্ছায় চার অংশে বিভক্ত হয়ে (রাম,ভরত,লক্ষণ,শত্রুঘ্ন) অবতার রূপে জন্মগ্রহণ বিবরণ দিয়েছেন। তারপর রাম নামের মাহাত্ম্যে রত্নাকর দস্যু বাল্মীকিতে রূপান্তর ও রামায়ণ রচনার জন্য বহ্মার আদেশ প্রাপ্তির কাহিনী।

২. আদিকান্ডের হরিশচন্দ্রের উপাখ্যান কৃত্তিবাস দেবী ভাগবত ও মার্কন্ডের পুরাণ থেকে নিয়েছেন।

৩. এই কান্ডে বর্ণিত ভগীরথের জন্মবৃত্তান্ত যোগ বশিষ্ঠ রামায়ণ ও পদ্মপুরাণ থেকে নেওয়া।

৪. কান্ডার মুনির উপাখ্যানটি কৃত্তিবাস স্কন্ধপুরানের কাশীখন্ড থেকে নিয়ে আদিকান্ডের গঙ্গাবতরণ প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন।

৫. দশরথের রাজ্যে শনির প্রকোপে বিবরণও তিনি স্কন্ধ ও কালিকাপুরাণ থেকে গ্রহণ করে আদিকান্ডের অন্তর্গত করে দিয়েছেন।

সুন্দরাকান্ডে:

সেতুবন্ধনের সময়ে রামের শিব প্রতিষ্ঠার যে বিবরণ কৃত্তিবাস দিয়েছেন তার উৎস হল কূর্মপুরাণ।

লঙ্কাকান্ড বর্ণিত:

১. চন্ডিকার অকালবোধনের কাহিনী কৃত্তিবাস দেবী ভাগবত,বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও কালিকাপূরাণ থেকে নিয়েছেন।

২. মেঘনাদের সঙ্গে যুদ্ধে রামলক্ষণ মূচ্ছিত হয়ে পড়লে জাম্বুবান হনুমানকে ঋষ্যমূক পর্বত থেকে ওষুধ আনতে বলেন এ কাহিনী কৃত্তিবাস কোথা থেকে পেয়েছিলেন, নিজেই তা উল্লেখ করে দিয়েছেন।-

নাহিক এসব কথা বাল্মীকি রচনে।
বিস্তারিয়া লিখিত অদ্ভুত রামায়ণে।।

৩. গন্ধমাদন পর্বত থেকে বিশল্যকরণী আনার সময়ে হনুমানকে কালনেমির বাধাদানের বৃত্তান্ত অধ্যাত্ম রামায়ণের অনুসরণে লেখা। শুধু ধান্যমালী অপ্সরা এখানে গন্ধকালী।

৪. অযোধ্যায় ফিরে সীতা হনুমানকে যে স্বর্ণহার পুরস্কার দিয়েছিলেন তাতে রামনাম লেখা ছিল না বলে হনুমান তা খন্ড খন্ড করে ফেলে দেন। লঙ্কাকান্ডের এই ঘটনা কৃত্তিবাস অধ্যাত্ম রামায়ণ অনুসারে বর্ণনা করেছেন।

উত্তরাকান্ডে লব কুশের হাতে ভরত,শত্রুঘ্ন ও লক্ষণ পরাজিত ও নিহত হলে তাঁরা যে বাল্মীকির প্রসাদে পুনর্জীবিত হন,এই বৃত্তান্তটির উৎস কৃত্তিবাস নিজেই নির্দেশ করে বলেছেন-

এসব গাহিল গীত জৈমিনি ভারতে।
সম্প্রতি যে গাই তাহা বাল্মীকির মতে।।

কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে কৃত্তিবাসের এই জাতীয় ঋণ স্বীকার থেকে এই তথ্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বিভিন্ন সংস্কৃত রামায়ণ ও পুরাণের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। সুতরাং সংস্কৃত ভাষার উপর তাঁর যে পূর্ণ অধিকার ছিল তাতে সন্দেহ থাকে না।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের কতকগুলি উপাখ্যান কৃত্তিবাসের নিজস্ব কবিকল্পনার সৃষ্টি।এই মৌলিক কাহিনীগুলি হল-

আদিকান্ডে ১. সৌদাস-দিলীপ-রঘুর কাহিনী ২. জটায়ু ও শনির কাহিনী ৩. গণেশের জন্ম ৪. সম্বরাসুর বধ ৫. গুহকের সঙ্গে মিত্রতা ইত্যাদি উপাখ্যান।

অরণ্যকান্ডে সীতাহরণের আগে লক্ষণের গন্ডী দেওয়ার বৃত্তান্তটি কৃত্তিবাসের যোজনা।

কিষ্কিন্ধ্যাকান্ডে ১. বালীরাজার সন্ধ্যাহ্নিক ২. রাবণকে লেজে বেধে লাঞ্ছনা ৩. বালীবধে তারার অভিশাপ ৪. সতীত্বের প্রশস্তি ৫. সম্পাতির কাছে হনুমানের রত্নাকর ও রামের কাহিনীকীর্তন ইত্যাদিও কৃত্তিবাসের যোজনা।

সুন্দরাকান্ডের সিংহিকাবৃত্তান্ত ও চামুন্ডাপ্রসঙ্গ কৃত্তিবাসের সংযোজন ।

এই সূত্র বলতে ১. রাবণ-বিভীষণ বাদানুবাদ ২. রামের সঙ্গে বিভীষণের মিত্রতা ৩.সমুদ্রে সেতুবন্ধন

ও ৪. রামের সসৈন্যে লঙ্কায় আগমন ইত্যাদি ঘটনাগুলি কৃত্তিবাস সুন্দরাকান্ডের অন্তর্ভুক্ত করেছেন যেগুলি বাল্মীকির রামায়ণে যুদ্ধকান্ডের অর্ন্তগত ছিল। তবে এই পরিবর্তনে সুন্দরাকান্ডের ঘটনাগত ঐক্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলেই মনে হয়।

লঙ্কাকান্ডে কৃত্তিবাস অনেক নতুন বিষয়ের অবতারণা করেছেন।–

১. তরণী সেন-বীরবাহু -ভস্মলোচন বধ ২. সূর্যকে হনুমানের কক্ষতলে ধারণ ৩. মহীরাবণ ও অহিরাবণ বধ ৪. অকাল বোধনে ১০৮ টি নীলপদ্মের কাহিনী ৫. ছদ্মবেশী হনুমানের মন্দোদরীর কাছ থেকে রাবণের মৃত্যুবান হরণ ৬. সীতার প্রতি মন্দোদরীর অভিশাপ এবং ৭. মূমূর্ষ রাবণের কাছে রামের রাজনীতি শিক্ষা প্রভৃতি উপাখ্যানগুলি কৃত্তিবাসের স্বকীয় উদ্‌ভাবনা। এগুলি নি:সন্দেহে তাঁর মৌলিক কবিপ্রতিভার পরিচয় দেয়।

টিপ্পনী

কাহিনী বিন্যাসে কৃত্তিবাসের কৃতিত্ব বিচার করতে গেলে প্রথমেই মনে রাখতে হবে পুঁথির মধ্যে কৃত্তিবাসের যে আদি কাব্যরূপের সন্ধান পাওয়া যায় তার কাহিনী ছিল অতি শিথিল। জয়গোপাল তর্কলংকার বা মোহনচাঁদ শীলের পরিমার্জনার ফলে কাহিনীটি কিছুটা সংহত আকার ধারণ করেছে। বর্তমান আলোচনা সেই পরিমার্জিত সংস্করণের ভিত্তিতেই করা।

বর্তমান রামায়ণে ঘটনা ও চরিত্র বর্ণনায় কিছু শিথিলতা থাকলেও সাতটি কান্ডের মধ্যে যে কাহিনীগত ঐক্য নে তা নয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণে সুলভ ভক্তির আবেগ উচ্ছাস,কারণে অশ্রুর প্রবাহ,নিয়তি-নির্ধারিত জীবন-পরিণতি ইত্যাদি বিষয় বাল্মীকির মহাকাব্যিক কাহিনীর বিশালতা ও গভীরতাকে ক্ষুণ্ণ করলেও মোটের উপর কাহিনীগত পারস্পর্য ও সংহতি রক্ষিত হয়েছে। অবশ্য তরকাবধ,হনুমানের গন্ধমাদন পর্বত আনা,ভরতের ছোঁড়া গুলি (বাঁটুল) লেগে আকাশ থেকে হনুমানের পড়ে যাওয়া,কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ ইত্যাদি শিশুতোষ কাহিনীগুলি কৃত্তিবাসের অতিরঞ্জনের ফলে অবিশ্বাস্য হয়ে উঠেছে। তার কারণ হিসাবে জনৈক সমালোচক মন্তব্য করেছেন-' কৃত্তিবাসের সময়ে বাঙালীর চিত্ত অনেকটা শিশুচিত্তের মত সরল, কল্পনাপ্রবণ ও কৌতূহলী ছিল।' এই কাহিনীগুলি তাঁরা উপভোগ করতেন। অবশ্য পাশ্চাত্যের গ্রীক পুরাণে বা হোমার থেকে মিল্টনের কাব্যে পর্যন্ত্য অনেক অতিলৌকিক কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাচ্যেও রামায়ণ-মহাভারতে বা পুরাণে অনেক অনৈসর্গিক ঘটনার বর্ণনা আছে। আসলে তখন বৈজ্ঞানিক নানা সত্য বা আধুনিক যুক্তিবাদের জন্ম হয়নি। কাজেই এইসব শিশুসুলভ কাহিনীর জন্যে কৃত্তিবাসকে দোষী করা চলে না।

যাই হোক কৃত্তিবাসের কাহিনী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তিনি তাঁর কাব্যে মহাকাব্যিক গতিসীলতা বজায় রাখতে পারেননি। অনেক জায়গাতেই মূল কাহিনী কেটে ছেঁটে ছোটো করে নিয়েছেন। বাল্মীকির নিসর্গ বর্ণনার অপরূপ কবিত্ব ও মাধুর্যের স্বাদ কৃত্তিবাসে কিছুই পাওয়া যায় না। কিষ্কিন্ধাকান্ডের বর্ষা ও শরৎ ঋতুর বর্ণনা তো কৃত্তিবাস পুরোপুরি বাদই দিয়েছেন। তবু কৃত্তিবাসের কাহিনীতে (১) দশরথের সিন্ধুবধ (২) রামের নির্বাসন ও ভরতমিলন (৩) সীতাহরণে রামের বিলাপ (৪) লক্ষণের শক্তিশেল (৫) সীতার অগ্নিপরীক্ষা (৬) সীতা নির্বাসন (৭) লব কুশের হাতে রামসেনার পরাজয় (৮) সীতার পাতাল প্রবেশ (৯) রামের লক্ষণ বর্জন (১০) হনুমানের দাস্যভক্তি ইত্যাদি বর্ণনায় মানব রস বিশেষ উপভোগ্য হয়েছে-মানবজীবনের সুখদুখে:র চেনারূপটি স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। মহাকবির আকাশচারী কল্পনা গ্রামবাংলার চন্ডীমন্ডপে ও ঘরের আঙিনায় নেমে এসে বাঙালীর জীবনকাব্যে রূপলাভ করেছে।

চরিত্রবিচার

মহাকবি বাল্মীকি রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে যে মহৎ জীবনাদর্শের নিখুঁত শিল্পরূপ ফুটিয়ে তুলেছিলেন মধ্যযুগীয় পাঁচালীকার কৃত্তিবাসের হাতে সে জাতীয় চরিত্তচিত্রণ আশা করা যায় না। কৃত্তিবাস বাংলার সমাজ জীবনে দাঁড়িয়ে সাধারণ জনমানসের উপযোগী করে চরিত্রগুলিকে গড়েছিলেন। তাতে আর্য রামায়ণের চারিত্র মহিমা ও বৈচিত্র্য না থাকলেও বাঙালীর জীবনাদর্শ নির্ভূলভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। কৃত্তিবাসের কৃতিত্ব এখানেই।

বাল্মীকি রামায়ণের রাম-লক্ষণ-ভরত, সুগ্রীব-অঙ্গদ-হনুমান, রাবণ-বিভীষণ-ইন্দ্রজিৎ-কুম্ভকর্ণ কিংবা কৈকেয়ী-মন্থরা-সীতা-তারা-মন্দোদরী প্রত্যেকটি চরিত্র স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা চিহ্নিত। তারা সবাই ভালোত্বের একঘেয়ে ভূমিকায় অভিনয় করেননি। জীবনের সহজ ও সমতল পথ থেকে বাল্মীকি চরিত্রগুলিকে উঁচুনীচু,সরল-কুটিল সব রকম মানসিকতার মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে গেছেন। তাই সত্যবদ্ধ দশরথের অসহায় স্নেহব্যাকুলতা, কৈকেয়ীর নীচ স্বার্থপরতা,রাম-সীতার অসাধারণ সহিষ্ণুতা,লক্ষণের বলিষ্ঠ পৌরুষের বাস্তবতা, ভরতের ত্যাগপূত চরিত্রমহিমা বা রাবণের অত্যুগ্র দাম্ভিকতা চরিত্রগুলিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

টিপ্পনী

কৃত্তিবাসে আঁকা চরিত্রগুলিতে মহাকাব্যিক মহিমা কিংবা অমানুষিক বর্বরতা কোনটাই তেমনভাবে ফোটেনি। আসলে কৃত্তিবাসের আমলে দেশে পাঠান অধিকার কায়েমী হয়ে বসেছিল। গণেশ অল্প কয়েক বছর গৌড়ের সিংহাসনে বসলেও তাঁকে যে কোন পরিবেশের সঙ্গে সমঝোতা করে চলতে হত,তাঁর পুত্র যদুর জালালুদ্দীন হওয়ার ঘটনা থেকেই বোঝা যায়। তখন রাষ্ট্র মুসলিম-কবলিত। ভূ-সম্পত্তি বেশীর ভাগ ওমরাহদের দখলে,হিন্দুর ধর্ম পীর-গাজী ও সুলতানদের উৎপাতে কোনঠাসা। একরম সামাজিক অবস্থায় মহাকাব্যের বিশালতা ও চরিত্রের উচ্চতম সমুন্নতি আশ করা যায় না। তাই কৃত্তিবাসী রামায়ণের চরিত্রগুলি কাশী-কোশল-মগধ-বিদিশা ছেড়ে বাঙালীর ঘরের আঙিনায় চলে এসেছে আর অনিবার্যভাবে বাঙালীর জনজীবনের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। তাই অনেক চরিত্রই মহত্ব বিসর্জন দিয়ে হীন হয়ে পড়েছে। যেমন মহারাজ দশরথ রামের প্রতি স্নেহান্ধ হয়ে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে প্রতারণা করে রাম- লক্ষণের বদলে প্রথমে ভরত-শত্রুঘ্নকে দিয়েছিলেন। এ জাতীয় তঞ্চকতা পরাক্রমশালী বীর দশরথের চরিত্রে কালিমা লেপন করেননি কি? আবার রাম- লক্ষণ বিশ্বামিত্রের সঙ্গে চলে গেলে 'ভূমিতে পড়িয়া রাজা করেন ক্রন্দন।' এ আচরণ কি রাজোচিত? (দ্রষ্টব্য ঃ রসবিচার-করুণরস)। কৃত্তিবাসের হাতে পড়ে প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা দশরথ দুর্বল স্ত্রৈণ ও হীন চরিত্রে পরিণত হয়েছেন। আবার তাড়কাকে দেখে বিশ্বামিত্রের মাত্রাছাড়া ভয় এই মহাতপা মুনির চরিত্রকে লঘু ও হাস্যাস্পদ করে এমন বিকৃতি ঘটিয়েছে যা বাল্মীকির পক্ষে কল্পনা করাও দুঃসাধ্য (দ্রষ্টব্য ঃ রসবিচার-হাস্যরস) ছিল।

বাল্মীকির রাম 'নরচন্দ্রমা',মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ গুণে ভূষিত। কেননা বাল্মীকি চেয়েছিলেন-' তুলিব দেবতা করি মানুষেরে মোর ছন্দগানে'। তাই বাল্মীকির কল্পনায় রামচরিত্রে যে গুণগুলি আরোপিত হয়েছিল তা হল-

...........'বীর্য কার ক্ষমারে করে অতিক্রম
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো, মহৈ
হশ্বর্যে আছে নম্র,মহাদৈন্যে কে হয়নি নত সম্পদে
কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক কে
পেয়েছে সবচেয়ে , কে দিয়েছে তাহার অধিক, কে
নিয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম সি
বনয়ে সগৌরবে ধরা মাঝে দুঃখ মহত্তম,-
কহ মোরে সর্বদর্শী হে দেবর্ষি তার পুণ্য নাম।''
নারদ কহিলা ধীরে '' অযোধ্যার রঘুপতি রাম''।

-'কাহিনী' ভাষা ও ছন্দ

বাল্মীকির রাম মনুষ্যত্বের সর্বোত্তম আদর্শের প্রতিভূ হয়েও কতকগুলি নিষ্ঠুর অন্যায় করেছিলেন। বালীহত্যার হীনতা সীতাবর্জনের কলঙ্ক,শম্বুকবধের অপরাধ তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছিল। অবশ্য সীতাবর্জন বা শম্বুকবধ উত্তরকান্ডের অন্তর্গত-যেটিকে বাল্মীকির রচনা বলে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করা হয়। তবে বালীবধ তো বাল্মীকির কল্পনা,রামের যে কাজটিকে কোনো যুক্তিতেই মানা যায় না। আবার লঙ্কাযুদ্ধের পরে এত দুঃখে ফিরে-পাওয়া সীতাকে দেখে রাম বললেন-

তোমার মঙ্গল হোক। তুমি জেনো এই রণ-পরিশ্রম... এ তোমার জন্য করা

হয়নি। ....তোমার চরিত্রে আমার সন্দেহ হয়েছে,নেত্ররোগীর সামনে যেমন দীপশিখা, আমার পক্ষে তুমি সেইরকম কষ্টকর .....এখন আর তোমার প্রতি আমার আসক্তি নেই। ....লক্ষণ,ভরত,শত্রুঘ্ন,সুগ্রীব বা রাক্ষস বিভীষণ, যাঁকে ইচ্ছা কর তাঁর কাছে যাও।....

টিপ্পনী

এমন মর্মান্তিক কথা যে রামের মুখ দিয়ে বার হল,তার থেকে বোঝা যায় তিনি তখন মনোবিকারে ভুগছিলেন। তাই সীতাকে দীপশিখার মতো পবিত্র জেনেও তাকে সে-মূহূর্তে সহ্য করতে পারেননি। তবে শেষবারের মতো সীতা যখন অর্ন্তহিতা হলেন তখন তাঁর ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে পড়ল। তিনি 'মৈথিলির জন্য উন্মত্ত' হলেন,জগৎ শূন্যময় দেখতে লাগলেন, কিছুতেই মনে শান্তি পেলেন না।' এই ধৈর্য্যহীন শোকের কারণে তিনি হয়ে উঠেছেন মানুষ,দেবতার অবতার নয়। তাই মারীচের রাক্ষসী মায়া তাঁকে ভোলাতে পেরেছে। সীতা উদ্ধারের জন্যে তাঁকে এত পরিশ্রম করতে হয়েছে.। তাঁকে মেনে নিতে হয়েছে বর্ষার বাধা,সমুদ্রের ব্যবধান। সেই একই কারণে বালীকে মেরে সুগ্রীবকে রাজত্ব দিয়ে সংগ্রহ করতে হয়েছে বানর-সেনা। এটাই আদি কবির বাস্তববোধ। তাঁর রাম অতিমানব নন,তাই মানুষের দুঃখ যত মর্মান্তিক হতে পারে তার সবটাই তিনি সম্পূর্ণ ভোগ করেছেন-এমন কি মানুষী অবমাননা থেকেও তিনি রেহাই পাননি।

কৃত্তিবাসের রাম বিষ্ণুর সাক্ষাৎ অবতার। তিনি করুণাময়,পতিতপাবন ও ভক্তগতপ্রাণ। তাঁর পায়ের ছোঁওয়ায় অহল্যা জীবন ফিরে পায়,তাঁর হাতে নিহত হতে পেরে তরণীসেন,বীরবাহু, অহী ও মহীরাবণ এমন কি স্বয়ং রাবণ পর্যন্ত ধন্য হয়ে যায়। অন্যদিকে তিনি আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভাই,আদর্শ স্বামী, আদর্শ রাজা। সীতার অগ্নিপরীক্ষা নিলেও,তপোবন দেখানোর ছলনায় সীতাকে বিসর্জন দিলেও (কৃত্তিবাসের রাম সীতাগতপ্রাণ) আজও বাঙালী পল্লীবালার বতকথায় তিনিই আদর্শ স্বামী। আর রাম রাজত্বের সুখের কথা তো প্রবাদে পরিণত হয়েছে। তবে কৃত্তিবাসী রামের মধ্যে ক্ষাত্রতেজের বদলে অশ্রুপাত প্রবণতা বেশী দেখা যায়,তা সে সীতাবিরহ বা ভক্তবৎসলতা যে কারণেই হোক (দ্রষ্টব্য ঃ রসবিচার-করুণরস ও ভক্তিরস)।

আর্য রামায়ণের সীতাচরিত্রও কৃত্তিবাসের হাতে সদাসহিষ্ণু অশ্রুমুখী কুলবধূ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বনবাসের সময় রাম-সীতাকে সঙ্গে নিতে দ্বিধা করলে এই ক্ষত্রিয়াণী জনকনন্দিনী বলেছিলেন, আমার পিতা তোমাকে আকৃতিতে পুরুষ কিন্তু ব্যবহারে স্ত্রী ব্যল জানলে বোধহয় তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ দিতেন না সীতার এই উক্তি যে ক্ষুরধার ব্যঙ্গে ঝলসে উঠেছিল, কৃত্তিবাসের সীতার মুখে তার তীক্ষ্ণতা হারিয়ে গেছে।-

পন্ডিত হৈয়া বল নির্বোধের প্রায়।
কেন হেন জনে পিতা দিলেন আমায়।।
নিজ নারী রাখিতে যে করে ভয় মনে।
দেখ তারে বীর বলে কোন বীর জনে।।

সীতাহরণের সময় বাল্মীকির সীতা এই বলে আক্ষেপ করেছেন,যে রাম ধর্ম রক্ষার জন্য প্রাণ,সুখ ও অর্থ সবই ত্যাগ করে থাকেন, সেই তিনি সীতা অধর্ম কর্তৃক অপহৃতা হচ্ছেন দেখেও উপেক্ষা করছেন কেন? শত্রুতাপন রাম অবিনয়ীদের শাসনকর্তা। তবে কেন পাপাঙ্ক রাবণকে তিনি শাসন করছেন না? এখানে কৃত্তিবাসের সীতা শুধু অসহায়ের মতো কেঁদে কেঁদে বিলাপ করছেন-

ত্রাসেতে সীতা হইয়া কাতর।
কোথা গেলে প্রভুরাম গুণের সাগর।।
সিংহের বিক্রম সম দেবর লক্ষ্মণ।
শূন্য ঘরে পেয়ে মোরে হরিছে রাবণ।।

এখানে সীতা অস্থিহীন কান্তকোমল বাঙালিনী হয়ে গেছেন। অগ্নিপরীক্ষার আগে রাম যখন সীতার চরিত্র সন্দেহ প্রকাশ করে তাঁকে লক্ষণ-ভরত-শত্রুঘ্ন-সুগ্রীব বা বিভীষণকে বরণ অথবা যা খুশি তাই করার নির্দেশ দিয়ে রূঢ় ভষায় তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন তখন ধার্মিক জনকদুহিতা

সীতা সতীত্বের গৌরবে এবং পিতৃকুলের মহিমায় দীপ্ত হয়ে ক্ষত্রিয়াণী সুলভ তেজে রামচন্দ্রকে ‘প্রাকৃতজন’ অর্থাৎ নীচ বা ইতর বলে ভৎর্সনা করতে দ্বিধা করেননি। কিন্তু কৃত্তিবাসের ব্যাক্তিত্বহীনা সীতা রামের কাছে কৈফিয়ত দাখিল করতে বসেন।-

সবেমাত্র ছুঁইয়াছে পাপিষ্ঠ রাবণ।
ইতর নারীর মত ভাব কি কারণ।।

লক্ষ্মণের চরিত্রচিত্রণেও বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসে এরকম তফাত দেখা গেছে। অযোধ্যাকান্ডে রামের প্রতি বনবাসের আজ্ঞায় ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ বলেছেন-

হনিষ্যে পিতরং কৈকেয্যাসক্তমানসম্. ......

অর্থাৎ কৈকেয়ীর প্রতি আসক্ত বৃদ্ধ পিতাকে আমি বধ করব। শুধু পিতা নয়,ভরত এবং কৈকেয়ীকেও লক্ষ্মণ বধ করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। এমনকি রামকে পর্যন্ত লক্ষ্মণ বলেছেন, ধর্মের দ্বারা আপনার বুদ্ধি বিপর্যয় ঘটেছে। এই দুর্ভাষী,দুর্বিনীত ও স্বজনদ্রোহী ভাইকে রাম শান্ত ও সংযত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কৃত্তিবাস লক্ষ্মণের মধ্যে ভ্রাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাতে চেয়ে রামের প্রতি তাঁর একান্ত অনুগত ও বংশবদ রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন। অরণ্যকান্ডেও বাল্মীকির লক্ষ্মণ সীতার কর্কশ বাক্যে কুপিত হয়ে রামের কাছে চলে যান। কিন্তু কৃত্তিবাস লক্ষ্মণকে সংযত,সহিষ্ণু এবং সীতার প্রতি একান্ত ভক্তিমান করে এঁকেঁছেন। এইভাবেই বীর্যবান, দৃঢ় চরিত্র দাম্ভিক রাবণ শেষ পর্যায়ে কৃত্তিবাসের হাতে রামভক্ত হয়ে উঠেছেন। মুমূর্ষু রাবণ রামকে ‘বহ্মসনাতন’ ও ‘অনাদি পুরুষ’ বলে প্রার্থণা করেছে-

অনাথের নাথ তুমি পতিত পাবন। দয়া
করি মস্তকেতে দেহ শ্রীচরণ।।   চিরি
দন আমি দাস চরণে তোমার। শাপেতে
রাক্ষসকূলে জনম আমার।।

কিন্তু পরস্ত্রী-অপহারক পাপিষ্ঠ রাবণকে হঠাৎ এইভাবে রামভক্ত করে তোলায় চরিত্রটির পূর্বাপর সঙ্গতি বজায় থাকেনি। আবাপ অসামান্য নৈপুণ্যে দুটি মাত্র উপমার সাহায্যে বাল্মীকি রাবণকে জীবন্ত করে তুলতে পেরেছেন ঃ ‘ পাপরাশি সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ সেই রাক্ষসপতি যেন ভুজঙ্গের ন্যায় নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছে।’ এর সঙ্গে কৃত্তিবাসের বর্ণনা-

নীলবর্ণ রাবণ যে পীতবস্ত্রধারী।
নবজলধর যেন বিদ্যুৎ সঞ্চারী।

তুলনা করে দেখলেই বোঝা যায় মহাকাব্যের চরিত্রাঙ্কণে কৃত্তিবাসের অপটুতা।

হনুমানকে বাল্মীকি পরম প্রাজ্ঞ ও বেদজ্ঞ হিসাবে দেখিয়েছেন। কিন্তু কৃত্তিবাস যে হনুমানকে এঁকেছেন তার বানর স্বভাবটিই বিশেষভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে। হনুমান ইন্দ্রজিতের নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে গিয়ে যজ্ঞ নষ্ট করার অভিপ্রায়ে পূজার আয়োজন অপবিত্র করে দিয়েছে।-

হনুমান বীর যেন সিংহের প্রতাপ। যজ্ঞক
ুন্ড ভরি তায় করিল প্রস্রাব।। যজ্ঞকুন্ড
উপরেতে হনুমান মুতে। ফুলফল যজ্ঞের
ভাসিয়া যায় স্রোতে।।

এই রকম অসভ্য আচরণের অমার্জিত বর্ণনা বাল্মীকির কল্পনার অগোচর। সীতার খোঁজে লঙ্কাপুরীতে গিয়ে ঘুমন্ত মন্দোদরীকে সীতা ভেবে উল্লসিত হনুমান যে আচরণ করেছিল বাল্মীকির ভাষায় তা হল মহাবাহু পবননন্দন ‘বানর স্বভাব প্রদশনপূর্বক এক প্রান্তে গিয়া বাহু আস্ফোটন, পুচ্ছচুম্বন,আনন্দে নৃত্য, বিবিধ ভাবভঙ্গি,গান ও লম্ফপ্রদানপূর্বক স্তম্ভে আরোহণ করিয়া পুনর্বার ভূমিতে পতিত হইতে লাগিলেন।’ বাল্মীকি এখানে বানর-যূথপতির স্বাভাবিক চাপল্যকে বজায়

টিপ্পনী

রেখেও তার মহিমাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন।

বাল্মীকির মহাকাব্য যেমন বিশাল,তাঁর আঁকা চরিরগুলিও তেমনি মহিমান্বিত। আবার মনস্তত্ববিচারে এবং ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যেও তারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র। কৃত্তিবাসের চরিত্রচিত্রণ সম্পর্কে মনে রাখতে হবে যে কবি তাঁর সমসাময়িক দেশকালের. ছায়াকে ছাড়িয়ে উঠতে পারেননি। কোনো কবি এমনকি আত্মমগ্ন গীতিকবিও তা পারেননা। সুতরাং রামায়ণের মতো আখ্যান কাব্যের চরিত্রচিত্রণে কৃত্তিবাস যে মধ্যযুগীয় বাংলাদেশের জীবন ও চরিত্রাদর্শ গ্রহণ করবেন সেটাই স্বাভাবিক। সপ্তদশ শতকের কবি তুলসীদাসও মধ্যযুগীয় ভারতের আত্মনিবেদনমূলক ভক্তির আদর্শেই তাঁর চরিত্র-পরিকল্পনা করেছিলেন। আসলে সমাজে বাস করে বিশেষ ধরনের সমাজচেতনার মধ্যে বেড়ে ওঠার ফলে শিল্পীর সৃষ্টিতে যে পরিমাণ দেশকালের প্রভাব পড়া সম্ভব কৃত্তিবাসের আঁকা চরিত্রে সেটুকু থেকেছ। তাই সীতা হয়েছেন বাঙালী ঘরের কোমলস্বভাবা কল্যাণী গৃহবধূ,রাম হয়েছেন গৃহচারী বাঙালীর উপযোগী আদর্শ পুত্র ,আদর্শ অগ্রজ ও আদর্শ স্বামী,লক্ষ্ণণ হয়েছেন আদর্শ অনুজ ও ভক্তিনত দেবর,রাবণ হয়েছে প্রচ্ছন্ন ভক্ত এবং বীরবাহু-তরণীসেন প্রমুখের মধ্যে ভক্তিমিশ্রিত বীররস যে করুণকোমল অথচ বীর্যবান জীবনাদর্শকে ফুটিয়ে তুলেছে তা বাংলাদেশের নরনারীর জীবনের ছায়াতলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এইখানেই কৃত্তিবাসের চরিত্র সৃষ্টির সার্থকতা এবং এর ফলেই তাঁর রামায়ণ বাঙালীর জাতীয় কাব্য হয়ে উঠতে পেরেছে।

টিপ্পনী

রসবিচার

করুণরস

প্রাচীন অলংকার শাস্ত্রমতে বীর,করুণ,আদি ও শান্ত এই চারটি রসের যে কোন একটি মহাকাব্যের অঙ্গিরস অর্থাৎ প্রধান রস হতে পারে। আর আমরা সকলেই জানি আদি কবির শোক থেকে উচ্চারিত শ্লোকেই রামায়ণের উদ্ভব। তাই করুণ রসই রামায়ণের মুখ্য রস। রামায়ণের আগাগোড়া কাহিনীটিই তো করুণরসের আকর। অযোধ্যাকান্ডে বর্ণিত রামের নির্বাসন, অযোধ্যাবাসীর বিলাপ,কৌশল্যার খেদ,দশরথের মৃত্যু থেকে শুরু করে অরণ্যকান্ডে সীতাহরণ, রামলক্ষ্ণণের বিলাপ,কিষ্কিন্ধ্যাকান্ডে বালীবধে তারার ক্রন্দন,লঙ্কাকান্ডে বংশনাশে রাবণের শোক, রাবণের পতনে তার বিধবা পত্নীদের আর্তনাদ,সীতার অগ্নিপ্রবেশ ইত্যাদি কাহিনীতে করুণরসের প্রবাহ বয়ে গেছে। উত্তরকান্ডেও সীতার নির্বাসন,রামের বেদনা,সীতার পাতালপ্রবেশ এবং শেষে তিন ভাইসহ রামের সরযূনদীতে দেহত্যাগ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাই বেদনার অশ্রুজলে অভিষিক্ত। কৃত্তিবাস এই কাহিনীরই অনুবর্তন করেছেন। কিন্তু মহাকবি ও প্রাদেশিক কবির মধ্যে কবিত্ব শক্তির পার্থক্য যত তাঁদের পরিবেশিত করুণরসের অভিব্যক্তিতেও পার্থক্য ততদূর। মহাকবি বাল্মীকির করুণরসে যে সংযত মহিমা দেখা গেছে কৃত্তিবাসে সেই সংযম ,সেই মহিমা ফোটেনি। তাই তাঁর রামায়ণে কান্না ও বিলাপের আতিশয্য দেখা গেছে।

আদিকান্ডে ঋষি বিশ্বামিত্র যখন রাক্ষস বধের জন্য রাম-লক্ষ্ণণকে নিয়ে যাচ্ছেন তখন দশরথ তাদের বিদায় দিতে কেঁদেই আকুল।-

শ্রীরাম লক্ষ্ণণে লইয়া বিশ্বামিত্র যান।
মহারাজ নেত্রনীরে ধরণী ভাসান।।
কতদূরে গিয়া রাম হন অদর্শন।
ভূমিতে পড়িয়া রাজা করেন ক্রন্দন।।

দশরথের মতো বীর্যমান প্রতাপান্বিত রাজার পক্ষে এমন কান্না অশোভন ও অসংগত। রামের অভিষেকের প্রাক্কালে কৈকেয়ীর বর প্রার্থনায় সত্যবদ্ধ দশরথের দুর্দশার যে ছবি কৃত্তিবাস এঁকেছেন তা হল-

কৈকেয়ীর পায়ে রাজা লোটে ভূমি তলে।

সর্বাঙ্গ তিতির তাঁর নয়নের জলে।।

কৃত্তিবাসের রাম-লক্ষ্মণ পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী। তাই-

রাজার দুঃখেতে দুঃখী শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
রাজার ক্রন্দনে কাঁদেন ভাই দুইজন।।

সেইসঙ্গে রামনির্বাসনে রাজধানী অযাধ্যাতেও 'রাত্রিদিন কান্দে লোকে করে জাগরণ'। আবার সীতাহরণের পরে রামের যে বিলাপ তাও চোখে জলে তরল।-

কান্দিয়া বিকল রাম জলে ভাসে আঁখি
রামের ক্রন্দনে কান্দে বন্য পশুপাখি।

এরপর বর্ষাসমাগমে রাম মাল্যদান পর্বতে গেলেন। ওখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অপরূপ। কিন্তু-'সীতা বিনা সর্বসুখে শ্রীরাম বঞ্চিত' এবং পুরো বর্ষাকাল ধরে -'সীতা লাগি শ্রীরাম কান্দেন চারিমাস'।

এই প্রসঙ্গে আমরা বাল্মীকি রামায়ণে বর্ণিত বর্ষা ও শরতের ঋতুবিলাস স্মরণ করতে পারি। রামচন্দ্রের 'বনবাসের দুঃখ,সীতা হারানোর দুঃখ, বালীবধের উত্তেজনা ও অবসাদ-সমস্ত শেষ হয়েছে। সামনে পড়ে আছে মহাযুদ্ধের বীভৎসতা ঃ দুই ব্যস্ততার মাঝখানে একটু শান্তি, সৌন্দর্য-সম্ভোগের বিশুদ্ধ একটু আনন্দ' এই প্রসঙ্গে কবি-সমালোচক বুদ্ধদেব বসু মন্তব্য করেছেন

এই বিরতির প্রয়োজন ছিল সকলেরই-কাব্যের,কবির এবং পাঠকের,আর সবচেয়ে বেশী রামের।...বালস্বভাব লক্ষ্মণের সীতা উদ্ধারের চিন্তা ছাড়া আর কিছুতেই মন নেই; শান্ত শুদ্ধশীল রাম তাকে ডেকে এনে দেখাচ্ছেন বর্ষার বৈচিত্র্য, শরতের শ্রীলতা।......সীতার বিরহে রাম ক্লিষ্ট,কিন্তু অভিভূত নন; যদিও মুখে তিনি দুচারবার আক্ষেপ করেছেন, আসলে সীতার অভাব তাঁর প্রকৃতি-সম্ভোগের অন্তরায় হলো না।.....সীতা কাছে নেই বলে প্রকৃতির সৌন্দর্যের ওপর অভিমান করলেন না রাম, তার গলা জড়িয়েও কাঁদলেন না; সৌন্দর্যে তাঁর নিষ্কাম নৈব্যক্তিক আনন্দ, যেমন শিল্পীর।

- (প্রবন্ধ সংকলন ১৯৯৬,রামায়ণ)

এর আগে বা পরে নিসর্গ বর্ণনার সুযোগ বাল্মীকির ছিল,কিন্তু কর্মব্যস্ত রামের অবকাশ ছিল না। এখন যুদ্ধযাত্রার পূর্বাহ্ণে রামের একটু অবসর মিলেছে। আসন্ন হৃদয়হীন যুদ্ধের বীভৎসতাকে এবং সীতার চিন্তাকেও দূরে সরিয়ে রেখে তিনি ভ্রমরগুঞ্জন মুখরিত,শিখীব নর্তন সুশোভিত ও গজেন্দ্রের মত্ততায় মন্দ্রিত শ্যামল বনভূমির সৌন্দর্য্য সম্ভোগে মনপ্রাণ ভরিয়ে তুলেছেন। আসলে এখানে বর্ণনার যে কবিত্ব,রামের মুখে এই বর্ণনা বসানোর মধ্যে যে গভীর নাট্যবোধ এবং বিষয়োপযোগী চরিত্রাঙ্কণের মতো উঁচুদরের শিল্পকলা কৃত্তিবাসের মতো কবির কাছে প্রত্যাশিত নয়। সুতরাং সীতাবিরহে কান্না ছাড়া রামের আর কিছু করার থাকে না। তাই-

কান্দিতে কান্দিতে গেল সে শ্রাবণ মাস।
রামের ক্রন্দনে গীত গায় কৃত্তিবাস।।

সীতার অগ্নিপরীক্ষাব সময়ে প্রজ্জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডের মধ্যে সীতাকে না দেখে কৃত্তিবাসের রামের অবস্থা হল-

কুন্ডমধ্যে চাহি তবে সীতারে না দেখি।
ঝরিতে লাগিল তার দুটি পদ্ম-আঁখি।।
দেখেন সংসার শূন্য যেমন পাগল।
ভূমে গড়াগড়ি যান হইয়া বিকল।।

কৃত্তিবাসের রামের চরিত্রে বীরোচিত ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্যের নিতান্তই অভাব। তাঁর অধীরতার জন্য

টিপ্পনী

তাঁর আচরণ কাপুরুষের মতো বোধ হয়।আবার শুধু রাম নন, রামের প্রতি সহমর্মিতায় উপস্থিত সকলেই কেঁদে ভাসাচ্ছেন।-

রামের ক্রন্দনে কাঁদে সর্ব দেবগণ।
কান্দিছে বরুণদেব শমন পবন।।
যত লোকপাল কান্দে দেব পুরন্দর।
জলের ভিতরে থাকি কান্দেন সাগর।।
নল নীল কান্দে আর সুগ্রীব বানর।
জাম্বুবান সুষেণ ও বালীর কোঙর ।।
কান্দিতে কান্দিতে রাম ছাড়েন নিশ্বাস।
সীতার পরীক্ষা গীত গায় কৃত্তিবাস।।

টিপ্পনী

এখানে কান্না অনেক আছে,কিন্তু করুণরসের মর্মস্পর্শী গভীরতা আছে কি? সীতা বিসর্জনের পরেও রামের অশ্রুধারা প্রবহমান।-

লক্ষ্মণ বলেন তুমি করিলে বর্জন।
আপনি বর্জিয়া কেন করহ রোদন।।
ক্রন্দন সম্বর প্রভু ক্ষমা দেহ মনে।........

এর সঙ্গে বাল্মীকির রামের আচরণ তুলনা করলে কাব্য কিভাবে প্রকৃত রসসৃষ্টির আঁধার হয়ে ওঠে তা বোঝা যাবে। সীতার লোকপবাদ শুনে পরম দুঃখিত মহাবীর রামচন্দ্র কেবল সভাসদদের জিজ্ঞাসা করলেন যে সকলেই কি একথা বলে? সকলে তা সমর্থন করলে ধীরপ্রকৃতি রাজা বিনাবাক্যে সভাসদদের বিদায় করলেন এবং তিন ভাইকে ডেকে পাঠালেন। তিনি মূর্চ্ছাও গেলেন না - মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে মাথাও কুটলেন না। ভাইরা এলে শুধু অশ্রুজল চোখে কিন্তু অবিচল মুখে তাদের জানালেন যে তিনি অন্তরে সীতাকে পবিত্র বলে জানেন-অন্তরাত্মা চ মে বেত্তি সীতাং শুদ্ধাং যশস্বিনীম্। কিন্তু যেহেতু লোকপবাদ প্রবল অতএব তিনি সীতাকে ত্যাগ করবেন। তারপর স্থিতপ্রতিজ্ঞ রাম লক্ষ্মণকে সীতা বিসর্জনের জন্য আদেশ দিলেন।

মহাকবি কালীদাসও পত্নীর লোকপবাদ শোনার পর রামের অবস্থা বর্ণনা করে বলেছেন, এতদিন শত দুঃখেও যে বজ্রকঠিন হৃদয় অটল ছিল সীতার অপযশ রূপ হাতুড়ীর ঘায়ে সেই হৃদয় তপ্ত লোহার মতো বিদীর্ণ হল।এখানে কালিদাস রামকে 'বৈদেহীবন্ধু' বলে উল্লেখ করেছেন। যে যার হৃদয় বেঁধে রাখে সে তার বন্ধু।তাই রাম রঘুকূলের গৌরব,তিনি প্রজারঞ্জক,কিন্তু অন্তরের অন্তস্থলে তিনি 'বৈদেহীবন্ধু' ।কালিদাস রামকে এই বিশেষণে ভূষিত করেছেন এবং তাঁর শোকের গভীরতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যিনি অধীর হয়ে বিলাপ না করে সংযতচিত্তে সীতাত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন।

সীতাবর্জনের বারো বছর পরেও রামের মনের অবস্থাকে ব্যক্ত করে ভবভূতি তাঁর উত্তরচরিত নাটকে বলেছেন- 'পুটপাক-প্রতীকাশো রামস্য করুণো রসঃ'।ছিদ্রহীন লৌহপাত্রে জল উত্তপ্ত হলে তার বাষ্প বাইরে আসতে পারে না,যত তপ্তই হোক তা অভ্যন্তরেই থেকে যায়,রামের মর্মস্থলও তেমনি অবরুদ্ধ সন্তাপে দগ্ধ হয়েছে। তার কোনো বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় নি। এইসব মহাকবিদের লেখনীতে শোকের অন্তহীন দাহ ও বিষাদের স্তব্ধ গাম্ভীর্য যে করুণারস সৃষ্টি করেছে কৃত্তিবাস তার ধারে কাছে পৌঁছতে পারেননি।কান্না ছাড়া করুণরস সৃষ্টির আর কোনো উপকরণ তাঁর হাতে ছিল না। তাই সীতার পাতাল প্রবেশেও শোনা গেল-

অযোধ্যার নগরে হেথা উঠিল ক্রন্দন।।
শ্রীরামের ক্রন্দন হৈল অনিবার।
হাহাকার শব্দ করে সকল সংসার।।

সুতরাং কৃত্তিবাসী রামায়ণে বহু দুঃখজনক ঘটনা এবং তার জন্য বিলাপের হাহাকার যথেষ্ট থাকলেও যথার্থ করুণরস সৃষ্টি হয়েছে কিনা তাতে সংশয় থেকে যায়।

বীররস

বীররস সৃষ্টিতে ফুলিয়ার ব্রাহ্মণ কবি কৃত্তিবাস তেমন সফল হতে পারেননি। বাল্মীকির সঙ্গে তুলনা করলেই বিষয়টি ভালো বোঝা যাবে। বীররস ও রৌদ্ররস সৃষ্টিতে বাল্মীকির যুদ্ধকান্ডই শ্রেষ্ঠ। তবে অরণ্যকান্ডের যুদ্ধবর্ণনাও যথেষ্ট উত্তেজক। বিরোধ বিশেষ করে খরের সঙ্গে রামের যুদ্ধ বর্ণনায় পরস্পরের আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণের প্রতিটি স্তর নিখুঁতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তুলনায় কৃত্তিবাসের বর্ণনা অনেক নিষ্প্রভ।–

হাতে অস্ত্র নাহি আর উঠি দিল রড়।
রামেতে রুষিয়া যায় খাইতে কামড়।।

এই জাতীয় বর্ণনায় যুদ্ধজনিত বীররসের সৃষ্টি হয় না।

যুদ্ধের অতিবিস্তারিত ও ক্রমোত্তজক বর্ণনায় বাল্মীকির যুদ্ধকান্ড অতুলনীয়। দৈহিক বিক্রম, অস্ত্রচালনা,আক্রমণ-প্রতি-আক্রমণ পদ্ধতি ইত্যাদির সঙ্গে উদ্দীপনা,ক্রোধ,হিংসা, ঘৃণা প্রভৃতি মানসিক ভাবের উত্তপ্ত অভিব্যক্তিতে বাল্মীকির সঙ্গে কৃত্তিবাসের তুলনা চলে না। প্রচন্ডতা ও ভয়াবহতার দিক দিয়ে রাম-রাবণের অন্তিম যুদ্ধই সবচেয়ে উত্তেজনাজনক.। ৯৯ থেকে ১০৮ সর্গ পর্যন্ত এই ভীষণ যুদ্ধের একটানা বর্ণনা ধীরে ধীরে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে। এই ভয়ংকর দ্বৈরথ যুদ্ধ স্বর্গ মর্ত্যপাতাল ব্যাপী এক ভয়ংকর আলোড়ন জাগিয়েছিল। এই মূল যুদ্ধ ছাড়া লক্ষ্মণ-ইন্দ্রজিৎ এবং রাম-কুম্ভকর্ণ যুদ্ধ ও যথেষ্ট উত্তেজক। অবশ্য কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ ও পতন খানিকটা বীভৎসতা রসের সঞ্চার করেছে।

কৃত্তিবাসের যুদ্ধ বর্ণনা অনেকটাই নিরুত্তাপ ও উত্তেজনাহীন। অবশ্য বাহুযুদ্ধের চেয়ে বাগযুদ্ধেই কৃত্তিবাসের দাপট অনেক বেশী। হনুমান-মেঘনাদের বাগ্‌যুদ্ধ বা অঙ্গদের রায়বার তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যুদ্ধ বর্ণনায় বাঙালী কবি তাঁর সীমিত অভিজ্ঞতা নিয়ে যখন লেখেন–

অশ্বকর্ণ বৃক্ষ ধরে দিল তিন পাক।
বায়ুবেগে ঘুরে যেন কুমোরের চাক।। (লঙ্কাকান্ড)

তখন তাতে বীররস সৃষ্ট হয় না।

আসলে কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করেছিলেন সাধারণ অশিক্ষিত শ্রোতাদের জন্যে যাদের কল্পনাশক্তি ও রসবোধ নিতান্তই খাটো মাপের। যুদ্ধ সম্বন্ধে তাদের কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না,তাদের পাঁচালীকারেরও সে অভিজ্ঞতার একান্ত অভাব। অতএব কবি কৃত্তিবাস লঙ্কাকান্ডে মৌখিক আস্ফালনের মধ্যেই যুদ্ধের ভয়াবহতাকে সীমাবদ্ধ রেখে বাঙালী শ্রোতাদের উত্তেজনার আগুণ পোয়ানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তাই কৃত্তিবাসের বীররসের বর্ণনা নেহাৎই যাত্রাদলের কৃত্রিম যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। সবচেয়ে মারাত্মক হয়েছে লঙ্কাকান্ডে ভক্তিরসের অনধিকার প্রবেশ। রাবণ থেকে শুরু করে বীরবাহু,তরণীসেন সকলেই কেউ প্রচ্ছন্নভাবে কেউ বা প্রকাশ্যভাবে রামভক্ত। মুক্তিলাভেব আশায় তারা স্বেচ্ছায় রামের হাতে প্রাণ দিতে এসেছে। ফলে ভক্তবৎসল রামের পক্ষে সংকট ঘনিয়েছে-কিভাবে তিনি এমন ভক্তের প্রাণ সংহার করবেন। সুতরাং লঙ্কাকান্ডে সাময়িক পরিবেশটাই ভক্তিরসে আর্দ্র হয়ে গিয়ে রৌদ্ররসের উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে গেছে।

সংস্কৃত শব্দ ও বাক্যের ধ্বনিময় ওজস্বিতা বামীকির বীররসকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। আর শব্দাড়ম্বর ও অলংকারের অভাবে কৃত্তিবাসের সাদামাটা যুদ্ধবর্ণনা অনেকটা নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে।

ভক্তিরস

মূল বাল্মীকি রামায়ণের বালকান্ডে বিষ্ণুর চার-অংশে জন্মগ্রহণ বর্ণনায় সামান্য বৈষ্ণবীয় ভক্তিভাবের প্রভাব দেখা যায়। তবে বৈষ্ণব প্রভাব বলার চেয়ে একে বিষ্ণুর প্রভাব বলাই সঙ্গত।

টিপ্পনী

অবশ্য এই বিষ্ণুপ্রভাব বালকান্ড এবং উত্তরাকান্ডেই দেখা যায়,যে দুই কান্ডকে পন্ডিতেরা অনেকেই বাল্মীকির রচনা বলে স্বীকার করেন না। অন্ততঃ তাতে যে প্রচুর হস্তক্ষেপ ঘটেছে তা মানতেই হয়। যাই হোক বাল্মীকি বালকান্ড ও উত্তরাকান্ডে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি নিবেদন করলেও কৃত্তিবাসী রামায়ণে ভক্ত-ভগবানের মধ্যে যে প্রগাঢ় অনুরাগ দেখা গেছে সেই জাতীয় আবেগ-ব্যাকুল ভক্তিভাবের বাড়াবাড়ি বাল্মীকিতে দেখা যায়নি।

টিপ্পনী

কৃত্তিবাসী রামায়ণে ভক্তিবাদের দুটি ধারা দেখা যায়।একটি নামাশ্রয়ী রাম ভক্তিবাদ,অন্যটি রামচন্দ্রেব প্রতি দেবী চন্ডীর বাৎসল্যভাব। নামতত্ত্ব যা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান অঙ্গ বলে বিবেচিত (হরের্ণামৈব কেবলম্) তা কিন্তু কৃত্তিবাসেরও আগে থেকে এদেশে প্রচলিত ছিল। অধ্যাত্ম রামায়ণ বা অদ্ভূত রামায়ণে তার নিদর্শন পাই। কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকান্ডে রত্নাকর দস্যু যে রামনাম উচ্চারণ করতে না পারলেও শুধু ‘মরা মরা’ জপ করেই উদ্ধার পেল,অধ্যাত্ম রামায়ণেও সে নামতত্ত্ব পাওয়া যায়। –

ইত্যুক্ত্বা রাম তে নাম বাত্যস্তাক্ষরপূর্বকম্।
একাগ্রমন মাত্রৈব মরেতি জপ সর্বদা।।

এই রামায়ণের মাহাত্ম্য দশরথ ও অন্ধকমুনির বিবরণেও কীর্তিত হয়েছে। দশরথ ভুল করে অন্ধক মুনির ছেলেকে শব্দভেদী বাণে বধ করে ফেলার পর পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য বশিষ্ঠপুত্র বামদেবের শরণাপন্ন হয়। বামদেব দশরথের পাপ স্খালনের জন্য তাঁকে তিনবার রামনাম জপ করান এবং দশরথ মহাপাতক থেকে মুক্তি পান।কিন্তু বশিষ্ঠ তাঁব পুত্রের অজ্ঞতার জন্য মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেন। –

এক রামনামে কোটি ব্রহ্মহত্যা হরে।
তিনবার রাম নাম বলালি রাজারে।।
মোর পুত্র হয়ে তোর অজ্ঞান বিশাল
দূর হ'বে বামদেব হবি যে চন্ডাল।।

পিতৃশাপে বামদেব শেষে গুহক চন্ডাল হয়ে জন্ম নেন। কিষ্কিন্ধ্যাকান্ডেও কারণে অকারণে তাঁকে রামনামের মহিমা কীর্তন করতে দেখা যায়।–

রাম নাম জপ ভাই অন্য কর্ম পিছে।
সর্ব ধর্ম কর্ম রাম নাম বিনা মিছে।।

এমন জপের মহিমা তিনি বার বার ব্যক্ত করেছেন।–

রামানাম লৈতে ভাই না করিও হেলা।
সংসার তরিতে রাম-নামে বান্ধ ভেলা।।
রামনাম স্মরি যেবা মহারণ্যে যায়।
ধনুর্বান লয়ে রাম পশ্চাতে গোড়ায়।।

অবশ্য রামতত্ত্ব কৃত্তিবাসের আবিষ্কার নয়। ১২ শ শতকের লীলাশুক (বিল্বমঙ্গল)-রচিত ‘কৃষ্ণকর্ণামৃতে’ নামতত্ত্বের আভাস আছে,আর ওই গ্রন্থ বাংলাদেশে অজ্ঞাত বা অপ্রচলিত ছিল না।লঙ্কাকান্ডেই এই ভক্তির চূড়ান্ত রূপ দেখা যায়।রামের সঙ্গে যাত্রায় বিভীষণ- পুত্র তরণীসেন সমরসজ্জায় যে বর্ণনা কৃত্তিবাস দিয়েছেন তা হল।–

অঙ্গে লেখা রামনাম রথ-চারিপাশে।
তরুণীর ভক্তি দেখি কপিগণ হাসে।।

ভক্তবৎসল রামের চিন্তা এমন ভক্তের গায়ে কি করে অস্ত্রাঘাত করবেন?

কার্য নাই সীতায় না যাইব রাজ্যেতে।
কেমনে মারিব বাণ ভক্তের অঙ্গেতে।।

কন্টক ফুটিলে মম ভক্তেরে শরীরে।
শেলের সমান বাজে আমার অন্তরে।।

কিন্তু রামের হাতে মৃত্যুবরণ করে স্বর্গে যাওয়ার জন্যেই যে তরণীর যুদ্ধে আসা। তরণীর ভক্তি এত বেশী যে মুন্ড কাটা যাওয়ার পরেও তার মুখে রামনাম উচ্চারিত হতে থাকে।–

দুই খন্ড হয়ে বীর পড়ে ভূমিতলে।
তরুণীর কাটা মুন্ড রামনাম বলে।।

রামভক্ত বীরবাহু তো নিজেই বৈষ্ণব অস্ত্র দিয়ে তাঁকে নিধন করার কথা বলেছেন।–

জানিলাম রাম তুমি বিষ্ণু অবতার।
অগতির গতি তুমি সংসারের সার।।
শ্রীচরণে অধীনের এই নিবেদন।
বৈষ্ণব অস্ত্রেতে মোরে করহ নিধন।।

রাবণের যুদ্ধযাত্রার সময়ে অশুভ লক্ষণ দেখে মন্দোদরী বিলাপ করলে রাবণ তাঁকে এই বলে আশ্বাস দেন–

মরিব রামের হাতে ভাগ্যে যদি আছে।
যমের না হবে সাধ্য ঘনাইতে কাছে।।
বিষ্ণুদূত লয়ে যাবে তুলিয়া বিমানে।
সমান প্রতাপে যাব জীবনে মরণে।।

যুদ্ধের সময়ে অনুতপ্ত রাবণ রামের স্তুতি করলে রাম ব্যাকুল হয়ে ভাবতে থাকেন–

কেমনে এমন ভক্তে করিব সংহার।
বিশ্বে কেহ রামনাম না লইবে আর।।

শেষ যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণের পতন হতে মুমূর্ষূ রাবণকে রাম দর্শন দিলেন এবং রাবণ তাঁর মধ্যে ব্রহ্ম সনাতনকে প্রত্যক্ষ করে ধন্য হলেন।–

অনাথের নাথ তুমি পতিতপাবন।
দয়া করে মস্তকেতে দেহ শ্রীচরণ।।
চিরদিন আমি দাস চরণে তোমার।
পাপেতে রাক্ষসকূলে জনম আমার।।

এই ভক্তি বাঙালীর জীবনের সাধনায় এমনকি তার অস্থিমজ্জায় পরতে পরতে জড়িয়ে আছে। মনে রাখতে হবে কৃত্তিবাসের এই ভক্তের ভগবান রাম স্বয়ং বিষ্ণু,অবতার রূপে যিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ। তিনি বাল্মীকির ‘নরচন্দ্রমা’ অর্থাৎ নরশ্রেষ্ঠ নন।

লঙ্কাকান্ডেই রামনামের মহিমা আর এক ভাবেও প্রচারিত। লঙ্কাকান্ডে বানরদের সদগতি লহ না,অথচ রাক্ষসেরা মুক্তি পেল দেখে রামচন্দ্র ইন্দ্রকে তার কারণ জিজ্ঞেস করলে ইন্দ্র বলেন–

রাবণেরে মার বলি কপিগণ মরে।
উদ্ধার পাইবে বল কি নামের জোরে।।
বামে মার শব্দ করে মরেছে রাক্ষস।
রামনাম করে মরে গেছে স্বর্গবাস।।

রামনামের এমনই মহিমা। এই প্রসঙ্গে হনুমানের দাস্যভক্তির কথাটিও উল্লেখযোগ্য। রামে সমর্পিতপ্রাণ হনুমান তাই বলে–

তুমিই আশ্রয় মোর ওহে দয়াময়।

টিপ্পনী

তোমারি চরণে মোর মতি অবিরাম ।।
দুর্বল হনুর তুমি একমাত্র বল ।
তোমা বিনা নাহি কিছু হনুর সম্বল ।।
রাম হনুমৎ প্রভু হনু রামদাস ।
থাকুক সর্বদা এই হনুর বিশ্বাস ।।

এই দাস্যভক্তি পরবর্তী কালে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে গিয়েছিল। তখন ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্কটি নিছক প্রভুত্বের সম্পর্ক হয়ে থাকে নি। হনুমান তার প্রভু রামচন্দ্রকে যে সেবা করেছে তা কোনো কিছুর প্রলোভনে নয়। নিঃস্বার্থভাবে ভালোবেসে প্রভুর উদ্দেশ্যে নিজের সেবাকে সে উৎসর্গ করেছিল।পরবর্তী কালে যে বৈষ্ণবীয় দাস্যভক্তি দেখা গেছে তার উৎস হয়তো এখানেই নিহিত ছিল।

টিপ্পনী

আসলে বাংলাদেশে দশম-দ্বাদশ শতাব্দী থেকে প্রচ্ছন্নভাবে ভক্তির স্রোত বয়ে চলেছিল। একদিকে শাক্ত আর একদিকে বৈষ্ণব এই দু'রকম ভক্তিরস বাঙালীর স্বাভাবিক চিত্তধর্মের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। তার উপর বাংলার কোমল মাটির সন্তান স্বভাবতঃ ভাবপ্রবণ। আর বাঙলার জাতীয় কবি কৃত্তিবাস বাঙালী চিত্তের এই প্রবণতার উপযোগী করে তাঁর কাব্যে ভক্তিরসের প্লাবন বইয়ে দিয়েছিলেন। তবে এই ভক্তিরস কৃত্তিবাসের মৌলিক আবিষ্কার নয়। মন্দোদরী,রাবণ,কুম্ভকর্ণ,বিভীষণ,কালনেমি-প্রমুখ রাক্ষসেরা যে আসলে প্রচ্ছন্ন রামভক্ত তা রামকথাযুক্ত নানা পুরাণে কিংবা অধ্যাত্ম,যোগবাশিষ্ঠ ইত্যাদি রামায়ণে উল্লেখিত আছে। অধ্যাত্ম-রামায়ণে আছে রাবণ যখন জানতে পারলেন যে বিষ্ণুর হাতে নিহত হলে অন্তিম মোক্ষ অনিবার্য তখন বিষ্ণু-অবতার রামের হাতে হবার জন্যেই তিনি স্বেচ্ছায় সীতাকে হরণ করেন। কৃত্তিবাস সম্ভবতঃ ওই সমস্ত উৎস থেকেই তাঁর রামায়ণে এই রাম ভক্তিবাদের অবতারণা করেছিলেন। তাঁর কাব্যে বর্ণিত দুর্গোৎসব ও কালিকা স্তুতিও শ্রোতাদের ভক্তিভাব চরিতার্থ করার জন্যেই রচিত হয়েছিল।

হাস্যরস

ভক্তিরসের মতো হাস্যরস সৃষ্টিতেও কৃত্তিবাসের কৃতিত্ব তর্কাতীত। বাঙালী মনের রুচি ও রসগ্রহীতার উপযোগী করে তিনি রামায়ণ রচনা করেছিলেন। কৃত্তিবাসের কালে বাঙালী সমাজ তেমন রুচিবাগীশ বা শিক্ষাভিমানী ছিল না। তাই স্থূল,গ্রাম্য এবং কিছু পরিমাণে অশ্লীল হাসি উপভোগে তার বাধা ঘটে নি। কৃত্তিবাস তথা রামায়ণে গায়েন বা কথকদের উদ্দেশ্যই ছিল বাঙালী জনমানসের মনোরঞ্জন। তাই কৃত্তিবাস-পরিবেশিত হাস্যরস কখনও রঙ্গব্যঙ্গে শাণিত, কখনও বাক্চাতুর্যে উজ্জ্বল,তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই উদ্ভট কৌতুকে উচ্ছসিত,যা মাঝে মাঝে ভাঁড়ামির পর্যায়ে পৌছে গেছে।

আদিকান্ডে থেকেই কৃত্তিবাস হাস্যরসের স্রোতকে মুক্ত করে দিতে চেয়েছেন এবং তার জন্য মহাতপা মুনির চরিত্রবিকৃতি ঘটাতেও তাঁর দ্বিধা হয়নি। তাড়কা রাক্ষসীকে নিধন করার জন্যে বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণ দুই ভাইকে দশরথের কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন। এই তাড়কাকে দেখে বিশ্বামিত্রের অতিমাত্রায় আতঙ্কিত হবার বর্ণনা দিয়ে কবি কৌতুকরস উদ্রেক করতে চেয়েছেন।

উভয় ভ্রাতার মধ্যে থাকি মুনিবর ।
দূর হতে দেখালেন তাড়কার ঘর ।।
কর বাড়াইয়া তার ঘর দেখাইয়া ।
অতি ত্রাসে মুনিবর যান পলাইয়া ।।

বিশ্বামিত্র চরিত্রের এমন হীন বিকৃতি বাল্মীকির পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না।

সীতার বিবাহসভায় হরধনু ভাঙার ব্যাপারেও কৃত্তিবাস কৌতুকরস সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। হরধনু ভাঙতে এসে রাবণ কিন্তু নাকাল হচ্ছে কৃত্তিবাস তার সরস বিবরণ দিয়েছেন।-

দ্বারেতে দাঁড়ায়ে বীর উঁকি দিয়া চায়।
দেখিয়া দুর্জয় ধনু অন্তরে ডরায়।।
আঁটিয়া কাপড় বীর বান্ধিল কাঁকালে।
কুড়ি হস্তে ধরিল সে ধনু মহাবলে।।
আঁকাড়ি করিয়া সে ধনুকখানি টানে।
তুলিতে না পারে আর চায় চারিপানে।।

এইভাবে বারবার তিনবার রাবণ ধনুক তোলার চেষ্টা করেও পারল না। তখন –

টিপ্পনী

কাঁকালেতে হাত দিয়া আকাশে নিরখে।
মনে ভাবে পাছে আসি ইন্দ্র বেটা দেখে।।

শেষ পর্যন্ত রণে ভঙ্গ দিয়া তার পলায়ন এবং মিথিলায় 'সকল বালক দেয় তারে টিটকারী'।।

আমরা যাকে পছন্দ করি না তার লাঞ্ছনা আমরা উপভোগ করি। তাই রাবণের দুর্দশায় শ্রোতা খুশী হয়।এখানে কৌতুক বিশুদ্ধ নয়,আমাদের সংস্কার,আমাদের ন্যায়নীতিবোধই এখানে পরিতৃপ্ত হয়েছে। কিষ্কিন্ধ্যা এবং উত্তরাকান্ডে বর্ণিত বালীর রাবণকে নাকাল করার বিবরণ অনুরূপভাবেই শ্রোতদের কাছে পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। অঙ্গদের রায়বারে দেখি এই প্রসঙ্গ তুলে বালীনন্দন রাবণকে খোঁটা দিতে ছাড়েননি।

অযোধ্যাকান্ডে কুঁজীর লাঞ্ছনাও দর্শন-শ্রোতারা চিরকাল পরম প্রসন্নতায় উপভোগ করেছে। মন্থরা না হয়ে অন্য কেউ এমন দুরবস্থায় পড়লে আমাদের সহানুভূতি জাগত নিশ্চয়। ঠিক এই কারণেই অরণ্যকান্ডে শূর্পণখার নাক কাটার যন্ত্রণায় আমাদের সমবেদনা জাগে না।বিধবা শূর্পণখার এই অনুচিত প্রণয় কবির রঙ্গব্যঙ্গের খোরাক মাত্র। সুন্দরকান্ডে লঙ্কাদাহনের সময় রাক্ষস বধূরা আত্মরক্ষার তাগিদে জলে ডুবে মুখটা ভাসিয়ে রাখে। তখন হনুমান 'লেজের অগ্নিতে তার পোড়ায় কুন্তল' আর 'অগ্নিতে পোড়ায় মুখ দেখিতে কৌতুক'।শ্রোতাদের এবং হনুমানের কাছে এটা কৌতুকাবহ হলেও রক্ষোরমণীদের কাছে এটা নিশ্চয় কৌতুক ছিল না। তব তাদের দুখেঃ আমরা সমবেদনায় আর্দ্র হই না,বরং প্রতিহিংসার আনন্দ উপবোগ করি।

বিবাহবাসরে রঙ্গরসিকতা বাঙালীর চিরাচরিত প্রথা। বাঙালী সমাজে ঠাট্টা রসিকতার যে বিশিষ্ট ভাষা ও ভঙ্গি আছে তার হুবহু প্রতিফলন দেখি কৃত্তিবাসী রামায়ণে।বিয়ের পরে রামসীতাকে বাসরঘরে বসিয়ে জনকপুরীর অন্তঃপুরিকারা রামের সঙ্গে পরিহাস করতে থাকেন।–

এই কথা রাম হে তোমাকে কহি ভাল।
সীতা বড় সুন্দরী তুমি বড় কাল।।

রামের মুখে শোনা যায় তার যোগ্য জবাব।–

হাসিয়া বলেন রাম সবার গোচর।
সুন্দরীর সহবাসে হইব সুন্দর।।

সুন্দরকান্ডে দেখি রাবণের অনুচরেরা অশোকবন ভাঙার জন্যে হনুমানকে বেঁধে ফেলল। তাতে হনুমানের ভ্রূক্ষেপ নেই। সে নিজের দেহকে সত্তর যোজন বড় করে পড়ে থেকে ধুয়ো তুলল–' রাজ সম্ভাষণে যাব কান্দে কর আমা'।

দু'লক্ষ রাক্ষস তাকে কাঁধে তুলে বয়ে নিয়ে যেতে হিমশিম খেল। কিন্তু প্রতিদানে হনুমান যা করল তা অবর্ণনীয়।–

মনে মনে হাসে তবে পবনকুমারে।
প্রস্রাব করিয় দিল কান্ধের উপরে।।

গ্রাম্য শ্রোতারা স্থূল ও অশ্লীল রসিকতায় আমোদ পেত বেশী।বর্ণনা যত অশ্লীল হাসির প্রচন্ডতা

ততো বেশী,আর কৃত্তিবাসের রচনাও তো এই পল্লীসমাজের বিনোদনের জন্যেই। হনুমান

রাবণের কাছে পৌঁছে হনুমান পিছন ফিরে বসল। সে তাকে রাজা বলে স্বীকার করতে নারাজ। সেই সঙ্গে রাবণ কোন কোন যুদ্ধে হেরে জব্দ হয়েছে তারও ফিরিস্তি দিতে বসে। তবে রাক্ষস হলেও রাবণের রসবোধ যথেষ্ট। সে রাগ না করে হাসতে থাকে। এদিকে বন্দী হনুমানকে দেখতে এসে রাক্ষসীরা তাকে নিয়ে পরিহাস করতে শুরু করে–'ফুলের মালায় তুমি ভুবন মোহন।' নারীদের মধ্যে হনুর রসিকতা খোলে ভালো। সে সঙ্গে সঙ্গে সরস কথায় জবাব দিয়ে বলে যে রাবণ তাকে জামাই করার জন্য বেঁধে এনেছে,সে কুলীন,রাবণ মৌলিক। সুতরাং এই বিয়ে রাজযোটক। এই বিয়ে হলে সে মন্দোদরীর মত সুন্দরী শাশুড়ী এবণ ইন্দ্রজিতের মতো শ্যালক পাবে। সেই সঙ্গে–

টিপ্পনী

প্রমীলা শালাজ পাব পরম রূপসী।
রসরঙ্গে তার সঙ্গে রব দিবানিশি।।

বাঙালীর বৈবাহিক রসিকতা বাসরঘর ছেড়ে লঙ্কায় গিয়ে হাজির হয়েছে। আবার বানরের মুখে মানুষের এই বিবাহ প্রথার বর্ণনা আরও কৌতুককর হয়ে উঠেছে। রক্ষোনারীরাও রসিকতায় কম যায় না। তাদের অনুরোধ– 'ঠাকুরজামাই
হলে নাচ তো এখন।' হনুমানও উত্তর দিতে ছাড়ে না–

দন্ড দুই থাক নারীগণ।
কত নাচ দেখাইব কে করে গণন।।

হনুমান রায়বারে তরল পরিহাস,সরস রঙ্গরস। কিন্তু অঙ্গদ রায়বারে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ বিদ্রূপের উগ্র জ্বালা ফুটে উঠেছে। মহাবীর বালীনন্দনকে ডেকে–

শ্রীরাম বলেন শুন,হে অঙ্গদ বালী।
রাবণ রাজারে কিছু দিয়া এস গালী।।

রামের এই আদেশ থেকে মহাবীর অঙ্গদের দৈহিক পরাক্রমের পরিচয় পাওয়া না গেলেও বাগ্‌যুদ্ধে তার পটুত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায় অঙ্গদের ভয়ে রাবণ ও তার সভাসদেরা শত শত রাবণমূর্তি ধারণ করে অঙ্গদকে ছলনা করতে চাইলে যুবরাজ যে বিদ্রূপাত্মক ভাষায় রাবণ ও ইন্দ্রজিৎকে গালিগালাজ করেছে তা অশালীন হলেও তাতে বাক্‌চাতুর্যের অভাব নেই।–

অঙ্গদ বলে, সত্য করি কওরে ইন্দ্রজিতা।
এই যত বসিয়াছে, সবাই কি তোর পিতা।।
ধন্য নারী মন্দোদরী ধন্যেরে তোর মাকে।
এক যুবতী শতেক পতি ভাব কেমনে রাখে।।

রাবণ–অঙ্গদের এই বাগ্‌যুদ্ধ কলহরসিক বাঙালীর কাছে পরম উপাদেয় ছিল। রাবণ অঙ্গদকে তার মা কুলটা বলে গাল দিলে অঙ্গত তার যোগ্য জবাব দিয়েছে। এই ধরনের সরস উক্তি–প্রত্যুক্তি, পরস্পরের প্রতি দোষারোপ,শ্রোতাদের পরম উপভোগের বস্তু হয়ে উঠত। ভাষা যত কটু ও ঝাঁঝালো শ্রোতদের আমোদও ততো বেশী। প্রথমে শ্লেষবিদ্রূপের লড়াই,তারপর ক্রোধের সঞ্চার যার পরিণতি গালিগালাজে।

অতিরঞ্জন হাসির একটা বড়ো উপাদান। বিকটাকৃতি কুম্ভকর্ণের আচরণে অসংগত রকমের বাড়াবাড়িতে শ্রোতারা না হেসে পারত না। তার 'নাকের নিশ্বাস যেন প্রলয় পবন' এবং তার শ্বাস–প্রশ্বাসের ঝড়ে রাক্ষসেরা কখনও উড়ে যায়,কখনও নাকে ঢুকে যায়। আর–

অঙ্গ ভঙ্গে আলস্যে যখন তুলে হাই।
মুখের গহ্বর যেন বড় গড়খাই।।

এই কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের উৎকট আয়োজনে এক লক্ষ ঢাক,তিনলক্ষ শাঁখ বাজানো হয়। তবু

তার রাজকীয় ঘুম ভাঙার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। শেষ পর্যন্ত মদ্যমাসেংর গন্ধে সে নিজেই উঠে বসে। এবং ঘুম ভেঙ্গেই তার রাক্ষুসে আহারের বর্ণনা। সাতায় কলসী মদ্যপানের পর-

হরিণ মহিষ বরা সাপটিয়া ধরে।
বারো তের শত পশু খায় একবারে।।

তারপর যুদ্ধযাত্রার সময়ে সে আরও খেতে চায়। সে খাওয়া কেমন? না-

মদ খেয়ে উঘাড়িল সাত শত হাঁড়ি।।
নহে সে সামান্য হাঁড়ি কি কব বাখান।
পঁচিশের বন্দ যেন ঘর একখান।।

তার যুদ্ধের ধরনও আলাদা-অস্ত্রের ধার সে ততো ধারে না।-

সহস্র সহস্র কপি সাপটিয়া ধরে।
পাতাল সমান মুখ তাহে লয়ে পোরো।

শেষ পর্যন্ত সুগ্রীব-'কর্ণ টানে দুহাতে কামড় ছিঁড়ে নাক'। তখন কুম্ভকর্ণের-

এত বল বিক্রম সকল হৈল মিছা।
সুগ্রীব বানরা বেটা করে গেল বোঁচা।।

কুম্ভকর্ণের এই দুগতি কৃত্তিবাসের শ্রোতারা নিশ্চয় পরম আনন্দে উপভোগ করত,ঠিক যেমন মন্থরা,শূর্পনখা কিংবা রাবণের দুর্দশায় তারা খুশী হত।

হাস্যরস সৃষ্টির আর একটি সহজ উপায় ঔদারিকতায় আতিশয্য। লঙ্কাকান্ডের শেষে অযোধ্যায় ফেরার পথে ভরদ্বাজের আশ্রমে বানররা চর্বচূষ্যলেহ্যপেয়ের বিপুল আয়োজন দেখে লোভ সামলাতে না পেরে 'যতো পায় ততো খায় নাহি অবসাদ।' এবং 'নড়িতে চড়িতে নারে পেট ফাটে।' শেষ পর্যন্ত 'ঊর্ধ্ব দৃষ্টে রহে সবে নাহি চায় হেঁটে। কোনরূপ চিত হয়ে শুইলেক খাটে।' কৃত্তিবাসের কালে বাঙালী জনসাধারণের রসবোধ অনেকটা শিশুর মতো ছিল। তাই আকন্ঠ ভোজনে কাতর বানরদের অবস্থা তারা শিশুর সারল্যে সানন্দে উপভোগ করত।

লঙ্কাকান্ডে আরও অনেক যুদ্ধ বর্ণনা আছে। কিন্তু তা বীর বা করুণরস না জাগিয়ে হাসির খোবাকই জোগায় কৃত্তিবাসের হাতে বানরদের বীরত্ব ও যুদ্ধরীতি সর্বত্র একটা মজার প্রহসনে পরিণত হয়েছে। কুম্ভকর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে তাদের পলায়ন-তৎপরতা দেখে যেমন হাসি পায়, ইন্দ্রজিতের নিকুম্ভিলা যজ্ঞগারে তাদের যুদ্ধক্ষেত্র-বর্হিভূত ক্রিয়াকান্ড দেখে তেমনি কৌতুক জাগে। রামায়ণের শ্রোতারা কোনো গভীর রসাবেগে আলোড়িত হওয়ার চেয়ে হাসি-কৌতুকের টুকরো টুকরো বর্ণনা শুনতেই বেশী আগ্রহ দেখাতেন।তাই রামায়ণ মূলতঃ করুণরসাত্মক হলেও তার আনুষাঙ্গিক হিসাবে কৌতুকরস শ্রোতদের মনোরঞ্জন করেছে-এবং বলা বাহুল্য কৃত্তিবাস হাস্যরস পরিবেশনে যোলো আনা সফল হয়েছিলেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে বাঙালীয়ানার প্রতিফলন

কৃত্তিবাসী রামায়ণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ একসময়ে বলেছিলেন-

> এই বাংলা মহাকাব্যে কবি বাল্মীকির সময়ের সামাজিক আদর্শ রক্ষিত হয় নাই। ইহার মধ্যে প্রাচীন বাঙালী সমাজই আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে।

বাংলা রামায়ণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য যে কতদূর সত্য এবার তার পরিচয় নেওয়া যাক।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের,তার মানসপ্রবণতা ও জীবনাদর্শের যে অনিবার্য ছায়াপাত ঘটেছে চরিত্রচিত্রণ ও রসবিচার প্রসঙ্গে আমরা তার উল্লেখ করেছি। সামাজিক

টিপ্পনী

আচার আচরণের বর্ণনাতেও আমরা দেখি ফুলিয়ার কবি কৃত্তিবাস নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন। তাই বাঙালীর রুচি পছন্দের মুখ চেয়ে বাঙালী কবি বিবাহ বর্ণনার সুযোগ পেলে ছাড়েন না আর বিয়ের অনুষ্ঠানের যাবতীয় খুঁটিনাটি যথেষ্ট দক্ষতা ও উৎসাহের সঙ্গে ফুটিয়ে তোলেন। সেইজন্যে তিনি দশরথের বিয়ের বর্ণনা দেন,যা বাল্মীক রামায়ণে নেই। এমনকি বাসিবিয়ে, কালরাত্রি, আড়িপাতা ইত্যাদি বিয়ের কোনো পর্বই তিনি বাদ দেন নি। আবার রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্নের জন্ম হলে নবজাতকের জাতকর্ম ইত্যাদি বর্ণনায় বাঙালী হিন্দুর আচরণীয় সব সংস্কারকেই অনুসরণ করেছেন। যেমন শিশুর জন্মের পর পাঁচদিনে 'পাচুটি', ছদিনে 'ষষ্ঠীপূজো',আটদিনে 'অষ্টকলাই',তোরো দিনে 'জননাশৌচান্ত',ছ'মাসে 'অন্নপ্রাশন' ইত্যাদি। রাম-সীতার বিয়ে উপলক্ষ্যেও কৃত্তিবাস অধিবাস,স্ত্রী-আচার,যৌতুকদান,বাসরঘরের রঙ্গরসিকতা,বধূবরণ ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলির নিখুঁত বিবরণ দিয়ে বাঙালীর সামাজিক আচার-আচরণকে যেন প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন।

টিপ্পনী

কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনেক জায়গাতেই পশ্চিমবঙ্গের দৃশ্য ও দৈনন্দিন জীবনের ছবি ফুটেছে। গঙ্গা-অবতরণের বর্ণনায় কৃত্তিবাস গঙ্গাতীরের যে সব তীর্থের নাম করেছেন,য়েমন-মেড়াতলা, নদীয়া,নবদ্বীপ,সপ্তগ্রাম,আক্‌নামহেশ প্রভৃতি ,সেগুলি সবই পশ্চিমবঙ্গের প্রসিদ্ধ গ্রাম। লঙ্কাকান্ডে দেখি রাবণ রাক্ষসদের ' বাটাভরি গুয়া' দেবার প্রলোভন দেখান আর হনুমান লঙ্কাদাহনের জন্য প্রথমেই 'বাঘ ঘরের চালে'র ওপর লাফ দিয়ে পড়েন। কোনো কোনো সমালোচক যে বলেছেন কৃত্তিবাসের হাতে স্বর্ণলঙ্কা যেন ফুলিয়া গ্রামে পরিণত হয়েছে একথার সত্যতা অস্বীকার করা যায় না তাই রামের খোঁজে ভরত গুহকের কাছে এলে গুহক তাঁকে দই-দুধ, নারকেল-সুপারি, কলা-আম-কাঁঠাল দিয়ে আপ্যায়ন করেন। তার সঙ্গে রুই ও চিতল মাছও দিতে ভোলেন না। আর ঋষি ভরদ্বাজ তাঁকে আশ্রমে ভরতের সৈন্যদের যা দিয়ে অতিথি সৎকার করেছেন তা হল।-

চন্দ্রাবতী বড়া পীঠে মুগের সাম্‌লী।
সুধাময় দুগ্ধে ফেলে নারিকেল পলি।।.........ইত্যাদি।

আবার অযোধ্যায় ফেরার পথে রামের বানর বাহিনীকে ভরদ্বাজ 'ক্ষীর লাড়ু পাঁপড় মোদক রাশি রাশি' দিয়ে পরিতুষ্ট করেছেন। বলা বাহুল্য এ সবই বাঙালীর রসনালোভন ভোজ্য। কৃত্তিবাসের সীমিত কল্পনা এইসব খাদ্যতালিকায় মতিচুর,মোন্ডা, রসকরা, সরুচাকলি, গুড়পিঠে, চিতুইপুলি, কলাবড়া,তালের বড়া, ছানাবড়া,খাজা,গজা,পায়েস ইত্যাদি বাঙালীর প্রিয় মিষ্টান্নগুলিকে স্থান দিয়েছে। শুধু পরিবেশনের পাত্রগুলিকে স্বর্ণময় করে তুলে ভরদ্বাজের তপোবলের দিব্য প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। উত্তরাকান্ডে সীতাদেবী চোদ্দ বছরের উপবাসী লক্ষ্মণকে স্বহস্তে রান্না করে যা খেতে দিয়ে ছিলেন তার বর্ণনাটি উল্লেখযোগ্য।-

প্রথমেতে শাক দিয়া ভোজন আরম্ভ।
তাহার পরে সূপ আদি দিলেন সানন্দ।।
ভাজা ঝোল আদি করি পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
ক্রমে ক্রমে সবাকার কৈল বিতরণ।।
শেষে অম্বলান্ত হলে ব্যঞ্জনে সমাপ্ত।
দধি পরে পরমান্ন পিষ্টকাদি যত।।

এইসব ভোজ্য অযোধ্যার বা মিথিলার নয়। এ নিতান্তই সাধারণ বাঙালীব পাকশালায় প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন। এর মধ্যে রাজকীয় আড়ম্বরের ছিঠে ফোঁটাও নেই। অযোধ্যার রাজবধূ সীতাও আচারে ব্যবহারে খাঁটি বাঙালী কুলবধূ. মুনিপত্নীরা সীতার কাছে রামের পরিচয় জানতে চাইলে-

লাজে অধোমুখী সীতা, না বলেন আর।
ইঙ্গিতে বুঝান স্বামী ইনি যে আমার।।

এখানে গুরুজনের সামনে সীতার লজ্জানম্র বধূমূর্তি সেকালের বাঙালী ঘরের কুললললনার চমৎকার

প্রতিচ্ছবি। উত্তরাকাণ্ডে 'গৃধিনী ও পেচকের দ্বন্দ্ব' আখ্যানে যে পাখ্‌পাখালির বর্ণনা দেখি তারাও বাংলার ঘরের আনাচে কানাচে উড়ে বেড়ানো অতি পরিচিত পাখি। সে তালিকায় কাক-কোকিল-বক-সারস,চিল-শকুন,পায়রা-বাবুই থেকে শুরু করে শুকসারী-কাকাতুয়া, মাছরাঙা-পেঁচা,কাঠঠোকরা,কাদাখোঁচা কেউই বাদ পড়েনি।

আঙ্গিকের দিক থেকেও দেখি বাল্মীকির সরল অনুষ্টুভ ছন্দ এখানে বাংলা রামায়ণে পয়ার-লাচাড়ীতে এসে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া রায়রাব অংশের শ্বাসঘাত প্রধান ছন্দ কিছু বৈচিত্র্য সঞ্চার করেছে।এদিক থেকে তিনি ভরতচন্দ্রের পূর্বসুরী। অলংকার প্রয়োগেও কৃত্তিবাসের অভিনবত্ব চোখে পড়ার মতো। সংস্কৃত অলংকার প্রয়োগের বাঁধা পথেই তিনি আবদ্ধ হয়ে থাকেননি। তাঁর উপমানের উপকরণ তিনি বাংলাদেশের দৈনন্দিন জীবন থেকে আহরণ করেছিলেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। রাবণ সীতাকে হরণ করতে উদ্যত হলে 'জানকী কাঁপেন যেন কলার বাগুড়ী'। আর একটি উৎপ্রেক্ষা 'কুমারের চাক যেন ঘুরাইয়া ফেলে'। এছাড়া-

দশ শখ মেলিয়া রাবণ রাজা হাসে।
কেতকী কুসুম যেন ফুটে ভাদ্রমাসে।।

কিংবা-

কুম্ভকর্ণ স্কন্ধে চড়ি বীরগণ নাচে।
বাদুড় দুলিছে যেন তেঁতুলের গাছে।।

এইসব উপমান গ্রাম বাংলার চির-চেনা ছবি আর বাঙালীর দৈনন্দিন জীবন থেকে নেওয়া বলেই এই জাতীয় অলংকার কৃত্রিম গতানুগতিকতার পথ ছেড়ে কবির প্রকাশভঙ্গিতে একটা মাত্রা এনে দিয়ে বাঙালীর প্রাণের জিনিস হয়ে উঠেছে।

বাঙালীর পারিবারিক পরিহাসেরও একটি সুন্দর ছবি উত্তরাকাণ্ডে পাওয়া যায়। রামের আজ্ঞায় সীতাকে নির্বাসন নিয়ে যেতে এলে সীতা সরল মনে ভ্রাতৃজায়াসুলভ রসিকতা করেছেন।-'লক্ষ্মণে দেখিয়া পরিহাস করে সীতে'-

আইস দেবর আজি বড় শুভদিন।
এবে হে দেবর তুমি হয়েছ প্রবীণ।।
চৌদ্দ বৎসর একত্রে বঞ্চিলাম বনে।
রাজশ্রী পাইয়া তুমি পাসরিলে মনে।।
কহিয়াছি কত মন্দ কথা অবিনয়।
সে কারণে দেবর হে হয়েছ নির্দয়।।
বৈসহ বৈসহ লক্ষ্মণ সীতাদেবী বলে।
বার্তা কহ দেবর হে আছত কুশলে।।
তোমা না দেখিয়া মম সদা পোড়ে মন
উত্তর না দেহ কেন বিরস বদন।।

এই পরিহাস বাঙালী পরিবারের বৌদি-দেবরের রঙ্গ কৌতুক। আগেই দেখেছি 'অঙ্গদ রায়বারে'র (দ্রষ্টব্য ঃ রসবিচার ,হাস্যরস) 'আধা তর্জা' জাতীয় স্থূল হাস্যপরিহাস ও ব্যঙ্গবিদ্রূপ বাঙালীর মধ্যযুগীয় জীবন ও সমাজ পরিবেশকে কিভাবে ফুটিয়ে তুলেছিল। আসলে রাষ্ট্রবিপ্লবের সংঘাত, তুখতা-তাতার-পাঠান-মোগলের শাসনাধীন হওয়ার কোনো যন্ত্রণা যে বাংলার নিস্তরঙ্গ জনজীবনে কোনরকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি বা তার জীবনকে নীতিভ্রষ্ট করে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি তার কারণ কৃত্তিবাসী রামায়ণের মধ্যে থেকেই সে যুগের সাধারণ মানুষ তার জীবনের ছোটো বড়ো সবরকম আদর্শ খুঁজে পেয়েছিল। রাম-লক্ষ্মণের মধ্যেকার আদর্শ ভ্রাতৃত্বের বন্ধন,সতীত্ব ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি সীতার বধূজীবন,রাম-সুগ্রীব-বিভীষণের অকপট বন্ধুত্ব,হনুমানের দাস্যভক্তি-এ সবই বাল্মীকির অযোদ্যা বা লঙ্কাপুরী ছেড়ে বাঙালীর ঘরের জিনিস হয়ে উঠেছিল। এই কাব্যে রাম-লক্ষ্মণ সীতা শুধু নন,দেব-দানব-রাক্ষসেরা সুদ্ধু মধ্যযুগীয় গৃহস্থ বাঙালী চরিত্রে

পরিণত হয়েছেন।

বাল্মীকি আদি কবি এবং আদি কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য তার বাস্তবতা। আসলে মহাকাব্য তো সভ্যতার সেই কিশোর বয়সের সৃষ্টি,যখন সাহিত্য একটি সচেতন শিল্পকর্মরূপে মানুষের মনে প্রতিভাত হয় নি। তাই তখনকার কবির বাস্তবতা এমনই নগ্ন ও নির্ভীক, এমন নির্মম ও এত সম্পূর্ণ যে আধুনিক পাশ্চাত্য রিয়ালিজমও তার কাছে লজ্জা পায়। তাই রামের বনবাসের খবর পেয়ে বাল্মীকির লক্ষ্মণ নিতান্ত গোঁয়ারেব মতো বলে উঠতে পারেন যে ওই কৈকেয়ীভজা বুড়ো বাপকে তিনি বধ করবেন। বনবাসের উদ্যোগের সময় ভরতের প্রতি সন্দিহান হয়ে রাম ভরতের সামনে তাঁর প্রশংসা করতে নিষেধ করে সীতাকে বলেছেন যে ঋদ্ধিশালী পুরুষ (অর্থাৎ এখানে ভরত) অন্যের প্রশংসা সইতে পারে না। আর লঙ্কাকান্ডে যুদ্ধবিজয়ী রাম যখন সীতাকে প্রত্যাখ্যান করলেন,তখন সীতা তাঁকে 'প্রাকৃতজন' অর্থাৎ নীচ ছোটলোক বলেছেন। কিন্তু বাঙালী কবি বাংলার জনগণের সামনে ভ্রাতৃত্বে,পুত্রত্ব ও সতীত্ব আদর্শের গৌরব রক্ষার খাতিরে এগুলি বর্জন করেছেন। সুতরাং কৃত্তিবাস শুদু যে সমসাময়িক দেশকালের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন তা নয়, সাধারণের সামনে চারিত্রিক আদর্শকে তুলে ধরে তার দ্বারা বাঙালীর জীবনকে নিয়ন্ত্রণও করেছেন। তাই নির্বিকার বাল্মীকি যখন ইন্দ্রিয়ভোগের জন্য অহল্যার ইন্দ্রকে স্বেচ্ছায় বরণের কথা বলেন তখন কৃত্তিবাস ইন্দ্রের ওপর প্রবঞ্চনার দোষ চাপিয়ে অহল্যার সতীত্বকে নিষ্কলঙ্ক করে দেখান। তেমনি সীতাহরণের সময় রাবণ সীতার দেহসৌন্দর্যের বর্ণনায় কুণ্ঠাহীন। কিন্তু কৃত্তিবাসের নীতিবোধের কাছে সেটি বর্জনীয় বলে মনে হয়েছে। আবার সীতার সঙ্গে রাবণের দূরত্ব ও সীতার বিশুদ্ধি বজায় রাখার জন্যে কৃত্তিবাস লক্ষ্মণের গন্ডি দেবার ব্যাপারটি কল্পনা করেছেন যেটি বাল্মীকিতে নেই। এইভাবেই বাঙালী কৃত্তিবাস বাঙলী জীবনাদর্শের উপযোগী করে আর্য রামায়ণের চরিত্রগুলিকে শোধন করে নিয়েছেন। সেইজন্যে বনবাসী রাম-লক্ষ্মণেরা বাল্মীকি রামায়ণে স্বাভাবিক কারণেই মাংসভোজী ও মদ্যপায়ী হলেও কৃত্তিবাসী রামায়ণে তারা ফলমূলাহারী হয়ে সাত্ত্বিক জীবনযাপন করে। আবাব বাল্মীকির রাম নরশ্রেষ্ঠ হওে মানবিক দুর্বলতার অতিশায়ী যে নন তা বোঝা যায় সীতাহরণের পর বর্ষা ও শরৎ বর্ণনা প্রসঙ্গে আদি কবি যখন স্পষ্ট ভাষায় রামচন্দ্রের কামবিকার বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গটি বিষ্ণুর অবতার ভগবান রামচন্দ্রের পক্ষে অসঙ্গত, সুতরাং বর্জনীয় বলে কৃত্তিবাসের মনে হয়েছে।

অরণ্যকান্ডে রামকে-খুঁজতে-আসা সৈন্যদলকে ঋষি ভরদ্বাজ তাঁর তপোবনে দেবভোগ্য উপকরণে আপ্যায়িত করেছিলেন। বাল্মীকি তার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন-

এক একজন পুরুষকে সাত আটজন সুন্দরী স্ত্রী নদীতীরে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে অঙ্গ সংবাহন করে মদ্যপান করাতে লাগল। পানভোজনে এবং অপ্সরাদের সহবাসে পরিতৃপ্ত সৈন্যগণ রক্তচন্দনে চর্চিত হয়ে বললে,- আমরা অযোধ্যায় যাব না, দন্ডকারণ্যেও যাব না, ভরতের মঙ্গল হক, রাম সুখে থাকুক।

এদিকে কৃত্তিবাসের বর্ণনায় দেখি-

দেবকণ্যা অন্ন দেয় সৈন্যদল খায়।
কে পরিবেশন করে জানিতে না পায়।।
ঘৃত দধি দুগ্ধ মধু মধুর পায়স।
নানাবিধ মিষ্টান্ন খাইল নানারস।।
চর্ব চোষ্য লেহ্য পেয় সুগন্ধি সুস্বাদ।
যত পায় তত খায় নাহি অবসাদ।।
মধুকর মধুকরী ঝঙ্কারে কাননে.।
অপ্সরারা নৃত্য করে গীত আলাপনে।।
সবে বলে দেশে যাই হেন সাধ নাই।
অনায়াসে স্বর্গ মোরা পাইনু হেতাই।।

এখানে দেখা যাচ্ছে অন্যসব প্রসহেগর মতো ইন্দ্রিয়সুখের প্রসঙ্গেও বাল্মীকির কল্পনা অকুণ্ঠ।

টিপ্পনী

কিন্তু নীতিবাগীশ কৃত্তিবাসের মনে সঙ্কোচ আছে বলেই ভরদ্বাজের আতিথ্যে 'তিনি শুধু দেখেছেন ঔদারিকতার আকণ্ঠ উদারতা'। কৃত্তিবাসের সৈন্য সামন্তরা শাক-ভাত খেয়ে মানুষ,হঠাৎ বড়ো দরের নেমতন্ন পেয়ে এত খেয়ে ফেলেছে যে আর নড়তে পারছে না। বাল্মীকির ভোজ্যতালিকা রাজকীয়, কিন্তু মদ্যমাংস বাদ দিতে গিয়ে কৃত্তিবাস সুবৃহৎ ফলারের বেশী কিছু জোটাতে পারেননি। তাই বুদ্ধদেব বসু মন্তব্য করেছেন-

কৃত্তিবাস যে সভ্যতার প্রতিভূ তার অশন বসন রীতিনীতি সবই অনেকটা নিতুস্তরের, আর বাল্মীকি যদিও তপোবনবাসী বলে কথিত, তবু তিনি রাজধানীরই মুখপাত্র,শ্রেষ্ঠ অর্থে নাগরিক, তুলনায় কৃত্তিবাসকে মনে হয় রাজার দ্বারা বৃত হয়েও প্রাদেশিক, কেননা তাঁর রাজা নিজেই তাই।......বাল্মীকির পাশে কৃত্তিবাস বাঙালী মাত্র, শুধু বাঙালী।

টিপ্পনী

-প্রবন্ধ সংকলন; রামায়ণ ১৯৪৭

তাই কৃত্তিবাস বাল্মীকির বাংলা অনুবাদক নন,তিনি রামায়ণেব বাংলা রূপকার। এবং গ্রন্থটির প্রাকৃতিক এবং মানসিক আবহাওয়া একান্তই বাংলার।

প্রশ্নাবলী

১। বাল্মীকির রামায়ণ-কাহিনী কৃত্তিবাসী রামায়ণের মূল উৎস হলেও একমাত্র উৎস ছিল না।

২। আর্য রামায়ণের অনুবাদ করতে গিয়ে কৃত্তিবাস কিভাবে তাঁর রামায়ণকে বাঙালীর জীবনকাব্যে পরিণত করেছেন তার পরিচয় দাও।

৩। 'কৃত্তিবাসের লেখনীতে বাল্মীকি রামায়ণের চরিত্রগুলি বাঙালীয়ানায় মন্ডিত হয়েছে। -কয়েকটি প্রধান চরিত্র অবলম্বনে এ মন্তব্যের সমীচীনতা বিচার কর ।

৪। আখ্যানকাব্য হিসাবে কৃত্তিবাসী রামায়ণের সাহিত্যমূল্য নিরূপণ কর।

৫। 'কৃত্তিবাসী রামায়ণে অনেক করুণ ঘটনার বিবরণ আছে,কিন্তু যথার্থ করুণরস সর্বত্র সৃষ্ট হয়নি'-বিচার কর।

৬। 'বীররস নয়,হাস্যরস সৃষ্টিতেই কৃত্তিবাসের সার্থকতা'।-আলোচনা কর।

৭। কৃত্তিবাসের লঙ্কাকান্ডে প্রত্যাশিত বীররস কিভাবে ভক্তিরসের প্লাবনে ভেসে গেছে তা আলোচনা কর।

৮। বাল্মীকি রামায়ণের বালকান্ডের সঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকান্ডের তুলনা করে কৃত্তিবাসের মৌলিকতার পরিচয় দাও।

৯। বাল্মীকি রামায়ণের যুদ্ধকান্ডের সঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণের লঙ্কাকান্ডের তুলনা কৃত্তিবাসের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ কর।

১০। কৃত্তিবাসী রামায়ণের 'আত্মবিবরণী' ও 'অঙ্গদের রায়বার' অংশ প্রক্ষিপ্ত কি না বিচার কর।

সহায়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ

১। বাল্মীকি রামায়ণ (সারানুবাদ)-রাজশেখর বসু,এম.সি.সরকার এ্যান্ড সন্স,১৩৯১ (৯ম মুদ্রণ)

২। কৃত্তিবাসী রামায়ণ -হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত,সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৩

৩। প্রাচীন সাহিত্য-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪। রামায়ণী কথা-দীনেশচন্দ্র সেন,জিজ্ঞাসা, ১৩৭৮ পৌষ

৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (প্রথম খন্ড)-অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,মর্ডার্ন বুক এজেন্সী ১৯৬৩

৬। রামায়ণ ও ভারতসংস্কৃতি-প্রবোধচন্দ্র সেন,জিজ্ঞাসা,১৯৬২ এপ্রিল

৭। 'বিবিধ প্রবন্ধ',উত্তরচরিত-বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৮। প্রবন্ধ সংকলন ঃ রামায়ণ-বুদ্ধদেব বসু,দে'জ পাবলিশিং ১৯৯১ জানুয়ারী

৯। 'রবীন্দ্রনাথ ঃ সৃষ্টির উজ্জ্বল স্রোতে',রামায়ণ ও রবীন্দ্রপন্থা-উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, আনন্দ পাবলিশার্স ১৪০০ বৈশাখ

১০। 'রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস',রামায়ণ-পম্পা মজুমদার

১১। জনজীবনে রামায়ণ-'আশুতোষ ভট্টাচার্য্য,রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা ঃ দ্বিতীয় বর্ষ ১৯৮১

১২। বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস-অজিত কুমার ঘোষ, ঐ

১৩। রবীন্দ্রভাবনায় রামায়ণ- পম্পা মজুমদার,বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়) ১৯শে সংখ্যা,২০০২ ফেরুয়ারী

১৪। 'কাহিনী',ভাষা ও ছন্দ- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

টিপ্পনী

অনুশীলনী

বড়ো প্রশ্ন

১। চন্ডীদাস সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন মত পর্যালোচনা করে নিজের মত তুলে ধরুন।

২। মিথিলার কবি বিদ্যাপতির আলোচনা ব্যতীত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য অসম্পূর্ণ-মন্তব্যটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।

৩। বিদ্যাপতিকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অন্তভূক্ত করার যৌক্তিকতা বিচার করুন।

৪। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত বাংলা অনুবাদ গ্রন্থগুলির পরিচয় দিন।

৫। কৃত্তিবাসের রামায়ণ অনুবাদে সমকালীন বাংলাদেশ,দৈনন্দিন জীবন এবং বাঙালী মানসের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা আলোচনা করুন।

৬। পদকর্তা চন্ডীদাসের কবিপ্রতিভার পরিচয় দিন।

ছোটো প্রশ্ন

১। কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয় সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২। কৃত্তিবাসের অনুবাদের মূলানুগত্য ও মৌলিকতার পরিচয় দিন।

৩। কৃত্তিবাসের আর্বিভাবকাল সম্বন্ধে তোমার অভিমত ব্যক্ত করুন।

৪। মালাধর বসুর ভাগবত অনুবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন ।

টিপ্পনী

গ্রন্থ পরিচিতি

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খন্ড – সুকুমার সেন, আনন্দ সংস্করণ জানুয়ারী। ১৯৯১

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খন্ড –অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মর্ডান বুক এজেন্সী, কলকাতা

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খন্ড –অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মর্ডান বুক এজেন্সী, তৃতীয় সংস্করণ

৪। বাংলা সাহিত্যের কথা– প্রথম মাওলা বাদার্স সংস্করণ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

৫। বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস – চতুর্থ সংস্করণ, ভূদেব চৌধুরী

৬। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা – প্রথম পর্যায়, পঞ্চম সংস্করণ, ভূদেব চৌধুরী

৭। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা – প্রথম খন্ড, গোপাল হালদার

৮। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস – ক্ষেত্র গুপ্ত, প্রথম সংস্করণ, গ্রন্থনিলয়।

৯। বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, আহমদ শরীফ, বর্ণ মিছিল, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৭৮

১০। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খন্ড, সুকুমার সেন, আনন্দ, ষষ্ঠ সংস্করণ, অষ্টম মুদ্রণ, ২০০৭

১১। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস – ক্ষেত্রগুপ্ত গ্রন্থনিলয়, ত্রয়োদশ সংস্করণ, জুলাই – ২০০৯

১২। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ পরিচয়, ড. দিলীপকুমার মিত্র, দিশারি প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৩

১৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, আদি ও মধ্যযুগ, ড. দেবেশকুমার আচার্য্য, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, জুন, ২০১৩

১৪। বৈষ্ণব পদাবলীর নবমূল্যায়ন, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, পুস্তক বিপণি, মার্চ, ২০১০

১৫। উচ্চমাধ্যমিক বাংলা ভাষা প্রকাশ, অমিতাভ দাস, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, মার্চ, ২০১২

টিপ্পনী

সাহিত্যের ইতিহাস ঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগ

পঞ্চদশ শতক ঃ লোকজীবনস্পর্শী সাহিত্য

৪.০০ - উদ্দেশ্য

৪.০১ - কাব্য পরিচয়

৪.০২ - অন্যান্য লোকয়ত সাহিত্য

৪.০৩ - মঙ্গলকাব্যের স্বরূপ

৪.০৪ - অনুশীলনী

৪.০৫ - গ্রন্থপঞ্জি

টিপ্পনী

উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল লোকজীবনস্পর্শী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় করানো। পৌরাণিক পাঁচালির পাশাপাশি পঞ্চদশ শতকে অপৌরাণিক উৎসজাত দেবী মনসার কাহিনী অবলম্বনে পাঁচালী রচিত হয়েছে। যদিও মনসাদেবীকে পৌরাণিক দেবীতে রূপান্তরিত করা হয়েছে তবু মনে রাখতে হবে এই দেবীর পূজা প্রচার অন্ত্যজ সমাজ থেকে ক্রমান্বয়ে স্ত্রী সমাজে (অভিজাত) এবং উচ্চবর্ণের পুরুষ সমাজে প্রবিষ্ট হয়েছে। এর কাহিনী লোকজীবনস্পর্শী। লোকজীবনের আশা,আকাঙ্খা,আদর্শ,আনন্দ,হতাশা,তিতিক্ষা,ভ্রষ্টাচার,বেদনা সবকিছুই আছে এর কাহিনীতে। পৌরাণিক পাঁচালি দুটিতে (শ্রীরামপাঁচালী ও শ্রীকৃষ্ণবিজয়) বাঙালী জীবনের কথা থাকলেও তাতে ভক্তির আদর্শ বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু মনসাকে নিয়ে পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে পাঁচালী রচিত হয়েছে তাতে লোক জীবনাদর্শই বড় হয়ে উঠেছে। তুর্কি আক্রমণোত্তর বাংলা দেশের মানুষ এই রকম এক ক্রুর দেবীর ক্রীড়ানক মানুষের ব্যর্থ আকাঙ্খাকে তুলে ধরেছে। মনসামঙ্গলের বিভিন্ন অঞ্চলের কবিদের রচনার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় ঘটিয়ে যুগমানস সম্বন্ধে অবহিত করাও এই এককের অন্যতম উদ্দেশ্য।

কাব্য পরিচয়

সূচনাপর্বের মঙ্গলকাব্যের আলোচনায় আমরা মনসামঙ্গলের কথাই বলব কেননা ষোড়শ শতকের পূর্বে রচিত চন্ডীমঙ্গলের কোন পুথির সংবাদ পাওয়া যায় নি। মুকুন্দের পূর্ববর্তী কবি হিসাবে মাণিক দত্তের কথা জানা যায় বটে কিন্তু তার আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। মুকুন্দ চক্রবর্তী এবং দ্বিজমাধবের চন্ডীমঙ্গলের রচনাকাল ষোড়শ শতকের শেষভাগ। তাঁদের রচনায় আগে ষোড়শ শতকের যে কোন সময়েব মধ্যে মাণিক দত্তের চন্ডীমঙ্গলের রচনা সম্ভব বলে অনুমান করা যেতে পারে। মাণিক দত্তের পুঁথির ভাষায় অর্বাচীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। একে কিছুতেই পঞ্চদশ শতকের রচনা বলে চালানো যায় না। তাই চন্ডীর কথা বাদ দেওয়া হল।

এবার মনসার কথা। মনসা নাম ঋগ্বেদে আছে। বৌদ্ধগ্রন্থ 'বিনয়বস্তু'তে এবং 'সাধনমালা'য় সর্পের দেবী সম্বন্ধে অনেক উপাখ্যান আছে। তান্ত্রিক বৌদ্ধগ্রন্থাদিতে জাঙ্গুলী দেবীর বর্ণনা আছে। 'সাধনমালা'য় আছে জাঙ্গুলীতারা দেবীর বিস্তৃত পরিচয়। সর্পের চিকিৎসককে বলা হয় জাঙ্গুলিক। বিপ্রদাস পিপিলাই-এর 'মনসাবিজয়'এ 'জাগুলী' নাম পাওয়া যাচ্ছে। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর সংস্কৃত পুরাণগুলিতে মনসাদেবীর কথা আছে। একাদশ শতাব্দীর মূর্তিও পাওয়া গেছে। এসব থেকে অনুমান করা যেতে পারে একাদশ শতাব্দীর দিকে বাংলা দেশে সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর

পূজা শিল্পে ও অর্বাচীন সংস্কৃত পুরাণে স্বীকৃতি লাভ করে এবং চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সময়ে বাংলার শিক্ষিত সমাজেও বিষহরির পূজা খুবই জনপ্রিয় হয় (দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন'-চৈতন্যভাগবত) পঞ্চদশ শতকে মনসাপূজা যে জনপ্রিয় হয়েছিল তাতে সন্দেহের কোনো কারণ নেই। আর মনসামঙ্গলের কয়েকজন কবিরও আবির্ভাব ঘটেছিল পঞ্চদশ শতকে যাঁরা ঐ শতকেই মনসামঙ্গল রচনা করেছিল। মনসামঙ্গলের কাহিনীর মধ্যে মানবীয় রসের প্রাধান্য আছে। এর কাহিনীতে ব্রতকথা,ব্যালাড ও মহাকাব্যের মিশ্রণ ঘটেছে। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে -''ব্রকথার সরল ঋজু কাহিনী,ব্যালাডের শিথিল ঘটনাবিন্যাস ও মহাকাব্যের বিশালতা এই কাব্যের কাহিনীকে একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়াছে এবং সেইজন্যই শুধু বাংলা দেশে নহে,বিহার হইতে আসাম পর্যন্ত -সমস্ত অঞ্চলেই মনসা-চাঁদো-লখীন্দর-বেহুলার কাহিনী প্রচলিতআছে।'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,২য় খন্ড)

টিপ্পনী

আশুতোষ ভট্টচার্য মনে করেন যে মনসামঙ্গলের কাহিনীর উৎপত্তি পশ্চিমবঙ্গে অথবা বিহার অঞ্চলে। চাঁদের বাণিজ্যপথের বর্ণনায় মোটামুটি পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চলবিশেষের প্রভাব আছে। বিহারেও বেহুলার ব্রতকথা, গল্পকাহিনী ও মনসাপূজার বিশেষ প্রচলন আছে। এক সময়ে মনে করা হত মিথিলার কবি বিদ্যাপতি 'ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিনী' নামে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন যাতে বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনি আছে। পরে প্রমাণ হয়েছে ঐ বিদ্যাপতি মিথিলার বিদ্যাপতি নন,পূর্ববঙ্গের কোনো কবি।

বাংলা দেশের নানা অঞ্চলে বহু মনসামঙ্গলকাব্য পাওয়া গেছে,সেগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের কাব্যগুলি 'মনসামঙ্গল' এবং পূর্ববঙ্গের কাব্যগুলির প্রায় সবই 'পদ্মাপুরাণ' নামে পরিচিত। অঞ্চলভেদে মনসামঙ্গল কাব্যের চারটি রূপ-(১) রাঢ়ের মনসামঙ্গল (২) পূর্ববঙ্গের পদ্মাপুরাণ (৩) উত্তরবঙ্গের ও কামতা-কামরূপের মনসামঙ্গল কাব্য এবং (৪) বিহারি মনসামঙ্গল। এই চার অঞ্চলের মনসামঙ্গলের কাহিনিতে নানা বৈচিত্র্য ও পার্থক্য সত্ত্বেও,ঘটনা,আদর্শ ও চরিত্রের দিক দিয়ে মোটামুটি সাদৃশ্য আছে.।

মনসামঙ্গলে চাঁদের বিদ্রোহ ও বেহুলার সতীত্ব-কাহিনি বাংলাদেশে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কাহিনির প্রথম অংশ দেবখন্ড। এই খন্ডে মনসার জন্ম থেকে মর্ত্যলোকে পূজা প্রচারের জন্য অবতরণ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। এই অংশের আখ্যানে কিছুটা লোকসাহিত্যের প্রভাব আছে। পুরাণ ও মহাকাব্যের প্রভাব আছে এর কিয়দংশে।

নরখন্ডে আছে রাখালদের পূজা,হাসান-হুসেনের বিরোধিতা ও বিরোধিতার অবসান,চাঁদের মনসাবিরোধ,লখিন্দরের মৃত্যু, বেহুলার মৃতপতির সঙ্গে কলার ভেলায় যাত্রা-স্বর্গে উপস্থিতি-লখিন্দরকে এবং চাঁদের অন্যান্য পুত্রদের বাঁচিয়ে তোলা,স্বদেশে প্রত্যাবর্তন এবং চাঁদ কর্তৃক মনসাপূজা।

পঞ্চদশ শতকের মনসামঙ্গলের উল্লেখযোগ্য কবিরা হলেন বিজয়গুপ্ত,নারায়ণদেব এবং বিপ্রদাস পিপিলাই। এই কাব্যের আদি কবির নাম কানা হরিদত্ত। চতুর্দশ শতাব্দীর আগে মনসামঙ্গলের কাহিনী নারী সমাজে ব্রতকথা ও ছড়ার আকারে প্রচলিত ছিল। পঞ্চদশ শতকে তা আখ্যান কাব্যে রূপ লাভ করে। পূর্ববঙ্গের কানা হরিদত্তের নাম উল্লিখিত হয়েছে বিজয়গুপ্তের রচনায়। 'স্বপ্নাধ্যায়' পালায় বিজয় গুপ্ত লিখেছেন-

মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত।।
হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত পাইল কালে।
ঘোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে।। ইত্যাদি।

বিজয় গুপ্ত উল্লেখ করেছেন উক্ত কবির ত্রুটির দিকগুলি। কানা হরিদত্তের ভণিতাযুক্ত 'পদ্মার সর্পসজ্জা' শীর্ষক একটি কবিতা ছাড়া সব কিছুই লুপ্ত হয়ে গেছে। 'পদ্মার সর্পসজ্জার' ভাষা অবশ্য খুব পুরানো নয়। মনে করা হয়ে থাকে হরিদত্তের সময় থেকেই মনসামঙ্গল কাহিনি

কাব্যের রূপলাভ করে। কিন্তু হরিদত্ত কোন শতকে আবির্ভূত হয়েছিলেন তা জানার উপায় নেই।

মনসামঙ্গল কাব্যের জনপ্রিয় কবি বিজয় গুপ্ত। তাঁর কাব্যের নাম 'পদ্মাপুরাণ'। বরিশাল জেলার গৈলা গ্রামে কবির জন্ম। বাবার নাম সনাতন,মায়ের নাম রুক্মিনী। বৈদ্য পরিবারে কবির জন্ম। ১৪৯৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁর কাব্য রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়।

তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন–"বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি মূল্যবান উপাদান হইয়া রহিয়াছে। এমনকি তাঁর পরিকল্পিত দেবচরিত্রগুলিও তৎকালীন সমাজের এক একটি জীবন্ত মানবচরিত্র রূপেই অঙ্কিত হইয়াছে। দেবত্বের লেসমাত্র নাই। বাংলার ধূলিমলিন গৃহাঙ্গিনায় তাঁহার কাহিনীর পরিবেশটি রচনা করা হইয়াছে।"

দীনেশচন্দ্র সেন বিজয় গুপ্তের কাব্যে পল্লীপ্রাণের সাড়া পেয়েছেন।

বিজয় গুপ্তের সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে চাঁদ,বেহুলা ও মনসা উল্লেখযোগ্য। করুণ ও হাস্য উভয় রসসৃষ্টিতে কবি পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। কবি সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর পন্ডিত ছিলেন। অভিজ্ঞতা,সমাজচেতনা ও পান্ডিত্যের গুণে;শব্দ প্রয়োগ,ছন্দ ও অলঙ্কার সৃষ্টিতে তাঁর নৈপুণ্যের কারণে এবং সহজ কবিত্বের ফলে তাঁর কাব্যের কাহিনি জমজমাট হয়ে উঠেছে। বিজয় গুপ্ত মনসামঙ্গল কাব্যের একজন বড় কবি।

নারায়ণদেব মনসামঙ্গল কাব্যধারার একজন বিশিষ্ট কবি। ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বোর গ্রামে কবির বাড়ি। পিতার নাম নরসিংহ, মাতা রুক্মিনী। কবিরা জাতিতে কায়স্থ। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে কবির আবির্ভাবকাল পঞ্চদশ শতক। নারায়ণ দেবের উপাধি ছিল সুকবিবল্লভ। নারায়ণ দেবের কাহিনীতে পৌরাণিক উপাদানের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। তুর্কি আক্রমণে বিপর্যস্ত বাঙালীদের মধ্যে লৌকিক ও পৌরাণিক সংস্কৃতি সমন্বয়ের চেষ্টা চলছিল সেই সময়। যুগচেতনার সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে নারায়ণ দেবের কাব্যে। কবি সংস্কৃতে পন্ডিত ছিলেন। কাব্যের পান্ডিত্যের সঙ্গে স্বাভাবিকতার সমন্বয় ঘটেছে। গ্রামবাংলার মানুষের জীবনের সার্থক রূপকার নারায়ণদেব। মধ্যযুগের বাংলার একটি সামগ্রিক সমাজচিত্র তাঁর কাব্যে ফুটে উঠেছে।

পৌরাণিক কাহিনীর বিস্তার তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য হলেও চরিত্রচিত্রণে কবি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। চাঁদের উগ্র ব্যক্তিত্ব,মনসার হিংস্র আদিমতা,বেহুলার কারুণ্য শিল্পগুণান্বিত হয়ে রূপলাভ করেছে। সনকা চরিত্রটিকে কবি চিরকালের শোকবিহ্বল পুত্রহারা জননী হিসাবে অঙ্কণ করেছেন। স্থানে স্থানে কৌতুকরস সৃষ্টির ক্ষেত্রে কবি মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। নারায়ণ দেব অবশ্যই একজন শক্তিশালী কবি ছিলেন।

সুকুমার সেন বিপ্রদাস পিপিলাইকে সবচেয়ে পুরানো কবি বলে মনে করেন। কবির কাব্যের নাম 'মনসাবিজয়'। কাব্য রচনা জ্ঞাপক শ্লোক থেকে জানা যায় কাব্যটি ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে হোসেন শাহের রাজত্বকালে রচিত। কবিরা বাৎস্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। পিতার নাম মুকুন্দ পন্ডিত। বাড়ি চব্বিশ পরগণা জেলার নাদুড়্যা বটগ্রাম। কাব্যের ভাষা অবশ্য আধুনিক। চাঁদের বাণিজ্যযাত্রা প্রসঙ্গে রিষড়া,কোন্নগর,কামারহাটি,এড়েদহ, চিৎপুর,কলিকাতা প্রভৃতি আধুনিক স্থান নাম উল্লেখ আছে। সুকুমার সেন এগুলিকে প্রক্ষিপ্ত মনে করেন। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যটিকে পঞ্চদশ শতাব্দীর বলে মানতে চান না।

মনসামঙ্গলের ধারাবাহিক সম্পূর্ণ উপাখ্যান পাওয়া যায় এই কাব্যে। বিপ্রদাসের বর্ণনা সহজ,সরল,চিত্তাকর্ষক এবং আতিশয্যবর্জিত। কাব্যের নারী চরিত্রগুলি অধিকতর উজ্জ্বল। পান্ডিত্যের দ্বারা কাব্য গুরুভাব হয়ে ওঠেনি। সংস্কৃত ও বাংলার নানা ধরনের ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে কাব্যটিকে। নানা রাগরাগিনীর উল্লেখ আছে কাব্যে। করুণ ও হাস্য উভয় রসের পরিবেশনে কবি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

টিপ্পনী

সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস',প্রথম খন্ডে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন বিপ্রদাস পিপিলাই ও তাঁর কাব্য বিষয়ে।

অন্যান্য লোকয়ত সাহিত্য

এখানে লোকায়ত সাহিত্য বলতে বোঝান হচ্ছে অনুন্নত স্তরের মানুষের জীবনধারা অবলম্বনে রচিত সাহিত্যকে। আদি বাংলার চর্যাপদকে লোকায়ত সাহিত্য বলা যায়। মধ্য বাংলার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকেও লোকায়ত সাহিত্য বলা যায়। সেই অর্থে মঙ্গলকাব্যও লোকায়ত সাহিত্য । পঞ্চদশ শতকের গোড়ায় মুহম্মদ সগীর কুরআন শরীফের একটি বৃত্তান্ত অবলম্বনে লিখেছিলেন-'য়ুসুফ যুলায়খা'। এটির মধ্যেও লোকায়ত সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য আছে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের কথা' গ্রন্থে মুহম্মদ সগীর ও তাঁর কাব্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

টিপ্পনী

মঙ্গলকাব্যের স্বরূপ

অভিজাত শ্রেণীর হিন্দুর শ্রেষ্ঠ পুরাণ-কাব্য বাংলা ভাষায় পঞ্চদশ শতকে যেমন অনূদিত হয়েছিল তেমনি সমাজের নীচের তলার মানুষদের পূজিত দেবতাব মাহাত্ম্য অবলম্বনে ঐ শতকে মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছিল।মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীরা (মনসা,চন্ডী,ধর্ম প্রভৃতি) হিন্দু অভিজাত সমাজে অপাংক্তেয় ছিলেন। পঞ্চদশ শতকে এইসব দেবতার ভক্তরা বড় বড় কাব্য রচনা করতে লাগলেন। তার কিছু আগে অর্বাচীন পুরাণে এই সব দেবতাদের সংস্কৃতে শ্লোক গাথা রচিত হয়েছিল। বাংলায় লেখা বড় বড় কাব্যগুলিকে মঙ্গলকাব্য নাম দেওয়া হয়েছে।

তুর্কী আক্রমণের পরে সমগ্র বাংলাদেশের সমাজে অমঙ্গলের আশংকা ব্যাপক হয়েছিল। আলোচ্য কাব্যগুলির কবি-গায়কেরা বললেন যে তাঁদের পূজিত দেবতার অরাধনা করলে,কিংবা তাঁর মহিমা-কাব্যপাঠ করলে,গান করলে এমনকি তার ঘরে রাখলে লোকের মঙ্গল হতে পারে। এইদিক থেকে কাব্যগুলির 'মঙ্গলকাব্য' নাম তাৎপর্যপূর্ণ ।

এইসব কাব্যের বহিরঙ্গরূপে একটা সাধারণ সমতা লক্ষ করা যায়। মঙ্গলকাব্যের কবিরা তাঁদের রচনায় সংস্কৃত পুরাণের কাঠামোকে কিছুটা অনুসরণ করেছেন।প্রতিটি কাব্যেই পুরাণের মত সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা করা হয়েছে।প্রায় প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যেই মোটা রকমের চারটি ভাগ আছে। (১) বন্দনা (২) গ্রন্থোৎপত্তির কারণ (৩) দেবখন্ড ও সৃষ্টিতত্ত্ব (৪) নরখন্ড।

বন্দনা অংশে বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা করা হয় ও তাঁদের কাছে কৃপা করা হয।গ্রন্থোৎপত্তির কারণ দেখাতে গিয়ে কবিরা জানান যে আরাধ্যা দেবতার প্রত্যক্ষ নির্দেশ,স্বপ্নাদেশ বা দৈববাণী শুনে দেবতার কৃপা-বশে তাঁরা কাব্যরচনা করেছেন। এই অংশে কবিরা তাঁদের আত্মপরিচয় দিয়ে থাকেন।এই আত্মপরিচয় থেকে কবিদের জীবন ও সময় সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। দেবখন্ডে থাকে পুরাণের আদর্শে সৃষ্টিতত্ত্ব, দেবলোকে দেবতার লীলা। সাধারণ লোক-মনের অলৌকিক বিশ্বাসে অনুসরণে দেব-কাহিনি লেখা হয়-পুরানের সঙ্গে এর যোগ খুবই কম।নরখন্ডে থাকে নরলোকে মঙ্গলদেবতার পূজা প্রচারের বিস্তৃত কাহিনি।স্বর্গরাজ্যের কোন বাসিন্দা অভিশপ্ত হয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এবং দেবতার পূজাপ্রচার করে। কবি ও কাব্যভেদে রচনার আকৃতি-প্রকৃতিতে অবশ্য কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।মঙ্গলকাব্যগুলি সাধারণত আসরে গান করার জন্য পালাগানের মত সাজানো থাকে। প্রায় আটদিনরাত্রি ধরে পালাগান চলে বলে এর আর এক নাম 'অষ্টমঙ্গলা'। পঞ্চদশ শতাব্দীতে আমরা কয়েকটি মনসামঙ্গলের নিদর্শন পেয়েছি। তাই এই এককে কেবল মনসামঙ্গলের সম্পর্কে কিছু সাধারণ আলোচনা করা হল।

অনুশীলনী

বড়ো প্রশ্ন

১। মঙ্গলকাব্যে পৌরাণিক ও অপৌরাণিক আদর্শের যে সমন্বয় লক্ষ্য করা যায় মনসামঙ্গল অবলম্বনে তা দেখান।

২। মনসামঙ্গল কাব্য শাখার অন্ততঃ দুজন কবিকে আলোচনার অন্তর্ভূক্ত করে তাঁদের কাব্যে গতানুগতিকতার সঙ্গে স্বতন্ত্র কবি দৃষ্টির যে প্রতিফলন ঘটেছে তা দেখান।

টিপ্পনী

ছোটো প্রশ্ন

১। মঙ্গলক াব্যের লক্ষ্মণ ও বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করুন।

গ্রন্থ পরিচিতি

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খন্ড – সুকুমার সেন, আনন্দ সংস্করণ জানুয়ারী। ১৯৯১

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খন্ড –অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মর্ডান বুক এজেন্সী, কলকাতা

৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খন্ড –অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মর্ডান বুক এজেন্সী, তৃতীয় সংস্করণ

৪। বাংলা সাহিত্যের কথা– প্রথম মাওলা বাদার্স সংস্করণ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

৫। বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস – চতুর্থ সংস্করণ, ভূদেব চৌধুরী

৬। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা – প্রথম পর্যায়, পঞ্চম সংস্করণ, ভূদেব চৌধুরী

৭। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা – প্রথম খন্ড, গোপাল হালদার

৮। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস – ক্ষেত্র গুপ্ত, প্রথম সংস্করণ, গ্রন্থনিলয়।

৯। বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, আহমদ শরীফ, বর্ণ মিছিল, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৭৮

১০। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খন্ড, সুকুমার সেন, আনন্দ, ষষ্ঠ সংস্করণ, অষ্টম মুদ্রণ, ২০০৭

১১। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস – ক্ষেত্রগুপ্ত গ্রন্থনিলয়, ত্রয়োদশ সংস্করণ, জুলাই – ২০০৯

১২। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ পরিচয়, ড. দিলীপকুমার মিত্র, দিশারি প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৩

১৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, আদি ও মধ্যযুগ, ড. দেবেশকুমার আচার্য্য, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, জুন, ২০১৩

১৪। বৈষ্ণব পদাবলীর নবমূল্যায়ন, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, পুস্তক বিপণি, মার্চ, ২০১০

১৫। উচ্চমাধ্যমিক বাংলা ভাষা প্রকাশ, অমিতাভ দাস, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, মার্চ, ২০১২

টিপ্পনী

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যচরিত ধারা

মধ্যযুগের সাহিত্যে জীবনী কাব্যের ধারা

টিপ্পনী

চৈতন্য-চেতনার উন্মেষ বাংলা সাহিত্যে প্রথম জীবনী কাব্যের সূচনা করল। দেবগাথা থেকে সাহিত্য নব-অভিমুখী হল। এই প্রথম রক্তমাংসের মানুষ আখ্যানের বিষয় হয়ে উঠল। মধ্য -মধ্যযুগ চৈতন্যের স্পর্শে নতুন মূল্যবোধ পেল। যদিও চৈতন্যদেব সমকালে শুধুমাত্র মনুষ্যরুপে নয়, স্বয়ং ঈশ্বর-অবতার হিসাবে স্বীকৃত। মানবশ্রেষ্ঠ পুরুষটি জীবনীকারদের কাছে নরচন্দ্রমা স্বরুপ। তাই তাঁকে নিয়ে বাংলা ও সংস্কৃতে শ্লোক, গাথা, কাব্য,নাটক, গান রচিত হল।

এ বিষয়ে সুনীলকুমার দে-র মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য - “Biography is distinctively Vaisnava contribution to middle Bengali, and creating it, the movement addded a new geuve to the literature of the century.” (The Vaisnava Faith and Movement)

জীবনী কাব্যের বৈশিষ্ট্য

জীবনী কাব্য সাধারণতঃ তিন প্রকারের-(ক) জীবনী বা Biography, (খ) আত্মজীবনী বা Auto-biography এবং (গ)সন্তজীবনী বা Hagiography জীবনী বা চরিত্রকাব্য প্রধানতঃ আলচ্য চরিত্রটির উপর আলোকপাত করে থাকে। সমকালের প্রেক্ষিতে চরিত্রটির সামগ্রিকতা বিচারকরা হয়। চরিত্রের রহস্য, তাঁর আবিভাবের কারন ও জীবনসাধনার গুরুত্ব ইতিহাসের আলোয় বিশ্লষণ করা হয়। যে কীতির জন্য সেই ব্যক্তিত্বটি জীবনকথার আলোচনা তার যথাযথ পরিচয় প্রদান আবশ্যক। আবেগ সর্বস্ব ঐতিহাকি তথ্যের অনৃতভাষণ জীবনী কাব্যের পরিপন্থী।

চৈতন্যচরিতকাব্যে অলৌকিকতার পরিবেশ আছে। কিন্তু তার থেকে বড় হয়ে উঠেছে তার মানবিক রুপটি। সমকালের প্রেক্ষিতে মহাপ্রভুকে দাঁড় করান হয়েছে। এর সংগে যুক্ত হয়েছে তাত্ত্বিক ও দাশনিক দিকটি। সব মিলিয়ে চৈতন্যদেবের মহৎ-প্রগাঢ় জীবন মধ্যযুগীয় কবিদের হাতে বিস্তৃত চিত্রপটে অঙ্কিত হয়েছে।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত চৈতন্যজীবনী

শ্রী চৈতন্যদেবকে নিয়ে বাংলার আগে সংস্কৃত ভাষাতে জীবনীকাব্য রচিত হয়েছিল। রঘুনাথদাস যে ‘স্তবমালা’ রচনা করেছিলেন সেগুলির মুলত বৃন্দাবন ও রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক। এর মধ্যে চৈতন্যদেবের স্তব-স্তুতি করা হয়েছে ‘চৈতন্যাষ্টক’ও ‘গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু’ তে। এই দুটি অংশে কিছু পরম পুরুষের জীবনকথা বর্নিত হয়েছে। রুপগোস্বামীর ‘স্তবমালা’র চৈতন্যদেবের সঙ্গে চৈতব্যপরিকব অদ্বৈত , শ্রীবাস, রামানন্দ প্রমুখেরও উল্লেখ আছে। তবে সংস্কৃতে উল্লেখযোগ্য চৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলি হল-

(অ) মুরারীগুপ্তের কড়চা বা শ্রীশ্রী কৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃত।

(আ) কবি কর্ণপুর পরমানন্দ সেনের চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য।

(ই) কবি কর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক।

(ঈ) কবি কর্ণপুরের গৌরগনোদ্দেনীদপিকা।

(উ) প্রবোধানন্দ সরস্বতীর চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্।

টিপ্পনী

(ঊ) স্বরুপ দামোদরের কড়চা।

(অ) মুরারিগুপ্তের কড়চা বা শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচরিতামৃত

চৈতন্যদেবের জীবনীগ্রন্থের মধ্যে প্রাচীনতম হল মুরারীগুপ্তের 'শ্রীশ্রী কৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থটি। কবি ছিলেন স্বয়ং মহাপ্রভুর বয়োজ্যেষ্ঠ সহপাঠী। প্রথম জীবনে অদ্বৈত বাদী হলেও পরবর্তীতে চৈতন্যের প্রভাবে ভক্তিবাদে আশ্রয় নিয়েছিলন। দামোদর পন্ডিতের প্রশ্নের উত্তর দানে প্রসঙ্গে মুরারী কাব্যটি রচনা করেন। গ্রন্থটি চারটি প্রকৃম এবং আটাত্তরটি সর্গে বিভক্ত। মোট ১৯০৬ টি শ্লোক আছে. কবি চৈতন্যদেবের বাল্যলীলা থেকে তিরোধান অবধি সমগ্র জীবন অঙ্কন করেছেন। গ্রন্থরচনার সময় শক নিয়ে মতদ্বৈধতা আছে। ছাপা গ্রন্থে ১৪২৫শক (১৫০৩ খি) মতান্তরে ১৪৩৫শক (১৫১৩ খি) আছে। কিন্তু চৈতন্যদেবের তিরোধান ১৫৩৩ খি-তে। কেউ কেউ মনে করেন কবি চৈতন্যের সমগ্র জীবন প্রথমে চিত্রিত করেননি। ১৫০৩ খি বা১৫১৩ খি অবধি গিয়েছিলেন। মহাপ্রভুর মৃত্যুর পর চতুর্থ প্রক্রম যুক্ত হয়। কারোর কারোর মতে মুরারি গুপ্ত ১৫৩৩ খি থেকে ১৫৪২ খি-র মধ্যে গ্রন্থটি রচনা করেন।

মুরারি চৈতন্যদেবের অনুচর ছিলেন। তাই তাঁর লেখায় সত্য প্রতিষ্ঠিত। পরবর্তী চৈতন্য জীবনীরচয়িতারা গ্রন্থটিকে প্রামান্য বলে গ্রহন করেছেন। গ্রন্থটি কড়চা নামে পরিচিত। কড়চা অর্থে ছোট নোট। কিন্তু আয়তনে গ্রন্থটি বৃহদাকার। গ্রন্থটি চৈতন্য তথ্য ও তত্ত্বের আকার গ্রন্থ। ভাষা স্বচ্ছসরল। তিনি চৈতন্য দেবকে ছোট থেকেই ঈশ্বর রুপে আঁকেননি। ক্রমে ক্রমে, বিশেষত গয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর থেকে তাঁর মধ্যে ভগবান আবেগের প্রকাশ।

(আ) কবি কর্নপুর পরমান্দ সেনের চৈতন্যচরিতামৃতম্ মহাকাব্য

মহাপ্রভুর অন্যতম প্রধান পার্ষদ ছিলেন শিবানন্দ সেন। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র পরমানন্দ মধ্যযুগের বিশিষ্ঠ কবি ও নাট্যকার। স্বয়ং চৈতন্যদেব সাত বছরে জনক পরমানন্দের মুখে বিশুদ্ধ সংস্কৃত শ্লোক শুনে প্রীত হয়ে তাঁকে 'কবিকর্ণপুর' নামে অভিহিত করেছিলেন।

কাব্যটিতে কুড়িটি সর্গ উনিশ বেশি শ্লোক আছে। এর প্রথম এগারো অধ্যয় গৌরলীলা বিষয়ক এবং তা মুরারি গুপ্তের কড়চা থেকে প্রায় হুবহু গৃহীত। পরবর্তী অংশ অর্থাৎ লীলাচর যাত্রায় কবির পিতা মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিলেন তাই সে অংশের বর্ননায় অলৌকিকতার থেকেও তথ্যবিশিষ্ঠতা বিদ্যমান। ১৫৪২ খি: গ্রন্থটি রচিত হয়। সে সময় কবির বয়স ১৭-১৮ বছর। সুতরাং নবীন বয়সের উচ্ছাস এখানে বেশি। কিন্তু ঐ বয়সেই পরমানন্দ এরকম বিপুল কাব্য রচনা করেছিলেন এরকম কৃতিত্ত্বের নয়।

(আ) কবিকর্ণপুরের চৈতন্য চন্দ্রোদয়

মহাপ্রভুর অন্যতম প্রধান গুনগ্রাহী ও ভক্ত ছিলেন পুরীর রাজা প্রতাপ রুদ্র। চৈতন্য দেবের তিরোধানের পর রাজার শ্লোক প্রশমনের জন্য পরমানন্দ নাটকটি লেখেন ও অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। গজপতি প্রতাপ রুদ্রের দেহান্ত হয় ১৫৪০-৪১ খি:। সুতরাং নাটকটি তার আগেই লেখা। এইজন্য কেউ কেউপনে করেন নাটকটি কবির কাব্যের আগেই রচিত হয়েছিল। তবে নাটকের কালজ্ঞাপক শ্লোক অনুজায়ী এটি ১৫৭২-৭৩ খি: অথবা ১৫৭৯-৮০ খি: -তে রচিত।

টিপ্পনী

নাটকটি কৃষ্ণমিশ্রের রুপক নাটক 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের আদর্শে রচিত। এখানে দশটি আছে। সংক্ষেপে চৈতন্যদেবের সামগ্রিক জীবন বর্ননা করা হয়েছে। কাব্যটির থেকে নাটকের কাহিনী বন্দন সুদৃঢ়। প্রথম পাঁচ অঙ্কে পুরীধামে বসবাস পর্যন্ত নাটককরে বর্নিত পরবর্তী অংশে পহাপ্রভুর শেষ ক বছরের ঘটনা লিখিত হয়েছে। কবি কর্ণপুর রুপকর্নাটকের পৎ চৈতন্যজীবনকে নাট্যাকারে বর্ননা করেছেন। কৃষ্ণের কলিকালের রুপ চৈতন্যদেব। এখানে বৈধী ও রাগানুসাভক্তির পার্থক্য বিচার স্থান পেয়েছে।

(ই) কবি কর্ণপুরের গৌরাঙ্গ দীপিকা

দুইশ পনের শ্লোকের ছোট কাব্যগ্রন্থটি কৃষ্ণ ও তাঁর সখাসখীদের সঙ্গে চৈতন্যাবতার ও তাঁর পরিকরদের অবতারই ব্যাক্ষ্যাত হয়েছে। শুধু দ্বাপর নয় ত্রেতা যুগের অবতারদেরও এই প্রসঙ্গে। কৃষ্ণ স্বয়ং চৈতন্যদেব, বলরাম, নিত্যানন্দ এবং শিব। গ্রন্থটি চৈতন্যচন্দ্রোদয়ের থেকে উদ্ধৃতি আছে। মহাপ্রভুর দক্ষিনাত্য ভ্রমনের পর থেকে গম্ভীরালীলা পর্যন্ত জীবনের প্রাধান্য বর্ননা আছে। গ্রন্থটিতে রচনাকালজ্ঞাপন শ্লোক থাকলেও তা নিয়ে মতভেদ আছে।

(উ) প্রবোধানন্দ সরস্বতীর চৈতন্যচন্দ্রামৃতম

প্রবোধানন্দ সরস্বতী কাশী নিবাসী এবং গৌরপারম্যবাদের প্রচারক ছিলেন। তাঁর চৈতন্যমহিমা বিষয়ক গ্রন্থ 'চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ একশ তেতাল্লিশটি শ্লোকের সমারহ। এটি চৈতান্যভক্তিবিষয়ক স্তুতিকাব্য। স্তুতি, নীতি, আর্শীবাদ, গৌরাঙ্গভক্তমহিমা, গৌরাঙ্গ-অভক্ত-নিন্দা, দৈন্য, উপাস্যনিষ্ঠা, লোকশিক্ষা, চৈতান্যৎকর্ষ, অবতারমহিমা, শোচক-এই বারটি অধ্যায়ে কাব্যটি বিভক্ত। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবমন্ডলীর প্রভাব তাঁর মধ্যে প্রবল। মহাপ্রভুকে পরমতত্ত্ব বলে মনে করতেন।

(ঊ) স্বরূপ দামোদরের কড়চা

বিভিন্ন গ্রন্থে এর উল্লেখ থাকলেও মূল গ্রন্থ পাওয়া যয়নি নবদ্বীপ নিবাসী পুরুষোত্তোম আচার্য-ই পরবর্তী জীবনে সন্ন্যাসগ্রহন করে স্বরুপ দামোদর নাম নেন। মহাপ্রভুর থেকে বয়োজেষ্ঠ ব্যাক্তিটির মৃত্যু চৈতন্যের পরে ফলে তিনি চৈতন্যদেবের সম্পূর্ন জীবন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। নীলাচলে মহাপ্রভুর রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। বৈষ্ণব রসতত্ত্বের ভাষ্যকারদের অন্যতম প্রধান। কারোর কারোর মতে কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতান্যচরিতামৃত গ্রন্থের সূচনায়

উল্লিখিত শ্লোকদুটি স্বরুপদামোদরের, যার উপর ভিত্তি করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্ব ও দর্শন গড়ে উঠেছে। বৈষ্ণবীর পঞ্চতত্ত্বচৈতব্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাস-এর উদ্ভাবয়িতা স্বরুপ।

কৃষ্ণদাস বলেছেন-

প্রভুর যে শেষ লীলা স্বরুপ দামোদর।
সূত্র করি গাহিলেন গ্রন্থের ভিতর।।

টিপ্পনী

বাংলা ভাষার চৈতন্যজীবনী

(১) বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত

বাংলা ভাষার প্রথম চৈতন্যজীবনীকাব্য বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত। সম্প্রতি বৈষ্ণব সাহিত্য ও ইতিহাস বিশোষজ্ঞ অধ্যাপক ডঃ কাননবিহারী গোস্বামী একটি চৈতন্যচরিতকাব্য আবিষ্কার করেছেন। বংশীবদন চট্টোপাধ্যায় রচিত এই কাব্যটির নাম 'শ্রী গৌরলীলামৃত' বা 'গৌরাঙ্গবিলাস'। ডঃ গোস্বামীর মতে মুরারি গুপ্তের কড়চা পরে এবং বৃন্দাবন দাসের আগে এটি রচিত। খন্ডিত এই পুথিটির প্রাপ্ত পাতার মাত্র ১৫। যেখানে দ্বাদশ সর্গের দুই পৃষ্ঠা, ত্রয়দশ ও চতুর্দশ সর্গের পুরোটা এবং পঞ্চদশ সর্গের চারটি পৃষ্ঠা পাওয়া গেছে। কাব্যের প্রধান বিষয় গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলা। অধ্যাপক গোস্বামীর অনুমান কাব্যটি মহাপ্রভুর চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহন অংশে সমাপ্ত হয়েছে। এখানে এমন কিছু চৈতন্যলীলার বর্ননা আছে যা চৈতন্যচরিতকাব্যে নেই। প্রাপ্ত অংশে কোনো পূর্বসূচীর কথা উল্লেখ করা হয়নি বলেই প্রাচীনতম বাংলা জীবনীগ্রন্থ বলে অনুমান করা হয়েছে।

কবিপরিচয় ও কাব্যরচনার কাল

মহাপ্রভুর অন্যতম প্রধান ভক্ত ছিলেন শ্রীবাস পন্ডিত। শ্রীবাসেরা ছিলেন চার ভাই। তাঁর এক ভাই-এর কন্যা নারায়নী-র পুত্র ছিলেন বৃন্দাবন, বৃন্দাবন তাঁর মায়ের বিধবা অবস্থার পুত্র। বৃন্দাবন কাব্যে কোথাও পিতার নাম উল্লেখ করেননি। তবে নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস'-এ কুমারহট্টবাসী বিপ্র বৈকুন্ঠের কথা আছে। জগবন্ধু ভদ্র এক অলৌকিকতার গালগল্প করেছেন। ১৪২৯ শকের বৈশাখ মাসের কৃষ্ণ দ্বাদশীতে (১৫০৭খিঃ) বৃন্দাবনের জন্ম, অবশ্য মধ্যযুগের অন্যান্য কবির মতোই এখানেও মতভেদ আছে। ১৪৪০শক (১৫১৮খি)বা ১৪৫৭সালের (১৫৩৫খিঃ) তথ্যও পাওয়া গেছে। বৃন্দাবনের জন্মের পর নারায়নী শ্রীবাসের বাড়িতে না থেকে নবদ্বীপের কাছে বাসুদেব দত্ত-র মামগাছির বাড়িতে পুত্রসহ থাকতেন। যেখানে গরায়সী-র পাট ছিল। দীর্ঘজীবীবৃন্দাবন ১৫৮০ খি খেতুরী মহৎসবে অংশ নিয়েছিলেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবন দাসকে চৈতন্যলীলার ব্যসবলে অভিহিত করছেন। তাঁর কাব্যে মুরারি গুপ্তের কড়চা বা স্বরুপ দামোদরের লীলা সূত্রের উল্লেখ আছে। আবার কবিকর্ণপুরের দীপিকা গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে-''বেদবাস্যো ব একামীদ্দাযো বৃন্দাবনহধুঙ্ক''

'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের রচয়িত কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁকে 'চৈতন্যলীলারব্যাস' বলে অভিহিত করেছেন।

সঠিক কোন সময়ে চৈতন্যভাগবত রচিত হয়েছে তা নিয়ে মতান্তর আছে। ১৫৩৫খিঃ,

১৫৪৮খিঃ, ১৫৭৩খি, ইত্যাদি সালগুলি গবেষকদের পরিক্রমায় উঠে এসেছে। খুব সম্ভবত তরুন বয়সী কবির রচনা এটি। কাব্যে বৃন্দাবনের তারুন্যের অসহিষ্ণুতার পরিচয় আছে। ডঃ সুকুমার সেনের মতে বৃন্দাবন তার গুরু নিত্যানন্দের তিরোধানের (অনুমানিক ১৫৪১-৪২খিঃ) আগেই কাব্যটি রচনা করেন। কাব্যে আছে-

''অন্তযামী নিত্যানন্দ বুলিলা কৌতুকে।
চৈতন্যচরিত কিছু লিখিতে পুস্তকে।।''

তবে ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার নানা তথ্য-প্রমান,পটভূমির বিস্তার ইত্যাদি সাহায্যে মনে করেছেন যে, ১৪৪৮খিঃ-তে এটি লিখিত।

টিপ্পনী

কাব্যপরিচয়

কাহিনী বিন্যাসঃ বৃহৎ গ্রন্থ 'চৈতন্যভাগবত' তিন খন্ডে বিভক্ত-(ক)আদিখন্ড-পশের অধ্যয়, (খ)মধ্যখন্ড-ছাব্বিশ অধ্যয় এবং(গ)অন্তখন্ড(দশ অধ্যয়)। মোট একান্নটি খন্ড। ছত্র সংখ্যা প্রায় পঁচিশ হাজার।

আদিখন্ড- এই অংশের কাহিনী চৈতন্য জন্ম থেকে তাঁর গয়া গমন ও যেখান থেকে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন অবধি।গৌরাঙ্গের জন্ম ও বাল্যলীলা, নিত্যানন্দের জন্ম-বাল্যলীলা-প্রথমযৌবনেরতীর্থ ভ্রমন, নিমাইয়ের বিদ্যাবিলাস, লক্ষীদেবীর সঙ্গে নিমাইয়ের বিবাহ, গৌরাঙ্গের নীরস বিদ্যানুশীলনে ভক্তগনের ক্ষোভ, তর্কযুদ্ধে দিগ্বিজর পন্ডিতের গরাচুর, নিমাই পন্ডিতের পূর্ববরঙগ গমন ও খ্যাতিলাভ, সর্পদংশনে লক্ষীপ্রিয়ার মৃত্যু, মাতার অনুরোধে দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ, যবন হরিদাসের মহিমাবর্ননা বা, পিতার পিন্ডদানের জন্য গয়ার গমন, গয়াধামে ঈশ্বর পুরীর সঙ্গে সহিরৎ, সর্বপ্রথম একত্রেমাবেশের আর্বিভাব, ঈশ্বর পুরীর কাছে দশাঘরের বিযুমন্ত্রে মন্ত্রলাভ এবং নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন। -আদিখন্ডের কাহিনী পরিকল্পনা এইটুকু।

এই অংশে আছে ঐতিহাসিকসুলভ প্রত্যক্ষবৎ অধ্যয়। এ আক্ষ্যান বাস্তবধর্মী ও শিল্পগুনাদ্বিত্য। চৈতন্যদেবের বাল্যলীলার এমন বাস্তবোচিত বর্ননা আর কেউ দেননি।

মধ্যখন্ডঃ- বেশ বড় মধ্যখন্ডটিতে মহাপ্রভুর গয়া থেকে প্রত্যাবর্তন থেকে সন্নাসগ্রহন পর্যন্ত বিবৃত। এই খন্ডে আছে ঈশ্বরপ্রেমের স্পর্শে চৈতন্যদেবের বিদ্যাদর্প ত্যাগ, অধ্যাপক বন্দ, প্রেমাবেশে মগ্ন, নবদ্বীপে নিত্যানন্দের আগমন এবং গৌর-নিতাই-এর মিলন, ভক্তগোষ্ঠীর আবেষ্টব, মহাপ্রভুর আদেশে নবদ্বীপে হরিনামকীর্তন, নিত্যানন্দে জগাই-মাধাই উদ্ধারে,কাজীর বিরোধিতা, গৌরাঙ্গের কাজীদলন ও কাজী উদ্ধার, চৈতনদেবের গোপীভাব, সপরিষদ গৌরাঙ্গের লীলাভিনয়, সন্নাসগ্রহনের জন্য অভিপ্রায় প্রকাশ, শচীমাতার বেদনারপ্রকাশ, অবশেষে মাতা, স্ত্রী, ও সংসার পরিত্যাগ করে শ্রী গৌরাঙ্গের যতিবেশ ধারন।

আদি ও মধ্য খন্ডে মহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলা ও সংসার জীবন চিত্রিত হয়েছে। নিমাই থেকে নিমাই পন্ডিত হয়ে চৈতন্যদেব হয়ে উঠবার যাত্রাপথটি চমৎকারভাবে বৃন্দাবনদাস ফুটিয়ে তুলেছেন।

অন্ত্যখন্ডঃ- দশ অধ্যয়ের অন্ত্যখন্ডটি সংক্ষিপ্ত এবং আকস্বিক ভাবে সমাপ্ত। এই খন্ডের বিষয়বস্তু হল-গৌরাঙ্গের কেশব ভারতীর ক্যাছ সন্নাস দীক্ষাগ্রহন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব নাম গ্রহন,

রাঢ়দেশ ভ্রমন, নীলাচলযাত্রার অভিপ্রায় জাপন, শান্তিপুরের অদ্বৈতের গৃহ থেকে নীলাচলের উদ্দেশ্য যাত্রা, উড়িষ্যায় প্রবেশ ও একে একে স্থান অতিক্রম অবশেষে পুরীধামে উপস্থিতি, জগন্নাথ বিগ্রহ দর্শন ও বারবার মূচ্ছা, বাসুদেব সার্বভৌনের পরিচর্চা ও সবগৃহে অনয়ব, মহাপ্রভুর সার্বোভৌমের বিচারবিতর্ক, পরমানন্দপুরী ও স্বরুপ দামোদরের সঙ্গে মিলন, গৌড়ে প্রত্যাবর্তন, শান্তিপুরে অদ্বৈতেঃ গৃহে আগমন ও শচীমাতার সঙ্গে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ,কুমারহট্ট চৈতন্যদেবের আগমন ও শ্রীবাস প্রমুখের সান্নিধ্যলাভ,নীলাচলে পুনর্গমন, রাজা গজপতি প্রতাপ রুদ্রের মহাপ্রভু দর্শন ও মহাপ্রভুর শরণ-গ্রহন, মহাপ্রভুর আদেশে নিত্যানন্দের গৌরে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে অন্ননিয়োগ, অদ্বৈত নিত্যানন্দের ভক্তগন সহ নীলাচল যাত্রা ও মহাপ্রভুর সঙ্গলাভ,অদ্বৈত কতৃর্ক চৈতন্যদ্যেবের অবতার মাহাত্ম্য ঘোষনা ও সবার সামনে চৈতন্যকীর্তন, রুপ-সনাতনের পুরীধামে এসে মহাপ্রভু সঙ্গলাভ, প্রেমাবেশে চৈতন্যের রুপমন্য পতন ও উদ্ধার।

শেষ খন্ডটি বৃন্দাবন দাস হঠাৎ শেষ করায় মহাপ্রভুর শেষজীবনের আবেক গূঢ় তত্ত্ব কথা বাদ পড়ে গেছে। চৈতন্যদেবের দাক্ষিনাত্যভ্রমন ও রায় রামাবন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথাও।

কাব্য পরিচয়ঃ- বৃন্দাবন দাস যখন জন্মগ্রহন করেন তখন চৈতন্যদেব সন্নাস গ্রহন করে ফেলেছেন। সন্ন্যাসী মহাপ্রভুর অধিকাংশ সময় কেটেছে নীলাচলে। ফলে নবদ্বীপের মামগাছি কিংবা পরবর্তীতে দেনুড়ে বান করা কবির পক্ষে চৈতন্যলীলা প্রত্যক্ষ্য করা সম্ভব হয়নি। এক জায়গায় কবি বলেছেন-হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হইল তখনে।

হইলাঙ বঞ্চিত যে মুখ দরশনে।। মুখ হয়ত সঠিক পাঠ নয়। আসল পাঠ হবে সুখ।

এতে কারোর কারোর মত কবি চৈতন্যদেবকে কখনও দেখেননি। তবে তিনি নিজেকে নিত্যানন্দের সর্বশেষ ভৃত বলেছেন। নিত্যানন্দের অনুমতিতেই এই কাব্য রচনা এবং তা চৈতন্যদেবের তিরেধানের পরে। ভক্ত শ্রীবাসেব দৌহিন হিসাবে একটা বৈষ্ণবীর আবহের মধ্যে বসবাস তো ছিলই। তাঁর সঙ্গে তিনি ভক্তমুখে চৈতন্যলীলার (বিশেষত নবদ্বীপলীলা) সমন্ধে অনেক তথ্য শুনেছিলেন।এ ব্যাপারে সহায়তা করেছেন কবি মাতা নারায়নী দেবী, গুরু নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য, গদাধর দাস,প্রমুখ চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষ্যদর্শীরা, স্বয়ং কবি বলেছেন-

(ক) নিত্যানন্দ প্রভু মুখে বৈষ্ণব তত্ত্ব।
কিছু কিছু শুনিলাঙ সবার মহত্ত্ব।।

(খ) যেরুপ কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র বিদ্যানিধি।
গদাধর শ্রীমুখের কথা কিছু লিখি।।

(গ) সভার ঈশ্বর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
এ কথায় অদ্বৈতের প্রীত বসৃতর।।

নিত্যানন্দ-শিষ্য বৃন্দাবন নিত্যানন্দের শ্রীমুখ থেকে মহাপ্রভুর লীলার মধ্য পৃষ্ঠার সম্পর্কে গভীরভাবে অবহিত হয়েছেন। গদাধর-অদ্বৈতাচার্য চৈতন্যদেবকে শিশুকাল থেকে দেখেছেন। বৃন্দাবনের কাব্যের উৎস এঁরাই।

বৃন্দাবন দাস চৈতন্যলীলাকে ভাগবতের আদর্শ চিত্রিত করতে চেয়েছেন।বিশ্বম্ভরকে শিশুকাল থেকেই দেবতাজ্ঞানে অঙ্কন করেছেন।চৈতন্যের বাল্যলীলায় কৃষ্ণলীলার অনুসরন আছে।অন্য

টিপ্পনী

কিছু ত্যাগ করে ভাগবত গ্রহন,গোপালের বেশ ধারন,হরিধ্বনি শুনলে শান্ত হওয়া, কৃষ্ণের বাল্যাবস্থার মতো দুরন্তপনা, বাল্যে নিজেকে গোয়ালা বলে ঘোষনা করা-এসব কিছুর বর্ননায় ভাগবতের ছায়াস্পষ্ট।

এই গৌরচন্দ্র যবে জন্মিলা গোকুলে।
শিশু সঙ্গে গৃহে গৃহে ক্রীড়া করি বুলে।।

শ্রী চৈতন্য ও নিত্যানন্দ কবির কাছে কৃষ্ণ-বলরামের অবতার স্বরুপ।শচীমা তাকে বলেছেন-পৃথিবীস্বরুপ। কথাও মহাপ্রভুকে বরাহ অবতাররুপে বর্ননা করেছেন। পতিত, পাষন্ডী, অন্তজ, হীব, অহিন্দু-জাতীধর্মবর্ন নির্বিশেষে চৈতন্যদেব সবাইকে অহ্বান জানিয়েছেন।তাঁর শরনে আসতে বলেছেন-

সাধু উদ্ধারিমু দুষ্ট বিনাশিমু সব।
তোর কিছু চিন্তা নাই কর মোর স্তব।।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বা স্বরুপ-দামোদরের মতো সাধারোনের দুর্বোধ্য দার্শনিক তত্ত্বকথায় প্রবেশ করেননি। বরং সহজভাবে ভাগবত অনুসরনে চৈতন্যকথাকে ব্যক্ত করেছেন কবি। তবে বৃন্দাবনের চৈতন্যদেব কিন্তু অধিকাংশ স্থানেই হৃদয়গ্রাহী মানুষ।

তবে এরসঙ্গে কবি নবদ্বীপের তৎকালীন সমাজের সুন্দর চিত্র অঙ্কন করেছেন।চৈতন্য-পূর্ব নবদ্বীপ বিদ্যার স্থান, কিন্তু তার সঙ্গে আছে তান্ত্রিকদের শাকে-আচার, কাজীর হিন্দুবিশেষ, মহাপ্রভুর জনপ্রিয়তা,পান্ডিত্য ও ঈশ্বেরত্বের প্রতি ঈর্ষাপরায়নতা, এর মধ্যেই কিন্তু গৌড়াধিন হোসেনশাহ চৈতন্যদেবকে স্বধর্মাচাড়নে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছেন।

নানা দেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়।।

তখনকার দিনে অনেকেই শাসকের ভার চৈতন্য বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু চৈতন্যদেবের প্রবল প্রতিরোধের সামনে তুচ্ছ হয়ে গেছেন। কাজী দলবের মতো ঘটনা ঘটিয়েছেন তিনি, তাঁর কর্মকান্ডে চৈতন্যপ্রভাব সমাজে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল।

কবিপ্রতিভার পরিচয়

'চৈতন্যলীলার ব্যস বৃন্দাবন দাস'-কৃষ্ণদাস কবিরাজের এরকম আখ্যা দেবার কারন বাংলা ভাষা প্রথম চৈতন্যচরিত গ্রন্থপ্রনীতা বৃন্দাবন। সেই সঙ্গে তাঁর কাব্যটি ভাগবতের অনুসরনে লিখিত।চৈতন্যদেবের মহৎ-প্রগাঢ় জীবনকে কবি অসাধারন ভাষায় চিত্রিত করেছেন।এ কাব্যে আছে তত্ত্ব। কিন্তু যে তত্ত্বকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে ঈশ্বর অবতারত্ব।সাধারন বৈষ্ণব সমাজের জন্যকবি লেখনী ধারন করেছিলেন। তাঁর রচনা কোথাও শিথিল হয়নি। হয়ত কোথাও কোথাও ক্রমভঙ্গদোষ আছে।এতবড় পরিসরে তা খুব সামান্যই। বরং স্বচ্ছন্দ বর্ননায় বৃন্দাবন দাস বোধ হয় কৃষ্ণদাসকে ছারিয়ে গেছেন। কবি মূলত পাঁচালীরীতিকে মেনে চলেছেন। সঙ্গীত-বিদ্যার অভিজ্ঞতা তাঁর কাব্যকে স্বাদু করে তুলেছেন। অলংকার প্রয়গে দক্ষতা দেখিয়েছেন-

এতসব প্রকাশে কেহো নাহি চিনে।
সিন্দুর মধ্যে চন্দ্র যেন না জানিল মীনে।।

টিপ্পনী

ছন্দ প্রয়গেও কুশলতার পরিচয় পাওয়াযায়-কখনো পাঁচালী, কখনো বা ত্রিপদী ছন্দ।

বিমল হেম জিনি তনু অনুপামরে
তাহে শোভে নানা ফুলদাম।
কদম্য কেশর জিবি একটি পুলকরে
তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘাম।।

-এমন ত্রিপদী গৌরচন্দ্রিকার চিত্র অঙ্কন করে। বৃন্দাবনের বেশ কিছু পদ বৈষ্ণব সাহিত্যে স্বীকৃতি পেয়েছে। বিশেষ করে গৌরচন্দ্রিকা বিষয়ক পদগুলি বিখ্যাত হয়েছে।

টিপ্পনী

চৈতন্য-দেবের ঈশ্বরত্বের বর্ননাই কবির কাম্য ছিল। কিন্তু তার মধ্যে চৈতন্যজীবনে माननীয় দিকগুলি প্রকাশ পেয়েছে মাঝে মধ্যেই। যেমন-

গড়াগড়ি যায় প্রভু ধূলায় ধূসর।
হাসি উঠে জনবীর কোলের উপর।।

এমনকী মহাপ্রভুর ক্রোধের ছবিও পাওয়া যায়। কাজীদলনে তিনি কাজীর দুরবস্থা করার পরেও অনুচরদের কাজীর ঘরে আগুন লাগবার নির্দেশ দিয়েছেন-

ভাঙ্গিলেন সব যত বাহিরের ঘর।
প্রভু কোলে অগ্নি দেহ বাড়ির ভিতর।।

কেউ কেউ একে চৈতন্য বিরোধী বললেও, মহাপ্রভুর প্রেমাবতারের পাশে কঠোর মূর্তির পরিচয়ও আছে। পুত্রশোকাতুরা বেদনাহত শচীমাতার করুন মূর্তিটি বৃন্দাবন দাস অসাধারন দক্ষতার সঙ্গে এঁকেছেন।-

তোমা দেখি সকল সন্তান পাসরিনু।
তুমি গেলে প্রান মুই সর্বথা ছাড়িমু।।

শৈল্পিক রসভাষ্যের সঙ্গে ভক্তি-বাৎসল্যের অপূর্ব সমন্বয় বৃন্দাবন দাসে 'চৈতন্যভাগবত'।

লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল

কবি পরিচিতি

বৈদ্যকুলোদ্ভব লোচনদাস বর্ধমানে কোগ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। পিতার নাম কমলাকর দাস, মাতা সদানন্দী, মাতামহ পুরুষোত্তম গুপ্ত, মাতামহী অভয়াদাসী। কবির পিতৃকুল ও মাতৃকুল একই গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। কবি দুই বংশের একমাত্র পুত্র সন্তান হওয়ায় আদুরে ছিলেন। সেইজন্য তাঁর পড়াশোনা একটু দেরিতে হয়। মাতামহের জোর জবরদস্তিতে লোচন দাসের পড়াশোনা। কবির গুরু ছিলেন চৈতন্য-পরিকর বৈষ্ণবীয় শ্রীখন্ড সম্প্রদায়ের নেতা নরহরি দাস সরকার - 'নরহরিদাস গোর প্রেমভক্তিদাতা'। গুরুর সংস্পর্শে এসে তিনি 'গৌরনাগরী' ভাবে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। লোচন দাসের পুরো নাম লোচনানন্দ দাস। তবে ত্রিলোচন, সুলোচন ভবিতাদূর পদ পাওয়া গেছে।

কাব্য পরিচিতি

রচনাকাল ঃ

মধ্যযুগের কবিতাংশ কাব্যের মতোই এ কাব্যের নির্দিষ্ট সব তারিখ সংক্রান্ত মতভেদ আছে। ‘পদকলাতরু‘-তে এর রচনাকাল ১৪৫৯ সন অর্থাৎ ১৫৩৭ খি. বলা হয়েছে। ‘গৌরপদতরঙ্গিণী’ অনুযায়ী কবির বয়স তখন মাত্র ১৪ বছর (জন্ম ১৫২৩ খি. ধরে)। এত অল্প বয়সে এমন পক্কতা কতটা সঠিক এ নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। বরং ড. বিমানবিহারী মজুমদার যুক্তি সহকারে জানিয়েছেন ১৫৭৬ খি. কবিকর্ণগুরের ‘গৌরগণোদ্দেশদীপিকা’র অন্তত কিছুকাল আগে এটি রচিত। কেননা কর্ণপুরের যে চৈতন্যানুচরদের যে অবতারতত্ত্ব তা অতি সঙ্কোচে প্রকাশ করেছেন লোচন দাস। বোধহয় ১৫৫০-১৫৬৬ খি. -র মধ্যে ‘চৈতন্যমঙ্গল’ রচিত হয়েছিল।

বিষয়বিন্যাস ঃ

লোচন দাসের ‘চৈতন্যমঙ্গল’ ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ -তো বটেই ‘চেতন্যভাগবত’ -এর থেকেও আয়তনে ছোট। চারটি থেকে কাজটি বিভক্ত - সূত্র খন্ড, আদি খন্ড, মধ্য খন্ড এবং শেষ খন্ড। মোট এগার হাজার ছন্দ রয়েছে। সূত্র থেকে ১৮০০ ছত্র, আদি খন্ডে ৩৩০০ ছত্র, মধ্য খন্ডে ৪৩০০ ছত্র এবং শেষ থেকে প্রায় ১৬০০ ছত্রের সমাহার ঘটেছে।

অন্যান্য চৈতন্যচরিতের সঙ্গে চৈতন্যমঙ্গলের পার্থক্য যে এখানে অতিরিক্ত সূত্রখন্ড আছে। এতে কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের ধরণে অবতার রূপধারণের কারণ বর্ণিত হয়েছে। এই খন্ডের বিষয় - চৈতন্যদেবও বিত্যানন্দের অবতাররূপ গ্রহণের কথা নারদ কর্তৃক প্রচারিত হয়েছে উদ্ভব, শিব-পার্বতী, বহ্মা প্রমুখের সঙ্গে। বহ্মার সঙ্গে কৃষ্ণের অবতার তত্ত্বের আলোচনা। দারবহ্ম জগন্নাথ দর্শন এবংজগন্নাথদেবের নির্দেশে গৌরসুন্দরকে অবলোচন করা। আদখন্ডের কাহিনী মহাপ্রভুর নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ থেকে গয়াগমন এবং গয়া থেকে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। এখানে গৌরাঙ্গের নাগররূপের বর্ণনা আছে। মধ্যখন্ডের কাহিনীতে চৈতন্যের নদীয়ালীলা ও উৎকললীলা দুই-ই আছে। নীলাচল লীলার প্রথমাংশ এখানে বর্ণিত। নবদ্বীপে মহাপ্রভুর মহিমা প্রকাশ, ভক্তগণের সমাবেশ এবং গৌরাঙ্গের সঙ্গে মিলন সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাপ্রভু কোথাও কোথাও শ্রীকৃষ্ণের মতো লীলা করেছেন। নীলাচলে বাসুদেব সার্বভৌমেরে মহাপ্রভুর শরণ ও মহাপ্রভুর অনুগ্রহ প্রদর্শন, শেষখন্ড সবচেয়ে ছোট। এখানে আছে চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য যাত্রা, রায় রামানন্দের সঙ্গে মিলন, সেতু বন্ধ পর্যন্ত ভ্রমণ, নীলাচলে প্রত্যাবর্তন, গৌড় গমন এবং পুনরায় নীলাচলে আগমন, সবশেযে মহাপ্রভুর অলৌকিক শিরোধান কাহিনী।

কবিত্ব শক্তি ঃ

লোচন দাস মূলত সাধারণ মানুষের কাছে মহাপ্রভুর মহাজীবন তুলে ধরার জন্য কাব্য রচনা করেছেন।

‘যে কিছু কহিল বিজ বুদ্ধি করেছেন।
পাঁচালি প্রবন্ধে কহোঁ মো ছারমুরুখ।।’

সুর ও তাল সমন্বিত গেয় কাব্য ‘চৈতন্যমঙ্গল’। এতে আছে পাঁচালী ও মঙ্গলকাব্যের রীতির মিশ্রণ। নানান রাগরাগিনীর উল্লেখ রয়েছে। কাব্যে ‘শিকলি’ অর্থাৎ পয়ার এবং ‘নাচারি’ অর্থাৎ

টিপ্পনী

ত্রিপদী ছন্দ সমান সমান ব্যবহার করেছেন। কাব্যের উপাদান সংগ্রহে কবি গুরু নরহরি দাসের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও মুরারি গুপ্তের কড়চার সাহায্য নিয়েছিলেন।

এ কাব্য পন্ডিতদের জন্য নয়, বরং লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' ভক্ত ও জনসাধারণের চৈতন্যমুখরিত হবার জন্য রচিত। ঢলে তত্ত্বদর্শন বা ঐতিহাসিকতার বাইরে গিয়ে কবি অনেক জনশ্রুতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। পন্ডিত কবি সংস্কৃত শ্লোককে ভাবগম্ভীর ও হুবহু অনুবাদ করেন নি, ভাবানুবাদ করেছেন, ফলে সংস্কৃত ভাষার দার্ঢ্যতা, ধ্রুপদী বিন্যাস, ছন্দ অলংকারের গাঢ়তা থেকে কাব্যকে মুক্ত রাখতে পেরেছেন কবি। এই জন্য তাঁর কাব্য হয়ে উঠেছে সাধারণের বোধগম্য ও প্রিয়। একারণে কেউ কেউ তাঁকে নোট লিখিয়েদের মতো দেনানোর অভিযোগ করেছেন। কিন্তু অনেকেই লোচন দাসের সারল্যের জন্য প্রশংসা করেছেন। তবে এ কাব্যের বড় গুণ হল কাজটি গীতিলালিত্যপূর্ণ। বৃন্দাবন দাস কলিযুগাবতার হিসাবে মহাপ্রভুকে উপস্থাপিত করেছেন। লোচন এর সঙ্গে যুক্ত করেছেন 'গৌরনাগরভাব'কে।

একটি নানরভাবে বর্ণনা এইরূপ –

বসিল সুন্দরী সব প্রভুর সমীপে।
যে অঙ্গবাতাসে রঙ্গিনীর অঙ্গ কাঁপে।।
বসন বচন সব স্থলিত হইল।
নয়নে অলসযুত কাহারও হইল।।
কেহো অঙ্গপরশে অনঙ্গরঙ্গ করে।
ঢুলিয়া পড়িল বিশ্বম্ভরের উপরে।।

কিংবা বরবেশী গৌরচন্দ্রকে দেখে নদীয়ার গগরীগণের চিত্তে চাঞ্চল্য ঘটার বর্ণনা কবি দিয়েছেন। সেখানে তাঁকে দেখে 'মদনবেদনে অধীর হইল নারী'। এবং

গগরীর গুণ আদরে বাথান
বঙ্কিম আঁখি কটাক্ষে।
লাজের মন্দিরে আগুনি ভেজায়া
লোভে পড়ে লাখে লাখে।।

এই ব্যাথায় অনেক বৈধ্যিক বৈষ্ণব ক্ষুব্ধ হন।

'চৈতন্যমঙ্গলে' বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অন্য কোথাও এমনভাবে বিষ্ণুপ্রিয়া ভ্রমঙ্গ নেই। কবির বিষ্ণুপ্রিয়া মানবী সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বরাতে চৈতন্যের দাশত্যলীলার বর্ণনা কতদূর সত্য এ বিষয়ে প্রশ্ন হতে পারে। তবে এখানে মানবিকবোধ স্পষ্ট।

করুণরস কবির হাতে জীবন্ত রূপলাভ করেছে। চৈতন্যর সন্ন্যাসগ্রহণের সংবাদে শচীমাতার বিলাপ –

সুরধুনী তীরে বিমাই তিলেক দাঁড়াও।
চাঁদমুখ বিরখিয়ে তবে ছাড়ি যাও।।
এক বোল বলি নিমাই যদি তুমি রাখ।
সন্ন্যাসেরে কাজ নাই ঘরে বসে থাক।।

টিপ্পনী

সন্ন্যাসী না হও নিমাই বৈরাগী না হও।
অভানী মায়েরে নিমাই ছাড়িয়ানা যাও।।

আর বিষ্ণুপ্রিয়ার আর্তনাদ –

'তোমার বিছনি লৈয়া মরি যাঙ বিষ খাইয়া'

এ সব বর্ণনা সহজ মনের আবেগের জীবন্ত প্রকাশ।

বৈষ্ণব সম্প্রদায় চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কারণ হিসাবে

দুটি মতের প্রচারক – ক) দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ও ধর্ম সংস্থাপন

খ) রাধাকৃষ্ণের যুগল তনুরূপী অবতারের আবির্ভাব।

লোচন দাস দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন –

ক) জীব উদাহরণ – হেতু গৌণ করি মানি।

এই হেতু বলি অবতার শিরোকণি।।

খ) রাধাভাব অন্তরে রাধা বর্ণ বাহিরে
অন্তর্বাহ্য রাধাময় হব।

লোচন দাস ও জয়ানন্দ – এই দুজন কবি স্পষ্টভাবে চৈতন্যদেবের তিরোধানের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। সন তারিখ সময় সহযোগে লোচন চৈতন্যদেবের জগন্নাথদেবের মূর্তিতে অন্তলীন হবার কথা বলেছেন।

আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে।
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিঃশ্বাসে।।
সত্যনেতা দ্বাপর সে কলিযুগ আর।
বিশেষত কলিযুগে সন্নীর্তন যার।।
কৃপা কর জগন্নাথ পতিত পাবন।
কলিযুগ আই এই দেতে শরণ।।
এই বোল বলিয়া সেই ত্রিজগত রায়।
বাহু ভিড়ি আলিঙ্গনে তুলিল হিয়ার।।
তৃতীয় প্রহর বেলা করিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে।।

কোনো প্রাচীন পুথিতে চৈতন্যদেবের তিরোধান সম্পর্কিত তথ্য নেই। ঈশান নাগরের কাজ 'অদ্বৈত প্রকাশে' মহাপ্রভু জগন্নাথ মন্দিরে একাকী অবস্থান ও তিরোধানের কথা আছে। ওড়িয়া ভক্ত কবি অচ্যুতানন্দ তাঁর শূন্য সংহিতায় ইঙ্গিত দিয়েছেন –

চৈতন্যঠাকুর মহানত্যকায় 'রাধা' 'রাধা' ধ্বনি বলে।
জগন্নাথ মহাপ্রভু শ্রীঅঙ্গরে বিদ্যুৎপ্রায় মিনি গলে।।

কবি চৈতন্য-তিরোধানের ব্যাখ্যার জন্য জনশ্রুতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল

কবি পরিচিতি

টিপ্পনী

জয়ানন্দের চৈতন্যচরিত কাব্যটির নাম 'চৈতন্যমঙ্গল'। লোচন দাসের মতোই এটি গেয় ও আবৃত্তিযোগ্য। কাব্যের সন্ন্যাসখন্ডে কবি স্বপরিচয় জ্ঞাপন করেছেন।

বর্ধমান সন্নিকটে ক্ষুদ্র এক গ্রাম বটে,
আমাইপুরা তার নাম।

জয়ানন্দ বাহ্মণ এবং বন্দ্যঘটি গাঁই। বর্ধমারে কাছে আমাইপুরা গ্রামে কবির জন্ম। পিতা সুবুদ্ধি মিশ্র এবং মাতা রোদবী। সুবুদ্ধি মিশ্র চৈতন্যভক্ত ছিলেন। কবি জানিয়েছেন চৈতন্যদেব নীলাচল থেকে গৌড় আসার পথে সুবুদ্ধির বাড়িতে বিশ্রাম দিয়েছিলেন। পুরী থেকে গৌড় আসার পথে মহাপ্রভু পানিহাটি অবধি জলপথে এসেছিলেন। তবে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের সময় বোধহয় আমাইপুরা হয়ে বায়ড়া গিয়েছিলেন।

তাহে যে সুবুদ্ধি মিশ্র গোমাঞির পূর্বশিষ্য
তার ঘরে করিলা বিশ্রাম।।

শিশু পুত্র 'গুহিতা'-কে কোলে নিয়ে মা রোদনী মহাপ্রভুর জন্য ভোগের ব্যবস্থা করেন। স্বয়ং মহাপ্রভু ঐ শিশুর নাম রাখেন জয়ানন্দ। পিতা সুবুদ্ধি মিশ্র খুব সম্ভবত চৈতন্যের টোলে পড়তেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের কাব্যে সুবুদ্ধি মিশ্রের উল্লেখ আছে। তবে কবির কাকা-জ্যাঠারা চৈতন্যভক্ত ছিলেন না। কবির পিতা গদাধরের শিষ্য ছিলেন। কবিও গদাধর পন্ডিতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

চিন্তিয়া চৈতন্য গদাধর পদদ্বন্দ্ব।
আদিখন্ড জয়ানন্দ করিল প্রবন্ধ।।

নিত্যানন্দের অন্যতম প্রধান অনুচর অভিরাম গোস্বামী এবং নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্রের আশীর্বাদ জয়ানন্দের উপর বর্ষিত হয়েছে।

শ্রীবীরভদ্র গোমাঞির প্রসাদমালা পাঞা।
শ্রীঅভিরাম গোস্বাঞির কেবল বল পাঞা।।
গদাধর পন্ডিত গোস্বাঞির আড্ডা শিরেধরি।
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গীত কিছু যে প্রচারি।।

এর সঙ্গে ছিল স্বয়ং মহাপ্রভুর অনুগ্রহ।

কাব্য পরিচয়

জয়ানন্দ লিখেছেন -

বাপ সুবুদ্ধি মিশ্র তপস্যার ফলে।
জয়ানন্দের মন হৈল চৈতন্যমঙ্গলে।।

চৈতন্যভক্ত জয়ানন্দের কাব্য সম্পর্কে ১৩০৪-০৫ বঙ্গাব্দে প্রথম জানতে পারা যায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার মাধ্যমে। ১৩১২ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯০৫ খি. -তে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে নগেন্দ্রনাথ বসু ও কালিদাস নাথের সম্পাদনায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

টিপ্পনী

কাব্য রচনার কাল

চৈতন্যদেব পুরী থেকে গৌড় এসেছিলেন খুব সম্ভবত ১৫১৪ খি. -তে সেই সময় কবির বয়স এক বছর। 'চৈতন্যমঙ্গলে' বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবতের' উল্লেখ আছে। চৈতন্যভাগবত রচনার আনুমানিক সময় ১৫৪৮ খি.।এর পরে জয়ানন্দ কাব্যটি লেখেন।১৫৫০ খি. থেকে ১৫৬০ খি. -র মধ্যে কাব্যটি লেখা বলে ড. সুকুমার সেনের অনুমান।ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৬০ খি. এর কথা বলেছেন। 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যের সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু অদ্বৈত আচার্যের তিরোধানের পর ১৪৮০ শকাব্দ থেকে ১৪৯২ শকাব্দের (১৫৫৮ - ১৫৭০ খি.) মধ্যে কাব্যটি লেখা বলে অনুমান করেছেন।

বিষয় বিন্যাস

'চৈতন্যমঙ্গল' মোট নয়টি খন্ডে বিভক্ত - আদি, নদীয়া, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, উৎকল, প্রকাশ, তীর্থ, বিজয় ও উত্তর। কয়েকটি খন্ড বড়, কয়েকটি ছোট, কয়েকটি আবার মাঝারি। আদি খন্ডে আছে পৌরাণিক কথামুথ। চৈতন্য জন্মের পটভূমিকা তৈরী করা হয়েছে। নদীয়া খন্ডে নিমাইয়ের জন্ম থেকে জগাই-মাধাই উদ্ধার পর্যন্ত বিস্তৃত। বৈরাগ্য খন্ডের পরিমিতি গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস নেবার ইচ্ছা পর্যন্ত। সন্ন্যাস খন্ডে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ থেকে অদ্বৈতাচার্যের বাড়ি শান্তিপুরে আগমন। এরপর মহাপ্রভুর নীলাচল গমন কাহিনী উৎকল খন্ডে বর্ণিত। প্রকাশ খন্ডে আছে মহাপ্রভুর অবতারত্বের প্রকাশ, নীলাচলে চৈতন্যের অবস্থান ও মাহাত্ম্য প্রকাশ। তীর্থখন্ডে চৈতন্যদেবের বৃন্দাবন-মথুরা-দাক্ষিণাত্যে তীর্থ ভ্রমণ বৃত্তান্ত। বিজয় খন্ডের আখ্যান রয়েছে চৈতন্যদেবের গৌড়ে আগমন, নিত্যানন্দ চার্যের নীলাচল পরিত্যাগ করে গৌড়ে আগমন ও বসবাস। শেষখন্ডে উত্তর-এ মহাপ্রভুর অপ্রকট হওয়া ও ভক্ত-পরিকর অনুচরদের শোক। এই খন্ডে কবি নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত আচার্যেরও তিরোধানের উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য যে, মহাপ্রভুর পুরীধামে আগমনের পরবর্তী জীবনচর্যা সম্পর্কে কবি ততটা অবহিত ছিলেন না। তাই হয়তো ঘটনার পারম্পর্য রক্ষিত হয়নি। তবে জয়ানন্দ নিত্যানন্দ প্রভু ও তাঁর ভক্তদের কথায় রচনার সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। যা বৃন্দাবন দাসের অনুসরণ। কাব্যটি সাড়ে তের হাজার ছত্র আছে।

কবিত্ব

'চৈতন্যমঙ্গল' গেয় ও আবৃত্তিযোগ্য কাব্য। তাই তার মধ্যে আছে নানা রাগরাগিনীর উল্লেখ। কবির সহজ কবিত্ব, যা পাঠকের কাছে আদরণীয়। পাঁচালি ও ত্রিপদী ছন্দে লেখা কাব্যটি।

লোচন দাসের মতো নারদ-উদ্ভব সংবাদে কাব্য শুরু। কলিযুগে পাপমগ্ন জীব উদ্ধারে কৃষ্ণ অবতারের আবির্ভাব -

দ্বিজকুলে জনমিব গৌরভাবান। অি
খল নীবেরে যে করিব প্রেমদান।।

বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনার সঙ্গে সঙ্গে জয়ানন্দ অগ্রজ কবিদের নাম উল্লেখ করেছেন। চৈতন্যচরিত কাব্যকার হিসাবে বৃন্দাবন দাস ছাড়া অন্য রচয়িতাদের কাব্যের হদিশ পাওয়া যায় নি। এছাড়াও বাল্মীকি, কৃত্তিবাস, ব্যাসদেব, গুণরাজ খান, জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাসের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

তৎকালীন বাংলার শ্রীহট্ট ও নবদ্বীপের বাস্তব বর্ণনা আছে। জগন্নাথ মিশ্রের নবদ্বীপে গৃহ নির্মাণের সময় সুলতানের অত্যাচার বর্ণিত হয়েছে -

আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।
বাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাবি প্রাণ লয়।। . ...
পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের বাহ্মণ।।

আবার চৈতন্য অবতারের আবির্ভাবের কারণ হিসাবে সমসাময়িক বাংলাদেশের অস্থির অবস্থাকে কবি চিত্রিত করেছেন।

বৃক্ষলতা ফল হরে রাজা ম্লেচ্ছ জাতি।
মৎস-মাংসে প্রিয় হৈল বিধবা যুবতী।।
....
কপটী লোলুপ দ্বিজ শূদ্রান্ন ভোজন।
সর্বলোক হৈল শিশ্নোদর পরায়ণ।।

কবি বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা বর্ণনা করেছেন মঙ্গলকাব্যের মতো। বিষ্ণুপ্রিয়া পুরাণকাহিনী থেকে দৃষ্টান্ত সস্ত্রীক ধর্মাচরণই শাস্ত্রবিধি। এই বৈরপ্য খন্ডেই বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীমাতার বিলাপ বর্ণিত হয়েছে। লোচন দাস যেখানে সন্ন্যাস গ্রহণের আগের রাতে চৈতন্য-বিষ্ণুপ্রিয়ার দাম্পত্য বিলাস বর্ণনা করেছেন, সেখানে জয়ানন্দ লিখেছেন -

বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী জত কৈলা নিবেদন।
দৃক্পাত না করে প্রভু না করে শ্রবণ।।
শ্রবণযুগলে প্রভু দিঞা দুই হাথ।
জয়ানন্দ বলে প্রভু হা নাথ হা নাথ।।

জয়ানন্দ তাঁর কাব্যে কয়েকটি চমকপ্রদ তথ্যের অবতারণা করেছেন। তিনি দাবি করেছেন

যে, চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষগণ উড়িষ্যার যাজপুর নিবাসী ছিলেন –

চৈতন্য গোসাঞিঁর পূর্ব পুরুষ
আছিলা যাজপুরে।

অবশ্য এ তথ্য নিয়ে বিস্তর মতভেদ রয়েছে।

মহাপ্রভুর তিরোধান সম্বন্ধেও জয়ানন্দ বাস্তব তথ্য উপস্থাপন করেছেন –

আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয় নাচিতে।
ইটাল বাজিল বাম পাএ আচাম্বিতে।।
অদ্বৈত চলিনা প্রায়তঃকালে গৌড়দেশে।
বিভৃতে তাহারে কথা কহিল বিশেষে।।....
চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।
সেই লখ্যে টোটায় শায়ন অবশেষে।।
পন্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্বকথা।
কালি দশ দন্ড রাত্রে চলিব সর্বথা।।
নানা বর্ণে দিব্য মালা আইল কোথা হইতে।
কথো বিদ্যাধর নৃত্য করে রাজপথে।।
রথস্থান রথ স্থান ডাকেন দেবগণ।
গরুড়ধ্বজ রথে প্রভু করি আরোহণ।।
মায়া-শরীর তথা রহিল যে পড়ি।
চৈতন্য-বৈকুণ্ঠ গেলা জম্বুদ্বীপ ছাড়ি।।

আষাঢ় মাসে রথের দিন রথের সামনে নাচতে নাচতে মহাপ্রভুর পায়ে ইটের টুকরো বেঁধে। সেই ক্ষত থেকে প্রভুর দেহ অবসান নিতান্তই মনুষ্যজনোচিত। কবি চৈতন্যদেবের জন্মগ্রহণে অলৌকিকতার আশ্রয় মহাপ্রয়াণে লোচন দাসের মতো হতে পারেননি। তাই সাধারণ বৈষ্ণব ভদ্রের মধ্যে তাঁর কাজ বহুল প্রচারিত হয়নি।

তবে জয়ানন্দের সহজ কবিত্বশক্তি ছিল। বর্ণনা কবি-হৃদয়ের উৎস থেকে উৎসারিত হওয়ায় তাতে গীতিকবিতার ঝংকার পরিলক্ষিত হয়। বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাথ্যায় বিরহশঙ্কা

ও গৌরাঙ্ক প্রভু হে,
তোমার বিদারণ হিয়া
গছাএ প্রবেশ করি মরু বিষ্ণুপ্রিয়া।।

কিংবা লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিয়ে করতে আসা বরবেশী গৌরাঙ্গকে ছাতনাতলায় দেখে পুরনারীদের উচ্ছ্বাস –

একে যে লাবণ্যরূপে কি কহিব এক মুখে
আর নানা ফুলের ছামনি।
আর তাহে মধুর হাসি জীবোঁহেব নাঞি বাসি
আর তাহে পিরীতি চাহনি।।

টিপ্পনী

জয়ানন্দের কাব্যে ঐতিহাসিক তথ্য ও দার্শনিক তত্ত্ব-উভয় মিলিত হয়ে একটা নীরস ঘোট তৈরি হয়েছে যা জনসাধারণ বা গবেষক কারোর কাছেই পুরোপুরি গ্রহণ যোগ্য নয়। তাই একাব্য উপেক্ষিতাই রয়ে গেছে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'

টিপ্পনী

শুধু মাত্র চৈতন্যচরিত সাহিত্যই নয়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য অন্যতম প্রধান গ্রন্থ 'চৈতন্যচরিতামৃত'। লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজ। এর বহু মান্যতা বৈষ্ণব সমাজের সঙ্গে সঙ্গে সাধারন জীববেত্ত।

কবিপরিচিতি

'চৈতন্যচরিতামৃত'- এর পঞ্চম পরিচ্ছেদে কবি কৃষ্ণদাস আত্ম পরিচয় গোপন করেছেন। বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্তী নৈহাটি গ্রামের কাছে কামটপুর নামক গ্রামে কবির নিবাস। তিনি দীক্ষাগুরুর সরাসরি নাম করেননি। তবে মনে হয় নিত্যানন্দ-ই তাঁর গুরু ছিলেন।

জয় জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দরাম।
যাহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবনধাম।।

বাড়িতে একবার সংকীর্তন চলার সময় কবির ভাই নিত্যানন্দের নিন্দা করেন।এতে সংকীর্তন অনুষ্ঠানে আসা নিত্যানন্দ-শিষ্য মীনকেতন-রামদাস ক্ষুদ্ধ হয়ে অনুষ্ঠানস্থল পরিত্যাগ করেন। কবি রাতে নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশ পান এবং ভাইকে ভৎর্সনা করে বৃন্দাবন যান। সেখানে তিনি ষড়-গোস্বামীদের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন ও তাঁদের কাছে ভক্তি শাস্ত্র অধ্যায়ন করেন।শ্রীরুপ ও রঘুনাথ দাসের বিশেষ অনুকূল লাভ করেছিলেন।

শ্রীরুপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যতরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।।

মধ্যযুগের অন্যান্য কবিদের মতোই কৃষ্ণদাসের জন্ম স্থান নিয়ে বির্তক আছে। কারোর মতে কবির জন্ম ১৪৯৬ খীঃ (১৪১৮ সন)। তাহলে গ্রন্থ রচনার সময় কবির বয়স হয় একুশ বছর। রচনা কালে কবি নিজেকে অতিবৃদ্ধ জরাতুর বললেও এটা সম্ভব নয়। ১৫১৭ খীঃ বা ১৫২৭ খী এর মধ্যেই বেশি গ্রহন যোগ্য। কারন তিনি যখন বৃন্দাবনে যান তখন তাঁর বয়স ৩০ বছর।

কবির পিতার নাম ভগীরথ, মা সুনন্দা, এবং ভাই শ্যামদাস। তাঁর মৃত্যু সন নিয়েও মতভেদ আছে। ১৬১৫ খীঃ গ্রন্থ রচনার সমাপ্তির কিছুদিন পরে পুথি চুরির খবরে কবি অসুস্থ হয়ে পরেন এবং মারা যান।

গ্রন্থ রচনাকাল

'চৈতন্যচরিতামৃত' এর ছাপা গ্রন্থে রচনাকাল সর্ম্পকে বলা হয়েছে -

শকে সিন্দ্যাগ্নিবাণেন্দৌ ধর্মষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্যেইহ্নসিত-পঞ্চম্যাং গ্রন্থোহয়ং পূর্নতাং গবঃ।।

অর্থাৎ সিন্ধু অগ্নিবাণ ইন্দু - ৭৩৫১ অঙ্কস্য বামাগতি অনুযায়ী ১৫৩৭ সনে গ্রন্থটি রচিত। ১৫৩৭ শকাব্দ মানে ১৬১৫ খীঃ। এই সিন্ধকে চার ধরে ১৫৩৪ সন বা ১৬১২ খ্রীঃ-র দাবীও করেছেন।

ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার গণিত বিশারদের সাহায্যে গণনা করে অভিমত জানিয়েছেন ১৬১২ খীঃ এর জৈষ্ঠ মাসের রবিবার দিন কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয়।

'প্রেমবিলাস' গ্রন্থে আবার ১৫০৩ খীঃ শকাব্দ অথাৎ ১৫৮১ খীঃ, কথা বলা হয়েছে। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন-১৫৬০-১৫৮০ খীষ্টাব্দ রচনা কালের গন্ডি ধরিলে অন্যায় হইবে না।' আর ডঃ সুশীল কুমার দে তাঁর "Vaishhava Faith & Movement" গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন - 'Krishnadas there fore, could not have completed his work in 1581 AD. The date Saka 1537=1615 AD.' there fore appeans to be move likely.' অথাৎ ১৬১৫ খীঃ র কথা ডঃ দে বলেছেন। ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত ১৫৯২ - এর আগে নয় পরে এর রচনাকাল।

কাব্য পরিচয়

কাব্য বিন্যাস ঃ কৃষ্ণ দাস কবিরাজের গ্রন্থটি বৃহৎ। প্রায় কুড়ি হাজার দৃত্র সংখ্যাকে তিনটি খন্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। এখানে বাংলার সঙ্গে এক-তৃতীয়াংশ সংস্কৃত বক্ষন শ্লোকও কবির জরাচিত শ্লোক আছে। ভক্ত কবি খন্ডের নাম 'লীলা' দিয়েছেন, তিনটি লীলা - আদি, মধ্য, ও অন্ত্য। মোট বাষট্টি পরিচ্ছেদ আছে। আদি লীলায় সতেরো, মধ্য লীলায় পঁচিশ এবং অন্ত্য লীলায় কুড়িটি পরিচ্ছেদ আছে।

কবি লিখিত সংস্কৃত বন্দনা শ্লোক দিয়ে প্রতিটি পরিচ্ছেদের সূচনা। শ্লোকের পর আছে দুই ছত্রে সপরিকর চৈতন্য বন্দনা যেমন-

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় বিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ।।

প্রতিটি পরিচ্ছেদের শেযে বৃন্দাবনের গোস্বামী গুরুদেব বন্দনা আছে। তারপর পুস্পিকা, সংস্কৃত। প্রতিটি লীলার অন্তিম পরিচ্ছেদে লীলায় বর্ণিত বিষয় সূচী বা 'অনুবাদ' দেওয়া আছে।

আদিলীলা

মোট সতেরোটি পরিচ্ছেদের মধ্যে প্রথম বারোটিতে আছে বন্দন, মঙ্গলাচরণ, চৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈতো, অনুচর পরিকর ও শাখার সনক্ষিপ্ত পরিচয়, বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব দর্শন, চৈতন্যবতারের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি।

ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ পরিচ্ছেদের চৈতন্যদেবের বাল্যলীলা ও কৈশরলীলা সূত্রাকারে বর্নিত হয়েছে। শেষ পরিচ্ছেদে আছে কজী দলন ও নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহনের আগ্রহ প্রকাশ।

টিপ্পনী

মহাপ্রভুর নদীয়ালীলা পর্যায় এ অহশে চিত্রিত হয়েছে। মোট তেইশ বছরের জীবনচর্যাকে ধরেছেন কবি।

মধ্যলীলা

২৫ পরিচ্ছেদের এই অংশে গ্রন্থের বৃহত্তম। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহন, রাঢ়দেস পরিক্রমা, নীলাচল যত্রা, যাঠভৌমকে তর্কের মাধ্যমে বিজমতানুসারী করা, প্রতাপরুদ্রকে অনুগ্রহ প্রর্দশন, গুন্ডিচামার্জন,রথাগ্রে নৃত্য, দক্ষিন ভারত ভ্রমন, রায় রামা নন্দের সঙ্গে দাশর্নিক সতত্ত্বালোনা, কাশী হয়ে বজ মন্ডলে উপস্থিতি, বজধামকে পুনরায় স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠাকরা, স্বরুপ দামোদরের সঙ্গে মিলন, নীলাচলে প্রত্যাবর্তন – এই কাহিনী টুকু মধ্যলীলায় বর্ণিত হয়েছে। সন্ন্যাস গ্রহন পরবর্তি ছয় বছর ধরে চৈতন্যদেবের বিপুল বিস্তারের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।অনেকাংশেই পাঠকের কাছে নতুন বলে বিবেচিত হতে পারে।

টিপ্পনী

অন্ত্যলীলা

এই অংশের কুড়িটি পরিচ্ছেদ প্রথম তেরোটিতে কিছু কিছু ঘটনার উল্লেখ আছে। চর্তুদশ থেকে বিংশ – এই সাতটি পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর দিজেক্ষাদ অবস্থার কথা বলা হয়েছে। প্রথমার্ধে শিবানন্দ সেন, হরিদাস কীর্তনীয়া, যবন হরিদাস, রঘুনাথ দাস, বল্লভ ভট্ট, গোপীনাথ পট্টানায়ক, রামচন্দ্র পুরী, রাঘব পন্ডিত, দময়ন্তী, জগদাবন্দ পন্ডিত, রঘুনাথ ভট্ট প্রমুখ ভক্তদের কথা কিংবা তাদের নীলাচলে আগমন ও চৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ক্রমে প্রভুর প্রেমাবেশ গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠেছে। তাঁর কৃপাতির গভীরতা প্রকাশ পেয়েছে।শেষে চৈতন্যের রাধাভাবে ভাবিত হয়েও কৃষ্ণ বিরহে উন্মত্তবৎ আচরনে সমূদ্রে পতন ও জেলেদের দ্বারা উদ্ধার এবং প্রবল কৃষ্ণবিরহে যন্ত্রনায় বিলাপ প্রকাশ। শেষ পরিচ্ছেদে অনুবাদের সঙ্গে আছে চৈতন্যদেব রচিত শিক্ষাদকের আস্বাদন।

কবিত্বের পরিচয়

চৈতন্যজীবনী কাব্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ‘চৈতন্যচরিতামৃত’। মহাপ্রভুর চরিত কাহিনীর বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণদাস বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্ব দর্শনের পরিচয় দিয়েছেন। চৈতন্যচরিত কাব্যগুলি যেখানে শুধুমাত্র চৈতন্য জীবন কাহিনীকে চিত্রিত করেছে, যেখানে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাপ্রভুর সঙ্গে আলোচিত জীবন দর্শনের বর্ণনা করেছেন। বৃন্দাবন দাস প্রমুখ লেখকেরা চৈতন্যদেবের অন্ত্যজীবন সম্পর্কে তেমন কোন দিশা দেখেননি। সেখানে কৃষ্ণদাস জোর দিয়েছেন মহাপ্রভুর শেষ জীবনের প্রতি।

উখত্তের প্রায় প্রভু করে গান নৃত্য।
দেহের স্বভাবে করে স্নান ভোজনকৃত্য।।
রাত্রি হৈলে স্বরুপ রামাবন্দোর লইয়া।
আপন মনের কথা কহে উঘাড়িয়া।।

আগের এই গ্রন্থটির গুরত্ব পুর্ন স্থানটি হচ্ছে গভীর তত্ত্বালোচনা। বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্ব ও দর্শনের পথটি যেন কবি তৈরি করেছেন। বিশেষত মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে রায় রামানন্দের

সঙ্গে কথোপকথনকালে কবি চৈতন্যদেবের মুখ দিয়ে বিভিন্ন তত্ত্বকে উপস্থাপিত করেছেন। যেমন – অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব, রাগানুগা ভক্তি, রাগাত্মিকা ভক্তি, গৌরভাব, সখী তত্ত্ব, রাধা তত্ত্ব, প্রেম বিলাস-বির্বত, সাধ্য সাধনতত্ত্ব ইত্যাদি। এই সব দূরহ গভীর তত্ত্ব কথা পরিমিত গাঢ় রীতিতে প্রকাশ করেছেন। যেমন –

বক্ষ হৈতে জন্মে বিশ্ব, বক্ষেতে জীবয়।
সেই বক্ষে পুণরপি হয়ে যায় লয়।।

কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় বহুবিত হয়।
কৃষ্ণ প্রাপ্তির তারতম্য বহুত আদ্‌র।।

পূর্ব পূর্ব রথের গুণ পরে পরে হয়।
এক দুই গগনে পঞ্চ পর্যন্ত বাঢ়য়।।
গুনাধিক্যে স্বাদাধিক্যে বারে প্রতি রসে।
শক্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈযে।।

রাধার স্বরুপ কৃষ্ণ প্রেম কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব-পুস্প-পাতা।।

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলে কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।।

যচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরুপ।
অতএব স্বরুপ শক্তি হয় তিন রুপ।।
আনন্দাং সে হলাদিনী সদংশে সঙ্গিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে 'জ্ঞান' করি মানি।।

হলাদিনীর সার অংশে তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান।।
প্রেমের পরম রস 'মহাভাব' জানি।
সেই মহাভাবদশা রাধা ধাকুরাণী।।

শুধু এই নয় আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর আবির্ভাব সর্ম্পকে কবিরাজ কৃষ্ণ দাস বলেছেন যে, বজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের তিনটি অপূর্ন বাঞ্ছা পুরণ করার জন্য চৈতন্যাবতারের আবির্ভাব। প্রথমত ঃ রাধা প্রেমের প্রনয় মহিমা কেমন,দ্বিতীয়ত কৃষ্ণের অদ্ভুত মাধুর্য কীরুপ এবং তৃতীয়ত, কৃষ্ণ-মাধুর্য আস্বাদনে শ্রীরাধিকার যে আনন্দ হয় তা কী প্রকার – তা জানার জন্যই 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত' গৌরাঙ্গ অবতারের ধরায় আবির্ভাব।

রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে।।
রাধাভাব অঙ্গীকরি ধার তার বর্ণ।
তিনসুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ন।।

কৃষ্ণলীলার সঙ্গে চৈতন্যলীলার ঐক্য দেখানোর জন্যই যে কৃষ্ণদাস এসব লিখেছেন তা

টিপ্পনী

নয়, বরং শ্রীরাধাভাবগতিঅঙ্গীকার' করার কথা বলা হয়েছে। রে মধ্যে দিয়েই গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব-দর্শনের পক্ষটি তৈরি হয়েছে।

মহৎ গ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃতের রশেশৈলীতে কবি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষত ত্রিপদী ছন্দে আবেগের প্রকাশ ঘটেছে। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, "চৈতন্যচরিতামৃতের ত্রিপদী ছত্রগুলির মতো সহজ-সুজগ রচনা পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্য দূর্লভ।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে ১ম খন্ড পূর্বাধ)।

টিপ্পনী

সখি হে, না বুঝিয়ে বিধির বিধান।
সুখ লাগি কেলুঁ প্রীত হৈল দুঃখ বিপরীত
এসে যায়, না রহে পরান।।

সূক্ষ্ম দর্শন-তত্ত্ব ব্যাখ্যায় কৃষ্ণদাস সর্বদা ছন্দ - ভাষায় বৈষম্য রক্ষা করতে পারেননি। তা সবসময়ে সুখ শ্রাব্যত্ত হয়নি। কিছু এমন দুঢ়হ কাজে তিনি যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা আশাতীত সাফল্য লাভ করেছে। তত্ত্বকথা ব্যাখ্যায় স্বল্পাক্ষর গাঢ়বদ্ধ বাক্রীতি প্রয়োগ করেছেন। কেউ কেউ তাঁর ভাষাকে মিশ্রিত ভাষা বললেও, বহুদিন বাঙ্গালার বাইরে বসবাস করা কৃষ্ণদাস যে বাংলা ভাষা কাব্যে প্রয়োগ করেছেন তা প্রকৃত অর্থেই বাংলা অন্যকিছু মিশ্রিত নয়। এমন কি তাঁর কিছু কিছু উক্তি বাংলায় 'সূক্তি'র আকার ধারন করেছে।

এহো বাহ্য আগে কহ তার ।

অবয়জ্ঞ কাক চুযে জ্ঞান-বিশ্ব ফলে।
বসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে।।

আত্মোন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাস।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেমনাম।।

বৈষ্ণবীয় বিষয় কৃষ্ণদাসের সজ্জাসত ছিল। তিনি মহাপ্রভুর বিপুল জীবনের কথার সামান্যই যেন বর্ননা করেছেন -

আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙ্গা টুনি
সে যৈছে তৃষ্ণার পিরে সমুদ্রের পানী।
তৈছ একবর্ন আমি দুঁইল লীলার
এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার।।

শুধু তাই নয় পাঠক সর্ম্পকেও তাঁর শ্রদ্ধাবনতবিষয় প্রকাশ পেয়েছে।

চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে
তাঁহার চরন ধুঞা করি মুঞা পাবে।
শ্রোতার পদরেণু কারো মস্তকে ভূষণ
তেমরা এ অমৃত পীলে মদল হৈল শ্রম।

বৈষ্ণব সমাজে কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত এক অতি মহৎ গ্রন্থ। সপ্তদশ শতাব্দীর বৃন্দাবন বাসী বৈষ্ণব দার্শনিক মোহন্ত বিশ্বনাথ চক্রোবর্তী সংস্কৃতে গ্রন্থটির একটি টীকা গ্রন্থ

লেখেন সংস্কৃত ভাষায় অন্য ভাষার ভক্তদের জন্য। একটি বাংলা বইয়ের জন্য মধ্যযুগে সংস্কৃত ভাষায় টিকা গ্রন্থ রচনার মতো মান্যতা আর কি হতে পারে!

ষোড়শ শতাব্দী বাংলা সাহিত্যের সুবর্ণযুগ

ঊনবিংশ শতাব্দীকে নবজাগরণের যুগ বলা হয়। ষোড়শ শতাব্দীকে বলা হয় অন্য আর এক কারণে। মধ্যযুগ তো পুরোপুরি অন্ধকারের যুগ নয়। এ যুগের ষোড়শ শতাব্দীকে সুবর্ণযুগ বলা যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের পুণ্য আবির্ভাবে বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য এক নতুন প্রাণরসে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। বাংলা সাহিত্যের ক্ষীণ ধারায় যুক্ত হল নূতন প্রাণোচ্ছল স্রোত। চৈতন্যদেবের প্রেম ধর্ম মানুষকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করল। মানববাদী ধর্মের প্রভাবে জাতি ও ধর্ম বৈষম্য হল লুপ্ত। এই সর্বব্যাপী ঐক্যের সাধনায় শিল্প ধর্ম ও জীবন ভাবনায় এক নূতন জাগরণের সূচনা হল। বাংলা সাহিত্যে ষোড়শ শতক সেই অর্থে নবজাগরণের যুগ।

১৪৮৬ খ্রীঃ দোল পূর্ণিমার জ্যোৎস্নালোকে নবদ্বীপের পূর্ববঙ্গের বাহ্মণ জগন্নাথ নিজের বাড়িতে এলেন এই আলোক-উজ্জ্বল মহাপুরুষ নিমাই। শত স্বপ্রতিভাজাত গুণ থাকলেও তাঁর নিজের লেখ তেমন কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় নি। কিন্তু তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে ঘিরে গড়ে উঠল গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়।

দেব নির্ভরতার স্থলে এল মহিমান্বিক জীবনবোধ। মানুষের দৃষ্টি ফিরল মানুষের দিকে। ফলে গড়ে উঠল জীবনী সাহিত্য, যার একমাত্র প্রসঙ্গ 'চোখে দেখা মানুষ'। এই চৈতন্য চেতনার শ্রেষ্ঠদান চৈতন্য চরিত সাহিত্য এবং অন্যান্য জীবনীগ্রন্থ। আবার এ যুগেরই কীর্তি বৃন্দাবনের গোস্বামীদের অনুমোদিত বৈষ্ণব দর্শন। গোস্বামীদের বৈষ্ণবীয় দর্শন ছড়ি সাহিত্য বিকাশে দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়।

i) রাধা ভাবাশ্রিত লীলা বৈচিত্র্যকে অবলম্বন করে সাহিত্য।

ii) জীবনী কথা আশ্রয়ে - চরিত শাখা।

শান্তিপুরে অদ্বৈতচার্য প্রতিষ্ঠিত শান্তিপুর বৈষ্ণব সম্প্রদায় নিত্যানন্দের আখড়া ইত্যাদি।

বৈষ্ণব দর্শন পর্যায়ে যারা চৈতন্যদেবের আবেগ ধর্মকে সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাদের মধ্যে বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীরা উল্লেখযোগ্য। সনাতন, রূপ, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ উট্ট - এরা ছাড়া কৃষ্ণদাসকে ধরলে অবশ্য সংখ্যা দাঁড়ায় সাত।

রঘুনাথ ভট্ট তেমন কোন গ্রন্থ লেখেন নি। ২৮ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করে পুরীধমে চৈতন্যদেবের চরণে আশ্রয় নেন। পরে বৃন্দাবনে এসে বৈষ্ণব গ্রন্থগুলি উত্তম রূপে অধ্যয়ন করেন। 'তবমালা', 'মুক্তাচরিত্র', 'দানকেলি চিন্তামণি'-তে রঘুনাথ দাসের বৈষ্ণব প্রজ্ঞার পরিচয় মেলে। প্রসিদ্ধ চৈতন্যভক্ত গোপাল ভট্ট সম্পর্কে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। রূপ সনাতন ও জীব - এই তিন বৈষ্ণব দার্শনিক বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে আবেগের ধর্মকে সুদৃঢ় মননের উপর প্রতিষ্ঠা করেন। উচ্চ রাজাপদ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন রূপ সনাতন চৈতন্য দর্শনের পর। অনেক রচিত গ্রন্থের মধ্যে সনাতনের 'হরি ভক্তিবিলাস', রূপের

টিপ্পনী

‘ভক্তি রসামৃতসিন্ধু’, ‘উজ্জ্বলনীলমণি’ এবং জীব গোস্বামীর ‘ষটসন্দর্ৎ’, ‘হরিনামামৃত’ –গ্রন্থগুলি এদের গভীর পান্ডিত্য ও মনীষার পরিচয় বহন করে।

চরিত শাখায় চৈতন্য জীবনী ও কবিতা গ্রন্থগুলি সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় রচিত। সংস্কৃত ভাষায় জীবনী ছাড়া জীবনী তারনাম্বনে নাটক ও রচিত হয়। যেমন – বঙ্গদেশীয় বিপ্র পরমানন্দ দাসের ‘চৈতন্যচন্দ্রোদয়’। চৈতন্যজীবনী মহাকাব্য ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ (পরমানন্দ দাস) ছাড়াও রঘুনাথ দাস ও রূপ গোস্বামীর কোন কোন স্তব মূল্যবান। বাংলায় লেখা (চৈতন্যাবদান) কাব্য বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত। গ্রন্থটি তিনটি খন্ডে বিভক্ত –

টিপ্পনী

১) আদিখন্ড – পনেরো অধ্যায় – গয়া হতে প্রত্যাবর্তন।

২) মধ্যখন্ড – সাতাশ অধ্যায় – সন্ন্যাসে পরিসমাপ্ত।

৩) অন্ত্যখন্ড – দশ অধ্যায় – গৌড়ীয় ভক্ত মিলন ও মহোৎসব সমাপ্তি।

ছত্র সংখ্যা প্রায় পঁচিশ হাজার। মানবজীবনের অন্য ঘটনার সঙ্গে নবদ্বীপবাসের বিবরণ জ্বলন্ত প্রত্যক্ষ। যদিও প্রত্যক্ষ করেননি। বাহ্মণ পন্ডিত অনেকে চৈতন্যকে মানতেন। বৃন্দাবন দাসের সহনশীলতা কম ছিল। বৈষ্ণব দৈন্য ভুলে তিনি বলেছেন –

“এত পরিহারে ও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারো তার শিরের উপরে।।”

তিনি চৈতন্য–নিত্যানন্দকে কৃষ্ণ বলরামের অবতার বলে বিশ্বাস করতেন। এই বিশ্বাস, ভক্তি ও ভালোবাসা গ্রন্থকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত করেছে স্নিগ্ধ ও সরস। চৈতন্যকে ঈশ্বর বলে বিশ্বাস করলেও গ্রন্থের চরিত্র চৈতন্য স্বাভাবিক অথচ অদ্ভূত প্রকৃতির মানুষ। অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী মানুষ। বাঙালী মানুষ, চৈতন্যজীবনী গ্রন্থের চৈতন্য জীবনের প্রথম দিকের কথা বিস্তৃত আছে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে আর কৃষ্ণদাস কবিরাজ ভাগবতের উক্ত অংশ সংক্ষিপ্তে আর সন্ন্যাসের পর চৈতন্যের জীবন ও আচরণ তথা বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের নিগৃঢ় মর্ম কথা বলেছেন। তাঁর চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে, চৈতন্যভাগবতের পরিপূরক চৈতন্যচরিতামৃত একথা বলতে বাধা নেই। মন্ত্রগুরু নিত্যানন্দের আজ্ঞায় নৈহাটির নিকটে কামটপুর নিবাসী কৃষ্ণদাস ষড় গোস্বামীকে ‘শিক্ষাগুরু’ মেনে নিয়ে কাব্য লিখতে বসেন। কাব্যটি তিনখন্ডে বিভক্ত। খন্ডের নাম লীলা –

১) আদিলীলা – সতের পরিচ্ছেদে বন্দনা থেকে যৌবনলীলা।

২) মধ্যলীলা – পঁচিশ পরিচ্ছেদে নীলাচল প্রত্যাগমণ

৩) অন্ত্যলীলা – বিশ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভু রচিত শিক্ষাষ্টক আস্বাদান উক্ত।

‘চৈতন্যচরিতামৃত’ শুধু আখ্যান গ্রন্থ নয়। তত্ত্ব গ্রন্থ ও চৈতন্যজীবনী কথার সঙ্গে চৈতন্য অবতার তত্ত্ব কথা যুগপৎ এবং অঙ্গাঙ্গী ভাবে বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত –

“রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধারি।
অন্যোন্য বিশ্বাসে রস আস্বাদন করি।।
সেই দুই এক ত্রান চৈতন্য গোঁসাঞি।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই।।”

সনাতন রূপের ভক্তিরসতত্ত্ব এবং স্বরূপ দামোদর রঘুনাথের পারসতত্ত্ব বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণ যুক্ত বিচারে প্রতিষ্ঠিত। দুরূহ বিষয়কে বাংলায় সহজ সম্বন্ধ আনতে পেরেছেন তাঁর রচনারীতির নিজস্বেতার জন্য। চৈতন্যের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেননি কারণ ঈশ্বর মৃত্যুহীন।

জয়ানন্দ ও লোচনদাস

আবৃত্তি যোগ্য 'চৈতন্যমঙ্গল' জীবনী কাব্যরচনা করেন। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' জীবনী কথা ও অলৌকিক ঘটনা আছে। চৈতন্য মৃত্যুর কথা থাকায় কাব্যটি বৈষ্ণব সমাজে উপেক্ষিত হয়। লোচনদাস চৈতন্যদেবকে নাগর এবং ভক্তবৃন্দকে নাগরী বলেন যা গৌড়-নাগরী ভাব নামে পরিচিত। জীবনকথা ও কবিত্বশক্তির অদ্ভূত মিলন আছে। চৈতন্যজীবনীর আড়ালে অন্যান্য কিছু গুরু জীবনী গ্রন্থের মধ্যে বৃন্দাবন দাস রচিত নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর 'বংশ বিস্তার', হরিচরণ দাসের 'অদ্বৈত মঙ্গল' উল্লেখযোগ্য, এছাড়া কড়চা অর্থাৎ খসড়া লেখা হিসাবে মুরারি গুপ্তের কড়চা, স্বরূপ দামোদরের কড়চা, গোবিন্দদাসের কড়চা প্রভৃতি জীবনী ধারায় যুক্ত।

ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা সংস্কৃতির সাহিত্য ধারায় চৈতন্য প্রভাবে জীবনীকাব্য নাটক বৈষ্ণব দর্শন, বৈষ্ণব পদ নিয়ে এল বিপুল আলোড়ন পেলাম প্রথম জীবনী গ্রন্থ, প্রথম গৌরচন্দ্রিকা পদ, জীবনী নিয়ে নাটক, গদ্য জাতীয় কড়চা তথা মানুষের মহামিলন। সর্বোপরি রাধা-কৃষ্ণের এই অবৈধ প্রেম কাহিনী রূপক হিসাবে ভক্ত-ভগবানের প্রেম হিসাবে সাহিত্য যুক্ত হল।

সাহিত্য বিকাশের অপর ধারা হল পদাবলী শাখা চৈতন্যের আখেটিক জীবন প্রভাবে পদাবলী সাহিত্যের গুণগত ও পরিমাণগত সমৃদ্ধি লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে। চৈতন্যদেবকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করে এই ভক্ত কবি সম্প্রদায় মহাজন আখ্যায় ভূষিত হন। নরহরি দাস, মুরারি গুপ্ত, গোবিন্দ মাধব, বাসুদেব ঘোষ, বলরাম দাস, বৃন্দাবন দাস, জ্ঞানদাস – ইত্যাদি পদকর্তা চৈতন্য প্রবর্তিত নূতন ধর্মালোকে পদচারণা করতে থাকেন। এই কবিগণ শ্রী চৈতন্যকে রাধা-কৃষ্ণের সম্মিলিত অবতার রূপে প্রতিষ্ঠা করে 'গৌরচন্দ্রিকা' জাতীয় পদ সাহিত্য জীবনী গ্রন্থের মত প্রথম রচনা করলেন। এইভাবে ষোড়শ শতাব্দী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সুবর্ণযুগে পরিণত হয়েছে।

প্রশ্নাবলী

১) সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় রচিত চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলির গ্রন্থকর্তাসহ নাম লেখো।

২) সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্যজীবনী কাজ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

৩) বাংলা ভাষার প্রথম চৈতন্যজীবনী গ্রন্থ কোনটি? রচনাকারের পরিচয় দিয়ে গ্রন্থটি সম্পর্কে আলোচনা করো।

৪) কৃষ্ণদাস কবিরাজ কাকে কেন 'চৈতন্যলীলার ব্যাস' বলেছেন? তাঁর কাব্যটির বিশিষ্টতা আলোচনা করো।

৫) বাংলা ভাষার চৈতন্যচরিত কাব্যগুলির মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ এবং কেন?

৬) কৃষ্ণদাস কবিরাজের পরিচয় দিয়ে তাঁর লিখিত চৈতন্যচরিত কাব্যটির বিশিষ্টতার পরিচয় দাও।

টিপ্পনী

৭) লোচনদাস ও জয়ানন্দের চৈতন্যজীবনী কাব্য দুটির পরিচয় দাও।

৮) ষোড়শ শতাব্দীকে বাংলা সাহিত্যের সুবর্ণ যুগ বলা হয় কেন যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

৯) বাংলা ভাষার চৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো। .

টিপ্পনী

বৈষ্ণব পদাবলী

বাংলা সাহিত্যের যে কটি রত্ন বিশ্বসাহিত্যের নবরত্নসভায় চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছে, বৈষ্ণব পদাবলী তার মধ্যে অন্যতম। মধ্যযুগের সাহিত্য সম্পদের মধ্যে অনুবাদ সাহিত্যে কবিত্ব থাকলেও তা মৌলিক রচনা নয় – সংস্কৃত সাহিত্যের বা হিন্দী-অবধী-ফারসী সাহিত্যের অনুবাদ। মঙ্গলকাব্যে মধ্যযুগের সমাজ বাস্তবতার এক অনবদ্য আকার হলেও তাতে কবিত্বের নমুনা অপ্রতুল। বৈষ্ণব পদাবলী "বসন্তকালের অপর্যাপ্ত পুষ্পমঞ্জরীর মতো; যেমন তাহার ভাবের সৌরভ তেমনি তাহার গঠনের সৌন্দর্য।" ('কবি-সংগীত', 'লোক সাহিত্য', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের চৈতন্য সমসাময়িক ও চৈতন্যউত্তর বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের গান গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের আধ্যাত্মিকতার সীমানা ছাড়িয়ে পার্থিব সৌন্দর্যের শিখরদেশ স্পর্শ করেছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের আহ্বানে "হরিভক্তি"-র প্লাবনে ব্রাহ্মণ থেকে চন্ডাল সকলেই সমানাধিকার লাভ করেছিল। শুধু চতুবর্ণের হল অচল সীমারেখাই নয় হিন্দু-মুসলমানের ভেদরেঘাটিকেও মুছে দিয়ে মানবিকতার বিজয়মন্ত্র ঘোষিত হয়েছিল শ্রীচৈতন্যদেবের কণ্ঠে – এই কারণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর লোকসাহিত্য প্রবন্ধগ্রন্থের "গ্রাম্য সাহিত্য" প্রবন্ধে বলেছেন – "বৈষ্ণবের গান স্বাধীনতার গান। তাহা জাতি মানে না, কুল মানে না। অথচ এই উচ্ছৃঙ্খলতা সৌন্দর্য বন্ধনে হৃদয় বন্ধনে নিয়মিত।" বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের মিলন বিরহ পার্থিব মিলন-বিরহেরই এক অনন্য রূপায়ণ যেখানে ব্রাহ্মণ্য সমাজের চোখ রাঙানি নেই, নেই কোন পুরাণ-সংহিতার কঠোর অনুশাসন।

শুধু বৈষ্ণব গানেই নয়, সেকালের সন্ত ও সুফী সাধন সংগীতেও পুরাণ ও কোরাণের আবার সর্বস্বতাকে দূরে সরিয়ে মানবিক প্রেমের জয়গানে প্লাবিত করেছিল আসমুদ্র হিমাচল; পশ্চিম এশিয়া এমনকি ইউরোপের বিস্তৃত ভূখণ্ডেও সমাদৃত হয়েছিল সুফী-ত্রুবাদুর ঐতিহ্যে প্রতিপালিত এই পার্থব প্রেমগান।

বাংলা-বজবুলি বৈষ্ণব কবিতায় চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতি প্রাক চৈতন্য যুগের কবি। ভারতে প্রাক চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব কবিতার ইতিহাস অতি সুদীর্ঘ। খ্রীষ্ট জন্মেরও পূর্ববর্তী কালে তামিল বৈষ্ণব কবি সম্প্রদায় আলোয়ারদের গানে-কবিতায় বিষ্ণু আরাধনার প্রথম পর্যায় সূচিত হয়। সংস্কৃত ও প্রকৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী 'শৃঙ্গার শতক', 'অমরু শতক', 'কবীন্দ্র সমুচ্চয়', 'সুযুক্তি কর্ণামৃত', 'সুভাষিত মুক্তাবলী', 'শারঙ্গধর পদ্ধতি', 'গাথা সওসঈ' , 'বহুলগ্‌গ' -এ নরনারীর প্রেম বিষয়বস্তুরূপে গৃহীত হলেও তাতে সম্ভোগেরই প্রাধান্য ছিল। বাঙালীর কবি তথা সংস্কৃত সাহিত্যের শেষ উল্লেখনীয় শ্রষ্টা জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-ই প্রথম রাজসভার কাব্যদুৎতির সঙ্গে সঙ্গে 'মধুরকোমল কান্তপদাবলীর' কাব্যময়তা তথ্য প্রেমের উৎকর্ষতাকে প্রতিফলিত করে। জয়দেবের সময়ে পদাবলী যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল তা মিথিলার রাজসভা কবি বিদ্যাপতি এবং 'সহজ ভাষার সহজ ভাবের কবি' চন্ডীদাসের কবিকৃতিত্বে আরও বিস্তার লাভ করে। রাধা কৃষ্ণ প্রেমের যে ভুবন এই কবিদ্বয় রচনা করেছিলেন সেখানে – "বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চন্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন।" ('চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতি', 'সমালোচনা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) চৈতন্যদেবের প্রভাবে ও গৌড়ীয়

টিপ্পনী

বৈষ্ণব দর্শনের ভক্তিরসে সিক্ত হয়ে এই পার্থব প্রেমের কবিতাই মর্ত্যকামনার সীমানা অতিক্রম করে অমর্ত্যলোকের উদ্দেশ্যে ধাবিত হয়েছিল।

২

রাধিকার ভাব কান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজরস আস্বাদিতে চৈতন্য অবতার।।

টিপ্পনী

শ্রীরায় রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সূত্র ধরে শ্রীচৈতন্য দেবের এই স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। "রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ" শ্রীচৈতন্যদেব – বহিরঙ্গে রাধা অন্তরঙ্গে কৃষ্ণ। শ্রীচৈতন্যের এই রাধাভাবের রাগানুগা ভক্তি ভাবে আপ্লুত হয়ে ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের বৈষ্ণব কবিগণ রচনা করেছেন গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ ও গৌরচন্দ্রিকা।

"গৌরাঙ্গ নহিত কি মেনে হইত
কেমনে ধরিত দে।
রাধা মহিমা প্রেম রসসীমা
জগতে জানাত কে।"

নরহরি সরকারের গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদে, কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখা চৈতন্যজীবনী সাহিত্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-এর মধ্যলীলার ৮ম পরিচ্ছেদের রাধাতত্ত্ব তথা রাগানুগা ভক্তিবাদ কাব্যরূপায়িত হয়েছে।

বৈষ্ণব পদাবলীর বিভিন্ন পর্যায়ের পালাকীর্তন গাইবার পূর্বে কীর্তনীয়াগণ যে গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদের মাধ্যমে রাধাভাবসমন্বিত শ্রীচৈতন্যের ঐ পর্যায়ের তুলনা করেন তাকেই বলে গৌরচন্দ্রিকা।

"ঘরের বাহিতে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস যখন
কদম্ব-কাননে চায়।"

শ্রীরাধিকার পৌঢ় পূর্বরাগের প্রধান দশটি সথগরী ভাবের 'উদ্বেগ' দশার যে বর্ণনা দিয়েছেন চণ্ডীদাস তার তদুচিত গৌরচন্দ্রিকায় মহাজনী পদকর্তা রাধামোহন ঠাকুর বলেছেন ঃ

"আজুহাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপচন্দ।
করতলে করই বয়ন অবলম্ব।।
পুনপুন গতাগতি করু ঘর পন্থ।
খেনে খেনে ফুলবনে চলই একান্ত।।"

রাধামোহন ঠাকুরের পদের শেষ দুটি চরণে শ্রীরাধিকার পূর্বরাগের 'উদ্বেগ'-এর সমঅবস্থা রূপায়িত হয়েছে নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীচৈতন্যদেবের মাধ্যমে।

গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ বা গৌরচন্দ্রিকায় যে সবসময় রাধাভাবে ভাবিত শ্রীচৈতন্যের ছবি আঁকা হয়েছে তা নয়; কৃষ্ণের বাল্যলীলা, কৈশোরলীলা, প্রেমলীলার তদুচিত গৌরাঙ্গ বিষয়ক

পদ বা গৌরচন্দ্রিকায় গৌরাঙ্গকে কৃষ্ণভাবে ভাবিত অবস্থাতেই দেখা গেছে। বাসু ঘোষের পদ

"হরি হরি গোরা কোথা গেল
....
অনুক্ষণ মনে পড়ে গোরা মুখ খানি।"

মাথুরের গৌরচন্দ্রিকা, এই পদের পরেই কীর্তনীয়াগণ আখর সহযোগে গাইতে থাকেন বিদ্যাপতির পদ

"অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুলমাণিক কোহরি নেল।।"

আবার বল্লভদাসের পদ –

"নিতাই করিয়া আগে চলিলেন অনুরাগে
আইল সবাই শান্তিপুরে
মুড়াইছে মাথার কেশ ধর‍্যাছে সন্ন্যাসীর বেশ
দেখিয়া সবার প্রাণ ঝরে।"

–এটি একটি গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ হলেও পালাকীর্তনের কোন পর্যায়ের ভূমিকা হিসেবে এটি গাওয়া যাবে না – অর্থাৎ এটি গৌরচন্দ্রিকা নয়, চৈতন্যজীবনী বিষয়ক পদাবলী। নরহরি সরকার, মুরারি গুপ্ত, গোবিন্দ ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, শিবানন্দ সেন, রামানন্দ বসু, বংশীবদন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কবিগণ নবদ্বীপলীলার সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁদের রচিত পদসমূহ ভাব-ভাষা-ছন্দে গৌরচন্দ্রিকার মত উৎকৃষ্ট না হলেও শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনীলীলার আবেগময় রূপায়ণে অতুলনীয়।

গৌরচন্দ্রিকা ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ যদি চৈতন্য পূর্ববর্তী ও চৈতন্য সমসাময়িক-চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে একটি পার্থক্যকে সূচিত করে, তাহলে অপর একটি পার্থক্য হল বৈষ্ণব পদাবলীর ভাব ও রসের বৈচিত্র্য।

৩

ভরতের নাট্যশাস্ত্র ও পরবর্তী অলঙ্কার শাস্ত্রমতে অষ্টরস ও নবরস উল্লিখিত হলেও রূপ গোস্বামীর 'ভক্তিসামৃত সিন্ধু-' অনুযায়ী গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে পঞ্চস্থায়ীভাব বা রতিসঞ্জাত পঞ্চরস। শম, সেবা, বিশ্রম্ভ, বৎসলতা ও মধুরা রতির পরিণতি শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর বা শৃঙ্গার রস। মধুর বা শৃঙ্গার রসের নামান্তর হল উজ্জ্বলরস। এই রসের আবার দুটি প্রকারভেদ বিপ্রলম্ব ও সম্ভোগ

টিপ্পনী

টিপ্পনী

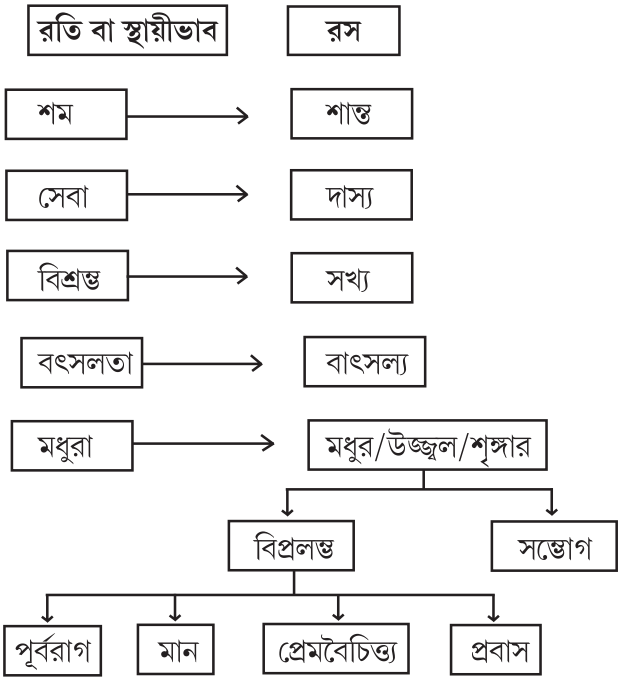

বিপ্রলম্ভ হল মিলনের বিপরীত অবস্থা।

“কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্ধতে।”

অর্থাৎ রঞ্জিত বস্ত্রকে আবার রাঙালে রঙের গাঢ়ত্ব যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনই বিপ্রলম্ভের মধ্য দিয়ে সম্ভোগ বা মিলনের আনন্দ আরও গাঢ় হয়। বিপ্রলম্ভ চার প্রকারের ঃ পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস।

পূর্বরাগ ঃ

“রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শনশ্রবণাদিজ।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্বরাগঃ স উচ্যতে।।” ‘উজ্জ্বলনীলমণি’

সঙ্গমের আগে দর্শন ও শ্রবণে যে রতির জন্ম হয় এবং নায়ক-নায়িকার উন্মীলন বা বিভাবের মিশ্রণে যা আস্বাদনযোগ্য হয় প্রাজ্ঞজন তাকেই বলে পূর্বরাগ।

“সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।।”

চন্ডীদাসের পদে রাধার কৃষ্ণনাম শ্রবনজাতি পূর্বরাগ অবস্থার চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে।

পূর্বরাগের তিনটি শ্রেণী সাধারণ, সমজ্ঞান ও প্রৌঢ়;

পূর্বরাগের দশটি দশা হল ১) লালসা, ২) উদ্বেগ, ৩) জাগর্জা, ৪) তানব, ৫) জড়তা, ৬) ব্যগ্রতা, ৭) ব্যাধি, ৮) উন্মাদ, ৯) মোহ, ১০) মৃত্যু।

"রূপলাগি আঁখি ঝুরে গুণে মোন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে। প
ুরান পিরীতি লাগি থির নাহি রান্ধে।।"

জ্ঞানদাসের এই পদে প্রৌঢ় পূর্বরাগের 'ব্যগ্রতা' – র দশা চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। আবার কৃষ্ণের–রাধার রূপ দর্শনজাত পূর্বরাগের পদে গোবিন্দদাস বলেছেন

টিপ্পনী

"যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু–জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি।। 'উজ্জ্বলনীলমণি'
....
দেখ সখি কো ধনি সহচরী মেলি।
আমারি জীবন সঞে করতহি খেলি।।"

মান ঃ

"দম্পত্যোর্ভাব একত্র মতোরপ্যনুরক্তয়োঃ।
স্বাভীষ্টাশ্লেষ বীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে।।"

অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত একত্রে থাকা দম্পতি বা নায়ক–নায়িকার নিজেদের অভিমত, আলিঙ্গনও বীক্ষণের নিরোধককে বলে মান।

এ সম্পর্কে 'উজ্জ্বল চন্দ্রিকা'–য় বলা হয়েছে –

"স্নেহের উৎকর্ষে হয় মাধুর্য নূতন।
তাহে অদাক্ষিণ্যে মান কহে বধূগণ।।"

জ্ঞানদাসের রাধা মান করে বলেছে –

"শুন শুন মাধব না বোলহ আর। ি
ক ফল আদয়ে এত পরিহার।।
....
অলপে বুঝলুঁ হাম তুয়াক পিরীত।
নামহি যৈছে অন্তরে সোই রীত।।"

আবার কবিশেখরের রাধা সখীদের সামনেই মানিনী হলেন

"ধনি ভেলি মানিনী সখীগণ মাঝ।
অনুনয় করইতে উপজায় লজে।।"

যদিও শেষ পর্যন্ত –

"অধরে মুরলী যব ধরু বনমালী।
ফোই করবী ধনি বান্ধি সঞারি।।"

কৃষ্ণের বাঁশী বাজাবার উপক্রম হতেই মানভুলে মিলনের আশায় করবী বাঁধতে শুরু করল শ্রীরাধা।

প্রেম বৈচিত্ত্য ঃ

"প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেহণি প্রেমোৎকর্ষ স্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে।।" 'উজ্জ্বলমণি'

প্রেমের উৎকর্ষবশে প্রিয়ের সন্নিকটে থাকা সত্ত্বেও যে বিচ্ছেদবেদনার উপলব্ধি হয় তাকেই বলে প্রেম বৈচিত্ত্য।

চণ্ডীদাসের "দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া" প্রেমবৈচিত্ত্যের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। প্রেম বৈচিত্ত্যের কারণে শ্রীরাধিকার মান যে আটটি বিষয়ে আক্ষেপ হয় তা হল – ১) কৃষ্ণের প্রতি, ২) নিজের প্রতি, ৩) সখীর প্রতি, ৪) দূতীর প্রতি, ৫) মুরলীর প্রতি, ৬) বিধাতার প্রতি, ৭) কন্দর্পের প্রতি এবং ৮) গুরুজনের প্রতি আক্ষেপ।

চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য জ্ঞানদাস আক্ষেপানুরাগের পদে বলেছেন ঃ

"সুখের লাগিয়া   এ ঘর বাঁধিনু
আনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে   সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।।"

প্রবাস ঃ

"পূর্বসঙ্গ তয়োর্যু নোর্ভবেঙ্গে শান্তরাদিভিঃ।
ব্যবধানন্তু যৎ প্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতির্যতে।।" 'উজ্জ্বলমণি'

পূর্বে মিলিত হয়েছেন এমন নায়ক-নায়িকার দেশান্তর গমনের কারণে যে বিচ্ছেদ ঘটে তাকে বলে প্রবাস। প্রবাসের দ্বিবিধ পর্যায় – অদূর ও সুদূর।

সুদূর প্রবাস হল মাথুর। মাথুরের পদে বিদ্যাপতি শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত –

"এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর
এ ভরা ভাদর   মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।।"

মিলনের অভাবজনিত বেদনাবোধে সমৃদ্ধ বিপ্রলম্ভের এই চতুবিধ পর্যায়ে যে বিচিত্র রসব্যঞ্জনার প্রকাশ ঘটে তা দুঃখকে রসোত্তীর্ণ করে মহাজনী পদকর্তাদের শ্রেষ্টত্ব ঘোষণা করেছে।
বৈষ্ণবীয় অলঙ্কার শাস্ত্রমতে নায়িকার অষ্টরূপ – ১) অভিসারিকা, ২) বাসক সজ্জিকা, ৩) উৎকণ্ঠিতা, ৪) বিপ্রলব্ধা, ৫) খণ্ডিতা, ৬) কলহান্তরিতা, ৭) প্রোষিতভর্তৃকা, ৮) স্বাধীনভর্তৃকা।

৪

প্রাক্-চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদাবলীর পার্থক্য

☐ মধ্যযুগে চৈতন্য প্রভাবে সাহিত্য, দর্শন ও শিল্পকলায় এক নবজাগরণ ঘটে যাকে অনেকে চৈতন্যরেনেসাঁ হিসেবেও আখ্যায়িত করেছেন। এর ফলে বৈষ্ণব পদাবলীতে বহু বিচিত্র

ভাব ও রসের সমাগণ ঘটে যা চৈতন্য পূর্ববর্তী কবিদের রচনায় ছিল না;

- গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদের সঙ্গে সঙ্গে, বৈষ্ণব পদাবলীর বিষয় বৈচিত্র চৈতন্য পূর্ববর্তী পদকর্তাদের সঙ্গে চৈতন্য সমসাময়িক বা চৈতনোত্তর পদকর্তাদের পার্থক্য সূচিত করে।

- চৈতন্যদেব নবদ্বীপে নাম সংকীর্তনের গ্রন্থিবন্ধনে আবন্দাল বাঙালীকে একসূত্রে বেঁধেছিলেন। শুধু তাই নয়, বাংলার সঙ্গে নীলাচল ও বৃন্দাবনকে গ্রন্থিত করে শিল্প-সাহিত্য-দর্শনের আদান প্রদানের পথটিকে করেছিলেন প্রসারিত। যার ফলে ষোড়শ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে অসংখ্য পদকর্তার পদামৃত সমুদ্রে প্লাবিত হয়েছিল রসিক হৃদয়। চৈতন্য পূর্ববর্তী বৈষ্ণব কবিতার ক্ষেত্রে যা কোনভাবেই সম্ভব ছিল না।

- হরিনাম সংকীর্তনের যে ধারার প্রবর্তন করেছিলেন স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব এবং যে নামসংকীর্তন প্রচারের জন্য তিনি কাজীর নিষেধ অমান্য করে বাংলার ইতিহাসে প্রথম গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা ঘটিয়েছিলেন সেই নামকীর্তনের ধারাকেই উত্তরভারতীয় মার্গীয় সংগীতের অবয়বে সজ্জিত করেন নরোত্তম ঠাকুর। বৃন্দাবনের সন্ত সাধক স্বামী হরিদাসের কাছে প্রবন্ধ গান ধ্রুবপদের সাংগীতিক শিক্ষালাভ করেছিলেন। স্বামী হরিদাসের আর এক শিষ্য তানসেন যেভাবে মুঘল সম্রাট আকবরের রাজদরবারের ধ্রুপদ গায়নশৈলীর জন্ম দিয়েছিলেন ঠিক সেভাবেই ষোড়শ শতকের শেষ পর্বে গরানহাট পরগণার খেতুরীতে আয়োজিত বৈষ্ণবীয় মহাসম্মেলনে গরানহাটী শৈলীর ধ্রুপদীয় কীর্তন গানের জন্ম দেন।

- রাধিকার বিভিন্ন মানসিক অবস্থাকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণবীয় অলঙ্কার শাস্ত্রে যে অষ্টনায়িকার অষ্টপর্যায় বিভাগ করা হয়েছে, সেই পর্যায়গুলোকে আবার আটটি উপপর্যায়ে বিভক্ত করে সর্বমোট চৌষট্টিটি রসপর্যায় পরিকল্পিত হয়েছে। বৈষ্ণবীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের এই রসপ্রকরণ গরাণহাটী শৈলীর ধ্রুপদীয় কীর্তনধারায় রসসিক্ত হয়ে বাংলা গানের এক নবজাগরণ ঘটিয়ে দেয়, চৈতন্য পূর্ব বৈষ্ণব পদাবলীর ক্ষেত্রে এ ছিল কল্পনারও অতীত।

- চৈতন্য পূর্ববর্তী বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে পরবর্তী কালের বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে আর একটি পার্থক্য সূচীত করেছে গৌরনাগরপদ বা গৌরপারম্যবাদ। গৌরনাগর বা গৌরপারম্যবাদীগণ চৈতন্যকে কৃষ্ণনাগর ভাবে এবং নিজেদেরকে বজের গোপিনী বা নাগরীভাবে কল্পনা করেন। চৈতন্য পার্ষদ নবদ্বীপের মুরারী গুপ্ত, শ্রী খণ্ডের নরহরি সরকার, বাসুদেব ঘোষ এবং কাঁচড়াপাড়ার শিবানন্দ সেন – এই মতবাদের অগ্রদূত। তাঁরা কৃষ্ণ বা জগন্নাথ দেবকে এড়িয়ে গৌরাঙ্গকেই পরমতত্ত্বরূপে গ্রহণ করেছিলেন। চৈতন্যজীবনীকার বৃন্দাবনদাস তথা বৃন্দাবনের গোস্বামী সম্প্রদায় এই মতবাদকে স্বীকৃতি দেননি। মুরারী গুপ্ত, নরহরি সরকার, বাসুদেব ঘোষ, শিবানন্দ সেন চৈতন্য সমসাময়িক এই চার মহাজনই তাঁদের রচিত বৈষ্ণব পদাবলীতে গৌরপারম্যবাদ রূপায়িত করেছেন; তাঁদের উত্তরাধিকার পেয়েছেন নরহরি সরকারের শিষ্য চৈতন্যজীবনীকার লোচনদাসের পদে শ্রীচৈতন্যদেব পুরোপুরিভাবেই শৃঙ্গার রসের নায়ক।

> "এক নাগরী বলে দিদি নাইতে যখন যাই।
> ঘোমটা খুলে বদন তুলে দেখেছিলেন ভাই।।
> রূপ দেখে চমকে উঠে ঘরকে এলাম ধেয়ে।
> দুই নয়ন বাঁধা রইল গৌরপানে চেয়ে।।"

টিপ্পনী

এভাবেই নাগরীভাবের কল্পনায় প্রেম ও কামের মিশ্রণ ঘটিয়ে গৌরনাগরতত্ত্ব পরবর্তীকালের সাংখ্য-তন্ত্র-যোগাচার নির্ভর বৈষ্ণব সহজিয়াবাদের অভ্যুদয়ের পথ প্রশস্থ করেছে।

৫

অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত গ্রন্থে ষোড়শ শতাব্দীকে বলেছেন "বৈষ্ণব মতাদর্শের সংহতির যুগ;" সপ্তদশ শতাব্দী তাঁর মতে "সেই আদর্শ সম্প্রসারণের যুগ;" অষ্টাদশ শতককে বলা হয়ে থাকে বৈষ্ণব পদ সঙ্কলনের যুগ।

টিপ্পনী

ষোড়শ শতকের বৈষ্ণব পদকর্তাদের আবার কালের মাত্রায় দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে –

১) চৈতন্য সমসাময়িক বৈষ্ণব পদকর্তা – (ষোড়শ শতক)

এই পর্যায়ের পদকর্তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন – ক) মুরারী গুপ্ত খ) নরহরি সরকার গ) শিবানন্দ সেন ঘ) গোবিন্দ ঘোষ ঙ) মাধব ঘোষ চ) বাসুদেব ঘোষ ছ) রামানন্দ বসু ও জ) বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়

২) চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব পদকর্তা (ষোড়শ শতক)

এই পর্যায়ের পদকর্তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন – ক) বলরাম দাস খ) জ্ঞানদাস গ) মাধব দাস (মাধবচার্য) ঘ) অনন্ত দাস ঙ) চৈতন্য জীবনীকার ও অপ্রধান পদকর্তা।

৩) সপ্তদশ শতকের বৈষ্ণব পদকর্তা

সপ্তদশ শতকে, বৈষ্ণবীয় ভাবাদর্শে সম্প্রসারণের জোয়ারে ভাববৈচিত্র্য ও সংখ্যা প্রাবল্যে বৈষ্ণব পদাবলীর বন্যাস্রোতে সারা বাংলা ভেসে গেছিল।

ক) এই পর্বের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা গোবিন্দদাস কবিরাজ

খ) এই পর্বের তিনজন প্রধান বৈষ্ণবীয় আচার্য শ্রীনিবাস – নরোত্তম – শ্যামানন্দ-এর মধ্যে কবি প্রতিভায় নরোত্তম ঠাকুর ছিলেন শ্রেষ্ঠ।

গ) সপ্তদশ শতকের উল্লেখনীয় পদকর্তারা হলেন – i) রায়শেখর ii) রায়বাসন্ত বা বসন্তরায়

ঘ) সপ্তদশ শতকের অন্যান্য পদকর্তারা হলেন – i) যদুনন্দন ii) কবিবল্লভ iii) ঘনশ্যামদাস iv) চম্পতি এবং v) জগদানন্দ

৪) অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব পদসঙ্কলন

এই কালের প্রধান সঙ্কলন গ্রন্থগুলো হল – ক) বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' খ) নরহরি চক্রবর্তীর 'গীতচন্দ্রোদায়' এবং 'গৌরচরিত চিন্তামণি'। গ) রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃত সমুদ্র' ঘ) বৈষ্ণব দাসের 'পদকল্পতর' ঙ) অপ্রধান বৈষ্ণব সঙ্কলনগ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখনীয় হল – i) গৌর সুন্দর দাসের – কীর্তনানন্দ এবং ii) দীনবন্ধু দাসের 'সঙ্কীর্তনামৃত'।

৫) অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব পদকর্তা

অষ্টাদশ শতক বৈষ্ণব পদসঙ্কলনের যুগ হলেও স্বল্প সংখ্যক পদকর্তা এই পর্বে কিছু উল্লেখনীয় পদ রচনা করেছে – তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন – ক) প্রেম দাস (প্রেমানন্দ দাস) খ) গোকুলচন্দ্র

– গোকুলানন্দ গ) শেখর ভ্রাতৃদ্বয় – চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর

একালের অপ্রধান পদকর্তারা হলেন i) বিশ্বম্ভর দাস ii) অকিঞ্চন দাস iii) সর্বানন্দ iv) রাধানাথ দাস v) মুকুন্দদাস বা রাধামুকুন্দ দাস vi) পরাণদাস vii) গদাধর দাস।

৬) মুসলমান বৈষ্ণব পদকর্তা

সঙ্কলন গ্রন্থে যে সব মুসলমান কবিদের বৈষ্ণব কবিতা সংকলিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে উল্লেখনীয় হলেন – ক) দৌলত কাজী খ) সৈয়দ আলাওল গ) সৈয়দ মতুজা ঘ) নসির মামুদ এবং ঙ) আলী রাজা।

টিপ্পনী

৬

১) ষোড়শ শতকের চৈতন্য সমসাময়িক বৈষ্ণব পদকর্তা

ক) মুরারি গুপ্ত

চৈতন্যদেবের পিতা জগন্নাথ মিশ্র যেমন আদি নিবাস শ্রীহট্ট ছেড়ে নবদ্বীপে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন মুরারি গুপ্তের পরিবারও সেভাবেই শ্রীহট্ট ছেড়ে চলে আসে নবদ্বীপে। বয়সে মুরারি গুপ্ত ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের থেকে একটু বড়। দুজনেই গঙ্গাদাস পন্ডিতের ছেলে পড়াশুনা করেছেন। মুরারি গুপ্তই প্রথম চৈতন্যজীবনী রচনা করেন। সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই গ্রন্থের নাম শ্রী শ্রী কৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত; যা সাধারণভাবে মুরারি গুপ্তের কড়চা নামেই খ্যাত। বৈষ্ণব পদকর্তা হিসেবে ও তাঁর কৃতিত্ব কম ছিল না। 'পদকল্পতরু'তে মুরারি ভণিতায় তিনটে পদ সঙ্কলিত হয়েছে। জগদ্বন্ধু ভদ্রের 'গৌরাঙ্গপদতরঙ্গিনী'তে নয়টি গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ সঙ্কলিত হয়েছে। যার দুটি পদ আবার বজবুলিতে রচিত। মুরারি, মুরারি গুপ্ত, দাস মুরারি এই সকল নামই তাঁর ভণিতা থেকে পাওয়া যায়। অতি স্বল্প সংখ্যক পদ লিখেছিলেন বলে পদকর্তা। হিসেবে তাঁর কবিখ্যাতি কম হলেও 'কড়চা'-র রচয়িতা হিসেবে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

গৌরাঙ্গ বিষয়ক নিম্নলিখিত পদে পদে গৌরাঙ্গের শৈশব অবস্থার যে ছবি তিঁনি এঁকেছেন তা বাৎসল্যরসে প্রাচুর্যময়।

"শবীর আঙ্গিনা মাঝে ভুবনমোহন সাজে
গোরাচাঁদ দেয় হামাগুড়ি
মায়ের আঙ্গুল ধরি ক্ষণে চলে গুড়ি গুড়ি
আছাড় খাইয়া যায় পড়ি"

কবির বাৎসল্য রসের কবিতা যেমন বলরাম দাসের কথা মনে করিয়ে দেয় আক্ষেপানুরাগের পদে কবি আবার চন্ডীদাসের অনুযায়ী।

"কি ছাড় পিরীতি কৈলা জীয়ন্তে বধিয়া আইলা
বাঁচিতে সংশয় ভেল রাই।
সবারী সলিল বিন গোঙাইব কতদিন
শুন শুন নিঠুর মাধাই।"

বজবুলিতে রচিত কবির পদও উৎকৃষ্ঠ –

"তপন কিরণ যদি অঙ্গ না দগধল
কি করব হল অভিষেকে
দুঃখ ভয়ে প্রাণ বাহির যবে নিকসব
কি করব ঔষধ বিশেষে।।"

চৈতন্য পূর্ববর্তী চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির প্রভাব থাকলেও মুরারী গুপ্তের আবেগ হৃদয় ছুঁয়ে যায় বিশেষ করে গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদে প্রতঘন্দর্শীরে অভিজ্ঞতা কাব্যময়তায় সমৃদ্ধ হয়েছে। চৈতন্য ভাবোন্মাদ অবস্থায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে রাস্তায় পড়ে যাচ্ছে দেখে বাচী মায়ের ব্যাকুলতা কবি যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা চরম উৎকর্ষতার দাবীদার

"ধর ধর রে নিতাই আমার গৌরে ধর।
আছাড় সময়ে অনুজ বলিয়া
বারেক করুণংকর।।
আচার্য গোঁসাই দেখি ও নিতাই
আমার আঁখির তারা।
না জানি কি ক্ষণে নাচিতে কীর্তনে
পরাণে হইব হারা।।"

খ) নরহরি সরকার

শ্রী খণ্ডের বৈদ্যবংশাজাত নরহরি সরকার নবদ্বীপের চৌলে পড়তে আসেন, সেই সূত্রেই তাঁর সঙ্গে শ্রী গৌরাঙ্গের পরিচয়। তিনি ও বয়সে গৌরাঙ্গ অপেক্ষা কয়েক বছরের বড় ছিলেন। গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদরচনাতেই তাঁর সবিশেষ কৃতিত্ব প্রতিফলিত হয়। 'পদকল্পতরু'-তে নরহরি ভণিতায় ৩৬টি পদ সঙ্কলিত হয়েছে। 'ক্ষণদা চিন্তামণি'-তে রয়েছে একটি পদ এবং 'গৌরপদতরঙ্গিনী'-তে রয়েছে ৩৯২টি পদ। তবে এই পদের সবগুলোই কিন্তু শ্রীখন্ডের নরহরি সরকার রচিত পদ নয়, পরবর্তীকালের 'ভক্তিরত্নাকর'-এর পদকর্তা, নরহরি চক্রবর্তীর কিছু পদও এর মধ্যে মিশে গেছে। অনুমান করা হয় শ্রীখন্ডের নরহরি সরকারই প্রথম চৈতন্যলীলা অবলম্বনে বাংলায় পদরচনা করেছিলেন। চৈতন্যের নাগরভাবের বৈশিষ্ট্য ও পদরচনা রীতির ও তিনি উদ্ভাবক ছিলেন।

"অন্তরেতে শ্যামতনু বাহিরে গৌরাঙ্গজনু
অদ্ভুত গৌরাঙ্গের লীলা।
রাই সঙ্গে খেলাইতে কুঞ্জবনে বিলাসতে
অনুরাগে গৌরতনু হৈলা।।"

কৃষ্ণ দাস কবি রাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'রাধাভাব সুবলিতকৃষ্ণতনু' রূপী গৌরাঙ্গের চিত্র রচনায় তিনি যেমন পারদর্শী ঠিক সেভাবেই আবার নিজস্ব চিন্তাধারায় কৃষ্ণ নাগরের ন্যায় গৌর নাগর রূপী গৌরাঙ্গের ছবিও ফুটে উঠেছে তাঁর রচনায়।

"বেলা অবসানে ননদিনী সনে

টিপ্পনী

জল আনিবারে গেনু।
গৌরাঙ্গ চাঁদের রূপ নিরখিয়া
কলসি ভাঙিয়া এনু।।
কাঁপে কলেবর গায়ে আসে জ্বর
চলিতে না চলে পা।
গৌরাঙ্গ চাঁদের রূপের পাথারে
সাঁতারে না পাই যা।।"

গৌরনাগরীর এই আর্তিতে কামগন্ধের লেপমাত্র নেই বললে ভুলে হবে কিন্তু কামও প্রেমের সামঞ্জস্য বিঘ্নিত হয়নি বা আদিরসের তীবতা প্রমুখিত হয়নি।

গ) শিবানন্দ সেন

শিবানন্দ সেন শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম প্রধান পার্শ্বচর। মহাপ্রভু পুরী থেকে বৃন্দবন যাওয়ার আগে কাঁচড়াপাড়ায় তাঁর বাড়ীতে এসেছিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁকে একটি বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছিলেন। প্রতিবছর রথযাত্রা উপলক্ষে যারা শ্রী জগন্নাথ ধাম শ্রীলাচলে যেতেন শিবানন্দ সেই যাতায়াতের দায়িত্ব ও ব্যয়ভার দুটোই বহন করতেন।

শিবাই, শিবারাম, শিবাই দাস ও শিবানন্দ ভণিতায় কবির পদ সংকলিত হয়েছে। 'পদকল্পতরু'-তে সংকলিত পদের সংখ্যা ৯টি; 'গৌরপদতরঙ্গিনী'-তে সংকলিত হয়েছে ১০টি পদ। এর মধ্যে যদিও গদাধর পন্ডিতের এক শিষ্য শিবানন্দ চক্রবর্তীর দু-একটি পদ মিশে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শিবানন্দের রচিত পদসংখ্যা অতি স্বল্প। গৌর পারম্যবাদের সঙ্গে সঙ্গে তিনি চৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণ এবং গদাধরকে শ্রীরাধার অবতার বলে মানতেন। এই তত্ত্বটি তাঁর কয়েকটি পদে মানতেন। এই তত্ত্বটি তাঁর কয়েকটি পদে প্রকাশিত হয়েছে –

"হোলি খেলব গৌর কিশোর।
রসবতী নারী গদাধর কোর।।"

গৌরাঙ্গ বিষয়ক কয়েকটি পদ চৈতন্যপূর্ববর্তী কবিদের অনুপ্রেরণায় উৎকর্ষতার পরিচয় দেয়।

"অখিল ভুবন ভরি হরি রস বাদর
বরি খয়ে চৈতন্য মেঘে।
ভকত চাতক যত পিবি পিবি অবিরত
অনুখন প্রেমজল মাগে।"

চৈতন্যভক্ত শিবানন্দের কবিকৃতিত্বে কাব্যময়তরে যে অভাব ছিল তা পূরণ করেছেন তাঁর পুত্র অন্যতম শ্রেষ্ঠ চৈতন্যজীবনীকার কবিকর্ণপুর পরমানন্দ সেন।

ঘ) গোবিন্দ ঘোষ

গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ ও বাসুদেব ঘোষ, নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের হরিভক্তির মাহাত্ম শুনে মুর্শিদাবাদের পৈতৃক নিবাস ছেড়ে নবদ্বীপে এসে চৈতন্যপার্সদ হন। তিন ভাইয়ের মধ্যে কবিকৃতিত্বে

টিপ্পনী

ছোটভাই ছিলেন সর্বশক্তিমান।

শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস নেওয়ার প্রাককালে রচিত একটি গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদে যে আর্তি ধ্বনিত হয়েছে গোবিন্দ ঘোষের পদে তা বিশেষ উল্লেখনীয় –

হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখচাও।
বাহু পসারিয়া গোরাচাঁদেরে ফিরাও।।
....
কি কোল হিয়ায় হায় কি কোল হিয়ায়।
নয়ান পুতলী নবদ্বীপ ছাড়ি যায়।।

টিপ্পনী

ঙ) মাধব ঘোষ

মধ্যম ভ্রাতা মাধব ঘোষ শ্রীগোরাঙ্গের সন্ন্যাস নেওয়ার পরে তাঁর পরিবারও নদীয়াবাসীর কি অবস্থা হয়েছিল তার বিবরণ দিয়েছেন –

"অচল সে বিষ্ণুপ্রিয়া তুয়াগুণ সোভারিয়া
মুরছি পড়ল ক্ষিতিতলে
তুয়া বিরহানলে অন্তর জর জর
দেহ ছাড়া হইল পরাণি।
নদীয়া নিবাসী যত তারাভেল মুরছিত
না দেখিয়া তুয়া মুখখানি।।"

কবিত্ব অপেক্ষা কীর্তনীয়া হিসেবে মাধব ঘোষ অনেক বেশি খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

চ) বাসুদেব ঘোষ

বৈষ্ণব পদাবলীতে বাসুদেব ঘোষ চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন শ্রীচৈতন্যের বাল্য; কৈশোর ও প্রথম যৌবনের চিত্র রূপায়নে।

"শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়।।
বয়ানে বসন দিয়া বলে লুকাইলুঁ।
শচী বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিলুঁ।।"

শৈশবলীলার পদ কবির আন্তরিকতায় যেভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে ঠিক সেভাবেই নিমাইয়ের গৃহত্যাগে শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপ হয়ে উঠেছে মানবিক আর্তির সবারুন রূপ।

"শচীর মন্দিরে আসি দুয়ারের পাশে বসি
ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।
শয়ন মন্দিরে ছিলা নিশি শেষে কোথা গেলা
মোর মুন্ডে বছর পড়িয়া।।
গৌরাঙ্গ জাগায়ে মনে নিদ্রা নাহি দুনয়ান

শুনিয়া উঠিল শচীমাতা
আউদড় কেশে ধায় বসন না রহে গায়
শুনিয়া বধূর মুখের কথা।।”

শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার এই আর্তিতে কবিহৃদয়ও সমব্যথী – কবি নিজেও যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে লেখেন –

“কি লাগিয়া দন্ড ধরে অরুণ-বসন পরে
কি লাগিয়া মুড়াইলে কেশ।
কি লাগিয়া মুখ-চাঁদে রাধা রাধা বলি কাঁদে
কি লাগিয়া ছাড়িল নিজ দেশ।।”

ভাব সম্মেলনের আদলে রচিত শচীমাতার স্বপ্নে উদ্বেল হয়ে ওঠে কবিহৃদয়

“আজিকার স্বপনের শুন গো মালিনী সই
নিমাই আসিয়া ছিল ঘরে।
আঙ্গিনাতে দাঁড়াইয়া গৃহপানে চাহিয়া
মা বলিয়া ডাকিল সে মোরে।।”

কবির গৌরনাগর ভাবের পদেও পাওয়া যায় এই মানবিক আর্তি –

“নিরবধি মোর মনে গোরারূপ লাগিয়াছে
কহ সখি কি করি উপায়।
না দেখিলে গোরারূপ বিদরিয়া যায় বুক
পরাণি বাহির হৈতে চায়।।”

বাসুদেব ঘোষের বৈষ্ণব পদাবলী চৈতন্যজীবনের কাব্যরূপ। বাস্তবতা ও ঐতিহাসিকতায় তা অনেক সময় চৈতন্যজীবনী সাহিত্যের থেকেও বেশি নির্ভর যোগ্য। মানব হৃদয়ের গভীর কথা অত্যন্ত সহজ সরল ভাবে ও ভাষায় বর্ণনা করে যে কাব্য কবি সৃজন করেছেন তা কালের মাত্রায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছে।

ছ) রামানন্দ বসু

কুলীন গ্রামে ভাগবত অনুবাদক মালাধর বসু বা গুণরাজ খাঁর পৌত্র (মতান্তরে পুত্র) রামানন্দ বসু ছিলেন শ্রীচৈতন্যের পরম ভক্ত। অনুমান করা হয় তাঁরা দুজনেই সমবয়সী ছিলেন। মালাধর বসুর ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ ছিল শ্রীচৈতন্যের প্রিয় গ্রন্থ। রামানন্দ এবং রামনন্দ বসু এই দুই ভণিতাতেই পদ ‘কল্পতরু’তে কবির রচনা সংকলিত হয়েছে যার সংখ্যা যথাক্রমে ১১টি ও ৭টি; যদিও রামানন্দ ভণিতাযুক্তপদে –

“কহে দীন রামানন্দে এ হেন আকন্দ কন্দে
বঞ্চিত রহিলঁ মঞি এক।”

শ্রীচৈতন্যের সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার কথা উল্লিখিত হয়েছেবলে ড. বিমানবিহারী বসু রামানন্দ ভণিতা যুক্ত পদগুলিকে রামানন্দ বসুর পদ নয় বলে মনে করেন কারণ, কবি প্রতি বছর

টিপ্পনী

রথ যাত্রার সময় কুলীন গ্রাম থেকে নীলাচলে গিয়ে শ্রীচৈতন্যপ্রভুর সান্নিধ্যলাভ করতেন।

রামানন্দ বসু রচিত পদ সমূহের মধ্যে শ্রীরাধিকার স্বপ্নে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের পদটি উল্লেখনীয়

"তোমারে কহিয়ে সখি স্বপন কাহিনী।
পাছে লোকমাঝে মোর হয় জানাজানি।।
শাওন মাসের দে রিমিঝিমি করিয়ে
নিন্দে তনু নাহিক বসন।
শ্যামবরণ এক পুরুষ আসিয়া মোরে
মুখে ধরি করয়ে চুম্বন।।"

টিপ্পনী

এই পদ অবলম্বনেই পরবর্তীকালে জ্ঞানদাস একটি উৎকৃষ্ট পদরচনা করেছিলেন –

"মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে হেথা
শুন শুন পরাণির সই।
স্বপনে দেখিলুঁ যে শ্যামল বরণ দে
তাহা বিনু আর কারো নই।।"

জ) বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়

শ্রীচৈতন্যের প্রতিবেশী এবং বয়সে তাঁর থেকে কয়েক বছরের ছোট বংশীবদন চট্টো চৈতন্য দেবের নীলাচল যাত্রার পরে শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়ের চৈতন্যলীলাও রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদ বিভিন্ন পদসংকলনে সংকলিত হয়েছে। বংশীবদন ভণিতায় 'পদকল্পতরু'-তে পঁচিশটি পদ সংকলিত হয়েছে। শুক শারীর উক্তি-প্রত্যুক্তির আদলে লেখা তাঁর একটি পদ কুঞ্জভঙ্গের শ্রেষ্ঠ পদ রূপে স্বীকৃত –

"রাই জাগ রাই জাগ শারীশুক বলে।
কত নিদ্রা যাও কালো মানিকের কোলে।।"

আবার একটি পদে দানী সেজে কৃষ্ণ রাধাকে বলেছে –

"হেদে লো বিনোদিনী
এপথে কেমতে যাবে তুমি।
শীতল কদম্ব তলে বৈসহ আমার বোলে
সকলি কিনিয়া নিব আমি।।
এভর দুপুর বেলা তাতিল পথের ধূলা
কমল জিনিয়া পদ তোরি।।
রৌদ্রে ঘামিয়াছে মুখ দেখি লাগে বড় দুখ
শ্রম ভারে আউলাইল করবী।।"

রাধা কৃষ্ণের লীলা বিষয়ক পদ বিশেষ করে দানলীলার পদের নাটকীয় আর্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ 'পসারিনী' কবিতাটি রচনা করেছিলেন –

"ওগো পসারিনী, দেখি আয়

কি রয়েছে তব পসরায়।
এত ভার মরি মরি কেমনে রয়েছে ধরি
কোমল করুণ ক্লান্ত কায়।”

৭

২) যোড়শ শতকের চৈতনোত্তর বৈষ্ণব পদকর্তা

টিপ্পনী

ক) বলরাম দাস

চন্ডীদাস সমস্যার মতই একাধিক বলরাম দাসের অস্তিত্বে “সাহিত্য জগতে বিষম গোল। আমরা ১৯জন বলরামের সন্ধান পাইয়াছি।” ‘গৌরপদতরঙ্গিনী’-র সম্পাদক জগদ্বন্ধু ভদ্র তাঁর পদসংকলনের ভূমিকায় একথা প্রথম জানান। ড. সুকুমার সেন যে পাঁচজন বলরামের সন্ধান দিয়েছেন তার মধ্যে দোগাছিয়া গ্রাম নিবাসী, নিত্যানন্দের ভক্ত বলরাম দাসই বিভিন্ন পদসঙ্কলনের বেশিরভাগ পদের রচয়িতা। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও যে দুজন বলরাম দাসের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন যোড়শ শতকের এই পদকর্তা – “তবে যে বজবুলিতে বাংলা শব্দের মিশাল অধিক এবং ঝঙ্কার, ছন্দের কারুকর্ম ও কৃত্রিমতা অল্প তাহাই নিত্যানন্দের শিষ্য বলরামের রচনা বলিয়া আমরা অনুমান করি। পদসাহিত্যে যে বলরাম দাসের চৈতন্য-নিত্যানন্দ ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী অতিশয় বিখ্যাত হইয়াছে, যাহার বাৎসল্য রসের পদের সমকক্ষ কোন রচনা সমগ্র পদাবলী সাহিত্যে পাওয়া যায় না, তিনি প্রাচীনতর – যোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি অথবা শেষের দিকে বর্তমান ছিলেন।” ‘পদকল্পতরু’-তে বলরাম দাস ভণিতায় ১৩৬টি পদ সংকলিত হয়েছে। বলা হয় যোড়শ শতকের শেষে খেতুরীতে আয়োজিত প্রথম বৈষ্ণব মহাসম্মেলনেও এই বলরাম দাস উপস্থিত ছিলেন।

হিন্দী সাহিত্যে কৃষ্ণভক্তি, শাখার অন্ধ কবি সূর দাসের মতই বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর বলরাম দাস বাৎসল্য রসের পদে অদ্বিতীয়। দুগ্ধপোষ্য বালক শ্রীকৃষ্ণকে গোষ্ঠে পাঠকের সময় মায়ের যে চিন্তা, তা প্রতিফলিত হয়েছে বলরাম দাসের একটি পদে –

“বসন ধরিয়া হাতে ফিরে গোপাল সাথে সাথে
দণ্ডে দণ্ডে দশবার খায়।
এহেন দুধের বাচ্ছা বনেতে বিদায় দিয়া
কেমনে ধরিব প্রাণ মায়।।”

গোপবালকদের কাছে যশোদার সকাতর নিবেদন

“শ্রীদাম সুদাম দাম শুনওরে বলরাম
মিনতি করিয়ে তো সভারে।
বন কত অতিদূর নব তৃণ-কুশাঙ্কুর
গোপাল লইয়া না যাও দূরে।”

মাতৃ হৃদয়ের এই আশঙ্কা দূর করার জন্য পদকর্তা স্বয়ং ভণিতায় বলেছেন –

“বলরাম দাসের বাণী শুন শুন নন্দরাণী

কেন সদা ভাবিতেছে তুমি।
গোপাল সাজায়ে দেহ মোর মিনতি মানহ
সঙ্গে যাইব গোঠে আমি।”

সখ্যরসে প্লাবিত বলরাম দাসের এই আশ্বাস একদিকে যেমন মানবিকতায় ভরপুর অন্যদিকে তেমন গোপবালকদের এক জীবন্ত প্রতিলিপি হয়ে উঠেছে কবির রচনা –

নটবর নব কিশোর রায় রহিয়া রহিয়া যায় গো।

“ধমকি ধমকি চলত রঙ্গে
ধূলি ধূসর শ্যাম অঙ্গে
হৈ হৈ হৈ ঘনয়ে বোলত মধুর মুরলী বায় গো।”

আবার বালক কৃষ্ণের অভিমানকেও কবি লিপিবদ্ধ করে বলেছেন –

“দাঁড়াইয়া নন্দের আগে গোপাল কান্দে অনুরাগে
বুক বহিয়া পড়ে ধারা
না থাকিব তোমার ঘরে অপযশ দেহ মোরে
মা হইয়া – বলে ননীচোরা।।”

বলরাম দাসের এই কবিতা সূরদাসের পদ –

“মইয়া, ম্যাঁয় নহিঁ মাখন খায়ো” -কে মনে করিয়ে দেয়। তবে বলরাম দাস নিরপেক্ষভাবে পদরচনা করেন নি সখ্যরসে আপ্লুত কবি গোপালের প্রতি পক্ষপাতে যশোদাকে বলেন –

“বলরাম দাসে কয় এই কর্ম ভাল নয়
ধাইয়া গোপাল কর কোড়ে।”

গোপালের অনুযোগে যশোদা যা করেন নি পদকর্তার অনুরোধে তা করতে বাধ্য হয়েছেন –

“যশোদা আসিয়া কাছে গোপালের মুখ মুছে
অপরাধ ক্ষমা কর মোরে।।”

ভণিতার মধ্য দিয়ে পদকর্তার কণ্ঠস্বরের এই অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে “মধ্যযুগের কবি ও কাব্য গ্রন্থে শঙ্করী প্রসাদ বসু বলেছেন বলরামের কাব্যের মধ্যে সর্বত্র একটা বয়স্থ মন খুঁজিয়া পাওয়া যায় বলরাম বয়োসুলভ প্রধাণতা অনেকাংশে কবি ধর্মের উপর চাপাইয়াছেন। এই মানসিক প্রৌঢ়ত্ব বাৎসল্য রসের পদসৃষ্টির পক্ষে বড়ই উপযোগী।” বলরাম দাস একটি পদে গোধূলিবেলায় গাভীদের নিয়ে রাখাল বালকদের গৃহে প্রত্যবর্তনের যে ছবি এঁকেছেন সে বড় অপূর্ব –

“চান্দ মুখে বেণু দিয়া সবধেনু নাম লৈয়া
ডাকিতে লাগিল উচ্চস্বরে।
শুনিয়া কাহ্নুইর বেনু- ঊর্ধ্ব মুখে ধারধেনু
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে।।
অবসান বেনুরব বুলিয়া রাখাল সব
আসিয়া মিলিল নিজ মুখে

টিপ্পনী

যে বনে যে ধেনু ছিল ফিরিয়া একত্র কৈল
চালাইলা গোকুলের মুখে।।”

কবির বর্ণনা ক্ষমতায় অতি সাধারণ বিষয়ও হয়ে ওঠে মনোরম।

বাৎসল্য রসের কবি জ্ঞানদাসের প্রবীণ কণ্ঠস্বর কখনও বা অন্য রসপর্যায়েও বাৎসল্যের প্রীতি নিয়ে আসে।

“কত নানা বেশ করি পরায় পাটের সাড়ী
সাধে সাধে সমুখে হাটায়।
দেখিয়া হাটন মোর হইয়া আনন্দে ভোর
দুই বাহু পসারিয়া ধায়।।”

জ্ঞানদাসের রসোদ্‌গারের পদ একই সঙ্গে পতিপ্রেম ও পিতৃস্নেহের দ্যোতনা নিয়ে আসে।

“অতি রসে গরগরি কাঁপে পহু থরথরি
আরতি করিয়া কোলে করে।
ঘন ঘন চুম্বনে নিবিড় আলিঙ্গনে
ডুবাইল রসের সাগরে।।”

এই স্নেহপূর্ব প্রণয়ের মধ্য দিয়ে জ্ঞানদাসের পদ এক অনন্য মাত্রাযোজনা করেছে রসোদগার রসপর্যায়ে।

জ্ঞানদাসের রূপানুরাগের পদে আত্মবিস্মৃত রাধিকা বলে –

“কিবা রাত কিবা দিন কিছুই না জানি।
জাগিতে ঘুমাতে দেখি শ্যামরূপ খানি।।
আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে।
পরাণ হরিল রাঙা নয়ান নাচনে।।
কিবা রূপ দেখিন সেই নাগর শেখর।
আঁখি ঝরে মন কাঁদে পরাণ কাতর।।”

রূপানুরাগের এই পদের শেষে আবার জেগে ওঠে রাধিকা সর্বস্ব কবিকণ্ঠ –

“সহজে মুরতি খানি বড়ই মধুর
মরমে পশিয়া যে ধরম কৈল চুর।।”

বৈষ্ণব সাহিত্যের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদে বলরাম দাস কৃষ্ণাশ্রয়ী হয়ে বলেছেন

“তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি।
না জানি কি দিয়া তোমা মিজিল বিধি।।”

কৃষ্ণ মানসের রহস্যময়তা, অন্তর্বেদনা, ব্যকুলতা – মনে হয় একটি পদে কবি নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েছেন –

“হিয়ার ভিতরে যুইচেত নহে পরতীত।

টিপ্পনী

হারাই হারাই যেন সদা করে চিত।।
হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির।
তেঞি বলরামের পহুঁর চিত নহে থির।।"

এই পদ সম্বন্ধে 'প্রাচীন সাহিত্য' প্রবন্ধগ্রন্থের 'মেঘদূত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন - "আমরা যেন কোনো-এক কালে একত্র এক মান সলোকে ছিলাম, সেখাই হইতে নির্বাসিত হইয়াছি। তাই বৈষ্ণব কবি বলেন ঃ তোমায় হিয়ার ভিতর কে কৈল বাহির।। একী হইল? যে আমার মনোরাজ্যের লোক, সে আজ বাহিরে আসিল কেন! ওখানে তো তোমার স্থান নয়। বলরামদাস বলিতেছেন: তেঁই বলরামের, পহু, চিত নহে স্থির। যাহারা একটি সর্বব্যাপী মনের মধ্যে এক হইয়া ছিল তাহারা আজ সব বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাই পরস্পরকে দেখিয়া চিত্ত স্থির হইতে পারিতেছে না; বিরহে বিধুর, বাসনায় ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছে।"

টিপ্পনী

খ) জ্ঞানদাস

বর্ধমান জেলার কাটোয়ার দশ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত কাঁদড়া গ্রামের বাহ্মণ বংশজাত জ্ঞানদাস ছিলেন নিত্যানন্দের ভক্ত এবং তাঁর পত্নী জাহ্নবীদেধার মন্ত্র শিষ্য। মধ্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্যের ত্রয়ী পদকর্তা চন্ডীদাস-জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাস স্বমহিমায় উজ্জ্বল। 'ভক্তিরত্না কর'-এ বলা হয়েছে

"রাঢ়দেশে কান্দরা নামেতে গ্রাম হয়।
যথায় মঙ্গল জ্ঞানদাসের আলয়"

যোড়শ শতকের শেষ পর্বে নরোত্তম ঠাকুরের উদ্‌যোগে খেতুরীতে যে প্রথম বৈষ্ণব মহাসম্মেলন আয়োজিত হয়েছিল বলরামদাস সেখানে উপস্থিত ছিলেন। 'পদকল্পতরু'তে জ্ঞানদাসের ভণিতায় ১৮৬টি পদ সংকলিত হয়েছে।

চৈতন্যত্তোর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা জ্ঞানদাসকে চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগের পদকর্তা চন্ডীদাসের ভাবশিষ্য বলা হয়ে যাকে।এই দুই পদকর্তার তুলনা করতে গিয়ে প্রথমেই "মধ্যযুগের কবি ও কাব্য"-এর শঙ্করীপ্রসাদ বসুর মন্তব্য উল্লেখ করতে হয়।চন্ডীদাস সম্পর্কে তিনি বলেছেন: "তাঁহা কাব্যে রূপরহস্য নয় - অপার্থিব ভক্তিপ্রাণ তাই জয়যুক্ত হইয়াছে। বিরতি আহারে রাঙাবাস পরে মহাযোগিনীর পারা" - ইহা চন্ডীদাসের কাব্যের একটি মূল ভাব। 'আক্ষেপানুরাগে', 'আত্মনিবেদনের' ভক্তিস্তোত্রে তাঁহার প্রতিভার বিশেষ বিকাশ ঘটিয়াছে।জ্ঞানদাসের পদ সম্পর্কে আলোচনায় তিনি বলেছেন - "জ্ঞানদাসের মধ্যে ভক্তি প্রবণতা আছে সত্য, এবং তাঁহার আত্মনিবেদনও চমৎকার, তথাপি জ্ঞানদাসের কাব্য মিষ্টিক হইয়া পড়ে নাই। তাঁহার কাব্যের একটি মূলধর্ম - আমার মনে হয় - রোমান্টিকতা।রোমান্টিক রহস্যময়তায় জ্ঞানদাসের কাব্যপূর্ণ।"

চন্ডীদাস ও জ্ঞানদাস দুজনেই সহজ ভাষায়, সহজ ভাবে কবিতা লিখেছেন। রসমাধুর্য ও অনুভূতির গভীরতায় চন্ডীদাসের আক্ষেপানুরাগের পদ জ্ঞানদাসের তুলনায় অনেক বেশি উৎকর্ষ মন্ডিত; আবার কবিতার রূপপ্রাচুর্যে গোবিন্দদাস অনেক বেশি সমৃদ্ধ।কিন্তু রূপ ও রসের যথাযথ সামঞ্জস্য বজায় রেখে যে পদাবলী জ্ঞানদাস রচনা করেছেন তা তুলনা রহিত। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে চন্ডীদাসকে 'সাধক' এবং জ্ঞানদাসকে 'শিল্পী'

হিসেবে অভিহিত করে বলেছেন রূপাসৃষ্টির আকাঙ্খায় জ্ঞানদাস সহজেই সামান্য পরিবেশে প্রচলিত শব্দকে একটা স্নিগ্ধ মধুর রসব্যঞ্জনায় পরিণত করিতে পারেন ....” স্বপ্নে মিলন-এর পদে কবি যখন বলেন –

“রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমিঝিমি শবদে করিষে।
পালঙ্কে শয়ান কিলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে।।
শিখরে শিঘন্দরোল মত্ত দাদুরী বোল
কোকিল কুহরে কুতূহলে
ঝিঁ ঝি ঝিনিকি বাজে ডাহকী সে গরজে
স্বপন দেখিনু হেন কালে।।”

বর্ষা রজনীর চিত্ররূপময় উপস্থাপনে সহজ ভাষা সাবলীল ছন্দে কবি এক অভিনব মায়াবিস্তার করেছেন। জ্ঞান দাসের পদে রহস্যদ্যোতনা এক যুগল প্রেমের স্রোতে ভেসে যায় –

“শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিত
পরাণে পরাণে নেহী।
না জানি কি লাগি কো বিধি গড়ল
ভিন্ ভিন্ করি দেহা।।”

পাঁচশ বছর আগের কবিতার সুরে খুজে পাওয়া যায়। আধুনিক কবিতার পূর্বাভাস রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটি মনে পড়ে যায় –

“আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদি কালের হৃদয় উৎস হতে।”

কবির এই প্রেমোপলব্ধি এক অনন্য মাত্রা পায় রূপোল্লাসের পদে –

“দেইখ্যা আইলেম তারে –
সই দেখখ্যা আইলেম তারে।
এক অঙ্গে এত রূপ নয়ানে না ধরে।।”

এ রূপ দর্শনে রাধিকা জাতি-কূল-মান সব হারায় –

“মোহন মুরলী হাতে কদম্ব-হিলন
দেখিয়া শ্যামের রূপ হৈলাম অচেতন।।”

রূপানুরাগের পদে রাধিকার এই রূপদর্শনেই এক বিষদেময়তার পটভূমি রচিত হয়।

“রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পুতলি লাগি থির নাহি বান্দে।।”

টিপ্পনী

এই পদে বিরাম হীন বাসনার অন্তহীন হাহাকারে এক বেদনার ম্লানচ্ছবি রচিত হয়।

"রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।।
ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফরান
অন্তরে বিদরে হিয়া না জানি কি করে প্রাণ।।"

টিপ্পনী

রূপানুরাগের পদে অন্তরের অতৃপ্তি নিয়ে রাধিকার এই অনন্ত অভিসার রোমান্টিক কবিতার মাধুর্যকে প্রকাশ করে – শুধু দুচোখ দিয়ে রূপ সম্ভোগ নয়, রূপের সমুদ্রে আত্ম নিমজ্জনের মধ্যে দিয়ে রূপানুরাগের পদে জ্ঞানদাসের শ্রেষ্ঠত্ব অর্পিত হয়েছে।

আত্মনিবেদনের পদে চন্ডীদাস তাঁর সবটুকু দিয়ে দেন –

"বঁধু তুমি যে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোমারে সঁপেছি
কুলশীল জাতি মান।।"

জ্ঞানদাসের রাধা আত্মগর্বটুকু দিতে পারেন না।

"বঁধূ তোমার গরবে গরবিনী হাম
রূপসী তোমার রূপে
হেন মনে লয় ওদুটি চরণ
সদা নিয়ে রাখি বুকে।।"

কৃষ্ণের রূপ বর্ণনার মধ্য দিয়ে জ্ঞানদাস প্রচলিত উপমা-শব্দ-সংস্কারের সীমারেখা ভেদ করে বলে ওঠেন

"কালার কপালে চাঁদ চন্দনের ঝিকিমিকি
কেবা দিল ফাগুরঞ্জিয়া।
রজতের পানে কেবা কালিন্দী পূজিয়াছে
জবা কুসুম তাহে দিয়া।।"

বৈষ্ণব হয়েও জবার উপমা দিতে কবির মনে কোন দ্বিধা নেই আধুনিক শৈলী বিজ্ঞানের ভাতায় একে বলা যায় প্রচলিত আদর্শ থেকে বিচ্যুতি-রূপে-রসে ভাবোল্লাসে-সম্ভোগে তৃপ্তি আসেনি বলেই বাঁধা পথের বেড়া ডিঙিয়ে কবি বারবার বিচ্যুতি হয়েছেন, অন্তরের অনন্ত হাহাকার নিয়ে হয়ে উঠেছেন সুদূরের পিয়াসী।

নৌকাবিলাসের পদেও জ্ঞানদাসের বিচিত্র কবি প্রতিভার পরিচয় প্রস্ফুটিত হয় –

"বড়াই হের দেখ রূপ চেয়ে
কোথা হতে আসি দিল দরশন
বিনোদ বরণ নেয়ে।
ঐ কি ঘাটের নেয়ে।।"

রূপদর্শনে রাধিকার এই বিস্ময় পদটির অমূল্য সম্পদ। আর একটি পদে কবি এক নাটকীয়

বাতাবরণ সৃষ্টি করেছেন –

“মানস গঙ্গার জল ঘন করে কল কল
দুকূল বাহিয়া যায় ঢেউ।
গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাড়িল বেগ
তরণী রাখিতে নারে কেউ।।”

এই পর্যন্ত রাধিকার আর্তিতে বহিঃপ্রকৃতির প্রতিকূলতার চিত্ররূপময় বর্ণনা ফুটে ওঠেছে। ক্রমশ ‘নধ্যন কান্ডারী শ্যামরায়’ –এর আচরণে, জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে আত্মসম্ভ্রম হারাবার ভয় প্রবল হয়ে উঠল –

“ন্যায়ার নাহিক ভয় হাসিয়া কথাটা কয়
কুটিল নয়নে চাহে মোরে
ডরেতে কাঁপিছে দে এজ্বালা সহিতে কে....”

এই আর্তির মধ্য দিয়েই কবিতাটি হয়েছে অমূল্য।

জ্ঞানদাসের রসোদ্‌গারের পদে সম্ভোগের উত্তাপ নয়, রাধার প্রতি কৃষ্ণের এক স্নেহ মমতাময় অনুভব প্রকাশিত হয়েছে।

“নিঁজের আলসে যদি পাশ মোড়া দিয়ে।
কি ভেল কি ভেল বলি চমকি উঠয়ে।।
হিয়ায় হিয়ায় এক বয়ানে বয়ানে।
নাসিকায় নাসিকায় এক নয়ানে নয়ানে।।
ইথে যদি মুঞি তেজি দীর্ঘ নিশ্বাস।
আকুল হইয়া পিয়া বিয়ে তরাস।।”

এ যেন সেই চন্ডীদাসের “দহুঁ কোরে দহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া”–র মতই মিলনের পরম লগ্নেও হারাবার ভয়।

বংশী বিষয়ক পদেও জ্ঞানদাস অনুপম। বাঁশির সপ্ত রন্ধ্রের কোন রন্ধ্র থেকে কোন সুর বেজে ওঠে সেই নিয়ে পদকর্তার বিসুয়ে পরিসীমাহীন

“কোন রন্ধ্রে বাঁশি বাজে অতি অনুপাম।
কোন রন্ধ্রে রাধা বলি ডাকে আমার নাম।।
কোন রন্ধ্রে বাজে বাঁশি সুললিত ধ্বনি” ইত্যাদি

ধ্বনিবাদী আলঙ্কারিকদের মতে রমণীদেহের লাবন্য দেহাবয়বের অতিরিক্ত কিছু জ্ঞানদাস রূপকে লাবণ্যে দ্রবীভূত করে এক অমোঘ রহস্যময়তার সৃষ্টি করেছেন আবার কখনও বা লাবণ্যকে রূপের বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন“, সেই কারণেই তিনি বলতে পারেন

“সে রূপ সায়রে নয়ন ডুবিল”

রূপানুরাগ, রসোদগার পর্যায়ে জ্ঞানদাসের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনবিদিত। বংশীশিক্ষা, নৌকাবিলাম, স্বপ্নে মিলন প্রভৃতি পর্যায়ের পদেও কবিকৃতিত্ব কিছু কম নয়। সর্বোপরি এক রোমান্টিক রহস্যময়তা

টিপ্পনী

জ্ঞানদাসকে মধ্যযুগের আর সকল পদকর্তার থেকে পৃথক আসনে বসিয়াছে। চণ্ডীদাস সম্পর্কে সমালোচনা প্রবন্ধগ্রন্থের চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি প্রবন্ধে যে মন্তব্য রবীন্দ্রনাথ করেছেন – "চণ্ডীদাস সহজ ভাষার সহজ ভাবের কবি" – সেই মন্তব্য চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য জ্ঞানদাস সম্পর্কেও প্রযোজ্য হলেও ব্যক্তি স্বাতন্ত্রে জ্ঞানদাস এতটাই আলাদা যে পাঁচশ বছর পূর্বের, মধ্যযুগের এই কবির মধ্যে আধুনিক কবিতার পূর্বাভাষ ধ্বনিত হয়।

টিপ্পনী

গ) মাধবদাস (মাধবাচার্য)

মাধবদাস বা মাধবাচার্য সম্পর্কে চৈতন্যদেবের স্যালক – যদিও এ বিষয়ে অনেক মতান্তর রয়েছে পদাবলী রচয়িতা হিসেবে তিনি এক মধ্যম মানের কবি – বাৎসল্য রসের পদে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন –

"বলরামের করলৈয়া গোপালেরে সমর্পিয়া
পুন পুন বাল নন্দরাণী।।
এই নিবেদন তোরে না যাবে কালিন্দীতীরে
সাবধান মোর নীলমণি।।"

ঘ) অনন্তদাস

'পদকল্পতরু'-তে অনন্ত দাস ভণিতায় ৩২টি পদ সংকলিত হয়েছে। কবি সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। গৌরাঙ্গ বিষয়ক ও রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক, এই উভয় প্রকার পদাবলীতেই অনন্তদাস কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছেন; তাঁর একটি উল্লেখনীয় অভিসারের পদ হল–

"ধনি ধনি অভিসারে।
সঙ্গিনী রঙ্গিনী প্রেমতরঙ্গিনী
সজেলি শ্যমবিহারে।।"

ঙ) চৈতন্য জীবনীকার ও অপ্রধান পদকর্তা ঃ

ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের পর থেকে শ্রীনিবাস – নরোত্তমের আবির্ভাবের মধ্যে আরও অনেক পদকর্তা পদ রচনা করেছিলেন – এ প্রসঙ্গে চৈতন্য জীবনীকার বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ উল্লেখনীয়; তাঁদের জীবনী কাব্যে অনেক উৎকৃষ্ট পদমালা প্রক্ষিপ্তভাবে রয়ে গেছে। অন্যান্য পদকর্তাদের মধ্যে নয়নানন্দ, দেবকীনন্দন, দ্বিজহরিদাস, পুরুষোত্তম দাস, জগন্নাহ দাস, কানুদাস, উদ্ধবদাস, চৈতন্যদাস, যদুনন্দন, আত্মারাম দাস উল্লেখনীয়।

i) <u>বৃন্দাবনদাস</u>
'চৈতন্য ভাগবত' রচয়িতা বৃন্দাবনদাস অনেক উৎকৃষ্ট পদরচনা করেছেন তার মধ্যে একটি হল – গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ

"বিমল হেম জিনি তনু অনুপাম রে

তাহে শোভে নানা ফুলদাম।

কদম্ব কেশর জিনি একটি পুলক রে

তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘাম।।”

কবি এখানে মহাপ্রভুর ভাবাবিষ্ট অবস্থাকে অনুপমভাবে রূপায়িত করেছেন।

ii) লোচনদাস

‘চৈতন্যমঙ্গল’ রচয়িতা লোচনদাসের গৌরনাগর ভাবের পদ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। গৌরাঙ্গের রূপ বর্ণনায় কবি ভক্তি ভাবের পরিচয় দিয়েছেন –

“অমিয়া মথিয়া কেবা নবনী তুলিল গো

তাহাতে গড়িল গোরাদেহ।

জগত ছানিয়া কেবা রস নিঙাড়িছে গো

এক ডৈল শুধুই সুনেহা।।”

শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপেও কবি কৃতিত্বের পরিচেয় দেন –

“সন্ন্যাসী না হও নিমাই – বৈরাগী না হও।

অভাগী মায়েরে নিমাই ছাড়িয়া না যাও।।”

শচীমাতার কান্নার সঙ্গে একাকার হয়ে যায় বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপ –

“না যাইহ দেশান্তরে কেহো নাহি এ সংসারে

বদন ছাড়িতে পোড়ে হিয়া।”

iii) কৃষ্ণদাস কবিরাজ

‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ রচনাকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ অতিবৃদ্ধ বয়সে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন সম্মত চৈতন্যজীবনী রচনার অভিপ্রায়ে এই কাব্যরচনা করেছিলেন; রসতত্ত্বে সমৃদ্ধ দর্শনও যে কাব্যগুণান্বিত হতে পারে তাঁর রচিত কয়েকটি পদে সেই নমুনা পাওয়া যায় –

“কৃষ্ণপ্রেম সুনির্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল

সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু।”

অথবা

“কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।

লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ।।

আতেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলে কাম।

কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।।”

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে ষোড়শ শতকে বৈষ্ণব সাহিত্য-দর্শন-শিল্পকলার যে নবজাগরণ ঘটেছিল তার প্রভাবে সপ্তদশ শতকে বৈষ্ণব পদাবলীতে আসে এক মহাপ্লাবন।

টিপ্পনী

৮

৩) সপ্তদশ শতকের বৈষ্ণব পদকর্তা

ক) গোবিন্দদাস কবিরাজ

শুধু বৈষ্ণব পদকর্তা হিসেবে নয় মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাস কবিরাজ। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সংকলিত 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'-তে তাঁর পদসংখ্যা ৭৭টি, নরহরি চক্রবর্তীর 'গীতচন্দ্রোদয়'-এ তাঁর ৬৫টি পদ সংকলিত হয়েছে, রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃতসমুদ্র'-এ তাঁর পদসংখ্যা ২৭০টি; বৈষ্ণবদাস সংকলিত 'পদকল্পতরু' যা বৈষ্ণব পদাবলীর সর্ববৃহৎ সংকলন, সেখানে গোবিন্দদাসের প্রায় ৪৬০টি পদ সংকলিত হয়েছে, দীনবন্ধু দাসের 'সংকীর্ণামৃত'-এ পদসংখ্যা ১৫৪ ও গৌরাঙ্গসুন্দরদাসের কীর্তনানন্দে সংকলিত হয়েছে ২০১টি পদ। অষ্টাদশ শতকের এই পদসংকলনেই শুধু নয়, উনিশ শতকের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সংকলিত 'পদরত্নাবলী' (১৮৮৫), বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত 'প্রাচীন কবির গ্রন্থাবলী'র ২য় ভাগ (১৮৯৭), শান্তিপুরের কালিদাস নাথ সংকলিত বিংশ শতাব্দীর 'গোবিন্দ দাসের পদাবলী' (১৯০২), দুর্গাদাস লাহিড়ী সংকলিত 'বৈষ্ণবপদলহরী'-তে (১৯০৫), গোবিন্দদাসের পদসমূহ সংকলিত হয়েছে। ড. বিমানবিহারী মজুমদারের সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে 'গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ' – যেখানে গোবিন্দ দাস কবিরাজের ৭২৮টি পদ সংকলিত হয়েছে।

বিগত তিনটি শতক ধরে বিভিন্ন সংকলনে যে বৈষ্ণব পদকর্তার পদসংকলিত হয়েছে সেই কবি আনুমানিক চল্লিশ বছর বয়সে শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং ওই প্রৌঢ়ত্বে শৈশব অবস্থা – উত্তর চল্লিশ থেকেই – তাঁর বৈষ্ণব পদ রচনার সূত্রপাত হয়। কবির পিতা ছিলেন কুমার নগর নিবাসী চৈতন্যভক্ত চিরঞ্জীব সেন। কর্মসূত্রে যিনি ছিলেন গৌড়ের সুলতান দৃশেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) ও তাঁর পুত্র নুসরৎ শাহের (১৫১৯-১৫৩২) অমাত্য। কবির মাতামহ ছিলেন শক্তধর্মী, কাটোয়ার নিকটবর্তী শ্রীখন্ডে বসবাসকারী দামোদর সেন। মাতামহের বাড়িতেই কবির জন্ম হয় এবং শোনা যায় শাক্ত যন্ত্রপ্রসাদেই তিনি মাতৃজঠর থেকে বাধাবিঘ্নহীন ভাবে ভূমিষ্ঠ হতে পেরেছিলেন। আবার মধ্যবয়সে দুরারোগ্য গ্রহণরোগে মরনাপন্ন হয়ে তিনি শ্রীনিবাসাচার্যের শরণাপন্ন হয়ে রোগমুক্ত হয়ে সপরিবারে বৈষ্ণব মতে দীক্ষা লাভ করেন। তখন থেকেই শুরু হয় কবির বৈষ্ণব পদচর্চা। ইতিপূর্বে তিনি হরগৌরী বিষয়ক পদরচনা করতেন – দীক্ষালাভের পরেই তিনি লিখলেন –

"ভজহুঁ রে মন শ্রী নন্দ নন্দন
অভয় চরণারবিন্দ রে।
দুর্লহ মানব দেহ সাধুসঙ্গ
তরাইতে এ ভবসিন্ধু রে।।"

বিদ্যাপতির কয়েকটি খন্ডিত পদ শুরু শ্রীনিবাসের অনুরোধ সম্পূর্ণ করেন গোবিন্দ দাস এবং তার জন্যই তিনি কবিরাজ উপাধি লাভ করেন। এই সম্পর্কে পদকর্তা বল্লভদাস লেখেন –

"অসম্পূর্ণ বাদ পদ রাখি বিদ্যাপতি পাহ
পরলোকে করিলা গমন।

গুরুর আদেশক্রমে　　　　শ্রীগোবিন্দ ক্রমে ক্রমে
সে সকল করিল পূরণ।।”

বৈষ্ণব পদাবলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা গোবিন্দদাস কবিরাজ। মৈথিল কবি বিদ্যাপতির ভাষারীতি ও অলঙ্করণ মাধুর্যকে আশ্রয় করে, মৈথিল ও বাংলার মিশ্রণজাত কৃত্রিম কবিভাষা ‘বজবুলি’তে অধিকাংশ পদ রচনা করেছিলেন বলে গোবিন্দদাসকে বলা হয়ে থাকে বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য। বস্তুতপক্ষে বিদ্যাপতির পদাবলীর আদর্শেই তিনি বজবুলিতে পদরচনায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কবিশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপতির গানের এই সুখসম্পদ থাকা সত্ত্বেও তাঁর নিজের পদরচনাকে কবি বামন হয়ে চাঁদ ধরার সমতুল্য বলে মনে করেছিলেন –

“কবিপতি বিদ্যাপতি মতিমানে
লাখগীত জগ　　　　চীত চোরায়ল
গোবিন্দ-গোরি-সরস রসগানে।।
....
গোবিন্দদাস মতি মন্দে।
এত সুখসম্পদ　　　　রহইতে আনমন
যৈছন বামন ধরবহি চন্দে।।”

বিদ্যাপতির ভাবাদর্শে কবি এতটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে ভণিতায় নিজের নামের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাপতিরও নাম উল্লেখ করতেন

“পাপ পরাণ　　　　আন নাহি জানত
কানু কানু করি ঝুর।
বিদ্যাপতি কহ
নিকরুন মাধব
গোবিন্দদাস রসপুর।”

এই পদটির উল্লেখ করে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে’ ৩য় খন্ডঃ প্রথম পর্বে বলেছেন যে, “বাস্তবিক, তাহাকে যে ‘দ্বিতীয় বিদ্যাপতি’ বলা হইয়াছে তাহা অযথার্থ নহে।” আবার নরহরি চক্রবর্তীর মতে গোবিন্দ দাসের

“পরম বিচিত্র বাক্য　　　　বিন্যাস কি রচত্র
সুকৌশল নহু অকাহ।
তিখিন বাণসম্　　　　বেধই হিয় শির
ঘুমই রসিকগণ শুনই-উচ্ছাহ।।”　(ভক্তিরত্নাকর)

ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেছেন – “বিদ্যাপতিকে বাদ দিলে তাঁহার সমধর্মা কোন কবি মধ্যযুগে আবির্ভূত হন নাই। আধুনিক কালেও তাঁহার পদঝঙ্কার আমাদের কানে আসিয়া বাজিতে থাকে। তাঁহার বাক রীতি, ছন্দ ও অলঙ্কারের মধ্যে এমন একটা রূপরসকল্পনাগত ঐশ্বর্যের সমারোহ আছে যে, মনের গভীরে ভাবের আলোড়ন উঠিবার পূর্বেই শ্রুতিপথ রমণীয় ধ্বনিরসে ভরিয়া যায়।”

অভিসার ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকার গোবিন্দদাস।

"নীরদ নয়নে নীরখন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব কদম।"

ভাবোন্মত্ত মহাপ্রভুর দেহ থেকে অঝোর ধারায় বিন্দু বিন্দু স্বেদ হল ঝরে পড়ে ভাবকদম্বের মত ফুটে উঠেছে - কাব্যের রূপনির্মাণ ও ভাবদেহ গঠনে কবিকৃতিত্ব তুলনাহীন।

টিপ্পনী

গৌরাঙ্গ বিষয়ক অমর একটি পদে চৈতন্যতত্ত্বকে অলঙ্কারের ছন্দ বন্ধনে প্রকাশ করেছেন -

"হয় নন্দ-নন্দন গোপী-জন-বল্লভ
রাধানায়ক নাগর শ্যাম।
যো শচীনন্দন নদীয়া-পুরন্দর
সুরমুনিগণমন মোহন ধাম।।"

গৌরচন্দ্রিকায় কবি বলেন

"বিপুল পুলককুল আকুল কলেবর

সাকার গরগর অন্তর প্রেম ভরে।

লহু লহু হাসনি গদগদ ভাষনি
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে।।"

রাধার অন্তরাগের পদে কৃষ্ণ বর্ণনায় কবি বলেন

"ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনি
অবনি বহিয়া যায়।
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া
নাচিয়া নাচিয়া যায়।।"

রূপানুরাগের পদে জ্ঞানদাস - অরূপরতনের সন্ধানে রূপ সবারে ডুব দেন; গোবিন্দদাস রূপানপরাগে রূপসম্ভোগ করেন।

কৃষ্ণদর্শনে রাধার রূপানুরাগে কবি বলেন

"নবঘন পুঞ্জ পুঞ্জ জিতি সুন্দর
অনুপম শ্যামর শোভা।
পীত বসন জনু বিহারী বিরাজিত
তাহে চাতক মনলোভা।।"

গৌরচন্দ্রিকায় কবি বলেন -

"নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন
গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ
হলদ সুন্দর কম্বু কন্দর

সিন্ধুর ভঙ্গ।।"

গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদের মতই অভিসারের পদে গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনবিদিত। নাটকীয় উপস্থাপনা ও চিত্ররূপময়তার মধ্য দিয়ে অভিসারের জন্য রাধা কিভাবে কৃচ্ছসাধনা করছে সেই দৃশ্য উপস্থাপিত হয়েছে কবির পদে –

"কন্টক গারি কমল সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি
গাগরি–বারি ঢারি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।।"

অপর একটি পদে রাধার অভিসার যেন বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে পরিব্যপ্ত হয়ে গেছে –

"মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।।
তঁহি অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল।।
সুন্দর কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস সুরধুনী পার।।"

গোবিন্দ দাসের রাধা অভিসারের জন্য সমস্ত প্রতিবন্ধবাতা অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চলে –

"কুল মরি যাদ কপাট উদ্‌ঘাটলুঁ
তাহে কি কাটকি বাধা।
নিজ মরিযাদ সিন্ধু–সঞে পঙারলু
তাহে কি তটিনী অগাধা।।"

বর্ষণসিক্ত রাতের অভিসারে –

"অম্বরে ডম্বর ডরু নব সেই।
বাহিরে তিমির ন হেরি নিজ দেহ।।"

প্রকৃতির এই প্রতিকূলতা রাধিকা যেভাবে লক্ষণ করে সেভাবে গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহও তার গতিরোধ করতে পারে না।

"মাথহি তপন তপত পথ–বালুক
আতপ দহন বিহার।
ননীক পুতলি তনু চরণকমল জনু
দিনহি করল অভিসার।।"

'মধ্যযুগের কবি ও কাব্য' রচয়িতা শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসুর মতে – "অভিসারের পদে গোবিন্দদাস রাজাধিরাজ। তাঁহার একাধিপত্যে সন্দেহ জানাইবার মত দ্বিতীয় বৈষ্ণব কবি নাই। সমকক্ষতা তো দূরের কথা কাছাকাছি আসিতে পারেন এমন কবিও দেখি না। .... গোবিন্দ দাসের অভিসার–পদে অলঙ্কার শাস্ত্রসম্মত নানা অভিসারিকা–ভেদের চিত্র আছে (যেমন –

টিপ্পনী

দিবাভিসারিকা, তিমিরাভিসারিকা, গ্রীষ্মাভিসারিকা, হিমাভিসারিকা, বর্ষাভিসারিকা, জ্যোৎস্নাভিসারিকা ইত্যাদি), কিন্তু ঐ বৈচিত্র্য সৃষ্টিই তাঁহার কবিত্ব শক্তির নিরিখ নহে। কবি সেগুলিকে কাব্য করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। এই পদগুলিতে দুইটি বস্তু প্রধান : চিত্র ধর্ম ও নাটকীয়তা। এক কথায় ইহাদের নাটকীয় চিত্র বলিতে পারি।"

অভিসার ও গৌরাঙ্গলীলা বিষয়ক পদের সঙ্গে সঙ্গে কলহান্তরিতার পদেও গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনবিদিত।

টিপ্পনী

"আন্ধল প্রেম
পহিল নহি জানলুঁ
সো বঙ্গবল্লভ কান।
আদর সাধে
বাদ করি তা সঞে
অহনিশি জ্বলত পরাণ।।"

শ্রীকৃষ্ণের বঙ্গবল্লভত্বের জন্য রাধার এই প্রাণের জ্বালাই কলহান্তরিতার মূল আশ্রয়। অপর একটি পদে অর্ধেকের অর্ধেকেরও অর্ধেক দৃষ্টি দিয়ে কৃষ্ণকে দেখার পরে রাধার যখন প্রাণ যায় যায় অবস্থা তখন যিনি দুই নয়নভরে কৃষ্ণকে দেখতে পান, কৃষ্ণের স্পর্শে ভেসে যেতে পারেন রাধা তাকে অবলীলাক্রমে 'সুনয়নী', 'রসবতী' ও 'প্রেমবতী'-র মত বিশেষণে বিশেষিত করেছেন–

"আধক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে
যব ধরি পেখলু কান।
কত শত কোটি
কুসুম-শরে জরজর
রহত কি যাত পরাণ।।
....
সুনয়নী বাহত
কানু ঘন শ্যামর
মোহে বিজুরী সম লাগি।
রসবতী তাক
পরম-রসে ভাসত
হামারি হৃদয়ে জ্বলু আগি।
প্রেমবতী প্রেম লাগি হিউ তেজত
চপল জীবন মঝু সাধ।"

রাধার ব্যাজস্তুতি শুনে কৃষ্ণের ঐ প্রেয়সী প্রেমের জন্য যখন জীবন ত্যাগ করতে উদ্যত তখন রাধার কণ্ঠে শোনা যায় ৪৭ জীবনের গান, যে মরতে চায়না বেঁচে থাকতে চায়। 'গোবিন্দদাসের রসতনু-রাধা একটি লাবন্য লীলায়িত অবহেলার নমস্কারে যখন আত্মপরাজয়কে স্বীকার করেন, তখন সেই স্বীকৃতি চূড়ান্ত জয়ের অভিজ্ঞান হইয়া ওঠে এবং গোবিন্দদাসের

i) শ্রীনিবাস

বৈষ্ণব সম্প্রদায় নিয়ে শ্রীনিবাস এতটাই ব্যস্ত ছিলেন যে পদ রচনার সময় বিশেষ একটা পান নি; যে কটি পদ তিনি লিখেছিলেন তার মধ্যে একটিতে কৃষ্ণের রূপ বর্ণনায় কবি বলেছেন–

"এ বুক ভরিয়া মুঞি উহা না দেখিলুঁ গো
এ বড়ি মরমে মোর ব্যথা।"

আবার রাধার আক্ষেপানুরাগের পদে কবি বলেছেন –

"দেহে বৈরি এ যৌবন বৈরি হল বৃন্দাবন
যাইবার নাহিক কোন ঠাঁই।"

সংখ্যার স্বল্পতা হেতু যথার্থ কবি ধর্ম অনুধাবন করা কঠিন – তবে ভাবের সংহতি ও প্রকাশ ভঙ্গীর তির্থকতা কবির উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্য। বলা যায়, গরানহাটী শৈলীর ধ্রুপদী কীর্তন আঙ্গিকের সঙ্গে আঞ্চলিক গায়নভঙ্গীর মিশ্রণ ঘটিয়ে মনোহরশাহী কীর্তনের প্রবর্তন করেছিলেন শ্রীনিবাস। যদিও এ বিষয়ে মতান্তর আছে।

ii) নরোত্তম ঠাকুর

তিন বৈষ্ণব আচার্যের মধ্যে – কবিত্বের বিচারে যেমন শ্রেষ্ঠ নরোত্তম ঠাকুর ঠিক তেমনি খেতুরী মহোৎসব থেকে তিনি ধ্রুপদীয় কীর্তন শৈলী তথা গৌর-চন্দ্রিকার প্রবর্তন করে বাংলা গায়ন রীতিতে আনেন এক আমূল পরিবর্তন। পদকর্তা নরোত্তম ঠাকুর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বৈষ্ণব পদে ব্যাকুলভাবে তিনি নিজের কথা ব্যক্ত করেছেন –

"আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে।।"

এক দিকে পদ রচনা অন্যদিকে ভক্তজানর সামনে কীর্তনাঙ্গে তা পরিবেশনার মধ্য দিয়েই কবি এই আন্তরিকতায় পারদর্শী হয়েছিলেন – ফলে কবি যখন বলেন

"নরোত্তম দাশ কয় দেখ্যা শুন্যা লাগে ডয় –"

তখন এই ডয় ব্যক্তিগত আশঙ্কার সীমা অতিক্রম করে হয়ে ওঠে নৈর্ব্যক্তিক।

"ঠাকুর বৈষ্ণবগণ করোঁ এই নিবেদন
মো বড় অধ্ম দুরাচার
এ সংসার হল নিধি তাহে ডুবাওল বিধি
চুলে ধরি মোরে কর পায়।।"

সহজ কথা, সহজ ভাবে বলার মধ্য দিয়ে প্রার্থনা বিষয়ক পদের এসুর অন্তরের অন্তস্থলে এসে আঘাত করে।

আবার ডাবি বিরহে রাধা যখন বলে –

"মাধব তুমি আমার নিধনিয়ার ধন।

আমারে ছাড়িয়া তুমি মধ্যপুরে যাবে জানি
তবে আমি তেজিব জীবন।।”

আবার আক্ষেপানুরাগে রাধা বলে –

“কি ক্ষণে হৈল দেখা নয়নে নয়নে।
তোমা বন্ধ পড়ে মনে সায়নে স্বপনে।।”

টিপ্পনী

সহজ সরল শব্দ চয়নে মধ্য দিয়ে কবি সহজ সুরটিকে সাবলীলভাবে প্রকাশ করেছেন।

iii) শ্যামানন্দ

শ্যামানন্দ ও অতি স্বল্প সংখ্যক পদ রচনা করেছিলেন। রাধার রূপ বর্ণনায় কবি বলেছেন –

“সীঁথের সিন্দুর মদন মুগধ
তাহে চন্দনের রেখা।
নব জল ধার অরুণের কোরে
নবীন চাঁদের রেখা।”

শ্যামানন্দকে রেনেটি কীর্তন শৈলীর প্রবর্তক হিসেবেও অনেকে উল্লেখ করে থাকেন।

গ) সপ্তদশ শতকের উল্লেখনীয় পদকর্তা

i) রায়শেখর

‘পদকল্পতরু’-তে শেখর, কবিশেখর, শেখরকবি, শেখর রায়, শেখর দাস, নৃপ কবিশেখর ও রায় শেখর ভণিতায় মোট ১৭৯টি পদ আছে, যার মধ্যে ৯০টি পদ বজবুলি এবং বাকিগুলো বাংলায় লেখা। ‘গৌরপদতরঙ্গিনী’-তে জগদ্বন্ধু ভদ্র প্রথম রায়শেখর সম্পর্কে জানান যে – ঐ বিভিন্ন ভণিতায় লেখা পদগুলো একই কবির রচনা, সপ্তদশ শতকে গোবিন্দদাস কবিরাজের কিছু পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন রায়শেখর। তিনি ছিলেন নিত্যানন্দ বংশোদ্ভূত এবং শ্রীখন্ড কেন্দ্রের নেতা রঘুনন্দনের মন্ত্রশিষ্য। এই তথ্যের প্রামানিকতা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ থাকলেও তার কোন নিষ্পত্তি এখনও হয়নি।

সপ্তদশ শতকের উল্লেখনীয় কবি রায়শেখর রায়শেখরের রচিত পদাবলী তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় –

১) গোবিন্দদাস অনুসারী বজবুলি পদ

২) সরল বাংলায় রচিত বিবৃতিমূলক পদ

চটুল চন্দে রচিত নরহরি সরকার ও তাঁর শিষ্য লোচনদাসের ‘ধামালি’ অনুসারী পদসমূহ

“গগনে অব ঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী চমকই।
কুলিশ-পাতন শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই।।”

শব্দলঙ্কারের আড়ম্বর ও ধ্বনিঝঙ্কারে বর্ষারজনীর অভিসারের যে পদ কবি রচনা করেছেন তা অনবদ্য।

রাধার আক্ষেপানুরাগের একটি পদে কবির নিরলঙ্কার প্রকাশ ভঙ্গী উল্লেখনীয়।

"সখি, কেমনে দেখাব মুখ।
গোপন পিরীতি বেকত করায়
এবড় মরম দুখ।।"

পদকর্তার ধামালী রীতিতে রচিত পদও বৈচিত্র্যপূর্ণ –

"দন্দ ধরি বন্ধ করি
কহে কুন্দলতা।
ডানুর কোলে কানু খেলে
এই যে ভাল কথা।।"

বর্ণনাত্মক 'দন্ডাত্মিকা পদে' কবি আবার রাধাকৃষ্ণের প্রতিদন্ডের বর্ণনা দিয়েছেন বাস্তব ভঙ্গীতে

"সকালে আসিহ গোপাল ধেনুগণ লইয়া।
অভাগিনী রৈল তোর চাঁদমুখ চাইয়া।।"

ii) রায়বসন্ত বা বসন্তরায়

দ্বিজ বংশজ কবি রায় বসন্ত নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। গোবিন্দদাসের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব এতটাই কাছের ছিল যে, ৩টি পদের মধ্যে তিনি বসন্তরায়ের নামোল্লেখ করেছিলেন। শেষ জীবনে রায়বসন্ত বৃন্দাবনে বসবাস করতেন। 'পদকল্পতরু'-তে রায় বসন্তের ৫১টি পদ সংকলিত হয়েছে যার মধ্যে ২৯টি পদ বজবুলি ও বাকিগুলো বাংলায় লেখা। রায়বসন্ত ও দাসবসন্ত এই দুই ভণিতায় তিনি পদ রচনা করেছেন। যে প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে তিনি কলকাতার শিক্ষিত সমাজের আলোচনায় উঠে আসেন সেই রবীন্দ্রনাথ লিখিত প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল 'বসন্তরায়' নিরাভরণ ভাষারীতি ও সহজ ভাবের মেলবন্ধনে কবি যে পদাবলী রচনা করেছেন তা অনুপম। শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনায় কবি বলেন –

"সহজে কি হেরলুঁ নাগর কান।
কানড় কুসুমতুল নীলমণি ঢল ঢল
চরণ চিকন অনুপাম।।"

আবার আক্ষেপানুরাগে রাধা বলেছে –

"অহে নাথ না বোল এমন।
সহিতে না পারি হেন করুণ বচন।।
শপথ স্বরূপ কহি তুমি অনুমন।
তুমি সে নয়ন মণি জীবনের জীবন।।"

টিপ্পনী

আরেকটি পদে রাধা বলেছে –

"প্রাণনাথ কেমন করিব আমি
তোমার বিনে মন করে উচাটন
কে জানে কেমন তুমি।।"

নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ও গোবিন্দদাসের বান্ধব রায়বসন্তের কবিত্ব নিয়ে প্রথম বিস্তারিত আলোচনা করেন রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৯ সালের ভারতী পত্রিকায়। যা পরবর্তীকালে 'অচলিত সংগ্রহ'-এ গ্রন্থিত হয়। তাঁর মতে উপরি উল্লিখিত পদটির "প্রথম দুটি পদে ভাবের অধীরতা, ভাষার বাঁধ ভাঙ্গিবার জন্য ভাবের আবেগ কি চমৎকার প্রকাশ পাইতেছে! আমার প্রাণ তোমাকে লইয়া কি যে করিতে চায় কিছু বুঝিতে পারি না। এত দেখিলাম, এত পাইলাম, তবু প্রাণ আজও বলিতেছে, প্রাণনাথ কেমন কবির আমি।"

টিপ্পনী

ঘ) সপ্তদশ শতকের অন্যান্য পদকর্তা

i) যদুনন্দন

সপ্তদশ শতাব্দীর পদকর্তা যদুনন্দন যে পদাবলী রচনা করেছিলেন তার মধ্যে বজবুলিতে রচিত মাথুরের পদ উল্লেখনীয়। এমন একটি পদে বিরহবিদুর শ্রীরাধিকাকে আশ্বস্ত করে তার এক সখী বলেছে

"ধৈর্য্যং রহু ধৈর্য্যংরাই গচ্ছং-মথুরাওয়ে।
ঢুঁড়ব পুরী প্রতি প্রতক্ষে
যাঁহা দর্শন পাওয়ে।।"

বর্ণনামূলক এই পদে যদু নন্দন জানিয়েছেন কিভাবে রাধিকার শুভেচ্ছা সাথে নিয়ে সখী মথুরায় কৃষ্ণের প্রাসাদ সম্মুখে এসে উপস্থিত হল। যদুনন্দনের পদ কয়েক ছত্রে একটা ঘটনাকে উপস্থাপিত করে; অপর একটি পদে

"সো বর নাগর যাওব মধুপুর
বজপুর করি আন্ধিয়ার।।"

এই সংবাদ শুনে রাধার কি অবস্থা হল তা বর্ণিত হয়েছে।

ii) কবিবল্লভ

সপ্তদশ শতকের পদকর্তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখনীয় নাম হল কবিবল্লভ

সখি কি পুছসি অনুভব মেয়ে।

"সোই পিরতি অনু রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।।"

অনুরাগের পদে কবি বলেছেন –

"কত মধু-যামিনী রভসে গোঁয়াইলুঁ

না বুঝলঁ কৈছন কেল।

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ

তব হিয়া জড়ন ন গেল।।”

কবি বল্লভ রচিত অনুরাগের এটি একটি উৎকৃষ্ট পদ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে পাঠান্তরে পদটি বিদ্যাপতির ভণিতাতেও পাওয়া যায়।

iii) ঘনশ্যামদাস

গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্র ঘনশ্যামদাস

সপ্তদশ শতকের শেষ পর্যায়ের বজবুলির একজন উৎকৃষ্ট পদকর্তা।

“ঘোর তিমির অতি ঘন কাজর জিতি

নিবসই বিপিনে একান্ত।

পিককুল বোলে সমাধি সমাপই

চমকই নেহারই পন্থ”

পিতামহ গোবিন্দদাসের অনুসারী এই কবি কয়েকটি পদ উৎকন্তৃতার পরিচয়বাহী।

iv) চম্পতি

কবি সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে বজবুলিতে পদরচনা করেছেন

“পালঙ্কে শয়ন ঘুমে অচেতন

দীঘল বহয়ে শ্বাস।

দীপ করে লই লুবধ মাধব

আওল হামারি পাশ।।”

এই পদে কবি নাটকীয় ভাবে রাধা ও কৃষ্ণের বর্ণনা দিয়েছেন।

v) জগদানন্দ

চৈতন্যবিষয়ক শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্যলীলা পর্যায়ের পদে কবি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। একটি পদে বর্ণিত হয়েছে কিভাবে শিশু গৌরাঙ্গের চাঁদ ধরার আকাঙ্খার পূর্ণ করতে তার মুখের সামনে একটি দর্পণ এনে ধরলেন শচীমাতা

“জগত সমুখে করি দরপণ অরপণ

মুখ দরসাই করল সমাধান।।”

সরল ভাষায় সাঙ্গ রূপকে আভরণে সজ্জিত কবির একটি পদ বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ –

“নন্দের দুলাল চাঁদ পাতিয়া রূপের ফাঁদ

ব্যধি ছিল কদম্বের তলে।।

দিয়ে হাস্য সুধাচার অঙ্গছটা আঠাতার

টিপ্পনী

আঁখি পাখি তাহাতে পড়িল।”

কবির অনুপ্রাস সমৃদ্ধ, ধ্বনি ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত

বিশেষ উল্লেখনীয়। পদসমূহও লাভ করেছিল।

“মঞ্জু বিকট কুসুমপুঞ্জ মধুপ শবদ গঞ্জিগুঞ্জ
কুঞ্জরগতি গঞ্জি গমন মঞ্জুল কুলনারী।।”

টিপ্পনী

অভিসারের একটি পদে কবি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

“বরিখে রিমিঝিমি সঘনে যামিনী
দামিনী ঝটকহিরে।
রাগে অভিসরি সঙ্গে সহচরি
চলল সুন্দরী রাই রে।।”

গোবিন্দদাস অনুসারী কবিসমাজে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী যদুনন্দন। সপ্তদশ শতকে বৈষ্ণব পদাবলীর উজ্জ্বল আকাশে অসংখ্য তারকা মাঝে একশ্চন্দ্র গোবিন্দদাস; নিজ কৃতিত্বে একটি যুগকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিলেন, গোবিন্দদাস অনুসারী পদকর্তাদের পদসমূহ তার সার্থক নিদর্শন বহন করে চলেছে। সামগ্রিক ভাবে বলা যায় অষ্টাদশ শতকে মহাসমুদ্রের ন্যায় যে বৈষ্ণব পদাবলী সঙ্কলিত হয়েছিল তার দুই-তৃতীয়াংশ রচনা সপ্তদশ শতকে সৃষ্টি হয়েছে-গুণগত ও সংখ্যাগতভাবে যার মান বিশেষ উৎকর্ষবাহী।

৯

৪) অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব পদসঙ্কলন

ক) বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ‘ক্ষণদাগীত চিন্তামণি’

বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ‘ক্ষণদাগীত চিন্তামণি’ আদি বৈষ্ণব সঙ্কলন গ্রন্থ। এই গ্রন্থে নায়ক-নায়িকার বিভিন্ন পর্যায় অনুসারে ৪৫জন কবির তিনশ-র অধিক পদ সঙ্কলিত হয়েছে – যদিও বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রমুখ পঁয়তাল্লিশ জন কবির মধ্যে চণ্ডীদাস স্থান লাভ না করার কারণ অজ্ঞাত।

খ) নরহরি চক্রবর্তীর ‘গীতচন্দ্রোদয়’ ও ‘গৌরচরিতচিন্তামণি’ ‘গীতি চন্দ্রোদয়’ –এর যে দুটি পুঁথি পাওয়া যায় তার প্রতিটিতেই হাজারের অধিক পদ সঙ্কলিত হয়েছে।

নরহরি চক্রবর্তীর অপর গ্রন্থ ‘গৌরচরিতচিন্তামণি’ গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদের সঙ্কলন – এতে সঙ্কলিত পদের সংখ্যা ৩৭১টি।

গ) রাধামোহন ঠাকুরের ‘পদামৃত সমুদ্র’

এই গ্রন্থটি বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধার আমল লাভ করেছে। এর মধ্যে সঙ্কলিত পদের সংখ্যা ৭৪৬। কীর্তন গায়কদের কথা মনে রেখে এই গ্রন্থে ধ্বনি ঝঙ্কার সমৃদ্ধ পদগুলি বিশেষভাবে সঙ্কলিত হয়েছে। যার মধ্যে গোবিন্দদাস ও সঙ্কলকের পদ সংখ্যা সর্বাধিক।

বৈষ্ণব দাসের 'পদকল্পতরু'

গুণগত ও সংখ্যাগত দিক থেকে বৈষ্ণবদাসের 'পদকল্পতরু' বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রেষ্ঠ সঙ্কলন গ্রন্থ। বৈষ্ণবদাসের প্রকৃত নাম ছিল গোকুলানন্দ সেন। তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ কীর্তনীয়া। প্রথমে এই সঙ্কলন গ্রন্থের নাম ছিল গীত কল্পতরু পরে 'পদকল্পতরু' নামে এটি বিখ্যাত। সঙ্কলনে ১৪০জন পদকর্তার তিন হাজারেরও বেশি পদ সঙ্কলিত হয়েছে যেখানে বিদ্যাপতির পদ সংখ্যা ১৬৩, চণ্ডীদাসের পদ সংখ্যা ১১৮, বলরামদাস ১৩৬, জ্ঞানদাস ১৮৬ এবং গোবিন্দদাসের পদ সংখ্যা ৪০৬।

টিপ্পনী

ঙ) অপ্রধান বৈষ্ণব পদ সঙ্কলন

i) গৌর সুন্দর দাসের কীর্তনানন্দ

৬০ জন কবির সাড়ে ছয়শ পদের সঙ্কলন গৌরসুন্দর দাসের কীর্তনানন্দ।

ii) দীনবন্ধু দাসের 'সঙ্কীর্তনামৃত'

দীনবন্ধু দাসের সংকীর্তনামৃত গ্রন্থে ৪০জন কবির প্রায় পাঁচশ পদ সঙ্কলিত হয়েছে, যার মধ্যে অর্ধেক পদ দীনবন্ধু দাস স্বয়ং লিখেছেন।

১০

৫) অষ্টাদশ শতকের বৈষ্ণব পদকর্তা

ক) প্রেমানন্দ দাস বা প্রেমদাস

অষ্টাদশ শতক বৈষ্ণব পদসঙ্কলনের যুগ হলেও যে সব পদকর্তা এই সময়ে পদরচনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন প্রেমানন্দ দাস বা প্রেমদাস।

"সই কাহারে করিব রোষ।
না জানি না দেখি সরল হইলু
সে পুনি আপনা দোষ।।"

সহজ সরল বাংলা ভাষায় রচিত কবির পদে আন্তরিকতার পরিচয় প্রস্ফুটিত হয়। কবির গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদও উল্লেখযোগ্য।

খ) গোকুল চন্দ্র – গোকুলানন্দ

সারল্যধর্মে কবি গোকুল চন্দ্র বা গোরুলানন্দের পদ অষ্টাদশ শতকের পদকর্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

"ললিতার মনে রাই গেলা নিজ ঘর।
শ্যাম প্রেমে গরগর সভয় অন্তর।।"

টিপ্পনী

গ) শেখর ভ্রাতৃদ্বয় – চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর

i) চন্দ্রশেখর

শেখর ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে বড় ভাই চন্দ্রশেখর বজবুলি পদে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

"কাহে তুহুঁ কলহ করি কান্ত সুখ তেজলি
অব সে বসি রোয়সি কাহে রাধে।
মেরুসম মান করি ডলটি ফেরে বৈঠলি
নহি যব চরণ ধরি সাধে।।"

আন্তরিকতাও গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ চন্দ্রশেখরের পদ বিশেষ প্রশংসনীয়।

ii) শশি শেখর

শশিশেখরের অলঙ্কার বহুল বজবুলি পদও অত্যন্ত সুনিপুণ।

"অতি শীতল মলয়ানিল
মন্দ মধুর বহনা।
হরি বৈমুখ হামারি অঙ্গ
মদনানলে দহনা।।"

অষ্টাদশ শতকে আরও অনেক পদকর্তা পদরচনা করেছিলেন – যেমন বিশ্বম্ভর দাস, আকিঞ্চন দাস, সর্বানন্দ, রাধানাথ দাস, মুকুল দাস বা রাধামুকুন্দ দাস, পরাণদাস, গদাধর দাস।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাব যে বৈষ্ণব ধর্মকে প্রবর্তিত করে ছিল ষোড়শ সপ্তদশ শতকে কলেবর ও উৎকর্ষে বৃহৎ হয়ে অষ্টাদশ শতকে তা ধর্ম-দর্শনগত ভাবে বহুধাবিভং হতে থাকে। শাস্ত্র-তন্ত্র-যোগান্বিত সহজিয়া সাধনার ধারা এক হয়ে সহজিয়া বৈষ্ণব পন্থা প্রসারিত হতে থাকে। এই অবস্থায় পদকর্তারা পুরাতন ধারার অনুবৃত্তিতেই নিয়োজিত হতে থাকে তার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নির্ভর এক নতুন আর্থসামাজিক গোষ্ঠী তৈরী হয়। ছাপাখানা প্রবর্তন ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের আরও অনেক ক্ষেত্র বিস্তারিত হতে থাকে। এই অবস্থাতেও মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথ জীবনের কোন না কোন পর্বে 'বজাঙ্গনা কাব্য' বা 'ভানুসিংহের পদাবলী'-র মাধ্যমে বৈষ্ণব পদাবলীর ধারাতেই কাব্য রচনা করেছেন। বৈষ্ণব পদাবলীর ধারক ও বাহক কীর্তন গায়ন শৈলীও বহুধা বিভক্ত হতে থাকে এই সময়ে – গরাণহাটী থেকে মনোহরশাহী, রেনেটি, মন্দারমণী, ঝাড়খন্ডী হয়ে চপকীর্তনে এসে থামে। উনিশ শতকের নাগরিক সমাজে প্রবর্তিত কবিগণ এই চপকীর্তনের ধারাকেই নিজস্ব গায়ন শৈলীগত ভাবে বিবর্তিত করে নেয়। তবে আর্থ-সামাজিক পটপরিবর্তনে উনিশ শতকের পক্ষে বৈষ্ণব পদাবলীতে আর নতুন কিছু দেওয়ার থাকে না; সে তুলনায় বাংলা সমালোচনা সাহিত্য নিত্যনতুন তথ্য ও তত্ত্বে নিত্যনূতন বিচার বিশ্লেষণে বৈষ্ণব পদকর্তা ও বৈষ্ণব পদাবলীর নবরূপায়ণ ঘটায়।

১১

৬) মুসলমান বৈষ্ণব পদকর্তা

প্রাচীন পদসংগ্রহ 'পদকল্পতরু', আধুনিক পদসংগ্রহ 'গৌরপদতরঙ্গিনী' (সম্পাদক জগদ্বন্ধু ভদ্র), 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী' (সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত), 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' (রমণীমোহন মল্লিক সম্পাদিত), 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' (বজসুন্দর সান্যাল সম্পাদিত, চার খন্ডে প্রকাশিত) প্রমুখ গ্রন্থে ৪৩জন মুসলমান কবির পদ সংকলিত হয়েছে। অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য শ্রীহট্ট থেকে অনেক পদ সংগ্রহ করে 'বাংলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি' গ্রন্থটি সম্পাদিত করেন যেখানে আরও ৫৯জন কবির পদ সংকলিত হয়েছে। পরবর্তীকালে যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর গ্রন্থের একটি পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় যার থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় কমপক্ষে ১০২ জন বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি প্রায় ৪৫০ টি বৈষ্ণব পদ রচনা করেছেন।

'সাহিত্য' পত্রিকার ১২৯৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় প্রথম 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন শ্রীফিরোদচন্দ্র রায়। পরবর্তীকালে মুন্সি আব্দুল করিম সাহিত্যবিষারদ, রমণীমোহন মল্লিক, বজসুন্দর সান্যাল প্রমুখ সকলেই বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান পদকর্তাদের মুসলমান বৈষ্ণব কবি হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

ইলম-ই-সফিনা বা কোরাণের মত গ্রন্থের পুঁথিতে জ্ঞানের বাইরেও রয়েছে ইলম-ই-ফিনা বা হৃদয়ের যা কোন ধর্মগ্রন্থ নয় - মুরিদের গুরু শিষ্য পরম্পরায় প্রবাহিত হয় পয়গম্বরের অলিখিত বাণী; ইলম-ই-সিনার এই বাণীকে অবলম্বন করেই ইসলামের সমান্তরাল পথে সুফীবাদের উত্থান। শরিয়তকে আচার সর্বস্বভাবে অনুসরণ না করে, ভিন্ন ভিন্ন 'তারিকা' বা মতাদর্শ - নির্ভর করে, চরম সত্য পথ 'হকিকত'-এর মধ্য দিয়ে 'মারিফত'-এর যোফলাভই হল সুফীবাদের মূল সাধনা। শরিয়ত বলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে, আর সুফীবাদ বলে দায়েমী নামাজ কায়েম করতে - আরব-পারস্য-তুর্কী হয়ে প্রথম ভারতীয় সুফী সাধক চিস্তিয়া সম্প্রদায়ের মৈনুদ্দিন চিস্তির মাধ্যমে একাদশ শতকে সুফীবাদ ভারতে আসে।। দম নির্ভর দায়েমী নামাজের সঙ্গে সংখ্যা-তন্ত্র-যোগ নির্ভর সহজিয়া সাধনার যোগ সূত্রে ইসলাম আর বৈষ্ণব ধর্ম পরস্পরের মুখোমুখি এসে বসে।

"মিশাই পরম হংশ পবনের সনে।
পূরক রেচক সঙ্গে হৃদের কম্পনে।।"

আলীরাজার পদাবলীতে প্রতীয়মান হয় যোগদর্শনের নিগূঢ় তত্ত্ব -

"শূন্যেত পরম হংশ শূন্যে বহ্মজ্ঞান।
যথাতে পরম হংশ তথা যোগধ্যান।।"

সুফিবাদে মুরিদের সঙ্গে মুরশেদ গুরুশিষ্য সম্পর্কটাও আসিফ-মাসুক অর্থাৎ প্রেমিকার সঙ্গে প্রেমিকের সম্পর্ক।

কবি আরকুম বলেন -

টিপ্পনী

“তুমি আসিক, তুমি মাসুক, তুমি রাজাপ্রজা।
তুমি দেবতা, তুমি ফুল, তুমি করপূজা।।”

আসিক-মাসুকে মিলে যায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্ত্ব-মিলন হয় বৈষ্ণব আর সুফীবাদে। কবি বাসনউদাস বলেন –

“হিন্দুরে বলে তোমায় রাধা, আমি খোদা।
রাধা বলিয়া ডাকিলে মুল্লা মুন্সিতে দেয় বাধা।।”

টিপ্পনী

মধ্যযুগের মুসলমান বৈষ্ণব কবিদের দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে যা একটি দলে রয়েছে দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওলের মত সুফী মতাবলম্বী রাজসভা কবি এবং অপর দলে রয়েছে সৈয়দ মর্তুজা, নসির মামুদ ও আলী হাজার মত সুফী সাধক কবি।

ক) দৌলত কাজী

দৌলত কাজী তাঁর ‘লোরচন্দ্রানী’-তে নায়িকা ময়নার বারোমাসের দুঃখ বর্ণনার জন্য বজবুলিতে যে সব তা বিযুদ্ধ বৈষ্ণবকবিতা না হলেও তার মধ্যে বৈষ্ণবপদের একটা আভাস পাওয়া যায়। বর্ষা বিরহের বন্দনায় কবি যখন বলেন ঃ

“যার ঘরে কান্ত সব সোহাগিনী
পূর এ মনোরথ কাম।
দুর্লভ বরিষা তামস্য রজনী
নির্জন সঙ্কেত ঠাম
দারুণ ভাউক দাদুরী ময়ূর
চাতক নিনাদে ঘন।
তা ধূনি শুনিতে শ্রবণে বিরহিনী
ছোহএ মনে মদন।।”

তখন ময়নার বিরহবেদনা রাধা বিরহ আভাসিত হয়।

খ) সৈয়দ আলাওল

সৈয়দ আলাওল তাঁর কাব্যে বৈষ্ণবপদাবলীর অনুকরণে পদ রচনা করেছেন। বজসুন্দর সান্যাল সম্পাদিত ‘মুসলমান বৈষ্ণব কবি’ গ্রন্থের ৩য় খন্ডে পাঁচটি বৈষ্ণবভাবাপন্ন পদাবলী সংকলিত হয়েছে। তার মধ্যে একটি পদে কবি বলেছেন ঃ

“আহা মোর বিদরে পরাণ।
জাগিতে স্বপন দেখি ভূমে নাহি আন।।
কি জানি লিখিছে বিধি এপাপ করমে।
পাইয়া পরশমণি হারাইলুঁ ভ্রমে।।
সে সব মনের দুঃখ কাহাকে কহিব।
ব্যথিত বান্ধবকুল স্মরিতে নারির।।”

বৈষ্ণবপদাবলীর ভাব ও আঙ্গিক অবলম্বন করলেও ভক্তির গভীরতা না থাকার দরুন

আন্তরিকতার অভাব সুস্পষ্ট। দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওল ছিলেন রাজসভার কবি। অন্যদিকে সুফী মতাবলম্বী কবিদের বৈষ্ণব কবিতা ভক্তের অন্তর্লীলা অনুভূতিতে উজ্জ্বল।

গ) সৈয়দ মর্তুজা

'পদকল্পতরু'-তে সৈয়দ মর্তুজার ক্রটি পদ সংকলিত হয়েছে। মর্তুজার ভণিতায় সংগৃহীত পদের সংখ্যা ২৮ যার মধ্যে ২২ টি পদ বজসুন্দর সান্যাল সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' (৩য় খন্ড)-তে সংকলিত হয়েছে। মুর্শিদাবাদের ইতিহাসকার নিখিলনাথ রায় 'সুধা' নামের পত্রিকায় সৈয়দ মর্তুজা নামে উদাসীন ভক্ত দরবেশ সম্পর্কে প্রথম প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে সৈয়দ মর্তুজা মুর্শিদাবাদে হিন্দু মুসলমান উভয়ের কাছেই সমাদৃত হয়েছিলেন। তন্ত্র ও বৈষ্ণবতত্ত্বের প্রতি কবির বিশেষ আকর্ষন দেখা গিয়েছিল। শোনা যায় আনন্দময়ী নামে এক বাহ্মণ কন্য ছিলেন তাঁর সাধন সঙ্গিনী। দুজনকে একসঙ্গে মর্তুজানন্দ নামে ডাকা হত, ঠিক যেভাবে যাদু ও তার সাধন সঙ্গিনী মিলে হয়েছিল রাউল গানের যাদুবিন্দু। 'পদকল্পতরু'-তে সংকলিত পদে কবি বলেছেন ঃ

"শ্যামবন্ধু চিতনিবারণ তুমি
কোন শুভ দিনে দেখা তোমা সনে
পাসারিতে নারি আমি।।
যখন দেখিয়ে এ চাঁদ বদনে
ধেরজ ধরিতে নারি।
অভাগীর প্রাণ করে আনচান
দন্ডে দশবার মরি।।"

আব্দুল করীম সাহিত্যবিষারদ মহাশয় চট্টগ্রামের আর এক মর্তুজার খানকয়েক পদ সংগ্রহ করেছেন। তার একটি পদে কবির রাধা কৃষ্ণকে বলে –

"পার কর পার কর মোরে নাইয়া কানাই
কানাই মোরে কর পার।।
ঘাটের ঘাটিয়াল কানাই পন্থের চৌকিদার
নয়ালি যৌবন দিসু খেয়ার পাই পার।।"

স্বতোৎসারিত ভাব এবং রূপনির্মাণের কৃতিত্বে সৈয়দ মর্তুজার পদ প্রশংসনীয়। মুর্শিদাবাদ ও চট্টগ্রামে প্রাপ্ত পদগুলোর ভাষা ও ভক্তিভাব প্রায় একই রকমের কৃতিত্বপূর্ণ। "মুসলমান বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে আমার মতে সৈয়দ মর্তুজাই সর্বশ্রেষ্ঠ।" – বজসুন্দর সান্যাল সম্পাদিত 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' (৩য় খন্ড)-র ভূমিকায় একথা লিখেছেন আব্দুল করিম সাহিত্যবিষারদ।

ঘ) নসির মামুদ

নসির মামুদের একটি 'পদকল্পতরু'-তে ও আর একটি পদ রমণীমোহন মল্লিকের 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি'-তে সংকলিত হয়েছে। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি'-তে বলেছেন নসির মামুদ হলেন সুলতান হুসেন সাহের পুত্র নুসরৎ শাহ। তবে এবিষয়ে কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ তিনি দেখাতে পারেন নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় সংকলিত

টিপ্পনী

‘পদকল্পতরু’-তে তাঁর পদ গৃহীত হয়েছে বলে অনুমান করা হয় তিনি ছিলেন সপ্তদশ শতকের কবি। ‘পদকল্পতরু’-তে কবির যে পদটি সংকলিত হয়েছে তা হল

“ধেনু সঙ্গে গোঠে রঙ্গে,
খেলত রাম সুন্দর শ্যাম,
পাঁচনি কাঁচনি বেত্র বেনু
মুরলী ঘূরলী গানরি।
প্রিয়দাম শ্রীদাম সুদাম মেলি
তপনতনয়া তীরে কেলি
ধবলি সাঙলি আওবি আওবি
ফুকরি চলত কানরি।।”

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ লীলা বিষয়ক এই পদে কবি যে চিত্ররূপ রচনা করেছেন তা বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ। কবির ভণিতাটিও কবির মনের ভক্তিভাবকে প্রকাশ করে –

“আগম নিগম বেদ সার,
লীলায় করত গোঠ বিহার,
নসির মামুদ করত আশ
চরণে শরণ দানরি।।”

ঙ) আলিরাজা

অষ্টাদশ শতকে চট্টগ্রামের বাঁশখালি থানার অন্তর্গত ওশাইন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন আলিরাজা। সাধারণ ভাবে তিনি কানুফকির নামেই পরিচিত ছিলেন সকলের কাছে। তাঁর মধ্যে সুফী, তন্ত্র, যোগ ও বৈষ্ণব সাধনার এক আশ্চর্য সমাবেশ ঘটেছিল। হিন্দু মুসলমান উভয়ের মধ্যেই তাঁর অনেক শিষ্য বা মুরিদ ছিল। তাঁর গুরু ছিলেন দরবেশ কেরামুদ্দিন।

আলিরাজার বেশিরভাগ পদ বজসুন্দর সান্যাল সম্পাদিত ‘মুসলমান বৈষ্ণব কবি’-তে প্রকাশিত হয়েছে। আব্দুল করীম সাহিত্য বিষারদ মহাশয় আলিরাজার কয়েকটি পদ সংগ্রহ করে সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত ‘প্রাচীন বাংলা পুঁথির বিবরণ’-এ মুদ্রিত করে ছিলেন।

“বনমালী, কি হেতু রাধারে ভাব ডিন।
তোময় প্রেমের ঘায়　　　দগধে জীবন যায়
নিত্য রাধা মদন-অধীন।।”

এভাবেই অতি অল্পকথায় কবি রাধার ব্যাকুলতা বর্ণনা করেছেন। কৃষ্ণদর্শনে রাধার আক্ষেপ ফুটিয়ে তুলতে কবি লেখেন

“কি খেনে আসিলাম ঘাটে
নন্দের নন্দন　　　ভুবনমোহন
দেখিয়ামরম ফাটে।।”

টিপ্পনী

কবির ভণিতাও উল্লেখনীয়

"হীন আলিরাজা বলে হরি-রাধা পদতলে
ঠাকুরাণী রাধা সার।
যে রামা হরিরে ভজে কদাচিত নাহি তেজে
হরি নিত্য বিদিতে রাধার।।"

সহজিয়া যোগাচারের গূঢ় কথাও কবি রাধাকৃষ্ণলীলার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন ঃ

"রাধিকার হৃদে বসি দামোদর ফুঁকে বাঁশী ণ
প্রেমবশে গাহে যন্ত্রগীত।।
রাধিকার কায়মনে ঠাকুরের বৃন্দাবনে
ষট ঋত রাগ তথা বৈসে।
ছয় চক্র জ্ঞানঘর তাতে সপ্ত সরোবর
রাজহংস শত পদ্ম ভাসে।।"

আলিরাজা কয়েকটি শাক্ত পদাবলীও লিখেছিলেন; কোথাও আবার শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় মতের প্রতি প্রণতি নিবেদন করে বলেছেন ঃ

"তুমি নারায়ণ হরি তুমি হয় বহ্মগোরী
দেবের দেবতা তুয়ামূল"

এই পদেরই অন্যত্র কবি বলেছেন -

"তুমি গুরু মাতাপিতা তিলেক পরম দাতা
তারিণী করুণা সিন্ধুময়।
জগৎ রুদ্রাণী তনু শিবলীলা রাধাকানু
সত্ত্ব রজঃ তমঃ শক্তিময়।।
হীন আলীরাজা বলে শ্যামাকালী পদতলে
শক্তিলীলা শঙ্কর ঘরণী।
সূর অংশ হরগৌরী চন্দ্র অংশী রাধাহরি
তত্ত্বরূপী নবীন যৌবনী।।"

"আলিরাজা কেবল প্রেমিক নহেন, তিনি ভক্তও বটেন।" - বজসুন্দর সান্যালের এই মন্তব্য উল্লেখ করে 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' তৃতীয় খন্ড ঃ প্রথম পর্বে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মন্তব্য করেছেন যে - "অসাম্প্রদায়িক উদারমতি আলীরাজা হিন্দুর অধ্যাত্মবাদে উত্তমরূপে অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছিলেন। সেই দিক দিয়া তিনি তাত্ত্বিক ও দার্শনিক। অপরদিকে তিনি আবার ভক্ত-কবি। তত্ত্ববাদ ও ভক্তিরস তাঁহার পদসাহিত্যে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়াইয়া গিয়াছে।

প্রশ্নাবলী

১) ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করো।

২) সপ্তদশ-অষ্টদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

টিপ্পনী

৩) প্রাক্-চৈতন্য ও চৈতন্যপরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলীর বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য কোথায় তা দেখিয়ে চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণবপদাবলীর পরিচয় দাও।

৪) জ্ঞানদাস-এর কবি কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

৫) গোবিন্দদাস-এর পদাবলী সম্পর্কে আলোচনা করে, তাঁর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দাও।

৬) মুসলমান কবিদের বৈষ্ণব পদ রচনার পরিচয় দাও।

৭) জ্ঞানদাসের সঙ্গে চন্ডীদাসের তুলনামূলক আলোচনা করে জ্ঞানদাসের কাব্যের রোমান্টিকতার পরিচয় দাও।

৮) গোবিন্দদাসকে কী দ্বিতীয় বিদ্যাপতি বলা যেতে পারে? তাঁর পদের বিষয়বস্তু ও কাব্যসৌন্দর্য আলোচনা করো।

টিপ্পনী

অনুবাদ সাহিত্যের ধারা

চৈতন্যপূর্ব যুগ থেকেই বাংলায় অনুবাদ সাহিত্যের একটি শক্তিশালীধারা গড়ে উঠেছিল। বাঙালি কবিদের সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষায় লেখা কবিতাবলী আমরা পেয়েছি। মধ্যযুগে এসে পেলাম সংস্কৃত ভাষার বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ সাহিত্যের প্রধান বিষয় ছিল – রামায়ণ, ভাগবত ও মহাভারত। পরবর্তীতে, এমনকি আধুনিককালেও আমরা সেই ধারা বহন করে নিয়ে চলেছি। তবে একথাও বলতেই হয় বাংলার ইসলামধর্মাবলম্বী শাসকরা হিন্দু পুরাণ মহাকাব্য অনুবাদে পৃষ্ঠপোষণা করেছিলেন। একটা সাম্প্রদায়িক প্রীতির বাতাবরণ তৈরী হয়েছিল এই কাজের দলে।

টিপ্পনী

রামায়ণ

বাংলায় রামায়ণ রচিত হওয়ার আগে থেকেই বাংলাদেশের লোকমুখে রামায়ণ কাহিনীর প্রচলন ছিল। কৃত্তিবাসী রামায়ণের সাফল্যের কারণেই হয়ত ষোড়শ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত একগুচ্ছ কবিকে রামায়ণ অনুবাদ করতে দেখা যায়। বাংলা রামায়ণে ভক্তিরস ও বাঙালি গার্হস্থ্য জীবনরস বিশেষভাবে পরিবেশিত হয়েছে। অধিকাংশ কবি বিশেষ ক্ষেত্রে আকৃষ্ট হয়ে অংশ অনুবাদে মনোনিবেশ করেছেন।

উল্লেখযোগ্য অনুবাদকগণ ঃ

১. দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ ঃ ষোড়শ শতকের শেষভাগে কৃত্তিবাসের বংশে আবির্ভূত গঙ্গানারায়ণ দ্বিজ ‘রামলীলা’ নামে রামায়ণ অনুবাদ করেন। তাঁর পিতার নাম সুষেণ পন্ডিত। কবিত্বগুণে এ কাব্য তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। অনেক পন্ডিত তাঁকে ভবানী মঙ্গল কাব্যের গঙ্গানারায়ণ মুখোপাধ্যায় বলে মনে করেছেন।

২. মাধব দ্বিজ ঃ ষোড়শ শতকের কবি মাধব দ্বিজের ভণিতাযুক্ত ‘রাম বনবাস’ পালার দুটি এবং ‘হরিশচন্দ্র রুহিদাস’ পালার একটি পুথির সন্ধান পাওয়া যায়। ‘মাধব’ ভণিতাযুক্ত কোন এক কবির ‘হরিশচন্দ্র স্বর্গারোহণ’ পালার ১৯টি পুথির সন্ধান পাওয়া যায়। মনে করা হয় ‘মাধব’ এবং ‘মাধব দ্বিজ’ একই ব্যক্তি। কিন্তু পালা দুটির ভিন্ন নামকরণ নিয়ে সমস্যা রয়েছে।

৩. ঘনশ্যাম দাস ঃ ষোড়শ শতাব্দীতে কবি ঘনশ্যাম দাস ‘সীতার বনবাস’ নামে একটি ক্ষুদ্র পালাগান রচনা করেন। ভাষা ব্যবহার ও বর্ণনার মধ্যে তিনি কবিত্বের তেমন কোনও প্রসংশনীয় পরিচয় দিতে পারেন নি।

৪. কৈলাসচন্দ্র বসু ঃ কৈলাসচন্দ্র বসু অদ্ভুত রামায়ণের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর পূর্বে রামায়ণ বা মহাভারতের কোনও আক্ষরিক অনুবাদ সংস্কৃত থেকে বাংলায় হয়নি। যদিও মূলানুগ আক্ষরিক অনুবাদ করতে গিয়ে কাব্যকে তিনি নীরস করে ফেলেছেন। যেমন –

অরণ্য নিবাসী যত ঋষি মুনিগণ।

তাঁদের শোণিতে হবে কলসী পূরণ।।
কামনা করিয়া কোন যেই নিশাচারী।
ভক্ষণ করিবে তাহা বিষজ্ঞান নিশাচারী।।

এ রচনা সুখপাধ্যও নয়। ভাষাও কৃত্রিম এবং জড়তাগ্রস্ত। এর মূল সংস্কৃত শ্লোকটি ছিল –

আরণ্যানাং মুনীনাং বৈ স্তোকং স্তোকঞ্চ শোণিতম্
কলসা পুরিতং ভক্ষেদ্রাক্ষসী যা চ কামতঃ।
তস্যা গর্ভে ভবিষ্যামি তচ্ছোণিতসমুদ্ভবা।।
(অদ্ভুত রামায়ণ, ৬/২৫)

টিপ্পনী

আক্ষরিক অনুবাদ হিসাবে বিচার করলে কবিকে অবশ্যই সাধুবাদ জানানো উচিত। কিন্তু কাব্যগুণ বিচারের ক্ষেত্রে আক্ষরিক অনুবাদ কর্ম নয়, অনুবাদকে স্বতন্ত্র সাহিত্য ধরেই তার কৃতিত্ব বিচার করা হয়। উপরন্তু পাঠকের দরকারে কবির কাব্যগুণ পরিমাপের নিক্তি সে সময় ছিল একমাত্র সুখপাঠ্যতা। স্থানে স্থানে অভিনয় পালা বা গান করে কাব্যপাঠ করা হত। পাঠকের দরকারে কৈলাসচন্দ্রের এই কাজ তাই সাদরে গৃহীত হয়নি। যদিও এর ঐতিহাসিক মূল্য বর্তমান।

৫. অদ্ভুত আচার্য ঃ সপ্তদশ শতকের কবি অদ্ভুত আচার্যের প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ। রামোদ্রসুন্দর ত্রিবেদী কর্তৃক প্রাপ্ত কবির তিনখানি সম্পূর্ণ ও একটি খণ্ডিত পুথির আত্মবিবরণী থেকে জানা যায়, কবি মাত্র পাঁচ বছর বয়সে মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে স্বয়ং রামচন্দ্র কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে রামায়ণ রচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁর পিতার নাম শ্রীনিবাস। পিতামহ প্রচন্ড। চার ভাই-এর মধ্যে তিনি জ্যেষ্ঠ এবং তাঁর তিন পুত্র যথাক্রমে জয়, বিজয় ও শিবানন্দ।

উত্তর ও পূর্ববঙ্গে অদ্ভুদ আচার্য রচিত রামায়ণের বহুল প্রচলন থাকলেও বাংলায় একমাত্র ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালীর গবেষণাতেই তাঁর বিস্তারিত তথ্য মেলে। পরে ১৩২০ বঙ্গাব্দে (১৯১৩) রজনীকান্ত চক্রবর্তীর সম্পাদনায় রংপুর সাহিত্য পরিষদ থেকে ‘অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণ’ (আদ্যকান্ড) প্রকাশিত হয়। ৭৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত কাব্যে কবি নিজের পরিচয় বিবৃত করেছেন–

পিতামহ গুরু বন্দো নামেতে মার্তন্ড।
যাহার প্রসাদে পাইলাম রামায়ণ সপ্তকান্ড।।
তাহার তনয় হইল নামে শ্রীনিবাস।
গুণে মহাজন তেঁহো নারায়ণের দাস।।
তাহার ঘরেতে হইল মেনকা জঠরে।
চারি পন্ডিত ভাল জন্মিলা তার ঘরে।।
চারি সহোদর তারা পন্ডিত গুণনিধি।
ভারতি প্রাসাদে পাইল অপেক্ষিত নিধি।।
করতোয়া কূলে বাড়ী অমৃতকুন্ড গ্রাম।
শুভক্ষণে হইল বটু নিত্যানন্দ নাম।।

ড. ভট্টশালী যাদবচন্দ্র চক্রবর্তীর ‘বারেন্দ্রকুলশাস্ত্রদীপিকা’র সাথে অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণের ‘কুলশাস্ত্রদীপিকা’র বংশতালিকা মিলিয়ে অনুমান করেন ১৫৪৭ খী. অব্দের দিকে নিত্যানন্দ

জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর আরও মত যে সমগ্র উত্তর বঙ্গ এবং (ঢাকা) ময়মনসিংহ – ত্রিপুরাতেও অদ্ভুত আচার্যের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল – এই অঞ্চলে প্রধানতঃ তাঁহারই রামায়ণ পাঠিত ও গীত হইত।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যদিও এ যুক্তি অস্বীকার করে ব্যাখ্যা করেন, যদি অদ্ভুত আচার্যের পুঁথি সত্যিই পাঠক সমাজে বা শ্রোতৃমন্ডলীতে জনপ্রিয় হত, তাহলে তাঁর পুথির একাধিক নকল পান্ডুলিপি পাওয়া যেত। যেমন কৃত্তিবাসী রামায়ণের ক্ষেত্রে মেলে। পুথির এই অপ্রতুলতাই অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণের ব্যর্থতা প্রমাণিত করে। যদিও ড. বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গের কোনও কোনও সীমায়িত স্থানে অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণের অংশবিশেষের জনপ্রিয়তার কথা স্বীকার করেছেন।

অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণের সাথে সংস্কৃতে প্রচলিত ‘অদ্ভুত রামায়ণে’র কোনও সম্পর্ক নেই। এ সম্পর্কে রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় (১৩০৫) লেখেন,

“অদ্ভুত রামায়ণ নামে মতস্কন্ধ রাবণের উপাখ্যানমূলক যে সংস্কৃত গ্রন্থ আছে, তাহার সহিত এই অদ্ভুত আচার্যের কোন সম্বন্ধ আছে বোধ হইল না। আদি কান্ড ছাড়া অদ্ভুত রামায়ণের আর কোনও সম্পূর্ণ পুথি পাওয়া যায় নি। আলোচ্য পুথি থেকে বোঝা যায় সম্পূর্ণ রামায়ণটি কৃত্তিবাসী রামায়ণের তুলনায় আয়তনে বড় ছিল। যদিও কবির রচনা তেমন উৎকৃষ্ট মানের নয়। সহজ সরল বাংলায় তিনি বাল্মীকিকে অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু কৃত্তিবাসের মতো রসালো কাব্য নির্মাণ করতে পারেন নি। সীতাহরণে রামচন্দ্রের বিলাপ দৃশ্যে যেমন –

কৃত্তিবাস ঃ বিলাপ করেন রাম লক্ষণের আগে ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে।।
কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষণ। কোথা গেলে সীতা
পাব কর নিরূপণ।। মন বুঝিবারে বুঝি আমার জানকী। ল
ুকাইয়া আছেন লক্ষণ দেখ দেখি।। বুঝি কোন মুণিপত্নী সি
হত কোথায়। গেলেন জানকী না জানাইয়া আমায়।।
....
তারা না হরিতে পারে তিমির আমার এক সীতা বিহনে
সকল অন্ধকার।। দশদিক শূন্য দেখি সীতা অদর্শনে।
সীতা বিনা অন্য কিছু নাহি লয় মনে।। সীতা ধ্যান, সীতা
জ্ঞান, সীতা চিন্তামণি। সীতা বিনা আমি যেন মণিহারা
ফণী।। দেখ রে লক্ষণ তাই কব্য অন্বেষণ। সীতারে আনিয়া
দেহ বাঁচাও জীবন।।

এর পাশাপাশি যদি অদ্ভুত আচার্যের রচনার একই দৃশ্য দেখি

সীতা সীতা বুলি রাম ডাকেন উচ্চ স্বরে।
হাহাকার শব্দ হৈল অমর নগরে।

টিপ্পনী

রাম বোলেন শুন ভাই প্রাণের লক্ষণ।
ফল আনিবার গেলা সীতা হেন লয় মন।।
নগড় দিঞা বনে গেল ভাই দুই জন।
চতুর্দ্দিকে বন প্রভু করে নিরীক্ষণ।।
সীতাকে না দেখেন প্রভু বনের ভিতর।
গোদাবরীর তীরে গেলেন দুই সহোদর।।
চতুর্দ্দিকে নদীর ঘাট করে নিরীক্ষণ।
সীতাকে না দেখিয়া প্রভুর আকুল জীবন।।

টিপ্পনী

সহজেই বোঝা যায় কৃত্তিবাসের রচনা আবেগ বেশি। ভাষা প্রাঞ্জল এবং বর্ণনায় সরলতা বেশি। তুলনায় অদ্ভুত আচার্যের রচনা প্রাণহীন কিন্তু স্বাভাবিক। স্বাভাবিক বলেই প্রশংসা যোগ্য। রজনীকান্ত চক্রবর্তী এ প্রসঙ্গে বলেছেন –

"কবিতাংশে তুলনা করিলে অদ্ভুতাচার্যের অপেক্ষা কৃত্তিবাসকে উচ্চ আসন প্রদান করিতে হয়। অদ্ভুতাচার্যের শব্দাড়ম্বর বড় বেশী, কিন্তু রচনায় প্রসাদ ও মাধুর্যগুণের অভাব দৃষ্ট হয়।" (সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩১৩)

"কৃত্তিবাসের রামায়ণ অপেক্ষা এই রামায়ণ আকারে অনেক বৃহৎ, কিন্তু কবিত্ব সম্পদে হীন। মোটের উপর ইহার বর্ণনা প্রসাদগুণ বিশিষ্ট।" (অদ্ভুত আচার্যের আদিকান্ডের ভূমিকা, মুখবন্ধ, পৃ ৩)

কিন্তু অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণের সম্পাদক ড. ভট্টশালী হয়ত নিজ কর্মের ধারকের প্রতি আসক্তি প্রবল। তাই তিনি মন্তব্য করেছেন।

"কৃত্তিবাসী রামায়ণ অপেক্ষা অদ্ভুতের রামায়ণে বিষয়বৈচিত্র্য অনেক বেশী, চরিত্রচিত্রণও নূতনতর।"

আবার একই সাথে এও বলেছেন

"রামায়ণ রচক হিসাবে অদ্ভুতের প্রভাবও প্রতিপত্তি কৃত্তিবাস অপেক্ষা বড় কম নহে।।"

অধ্যাপক অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় এ জাতীয় মন্তব্যকে পক্ষপাতি দুষ্ট ও আবেগপ্রবণ বলে মনে করেছেন এবং অস্বীকার করেছেন।

৬. রামশঙ্কর দত্ত ঃ সপ্তদশ শতকে পূর্ববঙ্গের মানিকগঞ্জের অধিবাসী রামশঙ্কর দত্তরায় অদ্ভুত রামায়ণ ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের অংশ বিশেষের সাথে আধ্যাত্ম রামায়ণ ও যোগবিশিষ্ট রামায়ণের অংশ বিশেষ যুক্ত করে একটি সংহত, পরিচ্ছন্ন সম্পূর্ণ রামায়ণ রচনা করেন কবি তাঁর কাব্যে কৃত্তিবাস ও অদ্ভুত আচার্যের কাছে ঋণ স্বীকারও করেছেন। কবির ভাষায় –

অদ্ভুত কৃত্তিবাসের কঠিত্ব শুনিয়া।
কহিল শঙ্কর কিছু সংক্ষেপ করিয়া।।

আত্মপরিচয় অংশে কবির রচনা –

'পদবন্দ করি কহে ভিষক শঙ্কর' – থেকে অনুমান করা হয় তিনি বৈদ্যবংশীয় ছিলেন। তাঁর

কাব্যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সুললিত দক্ষ প্রয়োগ দেখা যায়।

হেদে হে নাবিকি আমার বচন শ্রবণ করহ ভাই।
বায়ে তরণী আনহ এখানে উপারে আমরা যাই।।
রামের বদন হেরিয়া নাবিকি মোহিত হৈয়া মনে।
কমললোচনে নাবিকি কহেন এমন বেশেতে কেনে।।

৭. ভবানীদাস (ঘোষ) ঃ বাল্মীকির উত্তরকান্ডের অনুসরণে ভবানীদাস সপ্তদশ শতকের কোন এক সময় তাঁর রামায়ণ রচনা করেন। তাঁর পালার নাম 'রামের স্বর্গারোহন'। মূলত বাল্মীকির উত্তরাকান্ডকে অনুসরণ করে লেখা এই পালার কোন কোন স্থানে কবি অদ্ভুত রামায়ণকেও অনুসরণ করেছেন। তাঁর রচনার উদাহরণ ঃ-

রাজা বিনে সোভা নাহি প্রিথিবির ভিতর।
বিষ্ণু বিনে শূন্য দেখি আমরা নগর।
বিষ্ণু বিনে দেবগণের গতি নাহি আর।
হেন পদ না দেখিয়া করে হাহাকার।।

৮. দ্বিজ লক্ষণ ঃ সপ্তদশ শতকে আধ্যাত্ম রামায়ণ ও অদ্ভুত রামায়ণের সংমিশ্রণে সরল ভাষায় তাঁর কাব্য রচনা করেন। এর মধ্যে নিজ কল্পনাপ্রসূত পালাও সংযোজিত করেছিলেন। যার মধ্যে 'শিবরামের পালা' একসময় বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

৯. কবিচন্দ্র ঃ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবিচন্দ্র নামধারী প্রায় ত্রিশজন রামায়ণ রচয়িতাকে পাওয়া যায়। এর মধ্যে বাঁকুড়া জেলার তিনজন কবি শঙ্কর চক্রবর্তী, ভবানীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং লক্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তৎকালে জনপ্রিয়তা লাভ করেন।

১০. শঙ্কর চক্রবর্তী ঃ শঙ্কর চক্রবর্তীর কাব্য সপ্তদশ শতকে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তাঁর কাব্য নাম 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ'। মল্লরাজ দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের রাজত্বকালে তিনি তাঁর কাব্য রচনা করেন। গোপাল সিংহের আমলে তিনি সভাকবির মর্যাদা লাভ করেন। তাঁর উপাধি ছিল কবিচন্দ্র।

দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় পুনরায় বসতি।
রঘুনাথ সিংহের জয় করে রঘুপতি।।

শঙ্কর চক্রবর্তী বাল্মীকি বা কৃত্তিবাস কাউকেই হুবহু অনুসরণ করেন নি। আখ্যান রচনার ক্ষেত্রে এবং আখ্যান উপস্থাপনা ভঙ্গীতে তিনি মৌলিকত্বের পরিচয় দেন। তাঁর কাব্যে বৈষ্ণব প্রেমভাবের গভীর প্রভাব দেখা যায়।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে রাম-লক্ষণকে দেখে বীরবাহুর ভাবান্তরের দৃশ্যটি উল্লেখযোগ্য -

'বীরবাহু শ্রীরাম লক্ষণ রূপ দেখি।
ভাবে প্রেমে পুলকিত ছল ছল আঁখি।।
রাম দেখি মোহিত হইয়া বীর পড়ে।

টিপ্পনী

প্রণাম করিয়া স্তব করে কর জোড়ে।।
তুমি বহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
পরম পুরুষ বিশ্বময় পরাৎপর।।
এই হেতু পৃথিবীতে রাম অবতার।
রক্ষকুল সভাকার করিতে সংহার।।
চারি বেদে বহ্মা যারে না পায় ধেয়ানে।
অভয় চরণ দুটি দেখিনু নয়ানে।।'

টিপ্পনী

এই রচনা পরিচ্ছন্ন, আবেগমন্ডিত এবং অতিরিক্ত পান্ডিত্য বর্জিত। বহুল অলংকার ব্যবহারের পরিবর্তে তিনি চলমান মৌখিক রীতিকে কাব্যে ব্যবহার করেছেন স্বচ্ছন্দে –

'বুঝিলাম বটে বিষ্ণু আস্যাছেন অবনী
শ্যাপ্যা দিলা নারদ সে সব ফন্দি জানি।।'

১১. ভবানী শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ তিলক চন্দ্র রাজার রাজত্বকালে সাগরদিয়া নিবাসী কবি ভবানী শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বণে তাঁর কাব্য রচনা করেন। তাঁর উপাধি কবিচন্দ্র। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের মতে ভবানীশঙ্কর ও রামশঙ্কর একই ব্যক্তির নাম। ভবানীশঙ্করের কাব্যে বৈষ্ণবীয় ভক্তিরসের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তরণী সেনের মৃত্যু দৃশ্য বর্ণনায় কবি লিখেছেন –

'তরণীর মাথা পড়ে রাম পদতলে।
কাটা মুন্ড সবনেতে রাম রাম বলে।।
রাম পদতলে মুন্ড গড়াগড়ি যায়।
বদনে রামের নাম উভরায় গায়।।'

১২. অদ্ভুত আশ্চর্য রামায়ণ ঃ অষ্টাদশ শতকে বর্ধমান জেলার জগৎরাম ন'টি অংশে বিভক্ত রামায়ণ রচনা করেন। তাঁর পুত্র রামপ্রসাদ পিতার রচিত লঙ্কাকান্ড ও উত্তরাকান্ডকে পরিবর্ধন করেন। আবার ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গার অকালবোধনকে কেন্দ্র করে 'দুর্গা-পঞ্চরাত্রি' রচনা করেন। যার ষষ্ঠী, সপ্তমী এবং অষ্টমী পালা রচনা করেন জগৎরাম। নবমী ও দশমী পালা রচনা করেন রামপ্রসাদ। অদ্ভুত রামায়ণের অনুসরণে লেখা এই রামায়ণও অদ্ভুত রামায়ণ। আবার পিতা-পুত্রের যৌথ প্রচেষ্টায় রচিত বলে তা আশ্চর্যের। তাই এই কাব্য 'অদ্ভুত আশ্চর্য রামায়ণ' নামে খ্যাতি লাভ করেছে। রামপ্রসাদ তাঁর রচনায় পিতা জগৎরামের স্তুতি করে লিখেছেন –

'পিতা জগৎরাম মোর রামপরায়ণ।
যেহ কাব্য রচিল অদ্ভুত রামায়ণ।।'

১৩. রামানন্দ ঘোষ ঃ আঠারো শতকের শেষ ভাগে রামানন্দ ঘোষ তাঁর রামায়ণ রচনা করেন। রামচন্দ্র ও জগন্নাথকে অভিন্ন কল্পনা করে তিনি উভয়েরই উৎস পুরুষ বুদ্ধদেব বলে দাবী করেন। স্লেচ্ছ শাসনের বিপক্ষে প্রশ্ন তুলে তিনি আশা করেছেন যেদিন জগন্নাথ দেবের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে সেদিন তাঁর কাব্য জগন্নাথ দেব শ্রবণ করবেন।

'ম্লেচ্ছ ভোগ্য বসুন্ধরা হইল সংসারে।

দাসীরূপা হৈলা লক্ষ্মী নীচ জাতি ঘরে।।
ইহাতে সতের আর না দেখি নিস্তার।
কোন রূপে না মিলে ইহার প্রতিকার।।
কালী বৈলা তোমা হইতে হইবেক পথ।
একেবারে সিদ্ধ হবে জগমনোরথ।।'

....

'সুধাফল ঘোষ পুত্র আনিয়া সংসারে।
রামচন্দ্র লীলামৃত ভব তরাবারে।
দারু বন্ধ রাজা হয়্যা করিবা শ্রবণ।
প্রকাশ হইল গ্রন্থ ইহার কারণ।।'

টিপ্পনী

১৪. রামানন্দ যতী ঃ ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে রামানন্দ সতীর রামতত্ত্ব রচিত হয়। গ্রন্থের নানা জায়গায় ভণিতা হিসাবে কবি 'রামানন্দ ক্ষেপা' 'রামানন্দ জাতি' প্রভৃতি উপাধি ব্যবহার করেছেন। সুকুমার সেনের মতে রামানন্দ ঘোষ এবং রামানন্দ সতী একই ব্যক্তি –

'দুইজন বলিতেছি বটে, কিন্তু একজন হওয়াও একেবারে অসম্ভব নয়।' (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ২য় খন্ড)

তাঁর মতে কবি উড়িষ্যায় গিয়ে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হন এবং পরে এক নতুন ধর্মপথ প্রচার করেন। তাঁর শিষ্যদের দ্বারা তিনি চৈতন্যরূপে পূজাও লাভ করেন। রামানন্দ স্বরচিত রামায়ণ প্রসঙ্গে লিখেছেন –

রামানন্দ বলে নাহি জানি ভালোমন্দ।
কথার পুস্তক দেখ্যা করিয়ে প্রবন্ধ।।
সতী বলে মহীতে অনেক রামায়ণ।
রস ছাড়া কথা আমি না করি রচন।।

১৫. বিনন্দিয়া সিংহ ঃ পুরুলিয়া জেলা নিবাসী বিনন্দিয়া সিংহ ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে আঞ্চলিক লোক ভাষায় ঝুমুর গানের ছন্দে রামায়ণ রচনা করেন। তাঁর কাব্যের লিপান্তর করেন নিরঞ্জন মাহাতো। কবি লোকজীবনের সাথে সম্পৃক্ত করে তাঁর আখ্যান পরিবেশন করেছেন। তাঁর কাব্যে গ্রাম্য জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার স্বাভাবিক আলো-আঁধারের যাতায়াত পরিলক্ষিত হয় –

'সতী মন্দেদরী ফিরি গেলা ঘুরি,
নানা বাদ্য দ্বারে বাজিছে রে।
লঙ্কায় রাবণ রণে সাজিছে রে।।
সাজে রথ রথী, আনিল সারথী,
গজবাজী কত বাজীছে রে।
লঙ্কায় রাবণ রণে সাজিছে রে।।
বম্মাড তলওয়ার, মুষল মুদ্গার,

ঢাল কাট্টারী তীর সাজিছে রে।
লঙ্কায় রাবণ রণে মজিছে রে।।
যেথা বীর ছিল, সে সব আইল,
বিলন্দ মনে মনে ভাবিছে রে।
লঙ্কায় রাবণ রণে সাজিছে রে।।'

টিপ্পনী

১৬. চন্দ্রাবতী ঃ সপ্তদশ শতকের কবি চন্দ্রাবতী রামায়ণের একমাত্র মহিলা রচয়িতা। মনসামঙ্গল কাব্য রচয়িতা দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী।

চন্দ্রকুমার দে মহাশয় ময়মনসিংহের গ্রাম্য নারীদের থেকে মুখে মুখে প্রচলিত চন্দ্রাবতীর রামায়ণ সংগ্রহ করেন। ১৯৩২ সালে দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত পূর্ববঙ্গগীতিকায় এই রামায়ণ গাথা পাওয়া যায়। এই রামায়ণের কোন লিখিত পুথি পাওয়া যায় নি। ফলে এই রচনাকে নিয়ে বহু তর্ক-বিতর্ক ও সন্দেহ দানা বেঁধেছে।

প্রথমত, চন্দ্রকুমার দে-এর আগে ময়মনসিংহের অন্য কোন রচনায় এই রামায়ণ সম্বন্ধে কোনও উক্তি পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, এই কাব্যের ভাষার প্রয়োগ, বাকরীতি এত বিশুদ্ধ পশ্চিমবঙ্গীয় রীতিতে রচিত যে, যদি চন্দ্রকুমার দে মহাশয় এই কাব্য ময়মনসিংহের মহিলাদের থেকে সংগ্রহ করেও থাকেন, তিনি নিজে এতে কলম চালনা করে এর গ্রাম্যতা লক্ষণ সব মুছে ফেলেছেন। ফলে এর সাহিত্যিক মূল্য অনেকাংশে কমে গেছে।

চন্দ্রাবতীর কাহিনী সম্পর্কে জানা যায়, জয়ানন্দ নামে এক বাহ্মণ সন্তানের সাথে তার বিবাহ স্থির হয়। কিছু চূড়ান্ত প্রস্তুতির মুহূর্তে জয়ানন্দ ধর্মান্তরিত হয়ে আশমানী নামে এক মুসলিম মেয়েকে বিয়ে করলে চন্দ্রাবতীর আশাভঙ্গ হয় –

'না কান্দে না হাসে চন্দ্রা নাহি বলে বাণী।
আছিল সুন্দরী কন্যা হইল পাষানী।।'

এই যন্ত্রণা ভুলতে চন্দ্রাবতী রামায়ণ রচনায় মনোনিবেশ করেন –

'নির্ম্মাইয়া পাষাণ শিলা বানাইলা মন্দির।
শিব পূজা করে কন্যা মন করি স্থির।।
অবসরকালে কন্যা লেখে রামায়ণ।
যাহারে পড়িলে হয় পাপ বিমোচন।।'

চন্দ্রাবতীর রামায়ণ পালা গানটির সম্পূর্ণ সংগ্রহ করা যায় নি। সীতার বনবাসেরা কাহিনীর আগেই মাঝপথে কাহিনীটি খন্ডিত। চন্দ্রকুমার দে পালাটিকে তিনটি খন্ডে ও উনিশটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন। চন্দ্রাবতী নারীর দৃষ্টি দিয়ে রামায়ণকে দেখেছেন, তাই তাঁর রামায়ণ শুরু হয়েছে সীতার জন্ম আখ্যান দিয়ে, দ্বিতীয় খন্ডে সীতার বারমাস্যা বর্ণিত হয়েছে। শেষ খন্ডেও সীতার বনবাস কাহিনীরই প্রস্তুতি পর্ব। সমালোচকেরা তাই এই কাব্যকে রামের আস্তান নয়, সীতার আখ্যান কাব্য হিসাবে 'সীতায়ণ' নামে অভিহিত করেন। চন্দ্রাবতীর নিজের জীবনের মতোই এ কাব্যে সীতার দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা-বিরহ স্থান পেয়েছে। স্ত্রীসমাজে প্রচলিত এই রামায়ণটি রামায়ণের মত পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত আখ্যান দ্বারা যুক্ত নয়। কয়েকটি রামায়ণে প্রসিদ্ধ, আখ্যান আলাপ

আলাদা ভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। মূলত এই কাব্য রামায়ণের অনুবাদ কাব্য নয়; এ কাব্য রামায়ণের লোক গাথা।

সীতার জীবন বর্ণনায় চন্দ্রাবতীর মতোই সীতাও ভাগ্য দ্বারা নিগৃহীত। ভাগ্যকে দায়ী করে সীতার উক্তি –

'আমার লাইগা সোনার লঙ্কা গো হইল ছারখার।
আমি গো শুইনাছি লক্ষ লক্ষ নারীর হাহাকার।।
সেই অভিশাপ লক্ষ্মণ গো, আমার সংসার সুখ খাইল।
কারও কোনো দোষ নাই গো, আমার ভাগ্য যে ফলিল।।'

টিপ্পনী

এ প্রসঙ্গে নবনীতা দেবসেনের উক্তি –

'নিগৃহীত তপস্বীদের বুকের রক্ত এবং উপেক্ষিতা মন্দোদরীর বুকের কান্নায় তাঁর মৃত্যু কামনার সংমিশ্রণে সীতার সৃষ্টি।'

চন্দ্রাবতীর রামায়ণে 'কুকুয়া' চরিত্রটির বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে কবি সীতা আর কুকুয়া, শুভ-অশুভের দ্বন্দ্বকে রূপদান করেছেন। সীতার সতীত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনার ক্ষেত্রে কুকুয়া চরিত্রের বৈপরীত্যকে কাজে লাগিয়েছেন কবি। রামায়ণ গাথায় সীতার বারমাস্যা সংযোজন চন্দ্রাবতীর আরো একটি কৃতিত্ব –

'বৈশাখ মাসেতে দিন রে অরণ্যে প্রবেশ।
শিরে জটা প্রভুর আমার গো সন্ন্যাসীর বেশ।।
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে দিন গো রবির বড় জ্বালা।
হাঁটিয়া চলিতে প্রভুর গো বদন হইল কালা।।'

চন্দ্রাবতীর দুঃখ-বিরহ আর সীতা চরিত্রের বেদনা চন্দ্রাবতীর রামায়ণে যেন এক সরলরে খায় মিলে গেছে। এ সম্পর্কে সুরঞ্জন মিদ্দার উক্তিটি প্রাণধান যোগ্য –

"চন্দ্রাবতীর রামায়ণে মূলতঃ একজন নারীর উপাখ্যান লিখেছেন একজন নারী। লিখেছেনও নারীদের জন্যে। গানের ধুয়োটি দেখলে পরিষ্কার হয় – 'শুন সখীজন', এখানে এই সখীরা সবাই নারী। কোথাও রামভক্তির চিহ্নমাত্র নেই। তাই 'সীতায়ণ' বললেও ধর্মনিরপেক্ষ রামায়ণ বলা যেতে পারে। রামকথা নয় সীতার জীবনকথা প্রতিভাত হয়েছে। একজন সম্পূর্ণ নারীর জীবনচক্র প্রকাশিত। ... এখানে আসলে দুজন নারী আছেন। একজন সীতা অন্যজন চন্দ্রাবতী। সীতার কণ্ঠে বিদ্রোহ নেই। প্রতিবাদ আছে চন্দ্রাবতীর লেখনীতে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মূল আদর্শের যোগ্য প্রতিনিধি সীতা। কিন্তু চন্দ্রাবতী জীবনে আঘাত লাগা একজন প্রতিবাদী নারী। তিনি রামের কঠোর সমালোচনা করেছেন। চিরায়ত আখ্যানকে নতুন করে সাজিয়েছেন। ষোড়শ শতাব্দীর সময়কার আদর্শ ও ঘটনার নির্বাচনে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানিয়েছেন। অথচ তিনি সীতার মুখে রামের বদনাম করাননি। (দশদিশি : ২০১১)

ভাগবত

চৈতন্য আবির্ভাবের পরবর্তী সময়ে বাংলায় ভক্তিভাবের যে জোয়ার নামে তার সাথে কৃষ্ণের ষড়ৈশ্বর্যরূপমাধুরীর যথেষ্ঠ পার্থক্য ছিল। চৈতন্যের রাগানুগা ভক্তিরসে আপ্লুত বাঙালি তাই সহজে রামায়ণ মহাভারত অতিরিক্ত তত্ত্বাশ্রয়ী দর্শনের ভাগবতে মজতে সুযোগ পায়নি। যোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে গোটা সপ্তদশ শতক জুড়ে ভাগবতের অনুবাদ হলেও কোনও অগ্রগণ্য কবির সন্ধান মেলে না। উপরন্তু কবিরা বিচ্ছিন্নভাবে ভাগবতের বিভিন্ন স্কন্দেব্য অনুবাদ করলেও সমগ্র ভাগবত অনুবাদের মতো বিশালাকায় যঞ্জে কোনও কবিই অবতীর্ণ হননি। ভাগবত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপনিষদ স্বরূপ হলেও তৎকালীন বাঙালি সমাজ চৈতন্যভাবাপন্ন বৈষ্ণব সাহিত্যে অধিক রসেব্য আধার খুঁজে পেয়েছিল। বৈষ্ণব সমাজ রাগানুগা প্রেমভক্তিকে সাদরে গ্রহণ করে ঐশ্বর্য মিশ্রা ভক্তিকে তুলনায় দূরে সরিয়ে রেখেছিল। একই সাথে এই সময়ে বৈষ্ণব পদাবলীর বিপুল ও ব্যাপক প্রসার ভাগবতাশ্রয়ী কৃষ্ণলীলাকে অনেকাংশে মলিন করে রেখেছিল।

যোড়শ শতাব্দীতে ভাগবতের কোনও পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ হয়নি। একমাত্র ভাগবতার্যের 'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী' বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যের যথাযথ পূর্ণাঙ্গ অনূদিত ভাগবত পাওয়া যায় না।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ভাগবতের কোন আঞ্চরিক বা পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ পাওয়া যায় না। সনাতন বিদ্যাবাসীর, কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণকিঙ্কর, দ্বিজ হরিদাস, অভিরাম দত্ত (দাস), দুর্লভমন্দন, কবিচন্দ্র প্রভৃতি কবিদের রচনা এই সময়ের। এঁরা প্রত্যেকেই ভাগবতের নির্দিষ্ট কিছু স্কন্দের অনুবাদ করেছেন। সম্পূর্ণ ভাগবত অনুবাদের দায়িত্ব কেউই কাঁধে তুলে নেননি। উপরন্তু ভাগবত ব্যতিরেকে অন্যান্য পুরাণ - উপপুরাণ থেকেও এঁরা কাহিনী সংযোজন সংযোজন করেছেন এবং মূল ভাগবতের তত্ত্বকথা, দার্শনিক উক্তি, যথাসম্ভব বাদ দিয়েছেন। নিজের মতো করে শুধু আখ্যান বর্ণনা বা কোনও অক-দুটি স্কন্দেরা মূলানুগ অনুবাদ করেই এরা ক্ষান্ত থেকেছেন। লোক সমাজে ভাগবত সেভাবে জনপ্রিয় হয়নি ঠিকই, কিন্তু জনপ্রিয় করে তোলবার প্রয়াসেই এই সব কবিরা তাঁদের কাব্যে দানলীলা, নৌকালীলা, রাধাচন্দ্রাবলী, বড়ায়ির আখ্যান প্রভৃতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে কাব্যকে লোকমনোরঞ্জক করে তুলতে চেয়েছিলেন। এই সব গ্রাম্য কাহিনীগুলোর প্রভাব সমাজে এত গভীরভাবে বিদ্যমান ছিল যে কবিরা সহজে তার মোহ ত্যাগ করে, নিজস্ব কবিত্ব গুণের উপর ভরসা করতে পারেননি।

☐ **সনাতন বিদ্যাবাগীশ ঃ** সনাতন বিদ্যাবাগীশ ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ভাগবতের প্রথম স্কন্দের অনুবাদ করেন। পরবর্তী প্রায় কুড়ি বছর ধরে তিনি সমগ্র ভাগবতটিই অনুবাদ করেন। তাঁর প্রতিটি স্কন্দেরই রচনাকাল তিনি উল্লেখ করেছেন।

কৃষ্ণদাস ঃ সতেরো শতকে কৃষ্ণলীলার কবি হিসাবে তিনজন কৃষ্ণ দাসের নাম পাওয়া যায়। এর মধ্যে শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য কৃষ্ণদাস 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' রচনা করেন। এই কাব্যে ভাগবতের দশম স্কন্দের কৃষ্ণের জন্মলীলা থেকে শুরু করে একাদশ স্কন্ধের খানিকটা এবং দ্বাদশ স্কন্ধের পরীক্ষিতের কাহিনী পর্যন্ত আখ্যানকে কবি নিজের ভাষায় পরিবেশন করেছেন। এর মধ্যে

টিপ্পনী

দানলীলা, নৌকালীলা, বংশীখন্ডের আখ্যান, ভারখন্ডের কাহিনী প্রভৃতিকে তিনি সংযোজিত করেছেন। তাঁর নিজেরই রচনা –

‘দানখন্ড নৌকাখন্ড নাহি ভাগবতে।
অজ্ঞ নাহি কিছু কহি হরিবংশ মতে।।’

অর্থাৎ কবি এই সংযোজন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তবু হয়ত জনমানসে খ্যাতি অর্জনের জন্য এই সমস্ত লোক প্রচলিত আখ্যানগুলির সংযোজন করেছিলেন। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, হরিবংশের আখ্যান বলে কবি যে সংযোজনগুলিকে সিদ্ধ করতে চেয়েছেন সেগুলি আদৌ হরিবংশের উপাদান নয়; একেবারেই সমাজে প্রচলিত লোক আখ্যান।

টিপ্পনী

কাশীরাম দাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণদাস ভাগবতের দশম স্কন্দের অনুবাদ করেন। কাব্যের নাম ‘শ্রীকৃষ্ণবিলাস’। এটিও ভাগবতের ভাবানুবাদ। অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ কাব্যটির কিছু অংশ সম্পাদনা করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশ করেন। তাঁর কাব্য রচনাকাল সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশক। সম্পাদক অমূল্যচরণ ‘শ্রীকৃষ্ণবিলাস’ কাব্যের মধ্যে ‘কৃষ্ণকিঙ্কর’ নামে ভণিতা লক্ষ্য করেন। তাঁর মতে কৃষ্ণদাস এবং কৃষ্ণকিঙ্কর একই ব্যক্তি। কবির মতে তাঁর গুরু জয়গোপাল দাস তাঁর এই নামকরণ করেন।

সেইখানে শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর নাম থুয়া।
আজ্ঞা কৈলে শ্রীনন্দন ভজ গিয়া।।

কৃষ্ণদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর দাসও ‘জগৎমঙ্গলে’ এ কথার সমর্থনে রচনা করেছেন –

প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর।
রচিল কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর।।
আর অপরূপ কথা অমৃতের ভান্ডে।
না লিখিল বেদব্যাস এই নৌকাখন্ডে।।

কবির কাব্যনামও এক্ষেত্রে ‘শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল’ অভিধা প্রাপ্ত হয়। মনে করা হয় দুটিই নাম ভেদে একই গ্রন্থ। কবির ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী কোন আলাদা কৃতিত্বের দাবীদার নয়। কাশীরাম দাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হিসাবে অভিসন্ধিৎসু পাঠককূলে তিনি জ্ঞাত হয়ে আছেন। আবার ঘনশ্যাম নামে এক কবির সন্ধান পাওয়া যায়, যাঁর গুরু প্রদত্ত নাম ও কাব্যনাম একই। এই দু’জন কবি এক না আলাদা সে সম্পর্কে নিশ্চিত করে কোনও গবেষক পথ নির্দেশ করেননি। তবে ঘনশ্যাম ভণিতাযুক্ত কাব্যের কবিত্বগুণ অধিক প্রশংসাযোগ্য।

দৈবকীনন্দন সিংহ ঃ ষোড়শ শতকের দৈবকীনন্দন সিংহের কাব্য নাম ‘গোপাল বিজয়‘। তাঁর পিতা চতুর্ভুজ সিংহ এবং মাতা হীরাবতী। কবিশেখর উপাধিতে তিনি ভূষিত হন। আত্মপরিচয় অংশে তিনি লিখেছেন –

সিংহ বংশে জন্ম নাম দৈবকী নন্দন।
শ্রী কবিশেখর বুলি বোলে সর্ব্বজন।।
বা শ্রী চতুর্ভুজ মা হীরাবতী।
কৃষ্ণ যার প্রাণ ধন কুলশীল জাতি।।

গোপাল বিজয় ভাগবত অনুসারী পাঁচালী আকারে লেখা একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ। এ কাব্যের অনেকগুলি পুঁথির প্রাপ্তি থেকে অনুমিত হয় যে লোকসমাজে কাব্যটি জনপ্রিয় ছিল। কবি লোকসমাজে জনপ্রিয়তার কারনেই সম্ভবত ভাগবত কথার অতিরিক্ত হালকা চালের লোককথাকে কাব্যে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তাঁর রচনায় আঞ্চলিক উপভাষার বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়–

‘আর এক দোষ না লবে আহ্মার।
পুরাণের অতিরেক কহিব অপার।।’

টিপ্পনী

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সম্পাদনায় ‘গোপাল বিজয়’ প্রকাশিত হয়। জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় কাব্যটিতে ২৫০০ শ্লোকের সন্ধান পান। প্রাপ্ত পুথি গুলিও বৃহদাকার। কৃষ্ণজন্ম থেকে উদ্ধবসংবাদ পর্যন্ত, কোন কোন পুথিতে কংসবধের পরবর্তী কাহিনীও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। দানলীলা, নৌকালীলা প্রভৃতির কাহিনীকেও সংযুক্ত করা হয়েছে কাব্যে। ঘটনাবিন্যাস, চরিত্র চিত্রণ, কাব্যশৈলী নির্মাণ সর্বোপরি অলংকার প্রয়োগে কবিশেখর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

রঘুনাথ ভাগবতাচার্য ঃ ষোড়শ শতাব্দীর রঘুনাথ ভাগবতাচার্য চৈতন্য সমকালে জীবিত ছিলেন এবং সেই সময় কাব্য রচনা করেন বলে অনুমান করা হয়। নীলাচল প্রত্যাবর্তনকালে চৈতন্যদেব বরাহনগরে কবির আতিথ্য গ্রহণ করেন। তাঁর ভাগবতপাঠে মুগ্ধ হয়ে স্বয়ং মহাপ্রভু তাঁকে ভাগবতাচার্য উপাধি দেন। বৃন্দাবন দাসের কাব্যে একথার প্রমাণ মেলে –

‘প্রভু বলে ভাগবত এমন পড়িতে। কভ
ু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে।।
এতেক তোমার নাম ভাগবতাচার্য।
ইহা বহি আর কোনো না করিহ কার্য।।’

তাঁর কাব্যনাম কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিনী। ভাগবতের বারোটি খন্ডকে একত্রিশটি অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত করে যথাসম্ভব সহজভাবে তিনি ভাগবত বাংলায় অনুবাদের চেষ্টা করেছেন। বাংলা সাহিত্যের (সম্ভবত প্রতিনিধি স্থানীয় একমাত্র) ভাগবতের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী।

বৈষ্ণব গুরু গদাধর পন্ডিতের শিষ্য হওয়ার সুবাদে রঘুনাথের কাব্যে চৈতন্য প্রবর্তিত ভক্তিরসের সমাধিক প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। ভাগবতের পৌরাণিক ভাবমন্ডলকে যথাসম্ভব রক্ষা করে কবি বৈষ্ণবীয় প্রেমমার্গের আদর্শকে কাব্যে স্থান দিয়েছেন। রাসলীলা বর্ণনা দৃশ্যে কবি লিখেছেন –

‘আমাকে দেখিলে গোপী বড়ই সুন্দর।
শিঘ জাহ সুন্দরি চলিঞা নিজ ঘর।।
নারি কুলে মোঞ্চধর্ম পতির সেবণ।
....
রোগ ক্ষত উদ্ধত দরিদ্র ষড়মতি।
তবু পতি না ছাড়িব নারি গুণবতি।। ি
নজ পতি ছাড়ি জেবা পরে করে মন।
কুলে অবজস হএ নরকে গমন।।’

প্রচলিত রাসলীলায় যেখানে ষোড়শ সখীগণের সঙ্গে কৃষ্ণ লীলা করেছেন, সেখানে কৃষ্ণের মুখে এ হেম উক্তি অভিনব ও সমাজ উপযোগী।

দ্বিজমাধব ঃ লোক ভাষায় ভাগবত কথাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস দেখিয়েছিলেন দ্বিজমাধব। তাঁর কাব্যনাম 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'। লোকভাষায় ভাগবত রচনার জন্য তিনি যথার্থই কৃতিত্বের দাবীকার। তাঁর মতে –

'ভাগবত সংস্কৃতে না বুঝে সর্বজনে।
লোকভাষা রূপে কহি সেই পরিমাণে।।'

লোককথাকে বাস্তব ভিত্তি প্রদানের জন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণের পাশে নায়িকা হিসাবে রাধার চরিত্র অঙ্কণ করেছেন। দ্বিজমাধব-এর পিতা ছিলেন পরাশর। ময়মনসিংহের নবীনপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিজমাধব চৈতন্য সমসাময়িক কবি এবং চৈতন্যকে তিনি তাঁর সখা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। –

'কলিযুগে চৈতন্য সেই অবতার।
দ্বিজমাধব কহে কিঙ্কুর তাহার।।'

আবার অন্যত্র লিখেছেন –

ভাগবত কৃষ্ণকথা অমৃতের সার।
দ্বিজমাধব কহে চৈতন্য সখা জার।।'

দ্বিজমাধবের কাব্যে অতিরিক্ত পান্ডিত্য প্রদর্শন নেই। বরং আছে সহজ ভাবাবেগের হৃদয় প্রাধান্য ও চৈতন্যপ্রীতির সহজাত উচ্ছ্বাস।

দ্বিজ হরিদাস ঃ ষোড়শ শতকের কবি দ্বিজ হরিদাসের কাব্যে ভাগবত বহির্ভূত বিষয় সংযোজিত হলেও এর মূল সুর যে কৃষ্ণপ্রেম ও কৃষ্ণমাহাত্ম্য বর্ণনা – তা পূর্বাপর রক্ষিত হয়েছে। আখ্যানে তত্ত্বকথা ও দার্শনিক উক্তি তুলনায় কম উল্লেখ করেছেন।

দুঃখী শ্যামদাস ঃ মেদিনীপুর জেলার কেদারকুন্ড পরগণার হরিহরপুর গ্রামের দুঃখী শ্যামদাস। সুকুমার সেনের মতে, ষোড়শ শতকেই তাঁর 'গোবিন্দমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। কবি মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-এর দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত ছিলেন। 'বঙ্গবাসী' থেকে ১৩১৭ বঙ্গাব্দে দুঃখী শ্যামদাসের 'গোবিন্দমঙ্গল' প্রকাশিত হলে দেখা যায় রচনারীতিতে নাটকীয়তার অবতারণা করে কবি কাব্যকে জনপ্রিয় করে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর বর্ণনা ক্ষমতাও প্রশংসার দাবীদার। বড়াই-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন –

''বড়াইর বেশ যত কি বলিতে পারি।
পাকা চুলে রঙ্গ ফুলে বেন্ধেছে কবরী।।
সীথায় সিন্দুর ভালে চন্দনের ফোঁটা।
শ্রবণে কুন্ডল যেন দিনমণি দূটা।।
এ বৃদ্ধ বয়সে বুড়ী না ছাড়ে কজ্জল।
রসনা চলনে নড়ে দশন সকল।।

টিপ্পনী

স্বর্ণ সূত্র নাসাপুটে গজমতি দুলে।
স্তন দুটি গোটা তার দোলে নাভিমূলে।।”

কৃষ্ণ চরিত্র বর্ণনায় কবি কৃষ্ণকে ইন্দ্রিসাসক্ত করে তুলেছেন –

“রাধিকার অনুরাগে অন্তরে আনল জাগে
দগধে গারুণ কামশরে।
তাহার বিরহে প্রাণ ধরিতে নারিবে কান
বলহ বড়াই বুদ্ধি মোরে।।”

টিপ্পনী

সনাতন বিদ্যাবাগীশ ঃ সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে সনাতন বিদ্যাবাগীশ ভাগবতের সম্পূর্ণ অনুবাদ করেন। প্রতিটি স্কন্দের শুরুতে তিনি রচনাকালের উল্লেখ করেছেন। তিনি প্রথম স্কন্দ রচনা করেন ১৬৭৯ খীস্টাব্দে (১৬০১ সকাব্দে) সমগ্র কাব্যটি রচনা করতে তাঁর প্রায় কুড়ি বছর সময় লেগেছিল।

অভিরাম দত্ত ঃ সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগের কবি অভিরাম দত্তের কাব্য নাম ‘গোবিন্দবিজয়’। কেউ কেউ এ কাব্যকে ‘শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল’ নামেও অভিহিত করেছেন। কাব্যে কবি ভাগবতের প্রথম, দ্বিতীয় ও দশম স্কন্দের অনুবাদের সাথে সাথে কৃষ্ণের বাঁশী হারানোর কাহিনীকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কবির কবিত্ব শক্তি বিশেষ উল্লেখ্যের দাবীদার না হলেও পরিচ্ছন্ন, সরস এবং কবিত্বগুণ সমন্বিত।

শঙ্কর চক্রবর্তী ঃ সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কবিশঙ্কর চক্রবর্তীর রচনা ‘গোবিন্দমঙ্গল’-এ অভিরাম দত্তের কাব্যের বহুশ্লোক প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। বিষ্ণুপুরের কাছে পানুয়া গ্রামে বসবাসকারী এই কবি কাব্য রচনা করেন রাজা গোপালসিংহের আমলে। তাঁর উপাধি ছিল ‘কবিচন্দ্র’। নিজ কাব্যকে তিনি ‘ভাগবতামৃত’, ‘শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল’ প্রভৃতি নামে অভিহিত করেছেন।

‘গোবিন্দমঙ্গল’ সঠিক অর্থে ভাগবতের অনুবাদ নয়। ভাগবতের প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম স্কন্দের উল্লেখযোগ্য কিছু কাহিনী অবলম্বন করে কবি কাহিনী বা আখ্যান নির্মাণ করেছেন, সঙ্গে পুরাণের কাহিনীও যোগ করেছেন। কবির প্রাপ্ত পুথি থেকে অনুমিত হয় যে কাব্য এককালে প্রসিদ্ধ ছিল।

পরশুরাম চক্রবর্তী ঃ সপ্তদশ শতাব্দীর কবি পরশুরাম চক্রবর্তীর নামে ‘শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল’ শীর্ষক কাব্যটি পাওয়া যায়। এটিই লোকজীবনে প্রচলিত কাহিনী সম্বলিত ভগবতের ভাবানুবাদমাত্র।

তাঁর কাব্য ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও নলিনীকান্ত দাশগুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। সম্পাদক নলিনীকান্ত দাশগুপ্ত মহাশয় কবির রচনা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, –

“দশম স্কন্দেও কবি ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই, মোটামুটিভাবে ভাগবতকে উপজীব্য করিয়া কৃষ্ণচরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন।”

কবির ভাষা প্রয়োগে বহুল গ্রাম্য শব্দের প্রয়োগ লক্ষিত হয় –

“হেলায় ছের্দার জেবা কৃষ্ণকথা কয়” –জাতীয় বাক্যবন্ধ তিনি বহুবার ব্যবহার করেছেন। ড. অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মতে –

> “কবি ইচ্ছাকৃত কবিত্ব না দেখাইয়া সহজভাবে কাহিনীটিকে বিবৃত করিতে চাহিয়াছেন, – নিরাভরণ বর্ণনাধর্মী রচনা হিসাবে ইহার কিছু মূল্য স্বীকার করিতে হইবে।”

পরশুরাম চক্রবর্তীকে ‘দ্বিজ পরশুরাম’ নামেও অভিহিত করা হয়।

পরশুরাম রায় ঃ বীরভূম জেলার পরশুরাম রায় ছিলেন মনোহর দাসের শিষ্য। তাঁর কাব্য নাম ‘মাধবসঙ্গীত’। দীর্ঘদিন যাবৎ ওড়িশা অঞ্চলে বসবাস করার জন্য তাঁর কাব্যে কিছু ওড়িয়া শব্দের দেখা মেলে। কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা এই কাব্যের মূল উপজীব্য। কাব্যের আত্মপরিচয় অংশে কবি লিখেছেন –

টিপ্পনী

> “চম্পক নগরী গ্রাম   তাহাতে নিবাস ধাম
> মিরাস পুরুষ ছয় সাত।
> লোকনাথ হরিরায়   তৎসুত সুবুদ্ধি রায়
> তার পুত্র শ্রী মধুসূদন।
> দ্বিজ কূলে জনঝিঞা   তাঁহার নন্দন হঞা
> বিরচিল কৃষ্ণের কীর্ত্তন।।”

কৃষ্ণের প্রশস্তির মাধ্যমে কাব্য রচনা শুরু করে কবি লিখেছেন –

> “অবধানে শুন ভাই ভাগবত কথা।
> যে কথা শুনিলে তুষ্ট সকল দেবতা।।”

ভাগবতকে সকল গ্রন্থের থেকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়ে কবি লিখেছেন –

> “ভাগবত কল্পতরু অমূল্য শাস্ত্রলতা।”

কৃষ্ণদাস ঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণদাস নামধারী তিনজন কৃষ্ণলীলা রচয়িতার সন্ধান পাওয়া যায়। গঙ্গাতীরবর্তী কৃষ্ণদাস পন্ডিত, শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য ছিলেন। কবির পিতা যাদবানন্দ এবং মাতা পার্বতী। সুকুমার সেনের মতে সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে বা ষোড়শ শতকের শেষার্ধে কবি তাঁর কাব্য ‘কৃষ্ণমঙ্গল’ রচনা করেন। ভাগবতের দশম স্কন্দ, একাদশ স্কন্দের কিছু আখ্যান ও দ্বাদশ স্কন্দের পরীক্ষিতের কাহিনীকে তিনি তাঁর কাব্যে অন্তর্ভুক্ত করেন। কবির বর্ণনা ভঙ্গী ও ভাষা স্বচ্ছ, পরিণত। অলংকার ব্যবহার প্রশংসনীয়। কবি পূর্ববর্তী মাধবাচার্যের ‘শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল’ কে আদর্শ করে অগ্রসর হয়েছেন এবং ভাগবত বহির্ভূত আখ্যানসকল ‘হরিবংশ’ থেকে সংগ্রহ করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। যদিও দানখন্ড, নৌকাখন্ড প্রভৃতি কাহিনীর ‘হরিবংশে’ কোথাও উল্লেখ নেই।

> “দানখন্ড নৌকাখন্ড নাহি ভাগবতে।
> অজ্ঞ নহি কিছু কহি হরিবংশ মতে।।”

ভাগবতের দশম স্কন্দের ভাবানুবাদে ‘শ্রীকৃষ্ণবিলাস’ কাব্য রচনা করেন কাশীরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণদাস। পন্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় কাব্যটির কিছু অংশ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়। কাব্যটির রচনাকাল সপ্তদশ দশকের শুরু বা ষোড়শ শতাব্দীর

শেষভাগ। কাব্যে কবি ভণিতায় 'শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর' নামটি ব্যবহার করেছেন। গুরু জয়গোপাল দাস কবিকে এই উপাধি প্রদান করেন। কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর দাস তাঁর 'জগৎমঙ্গল' কাব্যে এই প্রসঙ্গে বলেছেন –

"প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর।
রচিল কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর।।"

ঘনশ্যাম নামে অপর একজন কবি 'কৃষ্ণকিঙ্কর' ভণিতায় 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' নামে কাব্য রচনা করেন। দুই কবির কাব্যনাম ও উপাধি এক হওয়ায় দু'জনের পৃথক ব্যক্তিত্ব নিয়ে সমস্যা ও সংশয় তৈরি হয়।

টিপ্পনী

আর একজন কবির কৃষ্ণদাস ভণিতায় রচিত কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এই কাব্যের প্রহ্লাদ চরিত্রের একটি স্বতন্ত্র অবস্থান লক্ষ্যনীয়।

আমলে ভাগবত সম্পূর্ণ অনুবাদের জন্য যে পরিমাণ স্থৈর্য-ধৈর্য্য-পরিশ্রম ও সর্বোপরি কবিত্বগুণ থাকা প্রয়োজনীয় ছিল, সপ্তদশ শতকে সেরকম কবিপ্রতিভা বিরল। ফলে ভাগবত অনুবাদের অছিলায় লোকমনোরঞ্জন উপযোগী রাধা-কৃষ্ণলীলা, গ্রাম্য রসিকতা দুষ্ট কৃষ্ণ আখ্যানকেই কবিরা পরিবেশন করেছেন। ফলে জনমানসে কোনও আলাদা আলোড়ন তাঁরা সৃষ্টি করতে পারেননি।

বলরাম দাস ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি বলরাম দাস ১৭০২ খীস্টাব্দে 'শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত' নামে কাব্য রচনা করেন। কৃষ্ণের লীলাকে নাটকীয়ভাবে পরিবেশন করার জন্য কবি ভাগবতের পাশাপাশি পুরাণ কাহিনীকেও অনুসরণ করেছেন। এই কবিরও বিশেষ কোন কবিকৃতিত্ব লক্ষ্য করা যায় না। কবি নিজের কাব্য সম্পর্কে বলেছেন –

"বন্মাবৈবর্ত্ত মতে জে কহিল ভাগবতে
তাহা আমি করি বিবেচন।।"

মহাভারত

ষোড়শ শতকে মহাভারতের অনুবাদক হিসাবে চারজন প্রধান কবির নাম পাওয়া যায়। কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, সঞ্জয় ও বিজয় পন্ডিত। এঁদের মধ্যে সঞ্জয় ও বিজয় পন্ডিতের পুথির কথা জানা গেলেও তাঁদের পুথির সন্ধান মেলেনি। অপরদিকে ড. শহীদুল্লাহ, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখরা শ্রীকর নন্দী ও কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে একই ব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা করেন। যদিও এঁদের পুথির মধ্যে বিস্তর ফারাক থাকার কারণে অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার সেন প্রমুখরা এঁদের স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবেই গণ্য করেন।

এছাড়াও মহাভারতের অনুবাদক রূপে দৈবকীনন্দন, দ্বিজ অভিরাম, রামচন্দ্র খাঁ, ঘনশ্যামদাস, নিজনন্দ ও দ্বিজ হরিদাস প্রমুখ কাশীরামের পূর্ব বা সমসাময়িক কবিদের নাম উল্লেখ্য। কিন্তু এই কবিদের কেউই প্রায় অখন্ড অষ্টাদশ পর্বের মহাভারত অনুবাদের সাহস দেখাননি।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর ঃ বাংলা মহাভারতের আদি কবিকে সে প্রশ্নের উত্তর সংশয়াতীত। চৈতন্য

সমসাময়িককালে কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামী কবি সমগ্র মহাভারতের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেন। একেই আদি মহাভারত অনুবাদক রূপে ধরা হয়। যদিও শ্রীকর নন্দী এবং কবীন্দ্র পরমেশ্বর একই ব্যক্তি কিনা সে বিষয়ে কোনও কোনও ঐতিহাসিক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

সুলতান হোসেন শাহের লস্কর পরাগল খান যুদ্ধের কাছে চট্টগ্রামে প্রেরিত হন। যুদ্ধ জয়ের পর তিনি এখানেই স্থায়িবসতি স্থাপন করেন। ইনিই একদিনে শ্রবণযোগ্য মহাভারত অনুবাদের আদেশ দেন। যদিও কবীন্দ্রর রচনা একদিনে শোনবার যোগ্য সংক্ষিপ্ত হয়নি; তবু তিনি মহাভারতের সমস্ত প্রধান কাহিনীকে সংঘবদ্ধ রূপদান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কবির ভাষায়–

“শ্রীযুক্ত পরাগল খান মহামতি
পঞ্চম গৌড়ত যার বিখ্যাত খেয়াতি।
নৃপতি হুষন সাহা গৌড়ের ঈশ্বর।
তার কে সেনাপতি হয়ন্ত লস্কর।।
আইলেন্ড চাটিগ্রামে হরষিত হৈয়া।।
পুত্রে পৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি।
পুরাণ শুনন্ত নিত্য হরষিত মতি।।
সংস্কৃত মহাশ্লোক শুতি গুরুতর....
কুতুহল বহুল ভারত কথাশুনি।
কেমতে পান্ডবে হারাইল রাজ্যখানি
বনবাসে বঞ্চিলেক দ্বাদশ বৎসর।
কোন কোন কর্ম কৈল বনের ভিতর....
কেমতে পৌরসে পাইল নিজবসুমতি।
এহি সব কথা কহ সংক্ষেপিয়া।
দিনেকে শুনিতে পারি পাঁচালী রচিয়া।।
তাঁহার আদেশমাল্য মস্তকে ধরিয়া।
কবীন্দ্র পরম যত্নে পাঁচালী রচিয়া।।”

কবির ব্যক্তিগত জীবনীও খুব স্পষ্ট নয়। কোনও কোনও ঐতিহাসিক মনে করেন যে কবির নাম ‘পরমেশ্বর’। ‘কবীন্দ্র’ তাঁর উপাধি। সুকুমার সেন মনে করেন যে কবির আসল নাম ‘কবীন্দ্র’ কিন্তু; ‘পরমযত্নে’ কথাটি লিপিকর ভুলবশত ‘পরমেশ্বর’ করে দিয়েছেন। আবার ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রীর মতে কবির আসল নাম ‘বানীনাথ’। কোচবিহার রাজ নারায়ণ দেবের রাজমন্ত্রী হয়ে তিনি ‘কবীন্দ্র পাত্র’ উপাধি লাভ করেন।

কবীন্দ্র পরমেশ্বরের কাব্যনাম ‘পান্ডববিজয়’ অথবা ‘ভারতপাঁচালী’। গ্রন্থটির প্রচলিত নাম ‘পরাগলী মহাভারত’। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে পরাগল খাঁর জীবদ্দশায় কাব্যটি সম্পূর্ণ লেখা হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ছুটি খাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় কাব্যটি সমাপ্ত হয়। পরাগলী মহাভারতে আঠারোটি পর্বের মধ্যে ‘অশ্বমেধ পর্ব’ টির কবি-ভণিতা শ্রীকর নন্দীর নামে। এখান থেকেই শ্রীকর নন্দী ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর এক ব্যক্তি কিনা – সে সমস্যার উদ্ভব।

শ্রীকর নন্দী ঃ একই কাব্যে ‘কবীন্দ্র’ এবং ‘শ্রীকরণ’ ভণিতা প্রাপ্ত হওয়ায় কোন কোন ঐতিহাসিকের ধারণা হয়েছিল যে, শ্রীকর নন্দী নামী কবিই ‘কবীন্দ্র’ উপাধি ধারণ করে অনুবাদ

কার্য সমাধা করেন। কিন্তু অশ্বমেধ পর্বে এমন কিছু কাহিনীর উল্লেখ মেলে, যা উভয় কবির ভিন্নত্বের প্রমাণ দেয়।

বস্তুত, পরাগল খানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ছুটি খাঁ সম্ভবত কবীন্দ্র পরমেশ্বর অনূদিত ব্যাস মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের কাহিনী শুনে শ্রীকর নন্দীকে 'জৈমিনি মহাভারতের' অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করতে বলেন। জৈমিনি মহাভারত আরও মধুর রচনা বলে তাঁর ধারণা ছিল। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ছুটি খান দেশীয় ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করিয়ে সুকীর্তি অর্জন করতে চেয়েছিলেন। শ্রীকর নন্দীর ভাষায় –

টিপ্পনী

"দেশী ভাষা কহি কথা রচিয়া পয়ার।
সঞ্চরউ কীর্তি মোর সকল সংসার।।"

শ্রীকর নন্দী তাঁর গ্রন্থে বারংবার হোসেন শাহ-এর নামোল্লেখ করেছেন। অনুমিত হয় হোসেন শাহের রাজত্বকালের মধ্যেই (১৫১৯ খীঃ) তাঁর গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। অর্থাৎ কবীন্দ্র এবং শ্রীকরের রচনাকাল প্রায় সমসাময়িক।

সারা ভারতবর্ষেই যেহেতু জৈমিনি মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব ব্যতীত অপর কোনও অংশ উদ্ধার হয়নি, ফলে অনুমান করা চলে শ্রীকর নন্দী জৈমিনি মহাভারতের সম্পূর্ণ অনুবাদ করেন। তাঁর রচনা ছিল বিস্তৃত আখ্যানধর্মী। এই মহাভারতে 'অনুশাল্ব', চন্দ্রহাস, নীলধ্বজ-জনা, প্রমীলা, যৌবনাশ্ব, বভ্রুবাহন, হংসধ্বজ প্রভৃতির আখ্যান কবির বর্ণনা শক্তির পরিচয় দেয় –

"দেবী সত্যভামা তবে পাইয়া অবকাশ।
দ্রৌপদীকে ফেলে তবে কিছু পরিহাস।।
ষোড়শ সহস্র নারী অগ্নি একত্রিত।
এক কৃষ্ণে করিবারে না পারি তাপিত।।
তুমিহ একাকিনী নারী বড়াহি চাতুরী।
পঞ্চজন নায়কের থাকা আসা পুরি।।
কেমত উপাত্র জান ভাল তুমি দেবি।
উদ্দেশে যে তোহ্নাক চরণ অহ্নি সেবি।।"

বিজয় পন্ডিত : এক সময় ঐতিহাসিকেরা মহাভারতের আদি অনুবাদকদের মধ্যে বিজয় পন্ডিতকে গণ্য করতেন। সাহিত্য পরিষদ থেকে নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদনায় 'বিজয় পন্ডিতের মহাভারত' প্রকাশিত হয়। তিনি দাবী করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গবাসী বিজয় পন্ডিতই বাংলা মহাভারতের আদি কবি এবং পূর্ববঙ্গে এই মহাভারতেই 'পরাগলী মহাভারত' নামে পরিচিত। অপরপক্ষে ড. মনীন্দ্রমোহন বসু এর বিপরীতে বলেন, "কবীন্দ্রের রচনা প্রয়োজন মতো গ্রহণ ও বর্জন করিয়া ব্যাস – ভারতের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায় বিজয় পন্ডিতের গ্রন্থের উৎপত্তি হইয়াছে।" ড. সুকুমার সেনের এ বিষয়ে মত – "কীবন্দ্রের 'বিজয় পান্ডব কথা' অজ্ঞ লিপিকরদের হস্তে পড়িয়া 'বিজয় পন্ডিত কথা' হইয়াছে এবং তাহা হইতেই বিজয় পন্ডিতের মহাভারতের উৎপত্তি।" কবীন্দ্রের মহাভারতের যে ভণিতা পাওয়া যায় –

"বিজয় পান্ডব কথা অমৃতলহরী।
শুনিলে অধর্ম খন্ডে পরলোকে তরি।।"

এখান থেকে ড. সেনের লিপিকর - বিভ্রাটের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কবীন্দ্রের মহাভারতের সাথে পাঠ মিলিয়ে দেখলেও এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। অতএব বিজয় পন্ডিত ভুয়া-কাব্য।

সঞ্জয় ঃ ড. দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সঞ্জয়কে বাংলা মহাভারতের আদি কবি বলে মনে করতেন ড. মনীন্দ্রমোহন বসুও সঞ্জয়ের মহাভারতকে স্বীকৃতি দেন। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রথম সিদ্ধান্ত করেন যে সঞ্জয় নামে কোন বাঙালি কবি ছিলেন না। মহাভারতের পৌরাণিক সঞ্জয় যিতি ব্যাসদেবের প্রসাদে দিব্যদৃষ্টি লাভ করে ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন, তাঁর নামই সঞ্জয়। এর বিপরীত যুক্তিতে বলা হয় -

টিপ্পনী

১. কোন কোন ভণিতায় পাওয়া যায়

'সঞ্জয় কহিল কথা বাখানে সঞ্জয়' - এখানে স্পষ্ট যে, পৌরাণিক সঞ্জয় ছাড়াও অপর এক সঞ্জয় বিদ্যমান ছিলেন।

২. তাছাড়া আত্মপরিচয় অংশে সঞ্জয় লিখেছেন -

'দেব-অংশে উৎপত্তি বান্মণ কুমার' অথবা 'ভরদ্বাজ উত্তম বংশ জন্ম সাধুকূলে।' এছাড়া

৩. মহাভারতের পুথির ভণিতায় পাওয়া যায় -

"হরিনারায়ণদেব দীন হীন মতি।
সঞ্জয়াভিমানে কৈলা অপূর্ব ভারতী।।"

অতএব সঞ্জয় নামক কবিকে অস্বীকার করবার অবকাশ নেই।

সঞ্জয় মহাভারতের রচয়িতা যেই হোক বহু আখ্যান কে এই গ্রন্থে সংযোজন করা হয়েছে। সাধারণ লোকের বোধগম্য করে সহজ ভাষায় পয়ার ছন্দে আখ্যানের বিস্তৃততর বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। পরীক্ষিতকে দংশনকারী তক্ষক পরীক্ষিতেরই শ্বশুর, মহী-নামক বানরের শাতনু-রূপে জন্মগ্রহণ, গান্ধারীর দ্বাদশবর্ষ গভধারণ, খান্ডবদাহনকালে নাগিনী এবং তার পুত্রের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ - ইত্যাদি অভিনব আখ্যান মহাভারত কাহিনীর সাথে সঞ্জয়ই যুক্ত করেন। গ্রন্থে বলা হয়েছে -

"সঞ্জয়ে পয়ারে কথা কহিল যেন মত।
হেন মতে কেহ নাহি রচয়ে ভারত।।"

রামচন্দ্র খান ঃ ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি মহাভারত রচনায় প্রবৃত্ত হন কবি রামচন্দ্র খান। জৈমিনি সংহিতাকে অনুসরণ করে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম তিনি মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব রচনা করেন। আত্মপরিচয় পর্ব থেকে জানা যায় কবি রাঢ়বঙ্গের দন্ড সিমলিয়া - ডাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাশীনাথ। আবার অন্য এক পুথিতে তাঁর জন্মস্থান জঙ্গীপুর এবং পিতার নাম মধুসূদন বলে জানা যায়। গ্রন্থে কবি লিখেছেন -

"কঙ্কগ্রাম স্থান আছে মধ্যরাঢ়া দেশে।
গঙ্গার নিকটে গুরু সর্বকালে বৈসে।।

সেই গুরু প্রসাদে মোর ধর্মে হৈল মন।
অশ্বমেধ কথা কহোঁ শমন দমন।।"

জন্ম পরিচয় পর্বে কবি লিখেছেন –

"রাঢ়া দেশে বসতি অছয়ে পুণ্যস্থানে।
দন্ডসিমলিয়া ডাঙ্গা সর্বলোক জানে।।
কায়েত কুলেতে জনম লস্কর পদ্ধতি।
কাশীনাথ জনক জনমী পুণ্যবতী।।
গুরুর কৃপাতে কি ভাল হৈল মন।
রামচন্দ্র খান কৈল পঞ্চালী বচন।।"

টিপ্পনী

গ্রন্থের রচনাকাল "শাকেন্দু বেদামুনিষে যুগান্তে পুরাণ" –এর বহুবিধ অর্থ নিষ্কাশিত হতে পারে। তবে তা মোটামুটি ১৫৩০ খীঃ – ১৫৪৪ খীঃ মধ্যবর্তী সময়েরই। রচনার দিক থেকে রামচন্দ্র খানের মহাভারতের উল্লেখযোগ্য কোনও বৈশিষ্ট্য না থাকলেও কোন কোন স্থলে প্রাচীন ভাষার নমুনা পাওয়া যায়।

অনিরুদ্ধ রামসরস্বতী ঃ কোচবিহারের কামতা রাজা বিশ্বসিংহ বা বিশু কোঁচ–এর পৃষ্ঠপোষকতায় কবি পীতাম্বর ১৫৪৫ খীঃ নাগাদ 'নলদময়ন্তী' রচনা করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। তাঁর পুত্র শুক্লধ্বজ–এর অনুপ্রেরণায় পন্ডিত অনিরুদ্ধ রামসরস্বতী মহাভারতের 'বনপর্ব, উদ্যোগপর্ব ও ভীষ্মপর্ব' অনুবাদ করেন। কবির পুত্র গোপীনাথ পাঠক পরবর্তী দ্রোণপর্ব পর্যন্ত গ্রন্থটির অনুবাদ তরান্বিত করেন।

দ্বিজ রঘুনাথ ঃ অনুমান করা হয় দ্বিজ রঘুনাথ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন। আত্মপরিচয় অংশ থেকে জানা যায় যে উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দ দেবের কাছে কবি নিজের কাব্য পাঠ করে শোনান। ১৫৬৭–৬৮ খীঃ নাগাদ মুকুন্দ দেবের শত্রুর আক্রমণে প্রাণঘাত ঘটে। অতএব গ্রন্থটি তার আগেই রচিত হয়। রঘুনথের কাব্য জৈমিনি মহাভারত অনুসরণে রচিত। যদিও কাশীরামের মহাভারতের সাথে রচনাশৈলীগত মিল পাওয়া যায়।

নিত্যানন্দ ঘোষ ঃ কবি নিত্যানন্দ ঘোষ বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর কাব্যও এই স্থান থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছে। সুকুমার সেনের মতেকবি সপ্তদশ শতকে জীবিত ছিলেন। কিন্তু 'গৌরীমঙ্গল' কাব্যের একটি শ্লোকে পাওয়া যায় –

"অষ্টাদশ পর্ব–ভাষা কৈল কাশীদাস।
নিত্যানন্দ কৈল পূর্বে ভারত প্রকাশ।।"

এর থেকে বোঝা যায় নিত্যানন্দ ঘোষ ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে বর্তমান ছিলেন। নিত্যানন্দ ঘোষ মহাভারতের সাতটি পর্বের অনুবাদ করেছিলেন।

কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী ঃ মল্লভূমির কবি শঙ্কর চক্রবর্তী সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে বা অষ্টাদশ শতকের শুরুর দিকে বিদ্যমান ছিলেন। একাধিক মল্লরাজার পৃষ্ঠপোষকতায় কবি

মহাভারত, রামায়ণ, ভাগবত, শিবায়ন, ধর্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, এমনকি লক্ষ্মীচরিত্রও রচনা করেন। মল্লরাজ প্রথম সিংহদেবের পৃষ্ঠপোষকতায় কবি মহাভারত রচনা করেন। গোপাল সিংহদেবের রাজত্বকাল ১৭১২ খীঃ - ১৭৪৮ খীঃ। অতএব গ্রন্থের রচনাকাল এই সময়ের মধ্যেই। শঙ্কর চক্রবর্তী সমগ্র মহাভারতেই অনুবাদ করেছিলেন।

ষষ্ঠীবর সেন ঃ ঢাকা জেলার জিনারদি গ্রাম নিবাসী ষষ্ঠীবর সেন মহাভারতের সম্ভবত সমগ্র অংশই অনুবাদ করেছিলেন। তবে ইনি তাঁর পুত্র গঙ্গাদাস-এর সাথে মনসামঙ্গল রচনা করেছিলেন। মহাভারতের ক্ষেত্রেও একই নীতি অনুসরণ করেছিলেন কিনা জানা যায় না। ভণিতায় তিনি লেখেন -

"গঙ্গাদাস সেন কবি রচিলেক সর্ব।
শ্লোক ভঙ্গি রচিলেক অষ্টাদশ পর্ব।।"

কাশীরাম দাস ঃ

কাশীরাম দেব বৈষ্ণব ধর্মোচিত কৃষ্ণের সেবক রূপে দাস উপাধি গ্রহণ করেন। আত্মপরিচয় অংশে কবি লেখেন -

"ইন্দ্রানী নামেতে দেশ বাস সিঙ্গীগ্রাম।
প্রিয়ঙ্কর দাস পুত্র সুধাকর নাম।।
তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা।।
পাঁচালী প্রকাশি কহে কাশীরাম দাস।
আল হব কৃষ্ণপদে মনে অভিলাষ।।"

বর্ধমান জেলার ইন্দ্রানী পরগণার সিঙ্গীগ্রামে কবি কাশীরাম ষোড়শ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। জাতিতে কায়স্থ। পিতা কমলাকান্ত দেব। মেদিনীপুরের আউসগড়ের জমিদার বাড়িতে শিক্ষকতার কাজে তিনি যোগদান করেন। সেখানকার পাঠশালায় আগত পন্ডিতদের মুখে তিনি মহাভারতের কাহিনী শুনে মহাভারত অনুবাদে উৎসাহবোধ করেন। কাশীরাম শেষ বয়সে নীলাচলে দিনযাপন করেন বলে অনুমান করা হয়।

কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর মহাভারতে লিখেছেন -

"আদি সভা বন বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেল স্বর্গপুর।।
ধন্য হইল কায়স্থকুলেতে কাশীদাস।
তিন পর্বে ভারত যে করিল প্রকাশ।।"

মনে করা হয় যে কাশীরাম দাস আদি, সভা, বন ও বিরাট পর্বের অংশবিশেষ রচনার পর পরলোক গমন করেন। তাঁর অসমাপ্ত কাজ তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম দাস সমাপ্ত করার দায়িত্ব নেন।

টিপ্পনী

“নন্দরাম দাস বলে শুন শ্যাম রায়।
আমারে অভয় প্রভু দেহ যমদায়।।
জ্যেষ্ঠভাত কাশীদাস পরলোক কালে।
আমারে ডাকিয়া বলিলেন করি কোলে।।
শুন বাপু নন্দরাম আমার বচন।
ভারত অমৃত তুমি করহ রচন।।”

টিপ্পনী

আবার অন্যত্র নন্দরাম নিজেকে কাশীরামেই সন্তান বলে পরিচয় দিয়েছেন।

“দ্বিজ পদরজ লইয়া কাশীব্য নন্দম।
জনকের আজ্ঞামত করিল রচন।।”

নন্দরাম দাসও বাকী ১৫ টি পর্ব একা রচনা করতে সক্ষম হন নি। তিনি উদ্যোগ এবং দ্রোণ পর্ব রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে কৃষ্ণানন্দ বসু শান্তিপর্ব, জয়ন্তদাস স্বর্গারোহন পর্ব এবং নিত্যানন্দ ঘোষ সম্ভবত স্ত্রী পর্ব রচনা করেন। দ্বৈপায়ন দাসের বনপর্ব, গদাপর্ব এবং সভাপর্বের পুথির সাথে প্রচলিত কাশীদাসী মহাভারতের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। দ্বৈপায়ন দাস নামক কবি একাধিক ক্ষেত্রে নিজেকে কাশীরামের পুত্র বলে অভিহিত করেছেন। যদিও সুকুমার সেনের মতে – “দ্বৈপায়ন দাস কোন কবির নাম ভণিতা বলিয়া বোধ হয় না।”

“দ্বৈপায়ন দাসে বলে কাশীর নন্দন।
এতদূরে পান্ডবের স্বর্গ আরোহন।।”

এই উক্তির নিরিখে দ্বৈপায়ন দাসের উপস্থিতিতে গ্রাহ্যও করা যায় না।

অতএব, বোঝা যাচ্ছে সমগ্র কাব্যের দোষ গুণের দায়ভার একা কাশীরাম দাসের নয়। তবু আলোচনার সুবিধার্থে সমগ্র গ্রন্থকেই কাশীদাসী মহাভারত রূপে বিবেচনা করাই শ্রেয়।

কাশীরামের কবি কৃতিত্ব ঃ

মহাভারতকে সংস্কৃত সমুদ্রের তরঙ্গবিক্ষুব্ধ স্রোত থেকে বাংলার সজল-শীতল নদী করে তুলেছিলেন কাশীরাম। বাঙালি পাঠকের উপযোগী সহজ-সরল ভাষা প্রয়োগে কাশীদাসী মহাভারত বাঙালির সন্ধ্যা আসরের নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছিল। কবির ভাষায় –

“শ্লোকছন্দে সংস্কৃত বিরচিলা ব্যাসে।
গীতিছন্দে কহি তাহা শুন অনায়াসে।।”

মূল মহাভারতের কাহিনী গ্রহণ-বর্জন এবং নতুনতর কাহিনীর সংযোজনে মহাভারত আখ্যানকে তিনি বাঙালির স্বাদে গড়ে তুলেছিলেন। পর্বের নামকরণের ক্ষেত্রে এবং পর্ব বিভাজনে তিনি স্বাধীনতা অবলম্বন করেছেন। কাশীরামের ‘গদাপর্ব’ ব্যাসের রচনায় নেই। আবার ব্যাসবিরচিত ‘অনুশাসন পর্ব’ কাশীরামে অনুপস্থিত। মহাপ্রস্থান এবং স্বর্গারোহন পর্ব দুটি কাশীরাম একত্রে স্বর্গারোহণ পর্বে সন্নিবিষ্ট করেছেন। কাশীদাসী মহাভারতে ব্যাস-ভারতের ‘বিদুলার তেজস্বিতার কাহিনী, রুরু-প্রমদ্বরার উপাখ্যান এবং উঞ্ছপরায়ণ বাহ্মণের শক্তুযজ্ঞ’ প্রভৃতি কাহিনী নেই। আবার শ্রীবৎস চিন্তার কাহিনী, অকালে আম্রো উৎপত্তির বিবরণ, জনা-প্রবীরের কাহিনী, ভানুমতী

ও লক্ষ্মণার স্বয়ংবর, প্রভৃতি নতুনভাবে সংযুক্ত হয়েছে। মূল মহাভারতের তত্ত্ব আলোচনার আখ্যান অংশগুলি থেকে কাশীরাম মূলত আখ্যান সংগ্রহ করেছেন। গল্পপ্রাণ বাঙালির তত্ত্বকথা শুনিয়ে তিনি ক্লান্ত করতে চান নি। একই কারণে গীতা কাশীদাসের রচনায় উল্লেখমাত্র। অনুগীতাও বর্জিত। 'রাজধর্ম অনুশাসন, আপদ্ধর্ম ও অনুশাসন পর্ব' নেই বললেই চলে। আবার কাশীদাস মূল কাহিনীর রূপান্তরও করেছেন। যক্ষ যধিষ্ঠির সংবাদে'র শতাধিক প্রশ্নকে তিনি মাত্র চারটি প্রশ্নে নামিয়ে এনেছেন। এখানে অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া যে সমস্ত দেশ পরিভ্রমণ করে, ব্যাসে তার নামোল্লেখ নেই। ব্যাসের মহাভারতে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় যে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্নের লক্ষ্যভেদ – চেষ্ঠার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, বাংলায় তা অনুপস্থিত। অর্জুনের লক্ষ্যভেদ বর্ণনায় কবি লিখেছেন –

"দেব দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি।।
অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কতশুচি করিয়াছে শোভা।।"

মূলত কাশীদাসী মহাভারত ভক্তিবাদী প্রাবল্যে, সেই দিক নির্দেশেই কাহিনী গ্রহণ – বর্জন- সংযোজন করেছে। ইত্যাবসরে চৈতন্যপ্রভুর আর্বিভাবে সমগ্র দেশ তখন কৃষ্ণপ্রেমে প্লাবিত। সেই প্রভাব জড়িয়ে কাব্যরচনা বৈষ্ণব কাশীরামের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি যে মূলত বাঙালিয়ানার ছাঁচে মহাভারতকে ঢেলে সাজাতে পেরেছেন এটাই তাঁর সর্বোত্তম কীর্তি।

সংস্কৃত ভাষার পন্ডিত হলেও বাংলা মহাভারত রচনার ক্ষেত্রে তিনি কোথাও শ্লথগতি হননি। বরং সংস্কৃতের সঙ্গে কোনও কোনও ক্ষেত্রে সাযুজ্য রক্ষা করেছেন – কৃষ্ণের রূপ বর্ণনায় লিখেছেন–

"সহস্র মুস্তক শোভে সহস্রা নয়ন।
সহস্র মুকুটমণি কিরীট ভূষণ।।
সহস্র শ্রবণে শোভে সহস্র কুন্ডল।
সহস্র নয়নে রবি সহস্র নন্ডল।।
বিবিধ আয়ুধ ধরে সহস্রেক করে।
সহস্র চরণে শোভে কত শশধরে।।
সহস্র সহস্র হেন সূর্যের উদয়।
শ্রীবৎস কৌস্তভমণি শোভিত হৃদয়।।"

ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, কাহিনীর স্বচ্ছন্দ বিবরণের দিকেই কাশীরামের বেশি আকর্ষণ ছিল। তত্ত্বকথা প্রায়ই তিনি বাদ দিয়েছেন, অথবা সংক্ষেপে সেরেছেন। কারণ এ কাব্য পন্ডিতজনের জন্য নয়, স্বল্প শিক্ষিত এবং প্রায় অশিক্ষিতের জন্যই রচিত হয়েছিল। তাই তাঁকে বাধ্য হয়ে তত্ত্ব, নীতি ও দর্শনের ডালপালা ছেঁটে দিয়ে শুধু গল্পের ধারা অনুসরণ করতে হয়েছিল।

তবে সমালোচক মহলে একাংশের কাছে কাশীরাম দাসের মূলানুগত্য সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে। অনেকে বলে থাকেন যে, কাশীরাম দাস সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী ছিলেন না। মূল মহাভারত তাঁর আয়ুত্তের অধীনে ছিল না। অনেকে বলে থাকেন মেদিনীপুরের কোনো এক ভূস্বামীর কাছে বাস করার সময় কথকের নিকট থেকে মহাভারতের আখ্যান শুনে কবি ভারত পাঁচালী রচনা

উপকরণ সংগ্রহ করেন দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে এমনতর ব্যক্ত করেছেন। তবে কাশীরাম দাস সম্পর্কে এই অভিযোগ সত্য নয়। কেননা কাশীরাম তার গোটা কাব্যে যে মূলানুগত্যের পরিচয় রেখেছেন তাতে মনে করা কঠিন যে তিনি মূল মহাভারতের পরিচিত ছিলেন না। তাঁর লিখিত প্রথম চারটি পর্বের ভাষাতে বাক্য বিন্যাসের ক্ষেত্রে কাশীরাম সংস্কৃত রীতি অনুসরণ করেছেন। এবং পন্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কাশীরাম দাস মূল মহাভারতের মধ্যে গভীর নৈকট্যের কথা বলেছেন। কাশীরাম দাসের রচনার মূল মহাভারতের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত বহু পয়ার আছে।

টিপ্পনী

বৈয়াসকী মহাভারত –

কিং স্বিৎ সুপ্তং ন নিমিষিত কিং স্বিজ্জতং ন চোপতি।
কস্য স্বিদ্ হৃদয়ং নাস্তি কিং স্বিদ্ বেগেন বর্ধতে।।

কাশীরাম –

নিদ্রা গেলে কে না করে নয়ন মুদ্রিত।
ভূমিষ্ঠ হইয়া কেবা না হয় স্পন্দিত।।
কাহার হৃদয় নাই বলহ আমায়।
পাইলে প্রবল বেগ কেবা বৃদ্ধি পায়।।

বৈয়াসকী মহাভারত –

অর্থানামর্জনে দুঃখং বর্ধনে রক্ষণে তথা।
তেষাং হি বৈরিণো জ্ঞাতি বহ্নি তস্করপার্থিবাঃ।।

কাশীরামের আছে –

উপার্জনে যতকষ্ঠ ততেক পালনে।
ব্যায়ে হয় যত কটি ঈয়েতে দ্বিগুণে।।
অর্থ যার থাকে তার গ্রদাভীতমন।
তার বৈরী রাজা অগ্নিচোর বন্ধুজন।।

এমনতর মূলানুগত্য কি কত কচী কুরের মুখে শুনে দেখানো সম্ভব? তাই বলা যায় মহাভারতের অনুবাদ কার্যে কাশীরাম দাসের মূলানুগত্য অনেকাংশ বজায় ছিল। তার পাশাপাশি কাশীরাম দাসের মৌলিকতাও কম ছিল না। নীচে তার মৌলিকতার পরিচয় আলোচিত হয় –

ক) কাহিনীগত মৌলিকতা ঃ

- মূল মহাভারতের সভাপর্বের ৩২-৩৫ সংখ্যক অধ্যায়ে যে সমস্ত ভৌগলিক চিত্রের বিষয় আছে, কাশীরাম দাস সেগুলি বর্ণনা করেছিলেন।
- মূল মহাভারতের ‘বন‘ পর্বে ৬৭-৭৫ সংখ্যক অধ্যায়ে ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রায় ৩১৮টি তীর্থস্থানের নাম আছে। কাশীরাম দাস এই বৃহৎ বর্ণনাকে সংক্ষিপ্ত করে আকর্ষণীয়

৮-১০টি তীর্থস্থানের বর্ণনা করেছেন।

- মূল মহাভারতের আদিপর্বে ১৩-৫০ সংখ্যক অধ্যায়ে দেবতাদের অমৃত পানের ঘটনাটি কাশীরামের রচনায় গুরুত্ব না পেয়ে লক্ষ্মী উদ্ধারের ঘটনাটি গুরুত্ব পেয়েছে।
- সমুদ্র মন্থনের সময় (পার্বতীর গঞ্জতনায়) শিবের গরল হজম করার ঘটনাটি মূল মহাভারতে নেই। এটি কাশীরাম দাসের সম্পূর্ণ নতুন সংযোজন।

টিপ্পনী

খ) চরিত্র চিত্রণে মৌলিকতা ঃ

মূল মহাভারতের চরিত্রের বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে কাশীরাম দাসের চরিত্রের মিল থাকলেও আরও প্রচুর পরিমাণে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মূলের চরিত্রের তুলনায় কাশীদাসের চরিত্র অন্য রকম হওয়ার কারণ কাশীরাম দাস বাঙালি কবি। চরিত্রগুলিও তাই বাঙিালি সুলভ হয়েছে।

মূল মহাভারতের যুধিষ্ঠির অপেক্ষা কাশীদাসের যুধিষ্ঠির অনেক দুর্বল ও ধর্মভীর। কাশীদাসের রচনায় যুধিষ্ঠির অর্জুনের বিরহে হাউ হাউ করে কেঁদেছেন। এটি বাঙালি কবি হওয়ার ফল ছাড়া আর কিছু নয়।

মূল মহাভারতের ভীম চরিত্রের কঠোরতা, ঔদ্ধত্য, প্রচন্ড বেগ কাশীরাম দাসে নেই। তাঁকে তিনি বিশালদেহী পেটুক উদারিকে পরিণত করেছেন।

মূল মহাভারতে দ্রৌপদী চরিত্রে তেজস্বিনী মূর্তি দেখি কিন্তু কাশীরামে দ্রৌপদীতে সেই তেজ নাই। মূলের দ্রৌপদী প্রতিবাদী ও প্রতি হিংসাপরায়ণ", কিন্তু কাশীরামের দ্রৌপদী অভিমানী ও আবেগ সর্বস্ব।

মূল মহাভারতে কৃষ্ণের দৈবগুণ অপেক্ষা মানবিক গুণ প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু কাশীদাসের রচনায় কৃষ্ণভক্ত ভ্রাতা ভগবান।

গ) দেশকালগত মৌলিকতা ঃ

মূল মহাভারত রচিত হয় প্রাচীন ভারতবর্ষীয় পটভূমিকায়। একটি রাজপরিবারকে আশ্রয় করে, তাই এতে প্রাচীন ভারতের রাজ-পরিবারের উত্থান-পতনের চিহ্ন আছে। কিন্তু কাশীরামদাস চৈতন্যদেবের প্রেম ভাবধারা প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ) রসনির্মাণগত মৌলিকতা ঃ

মূল মহাভারতের প্রথম চরিত্রটি পর্ব মধুর রৌদ্র বীর ও করুন রসের প্রাধান্য। কাশীরামের রচনায় মূলরস হলো ভক্তিরস আর অনুসঙ্গীরস হয়েছে করুণ ও মধুর।

অর্থাৎ মহাভারতের বিশালতা, ব্যপ্তি, জটিলতা, ঐশ্বর্য ও গাম্ভীর্য বর্জন করে কাশীরাম তাকে দেশকালের উপযোগী করে গড়ে তুলেছেন। ফলত দেখা যাচ্ছে মহাভারতের অনুবাদে কাশীরাম মূলানুগত্য যেমন স্বীকার করেছেন তেমনি সেই মূলানুগত্যের স্বীকরণের মাধ্যমে নিজস্ব প্রতিভার মৌলিক চেতনার ছাপ ও তাতে এঁকে দিয়েছেন।

বাঙালির অনুধ্যানে কাশীদানী মহাভারত সর্বাংশে জড়িয়ে রয়েছে। গ্রন্থটি নিছক অনুবাদের সীমানা পেরিয়ে যথার্থই বাঙালি জীবনের মহাকাব্য হয়ে উঠেছে। চৈতন্যের মাধুর্যবাদকে আত্তীকরণ করে কাশীদাসী ভারত কথা বাঙালির প্রাণস্পন্দনকে আলোড়িত করতে সক্ষম হয়েছে –

"কারণ চরণ কর্তা দেব গদাধর।
আমার একান্ত ভার তাহার উপর।।"

ড. বন্দ্যোপাধ্যায় আরো বলেন – "কাশীদাসী মহাভারতে ঠিক ততটা বাঙালিয়ানা দেখা যায় না। তবে কাশীরামের বিনয়াবনত বৈষ্ণব মনটি রচনার মধ্যে অকৃত্রিমভাবেই ধরা পড়েছে – ভক্ত বংশে যে তাঁর জন্ম হয়েছিল, তা তাঁর রচনা থেকেই বুঝতে পারা যায়। এদিক থেকে উত্তর চৈতন্য যুগের ভক্তির ধারা তাঁর হৃদয়কে গভীরভাবে প্লাবিত করেছিল।"

টিপ্পনী

প্রশ্নাবলী

১) চৈতন্য সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগে বাংলা অনুবাদকাব্যের ধারাটি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করো।

২) বাংলা ভাষায় কৃত্তিবাস ওঝা পরবর্তী রামায়ণ অনুবাদের ধারাটির পরিচয় দাও।

৩) মধ্যযুগীয় বাংলা অনুবাদ সাহিত্যধারায় গৌণ কবিদের সম্পর্কে আলোচনা করো।

৪) রামায়ণ অনুবাদের দুই কবি অদ্ভুত আচার্য ও চন্দ্রাবতীর কাব্যের বিশিষ্টতার পরিচয় দাও।

৫) বাংলা ভাষায় মালাধর পরবর্তী ভাগবত অনুবাদের ধারাটির পরিচয় দাও।

৬) বাংলা ভাষায় ভাগবত অনুবাদক গৌণ কবিদের সম্পর্কে আলোচনা করো।

৭) সপ্তদশ শতাব্দীর দুই কবি – পরশুরাম চক্রবর্তী ও কৃষ্ণদাস-এর ভাগবত অনুবাদ সম্পর্কে আলোচনা করো।

৮) ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা ভাষায় মহাভারত অনুবাদকদের পরিচয় দিয়ে তাঁদের কাব্য কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করো।

৯) কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীর অনূদিত মহাভারত সম্পর্কে আলোচনা করো।

১০) বাংলা ভাষায় মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কে? তাঁর কাব্যের বিশিষ্টতার পরিচয় দাও।

১১) কাশীরাম দাসের অনুবাদের মৌলিকতা ও মূলানুগত্য সম্পর্কে আলোচনা করো।

১২) সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো – কৈলাসচন্দ্র বসু, অদ্ভুত আচার্য, চন্দ্রাবতী, রঘুনাথ, ভাগবতাচার্য, দেবকীনন্দন সিংহ, শ্রীকর নন্দী, শঙ্কর চক্রবর্তী, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, কৃষ্ণদাস, সঞ্জয়, রামচন্দ্র খান, রামানন্দ যতী।

চতুর্থ একক

সপ্তদশ ও অষ্টদশ শতাব্দী

মঙ্গলকাব্যের ধারা

বাংলার লৌকিক দেবতার সাহিত্যে স্থান পেতে শুরু করে তুর্কি আক্রমণের পর থেকে। সূচনা হয় মঙ্গলকাব্য ধারার। আঙ্গিকটি মোটামুটিভাবে এক রেখে বাঙালিরা তাদের আশা-আকাঙ্খা প্রাপ্তির ভরসা রেখেছিল মঙ্গলদেবতাদের উপর। তার ফলেই মনসা-চন্ডী-ধর্ম প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রচারিত, প্রসারিত দেবী মনসা। পশ্চিমবঙ্গ ও রাঢ় বাংলায় চন্ডী ও ধর্মের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল চৈতন্য সমসময়ে বা পরবর্তীকালে। এই তিনটি মঙ্গলকাব্য বাংলা সাহিত্যের ধারায় প্রধান মঙ্গলকাব্য। যে ধারা মধ্যযুগের শেষ অবধি বজায় ছিল।

১. 'মনসামঙ্গল'

ষোড়শ শতকের পূর্বেই হরিদত্ত, বিজয়গুপ্ত ও নারায়ণ দেবের সৃষ্টিশীলতায়, বাংলায় লৌকিক বিষয়বস্তু ও সংস্কৃতের পৌরাণিক বিষয়বস্তুর সমন্বয়ে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল মনসামঙ্গল। বৈদিক দেবী ইলা সরস্বতী থেকে শুরু করে বৌদ্ধ দেবী জাঙ্গুলী, কুরুকুল্লা এবং দক্ষিন ভারতীয় দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর দেবী মনচা আম্মার মধ্যে বাংলার সর্পদেবী মনসার প্রত্ন রূপ খুঁজে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে পাথরে ও বোঞ্জে নির্মিত আটান্নটি সর্পদেবীর মূর্তি পাওয়া যায়। মুসলমান আক্রমনোত্তর সমন্বয় পর্বে এই বাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও লৌকিক দেবীর সংহত রূপায়ণ ঘটে মনসার মাধ্যমে।

ষোড়শ শতকে চৈতন্য প্রভাবে মনসামঙ্গল কাব্যে যে রূপান্তর ঘটল তা হল আতঙ্কগ্রস্থ ভক্তির পরিবর্তে দাস্যরসান্বিত ভক্তির নম্রতা। যার মাধ্যমে মনসা চরিত্রে অনেক বেশি স্নেহ-মমতার প্রতিফলন ঘটেছে। মনসামঙ্গলের পঞ্চদশ শতাব্দীর কবিরা হলেন হরিদত্ত, বিজয়গুপ্ত ও নারায়ন দেব। ষোড়শ শতকের উল্লেখনীয় কবি বিপ্রদাস নিপলাই। সপ্তদশ শতাব্দীর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দুই কবি হলেন দ্বিজ বংশীদাশ ও কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। এই সময়ের আরও দুজন উল্লেখনীয় কবি হলেন তন্ত্রবিভূতি ও জগজ্জীবন ঘোযাল। অষ্টাদশ শতকের কবিদের মধ্যে উল্লেখনীয় হলেন জীবন কৃষ্ণ মৈত্র।

পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত রচিত মনসামঙ্গলে ষোড়শ শতকে যেমন সংযোজিডত হয়েছিল চৈতন্যপ্রভাবিত দাস্যরস সেভাবেই মনসামঙ্গল সপ্তদশ - অষ্টাদশ শতকে নানাবিধ মানবিক গুণাবলীতে ঋদ্ধ হয়েছে।

বিপ্রদাস পিপলাই

মনসামঙ্গলের বিশেষ উল্লেখনীয় কবি বিপ্রদাস পিপলাই। সামবেদের অন্তর্গত পিপলাই শাখার (পৈপ্‌লাদ) বাহ্মণ বংশে কবির জন্ম। জন্মস্থান নাদুড়্যা বটগ্রাম বর্তমানে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বসিরহাটের বাদুড়িয়া থানার অন্তর্ভুক্ত। 'মনসাবিজয়', 'মনসামঙ্গল' ও 'মনসাচরিত' কবি এই তিনটি নামেই তাঁর কাব্যকে আখ্যায়িত করেছেন, যার মধ্যে 'মনসাবিজয়' নামটি সবথেকে বেশি বার উল্লিখিত হয়েছে বলে এই নামেই বিপ্রদাস পিপলাইয়ের মনসামঙ্গল

টিপ্পনী

টিপ্পনী

লোকসমাদৃত হয়েছে। মনসা বিজয় এর যে সব পুঁথি পাওয়া গেছে তার মধ্যে প্রথম দুটি রয়েছে এশিয়াটিক সোসাইটিতে, তৃতীয় পুঁথি রয়েছে বর্ধমান সাহিত্য সভায় এবং চতুর্থ পুঁথি বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে। শেষোক্ত পুঁথিটি ছাড়া অন্য সবগুলোই খন্ডিত। পুঁথিতে যে কালজ্ঞাপক পয়ারটি রয়েছে তা হল (বর্ধমান সাহিত্য সভার পুঁথি) ঃ

"সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন সাহা গৌড়ের প্রধান।।
হেনকালে রচিলা পদ্মার বতগীত।
শুনিয়া দ্রবিদ লোক পরম-পীরিত।।"

এই পয়ার অনুযায়ী ১৪১৭ সকাব্দ অর্থাৎ ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কবি এই কাব্য রচনা করেছেন। (এশিয়াটিক সোসাইটি ও বিশ্বভারতীর পুঁথিতে সামান্য হেরফের রয়েছে)

"পুঁথির ভাষা বিচার করিয়া ইহাকে কিছুতেই ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে লওয়া যায় না" – এই মত পোষণ করেছেন 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'-কার (২য় খন্ড) শ্রীযুক্ত অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর এই কাব্যের প্রমাণ স্বরূপ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভাষা রীতির যে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন তা এদিকে যেমন কাব্যমূল্যে উৎকৃষ্ট অন্যদিকে তেমনি প্রকাশ ভঙ্গীতে ষোড়শ শতক বা তার পরবর্তী কালকে সূচিত করে –

"তপত কাঞ্চন জিনি দেহের বরণ
পট্টবস্ত্র পরিধান সূর্যের কিরণ।
বরণে নূপুরধ্বনি বাজে রুনুরুনু
নানা রত্নে মণিময় দীপ্ত করে তনু।"

–আবার চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য যাত্রায় উল্লিখিত গ্রাম ও তীর্থ সমূহের যে বিবরণ রয়েছে সেখানে "পূজিল নিমাই তীর্থ করিয়া উত্তম" অথবা "খড়দহ শ্রীনাট করিয়া দন্ডবত"; এখন নিমাই তীর্থ ও শ্রীপাট খড়দহের উল্লেখ অনুযায়ী কবিকে চৈতন্য নিত্যানন্দ তিরোধানোত্তর পর্বে এনে ফেলতে হয়, যা পঞ্চদশ শতাব্দীর দাবীকে খারিজ করে ষোড়শ শতকের দাবীকেই প্রতিষ্ঠা করে।

বিপ্রদাসের মনসাবিজয় -এর হাসেন-হুসেন -এর পালাটি সুদীর্ঘ ও সুপরিকল্পিত। মুকুন্দ-রামের 'অভয়ামঙ্গল' পদ দিলে মুসলমান সমাজজীবনের এত তথ্যবহুল ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আর কোথাও নেই। মনসার সঙ্গে বিরোধের ফলে বড় মিঞার মৃত্যু হলে বাড়ীর ভৃত্যদের মনোভাব কবি নিপুনভাবে তুলে ধরেছেন ঃ

"মিঞা যবে ফৌত হইল গোলামের ঘোষ পাইল
বিবি লইয়া পলাইতে চায়।"
পংক্তিদ্বয় হাস্যরসেও উজ্জ্বল।

মনসা চরিত্র অনেক বেশি কমনীয়। যে স্নেহ ও করুনায় কবি মনসাকে আদ্রিত করেছেন তাতে হাসান ভক্তবেসে দেবীর পূজা করলে –

"হাসান এতেক যদি করিল স্তবন
মনসা ব্যথিত অতি হইলা তখন।
অধিক বাড়িল দয়া আপন কিঙ্করে

ডাকিয়া বলেন মাতা মধুর সুস্বরে।।”

মনসার এই মমতময়ী মাতৃরূপ কল্পনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বিপ্রদাস। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখনীয় এই দাস্যরসাসৃত ভক্তিভাবের পেছনে রয়েছে ষোড়শ শতকীয় চৈতন্য রেনেসাঁর ভক্তি প্লাবন। যার প্রভাবে কাব্যের শেষে চাঁদসদাগর যখন মনসার কাছে মিনতি করে বলেন যে তিনি পাপমুখে মনসার অনেক নিন্দা করেছেন মনসা যেন তার দোষ নিন্দার যথোচিত শাস্তি দিতে তার মাথায় পদাঘাত করেন তখন –

“দেখিয়া চাঁদের স্তুতি তুষ্ট বিষহরি
মাগিল যতেক বর দিলাপূর্ণ করি।
হালি পদাঘাত কৈলা চাঁদের মস্তকে
অন্তরিক্ষ হইলা দেবী রহিল কৌতুতে।”

মনসামঙ্গলের আর কোন কবিই দেবীকে দিয়ে চাঁদের মাথায় পদাঘাত করাননি।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত’–এ (২য় খন্ড) বিপ্রদাস পিপলাই–এর ‘মনসাবিজয়’–কে “নিতান্তই ব্যালাড ধরনের আখ্যানকাব্য” বলে উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে “মহাকাব্যোচিত প্রসার ও গভীরতা লক্ষ্য করা যায় না।” একদিকে এই ব্যালাডের প্রকরণ বৈশিষ্ট্য অন্যদিকে ষোড়শ শতকের চৈতন্য প্রভাবে মনসামঙ্গলের দেববিরোধী চরিত্রগুলো বিপ্রদাস পিপলাইয়ের ‘মনসাবিজয়’–এ অপেক্ষাকৃত কোমল ও মমতাময়ী মনসার নিকট আত্মাহুতি দিয়েছে যার ফলে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের প্রধান দেববিরোধী পুরুষও হাসিমুখে মনসার পদাঘাত মাথায় তুলে নিয়েছে। এই প্রসঙ্গে ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত’ দ্বিতীয় খন্ডে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি উল্লেখনীয় – “প্রথম দিয়ে রচিত মনসামঙ্গলের মনসা চরিত্রের কঠোরতা পরবর্তী কালের কাব্যে কিরূপ করুন ও কোমল হইয়া পড়িয়াছিল তাহার প্রমাণ বিপ্রদাসের মনসা। তবে একথাও ঠিক, কাব্যটি নিতান্তই ব্যালাড ধরনের আখ্যানকাব্য হইয়াছে। নারায়ণদেবের কাজে আদিরযোর উল্লাস আছে। আবার তাহার সঙ্গে বিশাল কাহিনী, দেবদ্রোহী মানব ও ক্রূর দেবীর জিঘানসার যে বর্ণনা পাওয়া য়ায়, বিপ্রদাসের ‘মনসাবিজয়ে’ সেরূপ মহাকাব্যোচিত প্রসার ও গভীরতা লক্ষ্য করা যায় না। বেহুলার বেদনা, সনকার বিলাপ, চাঁদের দুর্গতি–এ সমস্তই সহজ সরলভাবে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু সাহিত্যিক বক্রতা বা চারুত্ব নাই বলিলেই চলে।”

“চঁদো রাজা নাচে কান্ধে হেতালের বাড়ি
ঝলমল করে মুখে পাকা গোঁফ দাড়ি।”

চাঁদ সদাগরের এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে ছেলের বিয়ের সময় আনন্দিত চাঁদ সদাগরের যে বর্ণনা কবি দিয়েছেন রাজাসুলভ গরিমার পরিবর্তে সাধারণ মানবসুলভ আচরণে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে চাঁদ সদাগর, দেবদ্রোহী মানবের প্রতিভূ না হয়ে এই সহজ সরল চরিত্রচিত্রনেই উজ্জ্বল কবির কাব্য।

দ্বিজ বংশীদাস

ময়মনসিংহের কবি দ্বিজ বংশীদাসের পদ্মপুরাণ পূর্ব ও উত্তর বলে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ

করেছিল। আরও একটি কারণে দ্বিজ বংশীদাসের নম বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর পিতা এই দ্বিজ বংশীদাস। ময়মনসিংহের লোকপ্রিয় ময়মনসিংহ গীতিকা-তেও উল্লিখিত হয়েছে চন্দ্রাবতী সহ তার পিতা বংশী দাসের নাম।

দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে সর্বপ্রথম বংশীদাসের পরিচয় লিপিবদ্ধ করেন। ১৩১৮ বঙ্গাব্দে দ্বারকানায় ও রামনাথ চক্রবর্তীর সম্পাদনায় 'পদ্মপুরাণ' নামে দ্বিজ বংশীদাসের কাব্য প্রথম প্রকাশিত হয়। বংশীদাসের কাব্যের পুঁথির সংখ্যা বেশি নয় – সম্পূর্ণ পুঁথির সংখ্যা আরও কম। পুঁথিগুলো খুব বেশী প্রাচীনও নয়। ১৭১৭ শকাব্দের একটি পুঁথির সঙ্গে আরও তিনখানি পুঁথির পাঠ মিলিয়ে সম্পাদকদ্বয় ঐ গ্রন্থটি প্রস্তুত করেন। বংশীদাসের বিভিন্ন পুঁথিতে পাঠান্তর ও পাঠভ্রান্তির নিদর্শন পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়ে গেছে।

টিপ্পনী

আত্মপরিচয় অংশ থেকে জানা যায় কবি বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিপ্রাপ্ত রাঢ়ী বাহ্মণ –

"বন্দ্যঘাটি গাঁই গোত্র বাড়ীর প্রধান।
সান্ডিল্য গোত্র বলি যাহার বাখান।।"

কবির পূর্বপুরুষ রূঢ়ে থেকে বহ্মপুত্রের তীরে ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার হাজরাদি পরগনার, পাতুয়ারী গ্রামে আসেন – সেখানেই কবির জন্ম হয়।

"রাঢ় হৈতে আসিলেন লৌহিত্যের পাশ।
হাজরাদি পাতুয়ারী গ্রামেত নিবাস।।"

কবির পিতার নাম যাদ্ববানন্দ, মাতার নাম অঞ্জনা, পত্নী সুলোচনা এবং কন্যা চন্দ্রাবতী।

প্রকাশিত কাব্যে পয়ারবন্ধে কাব্যরচনার কাল সম্বন্ধে বলা হয়েছে –

হলধির বামেত ভুবন মাঝে দ্বার।
শকে রচে দ্বিজ বংশী পুরাণ পদ্মার।।

এক্ষেত্রে জলধি – ৭, ভুবন–১৪, দ্বার – ৯ অনুযায়ী ১৪৯৭ সকাব্দ অর্থাৎ ১৫৭৫–৭৬ খীষ্টাব্দে কাব্যটি রচিত হয়েছিল।

কিন্তু আত্মকথায় যে হাজারদি পরগনার উল্লেখ করা হয়েছে ১৫৯৫ সালের আগে তার অস্তিত্ব ছিল না বলে মত প্রকাশ করেছেন 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস'-কার ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য। ১৫৮৫–৯৫ সালের মধ্যে ঈশা খাঁ ময়মনসিংহের জনৈক রাজা লক্ষণ হাজরাকে পরাজিত করেন। এই লক্ষ্মণ হাজরার নামেই হাজরাদি পরগণা নামটির সৃষ্টি হয়। যার অস্তিত্ব ১৫৭৫ খীষ্টাব্দে কোনমতেই সম্ভবপর ছিল না।

সর্বোপরি কালজ্ঞাপক পয়ার ছত্রদুটি কোন পুঁথি থেকে সংগৃহীত হয়েছে তার উল্লেখ করেন নি সম্পাদক দ্বয়; এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় হল যে, কোন পুঁথি থেকেই ঐ পয়ারবন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় না।

সবদিক বিবেচনা করে দ্বিজ বংশীদাসকে সপ্তদশ শতকের কবি বলেই মেনে নেওয়া যায়। এ বিষয়ে 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'-কার অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিকে "সপ্তদশ শতাব্দীর কোন এক সময়ে (শেষভাগে হওয়াই সম্ভব) স্থাপন –" করেছেন। ('বাংলা সাহিত্যের

ইতিবৃত্ত' ৩য় খন্ড ঃ ১ম পর্ব)

আকারে বৃহৎ বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ দেবখন্ড ও মানব খন্ডে বিভক্ত। দেবখন্ডে বিশ্বসৃষ্টি থেকে শুরু করে দক্ষযজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, মহাদেবের তপস্যা, মদনভদ্ম, হরপার্বতীর বিবাহ, কার্তিক-গণেশের জন্ম-পুরাণ অনুসরণে বর্ণিত হয়েছে। এই অংশ পড়ে বোঝা যায় কবি সংস্কৃত কাব্যসম্ভার বিশেষ করে কালিদাসের 'কুমারসম্ভবম্'-কাব্য দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। আবার শিবের কৈলাস আগমন, পুষ্পবাটি প্রস্থান, মহামায়ার মায়াজাল বিস্তার, নেত্রাবতী ও পদ্মাবতীর জন্ম, পদ্মার প্রথম পূজা, কন্যাকে নিয়ে শিবের গৃহ গমন, পদ্মাবতীর বিবাহ, নেত্রাবতীর বিবাহ, হরৎকারু মুনির পত্নীত্যাগ - এই সকলপর্বে বাংলার শিবায়নের আখ্যানকেই অনুসরণ করা হয়েছে।

মানব খন্ডে প্রথমে কাজির সঙ্গে মনসার বিরোধ ও ধন্বন্তরি বধের পালা বিবৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি পরীক্ষিতের সর্পযজ্ঞের বর্ণনাও সংযোজিত করেছেন। লৌকিক কাহিনীর সঙ্গে পৌরাণিক কাহিনীর এই সমন্বয় সাধনের মধ্য দিয়ে কবির পান্ডিত্য ও পরিমিতিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এর পরে কবি চাঁদসদাগরের কাহিনীকে তুলে ধরেছেন। শিবের ভক্ত হলেও এই কাব্যে চাঁদসদাগরকে মূলত চন্ডীর উপাসক হিসেবেও দেখানো হয়েছে।

"পুত্র হইল হর চন্ডিকার বরে।
সেই তপস্বী যে কাম্যসাগরে মরে।।
পুত্র পাইয়া মহানন্দে কোটিশ্বর।
শিবের আজ্ঞায় নাম রাখে চন্দ্রধর।।"

পিতা কোটিশ্বর শিবদুর্গার বরে পুত্র লাভ করে শিবের আদেশে শিবের নামের সঙ্গে সংগতি রেখে পুত্রের নামকরণ করেন চন্দ্রধর - শিবের কাছ থেকেই 'মহাজ্ঞান' লাভ করেছিলেন চন্দ্রধর।

"শঙ্করের বর দানে পাইয়াছে মহাজ্ঞানে।"

সপ্তদশ শতকে নানা মত ও পর্বে বিভক্ত - আরাধ্য দেবসম্প্রদায়ের মধ্যে এক সমন্বয় সাধনের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় কবির পদে -

"যেই দুর্গা সেই তুমি জগতের মাতা।
অভেদ চন্ডিকা তুমি নাহিক অন্যথা।।
তোমার অনন্ত মায়াকে জানিতে পারে।
লক্ষ বলি দিয়া কালি পূজিব তোমারে।।"

পদ্মাকে ঘটে স্থাপন করে যখন পূজা করেছিলেন সনকা, তখন এভাবেই চন্ডিকা-দুর্গা-কালির প্রতিরূপ হিসেবে আধাধনা করতে চন্দ্রধরের কোন আপত্তি ছিল না। সপ্তদশ শতকে কবির এই প্রয়াস শুধু যে তাঁর কাব্যে বৈচিত্র্য এনেছিল তাই নয়, এই সমন্বয়ও সহনশীলতাই কবিকে কালোত্তীর্ণ করেছিল। যদিও চন্ডীর স্বপ্নাদেশে 'হেঁতালের বাড়ি' মোর ঐ ঘট ভেঙে দেওয়ার ফলে শুরু হল চাঁদসদাগর ও মনসার চিরাচরিত লড়াই।

"চান্দ বলে রাম রাম হেন অনুচিত কাম
চন্ডিকা পূজিনু যেই হাতে।

টিপ্পনী

সে হাতে ফুল পাণী　　　　　পাইতে ভাগ্য করে কানী
কি বলিমু চন্ডীর সাক্ষাতে।।”

মনসার চক্রান্তে ছয় পুত্রের মৃত্যুর পরে সনকা চন্দ্রধরকে মনসার পূজা করতে বলায় এভাবেই তার প্রতিবাদ করেছে চাঁদসদাগর। এই পর্বে চন্দ্রধর চন্ডিকার আরাধনা করে তাঁর বরলাভ করেছেন –

“চন্ডিকা দিলেন বর　　　　　শুন পুত্র চন্দ্রধর
বন্ধন মোচন হৌক তেরে।।”

টিপ্পনী

চন্দ্রিকার বরলাভ করেই সকল প্রকার সংকট থেকে মুক্তিলাভ করেছেন চন্দ্রধর এবং চন্দ্রধরকে বরদানের মধ্যে দিয়েই শুরু হয়েছে চন্ডী ও মনসার সম্মুখ সমর। এই পর্বে মহাদেব যেন কিছু পরিমাণে দ্বিধাগ্রস্থ–স্ত্রী ও কন্যার মধ্যে কাকে তিনি বেছে নেবেন? কার কথা শুনতেন? যদিও শেষ পর্যন্ত তাঁর পক্ষপাত দেখা গেছে কন্যার প্রতি;

“আজ্ঞা দিলু চল মাও　　　　　ডুবাও চন্দের নাও
চন্দ্রধর রাখিও পরাণে।।”

এভাবেই কন্যার প্রতি স্নেহবশে চন্দ্রধরের ডিঙি ডুবাবার আদেশ দিয়েছেন মহাদেব। কিন্তু তা সত্ত্বেও পদ্মাবতী চাঁদ সদাগরের ডিঙি ডোবাতে পারেন নি কারন ঐ চোদ্দ ডিঙার কান্ডারী তো স্বয়ং চন্ডী।

“দেবতা হইয়া স্ত্রীর অধীন”

কন্যার এই অনুযোগে মহাদেব স্বয়ং যান চন্ডিকাকে আটকাতে – ক্রুদ্ধ মহাদেব যখন চন্ডিকাকে বলেন

“স্ত্রী হইয়া স্বতন্ত্র তুমি দেবে উপহাস”

এর উত্তরে চন্ডিকাও স্বামীকে তিরস্কার করে বলেন –

“চন্ডী বলে, ডাঙরা রে তোর লাজ নাই।
যে তোরে দেবতা বলে তার মুখে ছাই।।”

এইভাবে বাংলার লৌকিক কাহিনীকে পরিবেশনের মধ্য দিয়ে এক অমলিন হাস্যরসে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে দ্বিজ বংশীদাসের কাব্য।

সব শেষে বেহুলার নৃত্যপ্রয়াস ও চন্দ্রধরের পূজাতে লখীন্দর জীবন ফিরে পেলে মনসা ও চন্ডীর বিবাদ মিটে যায়

“দেবের দুর্লভ তুমি শঙ্করের ঝী।
তোমারে যে নাহি পূজে তার জ্ঞান কি।।
তোমারে পূজিলে যেন আমারেই পূজে।
মূঢ় অজ্ঞান জনে ভিন্ন ভিন্ন বুঝে।।”

পদ্মাপুরাণের মধ্য দিয়ে কবি সপ্তদশ শতাব্দীর মতদ্বন্দ্বে দীন সমাজে শক্ত ও শৈব মতের সমন্বয়

সাধন করেছেন। কবি বহুবিধ উপাচার নির্ভর বাহ্মণ্যবাদের প্রতিও তীর্যক মন্তব্য করতে পিছ পা হন নি –

"কলির বাহ্মণ আর বলির ছাগল।
ডালমন্দ জ্ঞান নাই প্রশ্রয় পাগল।।"

কালিদাসের কাব্য তথা সংস্কৃত সাহিত্যে কবির যেমন অগাধ পান্ডিত্য তেমনই ভারতীয় দর্শনেও তাঁর বিশেষ বুৎপত্তি ছিল।

টিপ্পনী

"প্রকৃতির বলে যে পুরুষ অধিষ্ঠান।
এতেকে প্রকৃতি নাম বলয়ে প্রধান।।
সেই যে প্রকৃতি হাত হইল মহৎ।
প্রকৃতি-এ আবরিল সকল জগৎ।।"

সংখ্যা দর্শনের তত্ত্বকে সৃষ্টি প্রক্রিয়া বর্ণনায় যেরকম সহজ সরল ভাবে বর্ণনা করেছেন মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষায় একমাত্র কৃষ্ণদাস কবিরাজের কাব্যের সঙ্গেই তাঁর তুলনা চলে। সংখ্যা দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে তন্ত্র ও যোগাচরে কবির ছিল অবাধ যাতায়াত

"ইঙ্গলা পিঙ্গলা আর চিনা নামে নাড়ী।
সুযুন্নার মূলে দিয়া ঊর্ধ্বে লৈল ঝাড়ি।।"

হর পার্বতীর সঙ্গে সঙ্গে রাম-সীতা ও সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণবভক্তি প্লাবিত রাধা-কৃষ্ণ তথা গৌরাঙ্গ বিষয়েও কবির ব্যুৎপত্তি প্রকট হয় পদ্মাপুরাণের 'দিশা' সমূহের মধ্য দিয়ে –

"সখি গো, চল দেখি গিয়া।
সাজিছে বিনোদ শ্যাম রাধার লাগিয়া।।"

রাধাকৃষ্ণবিষয়ক দিশার মত গৌরাঙ্গ বিষয়ক দিশাতেও কবির আর্তি প্রকট হয়েছে –

"নিমাই, কে ডাঙিল আমার নদীয়ার বসতি।"

সার্বিকভাবে বিচার করে একথা বলা যায় যে সপ্তদশ শতকে রচিত দ্বিজ বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব ভাবের এক অভিনব ত্রিবেণীসংগম পরিলক্ষিত হয়েছিল, আর মধ্যযুগীয় সাহিত্যে এই সমন্বয় সাধনের অন্যতম পথিকৃত হিসেবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কালোত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন দ্বিজ বংশীদাস।

দ্বিজ বংশীদাসের কবিত্ব সম্পর্কিত আলোচনার উপসংহারে 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' রচয়িতা ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য উল্লেখনীয়ঃ "বংশীদাসের এই ব্যাপক লোক-প্রিয়তার কারণ, তাঁহার অনুভূতির আন্তরিকতা ও ভাষার প্রত্যক্ষতা। সহজ নিরলঙ্কার ভাষায় মনের গভীর ভাবটি পাঠকের মর্মতল স্পর্শ করে। ভক্ত সাধকের দৃষ্টির সঙ্গে সহজ কবিত্বের শুচিদৃষ্টি মিলিত হইয়া তাঁহার কাব্যে মনিকাঞ্চন যোগ সৃষ্টি করিয়াছে। মনসামঙ্গল কাব্য যে করুন রসের আকর, অন্তরের সহজ ভাবানুভূতি হইতে বংশীদাস তাঁহার কাব্যে তাহা উৎসারিত করিয়াছেন, ইহাতে বিন্দুমাত্র কৃত্রিমতা আছে বলিয়া মনে হয় না। এই ভাবানুভূতির অকৃত্রিমতাই দ্বিজ বংশীকে ভাবপ্রবণ বাঙালির কাছে এত জনপ্রিয় করিয়া রাখিয়াছে।"

টিপ্পনী

কেতকাদাস – ক্ষেমানন্দ

ছাপাখানার যুগে এসে শিল্প কিভাবে মহিমান্বিত হয় তার এক প্রকৃষ্ঠ উদাহরণ কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল। ১৮৪৪ সালে সর্বপ্রথম মুদ্রিত মনসামঙ্গল হিসেবে এটি প্রকাশিত হয়। ১৮৭২ সালে "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব"-এ রামগতি ন্যায়রত্ন ক্ষেমানন্দ ছাড়া আর কোন মনসামঙ্গল রচয়িতার নামোল্লেখ করেন নি। কবি প্রতিভার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ তথা উভয়বঙ্গে বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, বিপ্রদাস পিপলাই প্রমুখ কবিগণের তুলনায় কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের এই জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান কারণ যে মুদ্রণ সৌভাগ্য সে কথা বলাই বাহুল্য।

১৮৪৪ সালে প্রথম মুদ্রণের পরে ১৮৫২ সালে কেতকাদাস – ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের আরও একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তারপরে বটতলা থেকেও 'মনসার ভাসান'-এর একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয় – যা ছিল মূলত চাঁদসদাগর বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনী। এই পর্বে মুদ্রাকর ও প্রকাশকগণের একথা জানা ছিল না যে কেতকাদাস – ক্ষেমানন্দ একই ব্যক্তি – "শ্রীকেতকাদাস সাহায্যে শ্রীক্ষেমানন্দ কর্তৃক বিবিধ ছন্দে বিরচিত" – সে সময় এই ভাবেই কবি পরিচয় দেওয়া হত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, অধ্যাপক ফীন্দ্রমোহন সম্পাদিত গ্রন্থে 'কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ বিরচিত মনসামঙ্গল' এই নাম ব্যবহার করা হয়। অধ্যাপক ভট্টাচার্য ৬৬টি পুঁথির সাহায্য এই সঙ্কলন প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ বিষয়ে 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'-কার ড. সুকুমার সেনের মন্তব্য উল্লেখনীয় – "ভট্টাচার্য মহাশয় এক একটি পুঁথি হইতে এক একটি পালা লইয়া বইটি সঙ্কলন করিয়াছেন। এ সংস্করণ গবেষণার কাছে অনুপযোগী।" কিন্তু তা সত্ত্বেও সাধারণ পাঠক সমাজে এই গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা যে অনস্বীকার্যতা উল্লেখ করেছেন "বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত-" রচয়িতা অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় – "অ-গবেষক সাধারণ পাঠক সমাজে এই রূপ গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।" ('বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' ৩য় খন্ড ঃ ১ম পর্ব)।

এই কাব্যের আত্মপরিচয় অংশ থেকে জানা যায় কায়স্থ বংশ জাত কবি বর্ধমানের অন্তর্গত বলভদ্রের তালুকের কাঁথড়াগ্রামে বাস করতেন। কবির পিতা শঙ্কর মন্ডল স্থানীয় ফৌজদার (?) বারা খাঁর অধীনে কাজ করতেন। কোন এক যুদ্ধে বারা খাঁর মৃত্যু হলে আতান্তরে পড়ে শঙ্কর গ্রাম ত্যাগ করেন। দুই পুত্র ও পত্নীকে নিয়ে শঙ্কর চলে যান জগন্নাথপুরে। সেখানে জমিদার ভারমল্ল রায় শঙ্করকে জমিদার কাজে নিয়োগ করেন। সেখানে একদিন খড় কাটতে গিয়ে ক্ষেমানন্দ আর তার ছোটভাই দেখলেন যে গ্রামের ছেলেরা মাছ ধরছে, অভাবের সংসারে প্রতিপালিত ক্ষেমানন্দ সেই ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া করে তাদের মাছ কেড়ে নিয়ে ছোট ভাইকে দিয়ে বাড়িতে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে যায় খড় কাটতে জলার ধারে। সেখানে কাপড় বিক্রি করতে আসা মুচিনীর রূপ ধরে দেখা দেওয়ার পরে স্বরূপে আবির্ভূত হয়ে বলেন –

"ওরে পুত্র ক্ষেমানন্দ কবিতা কর প্রবন্ধ
আমার মঙ্গল গায়া বোল।।"

কেতকাদাসের এই আত্মবিবরণীতে তাঁর একশ বছরের পূর্ববর্তী কবি 'অভয়ামঙ্গল' (চন্ডীমঙ্গল)

রচয়িতা মুকুন্দরামের প্রভাব সুস্পষ্ট।

আত্মবিবরণীতে যে বারা খাঁর উল্লেখ রয়েছে তিনি ছিলেন দক্ষিণরাঢ়ের সেলিমাবাদ সরকারের শাসনকর্তা বর্তমানে এটি বর্ধমান জেলার একটি গ্রাম। সম্পাদক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য বারা খাঁর সমাধি দর্শন করে এসেছিলেন। বিভিন্ন প্রমানাদি থেকে জানা যায় বারা খাঁ কমপক্ষে ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত থেকে জানা যায় বারা খাঁ কমপক্ষে ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। আবার ভারমল্ল রায়ের জীবনকাল অনুযায়ীও কবির রচনাকাল নির্ণয় করা যায়। চৌভরমল্ল ও তাঁর দুই পুত্র ভারমল্ল ও বিষ্ণুদাস। ১৬৭৫-৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চৌভরমল্ল বাংলাদেশে বসবাস করেছিলেন। ফলত কবির পিতার ভারমল্লের অধীনে কাজ করা এবং কবির কাব্য রচনার কাল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়।

টিপ্পনী

পূর্ববঙ্গের পূর্ববর্তী কবিগণ মনসামঙ্গলের যে রচনারীতি তৈরী করে দিয়েছিলেন তাতে স্বকীয়তার বিশেষ কোন স্থান ছিলনা। তবে কাহিনীর যে সংহত রূপায়ণ কবি করেছিলেন তা উল্লেখনীয়। দেবখন্ড ও নরখন্ডে বিভক্ত মনসামঙ্গল। দেবখন্ডের পালাগুলোর মধ্যে উদাহরণ পালাই দীর্ঘতম। কবি কক্ষবিধ পুরাণ থেকে এর উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। ধন্বন্তরী পালাটিও দীর্ঘ। মনসা জাগরণ পালার আখ্যানভাগে মৌলিকতার নিদর্শন না থাকলেও এ কাব্যে লক্ষীনূরকে নিয়ে বেহুলার ভাসান যাত্রায় কবি নদীপথের যাত্রা যে ভৌগোলিক বর্ণনা দিয়েছেন তা বর্ধমান ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যকে প্রতিফলিত করে। এই প্রসঙ্গে কবি পশ্চিমবঙ্গীয় সমাজজীবনের চালচিত্রও ফুটিয়ে তুলেছেন।

পান্ডিত্য ও রচনারীতিতে উৎকর্ষতার পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে রচনাবিন্যাসে কবি মুকুন্দরামের প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। পূর্ববঙ্গের মাঝিদের বিলাপ বর্ণনায় মুকুন্দরাম 'অভয়ামঙ্গল'-এ যেভাবে লিখেছেন

"কান্দে রে বাঙ্গাল ভাই বাফোই বাফোই। ক
ুখাণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই।।
আর বাঙ্গাল কান্দে শিরে দিয়া হাথ।" (ইত্যাদি)

এরই অনুসরণে কবি কেতকাদাস লেখেন –

"বাঙ্গাল কান্দে হড়ুর বাঁকে বাঁকে।। (ধ্রুপদ)
....
মাথায় হাত দিয়া কান্দে যতেক বাঙ্গাল।
সকল ডুবিল জলে হৈনু কাঙ্গাল।।" (ইত্যাদি)

ঈর্ষাতুর মনসার চরিত্রাঙ্কনে কবি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সমুদ্র মন্থনে শিব কালকূট পান করে হতচেতন হলে, তাকে বাঁচাবার জন্য কার্তিক গনেশ দুই ভাই যখন মনসাদিদির কাছে গেল – মনসা তখন পিতার মৃত্যু সংবাদেও আনন্দিত কারণ –

"চন্দ্রিকা রন্দ্রিকা হইল ঘুচিল সন্তাপ।।
প্রাণ গেল মনসা তথারে নাহি যাই। এ
ই সমাচার কহ গিয়া প্রাণের ভাই।।"

এই প্রসঙ্গে সম্পাদক অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের মন্তব্য উল্লেখনীয় – "কেতকাদাসের বিশেষত্ব এই যে, বেহুলা এখানে কেবল একটি আদর্শের প্রতিলিপি নয়, রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ হইয়া উঠিয়াছেন। বেদনায় শোকে দুঃখে তিনি কাঁদিয়া সকলকে কাঁদাইয়াছেন, বুদ্ধিকৌশল প্রয়োগে সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন। আনন্দে উৎসবে হাস্যরসিকতায় সকলকে প্রসন্ন করিয়াছেন, অশ্রুও হাসিতে পরিপূর্ণ জীবনের সৃষ্টি হইয়াছে।" ('কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ বিরচিত মনসামঙ্গল', প্রকাশক কলিকাত বিশ্ববিদ্যালয়)।

টিপ্পনী

চাঁদ সদাগরের চরিত্র বর্ণনা করে কবি বলেছেন –

"মনস্তাপ পায় তবু না নোয়ায় মাথা।"

চাঁদের চারিত্রিক দৃঢ়তার চিত্রাঙ্কন করতে গিয়ে কবি সীমিত পরিসরে যেভাবে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা উল্লেখনীয় –

"যে হাতে পূজিনু মুই সোনার গন্ধেশ্বরী।
কেমনে পূজিব তাহে জয় বিষহরি।।"

লখীন্দরের মৃত্যুতে একদিকে যেমন চাঁদবেনে উন্মাদের মত নৃত্য করে অন্যদিকে সাত পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠতমের বিনাস হয়েছে শুনে দুঃখ-ভয় এই সব অনুভূতির উর্ধ্বে চলে যায় –

"বিভাদিনে চাঁদ বান্যা পুত্রের মরণ শুন্যা
নাচে হেতালের বাড়ি লইয়া।।
লখাই মৈল ভাল হৈল
নির্ভর হৈনু মনে চেঙ্গ মুড়ী কানী সনে
এতদিনে বিবাদ ঘুচিল।।"

চরম শোকে অবিচলিত থাকার এমন উদাহরণ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিশেষ একটা পাওয়া যায় না। যদিও শেষ অবধি মধ্যযুগীয় মানব চরিত্রের এই দেবদ্রোহ বেহুলার প্রচেষ্টায় সাত পুত্রের পুনর্জীবনেই শেষ হয়ে যায় –

"সাবিত্রী সমান হৈল পুত্রবধূ মোর।
ঘরেতে পাইলু মুই চৌদ্দ মধুকর।।
হেন মনসার পূজা নাহি করি যদি।
বিপাকে হারাই পাচ্ছে হাতে পায়্যা নিধি।।"

শেষ পর্যন্ত চাঁদবেনে যখন গলবস্ত্র হয়ে বলেন

"গলায় কাপড় দিয়া সদাগর দান্ডাইয়া
মনসারে বলে স্তুতিবানী।
তুমি দেব দেবতী তুমি হরদুহিতা
তুমি দেব ঈশাননন্দিনী।।"

চাঁদবেনের এই স্তবগান মনসার প্রতি স্বতস্ফূর্ত আত্মনিবেদনের পরিচয়বাহী।

তৎসম শব্দ ও সংস্কৃত অলঙ্কার প্রয়োগে কবি বিশেষ ব্যুৎপত্তির পরিচয় দিয়েছেন। 'পূর্ণিমার চন্দ্র যেন অমৃত বরিষে' অথবা 'হলদ নিন্দিয়া কেশভার'। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'-কার

সুকুমার সেনের মতে "ক্ষেমনন্দের বর্ণনার প্রধান বিশেষত্ব সবলতা ও সহৃদয়তা"। প্রাণ ফিরে পেয়ে লখীন্দর ও বেহুলার প্রত্যাবর্তনের বর্ণনার উদাহরণ দিয়ে সুকুমার সেন নিজের মত প্রতিষ্ঠা করেছেন। শ্বশুরবাড়ীতে ফেরার আগে ছদ্মবেশে বেহুলা লখীন্দর প্রথমে যার নিছনী নগরে বাপের বাড়ীতে তার পর যায় চম্পক নগরে শ্বশুর বাড়ীতে –

"গলায় রুদ্রাক্ষমালা স্কন্ধেঝুলি হাতে থালা
নখিন্দর চলে তার আগে
বেহুলা যায় পিছু পিছু লজ্জায় না বলে কিছু
মায়ারূপে দোহে ভিক্ষে মাগে।"

যোগিনীর ন্যায় বেহুলাকে দেখে তার মার মনে হয়েছে

"তোমা দেখিয়া শোকে কান্দে মোর প্রাণ
মোর কন্য ছিল এক তোমার সমান।
না বলিয়া কোথা গেল মড়া লৈয়া কোলে
যোগিনী ছাগালে শোক বেহুলা বদলে।"

শশুড়ির সামনে বেহুলা আসে ডোমনী সেজে –

"বেহুলা ডোমনী নাম সায় ডোম পিতা।
চাঁদ ডোম শ্বশুর নখাই-ডোম পতি
অতি হীনকুলে জন্ম মোরা ডোম জাতি।"

বেহুলার কথা শুনে সনকার মনে পুত্র ও পুত্রবধূর স্মৃতি জেগে ওঠে –

"বেহুলার লখাই নামে পূর্বশোক জাগে
সনকা ক্রন্দন করে ডোমনীর আগে।"

প্রসঙ্গত উল্লেখনীয় মনসামঙ্গল কাব্যে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ হলেন একমাত্র কবি যিনি মনসার কেয়াপাতায় জন্মবৃত্তান্ত উল্লেখ করেছেন।

"কি আ পাতে জন্ম হৈল কেতকাসুন্দরী"

আর এই হিসেবেই কবি নিজেকে কেতকাদাস বা মনসার দাস বলে মনে করেছেন।

কেতাকাদাসের সারল্য ও সহৃদয়তার এই বর্ণনা দেওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে সুকুমার সেন বলেছেন "কৃত্তিবাস, মুকুন্দ ও কাশীরাম যেমন রাম-কথা চন্ডী-কথা ও ভারত-কথার প্রতিনিধিস্থানীয় কবি, কেতকাদাস তেমনি মনসামঙ্গল কাব্যের।" নায়ায়নদেব বিজয়গুপ্তকে বাদ দিয়ে কেতকাদাসের প্রতি ড. সুকুমার সেনের এই পক্ষপাতিত্ব কবির মুদ্রণ মাহাত্যের নামান্তর বলে মনে হয়। যদিও এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য উল্লেখনীয় বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস রচয়িতা ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করেছেন। তাঁর মতে ঃ "ক্ষেমানন্দের কাব্যে উচ্চাঙ্গের কবিত্বের যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনই পান্ডিত্যের পরিচয় ও দুর্লভ নহে। বেহুলার দুঃখ-বেদনা বর্ণনায় তিনি সার্থক করুণ রসের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার ভাষা সুপরিচ্ছন্ন ও বহুলাংশে পূর্ববর্তী যুগের গ্রাম্যতা-মুক্ত। মুকুমন্দরামের চন্ডীমঙ্গল ও রামায়ণ কাহিনীর প্রভাব তাঁহার উপর অত্যন্ত স্পষ্ট; এই দুইটি উচ্চ

টিপ্পনী

আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তিনি কাব্যরচনা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মধ্যে আদর্শ ও রচনাগত শৈথিল্য প্রকাশ পাইতে পারে নাই।"

তন্ত্রবিভূতি

উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গলের আদি কবি তন্ত্রবিভূতি। মালদহ জেলা থেকে তন্ত্রবিভূতির একাধিক পুঁথি আবিষ্কৃত হয় এবং ড. আশুতোষ দাসের সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়।

টিপ্পনী

"মন দিঞা শুন সভে মনসার গীত।
তন্ত্রবিভূতি গায় মনসাচরিত।।"

'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' রচয়িতা সুকুমার সেন তন্ত্র শব্দটিকে তাঁতী জাতির প্রতিনিধিত্বের উল্লেখ বলে বিবৃত করেছেন।

'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' রচয়িতা অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে কবি ছিলেন তন্ত্রমতাবলম্বী।

তন্ত্রবিভূতির মনসামঙ্গলে আদিরসের প্রভাব পরিলক্ষণীয়। শিব ধর্ম পূজার জন্য ফুল তুলতে গিয়ে শক্তিক্ষয় করে – যার ফলে মাংস পিন্ডস্বরূপ মনসার জন্ম হয়। শুধু শিব নয় পিতামহ বাহ্মাও মনসার সঙ্গে সাগর পার হতে গিয়ে ঐরূপ দুর্বলতার পরিচয় দেন এমনকি কিশোর লখিন্দরও মাতুলানী দূষণের ন্যায় গর্হিত কর্মে লিপ্ত হয়। লোকজীবনাশ্রয়ী আদিরসের এই প্রকাশে কবি দ্বিধাহীন। একই সঙ্গে কবির পরিমিতিবোধ ও কবিত্বশক্তি উৎকর্ষতার পরিচয়বাহী। দেবখন্ডের কাহিনীতেও লৌকিক জীবনের প্রভাব সুস্পষ্ট –

"ফিরা না দেখহ মোরে সঙ্কর আতাই।
তোমার ঝি হই আমি নাম মনশাই।।
তোমার তেজেতে জন্ম নাম পদ্মাবতী।
দশ দন্দ মধ্যে মোর হইল আকৃতি।।"

কিন্তু দুর্গার ভয়ে শিব পূর্ণযৌবনা কন্যাকে নিয়ে কৈলাসে যেতে অনারগ।

"আমার বান্য শুন মা বাহ্মণী তোতল।
তুমি গেলে হবে মা ই ছন্দ কোন্দল।।
যখন বলিতে দুর্গা কুচ্ছীত বচন।
সহিতে নারিবে তুমি করিবে ক্রন্দন।।"

কিন্তু মনসা শিবের কথা না শুনেই চলে যায় কৈলাসে এবং দুর্গা যারপর নাই রুষ্ঠ হয়ে সন্দেহের বশে কু-কথা বলেন ঃ

"যুন বেটি দুষ্টমতি বাপ লঞা কর রতি
কাহাকে বোলহ তুমি বাগ।।"

শেষ পর্যন্ত সমুদ্রমন্থনের বিষপান করে শিব যখন মূর্চ্ছিত হলেন তখন পিতার প্রাণ রক্ষা করে

শিবের বরে দেবীরূপে গণ্য হলেন মনসা, এই পর্বে উল্লেখনীয় হল কন্যাকে 'বান্ধণী তোতল' বলে শিবের সম্ভাষণ। কৌতুক রসস্রিত লৌকিক আবহ রচনায় কবি যেমন স্বচ্ছন্দ, একের পর পুত্রের মৃত্যুতে সনকার দুঃখের বর্ণনাতেও তিনি সাবলীল। সর্পাঘাতে ষষ্ঠপুত্রের মৃত্যু হয়েছে শুনে সনকার ক্রন্দনের মধ্যে দিয়ে কবি যে করুণরসের পরিবেশ তৈরী করেছেন কবিকৃতিত্বে উজ্জ্বল।

"শুনিঞা চান্দোর কথা কান্দে সোনা হানে মাথা
ভূমি পরে অঙ্গ আছরিঞা।
তন্ত্রবিভূতি কবি বলে মা মনসাদেবী
দ্বিজমুনি আস্তিকের মাতা।।"

সর্পদংশনে সপ্তম পুত্র লখীন্দরের মৃত্যু হলে চাঁদ সদাগর সনকাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন ঃ

"সোনকা প্রবোধ চান্দো বোলেন বচন।
পুত্রের কারণে সোক কর অকারণ।।
ভাল হৈল মৈল পুত্র বালা লখিন্দর।
নিধনিয়ার ঘরে চোরের নাহি ডর।।"

বেহুলার রূপ বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে লখিন্দরের মৃত্যুতে বেহুলার আর্তনাদকেও কবি নিপুনভাবে তুলে ধরেছেন ঃ

"হাহাকার ক্রন্দন করি কান্দে বেহুলা সুন্দরী
বিষ উঠে কাল কেশ বাঞা"

আবার লখীন্দরের মৃত্যুতে ঝুলযানী বলে সনকা তাকে তিরস্কার করলে তেজোদীপ্তভাবে প্রতিবাদ জানায় বেহুলা –

"বেহুলা বলেন মাও কি করিবে রূপে।
দেবতা মনুষ্যে বাদ খাইল পদ্মার সাপে।।
তৈল ঘৃত থাকিতে প্রদীপ নিভাইল।
শ্বশুরের কারণে প্রাণনাথ হারাইল।।"

সপ্তদশ শতকে উত্তর বঙ্গে মনসামঙ্গলের আদিরসাস্রিত যে নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিলেন ত্ন্ত্রবিভূতি উত্তরনূরী জগজ্জীবন ঘোষালের প্রয়াসে তা আরও বিস্তারিত আকার লাভ করে", শুধু মালদহ জেলা নয় সমগ্র উত্তর বঙ্গে প্রচারিত হয় জগজ্জীবনের কাব্য। বল যায় কবি জগজ্জীবন যেন এক প্রকারে তন্ত্রবিভূতিকে আত্মসাৎ করে নিজের কাব্যবিস্তার করেছিলেন, ঠিক যেমন অষ্টাদশ সতকে আবার জগজ্জীবন ঘোষালকে আত্মসাৎ করেছিলেন কবি জীবনকৃষ্ণ মৈত্রেয়।

শুধু দুঃখ নয় তৎসম শব্দলালিত্যে সুখের আবহ রচনাতেও কবি সাবলীল। সনকার কাছে লখিন্দরের যোগ্য বধূ হিসেবে বেহুলার রূপ বর্ণনাতেও কবি উৎকর্ষতার পরিচয় দেন।

"নয়ন কট্যক্ষ জেন দেখিতে সুঠাম।
নাসা দিখল জেন গরূড় সমান।।
চাঁপার পাখড়ি জেন কন্যা সর্ব্বগায়।

টিপ্পনী

বিশ্বকর্মার নির্মিত জেন সুন্দর হতে পায় ।।"

জগজ্জীবন ঘোষাল

ড. আশুতোষ দাস ও সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের সম্মাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে। কাব্যে উল্লিখিত কবিপরিচয় থেকে জানা যায় দিনাজপুরের কুচিয়ামোড় গ্রামে ঘোষাল বংশে কবির জন্ম। বর্তমানে এই গ্রামটি পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত। কবির পিতামহ জয়ানন্দ, পিতা রূপ রায় চৌধুরী, মা রেবতী ও ভাই ঘনশ্যাম।

টিপ্পনী

"চৌধুরী রূপরায় সর্বদেশে গুণ গায়
জয়ানন্দ দ্বিজের নন্দন।
তার পুত্র ঘনশ্যাম তার কনিষ্ঠ অনুপম
বিরচিত জগৎজীবন।।"

সম্পাদক আশুতোষ দাসের মতে নরখন্ডের ১২দশ অধ্যায় 'রাজোপাখ্যান'-এর দিনাজপুরের মহারাজা প্রাণনাথের কাল অনুযায়ী জগজ্জীবনের কাব্যরচনাকাল সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধ। আবার জগজ্জীবনের একটি পুঁথির লিপিকাল ১১০২ বঙ্গাব্দ ১৬৯৬ খীষ্টাব্দ অনুযায়ী জগজ্জীবনের কাব্য সপ্তদশ শতাব্দীর শেষপর্বে রচিত এমনটাও অনুমান করা যায় কারণ কবির গ্রামের জমিদার ১৬৪৭ খীষ্টাব্দে জমিদারী লাভ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' তৃতীয় খন্ড ঃ প্রথম পর্বে বলেছেন "জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে – একেবারে শেষের দিকেই রচিত হওয়া সম্ভব।"

দেবখন্ড ও বাণিয়াখন্ড – এই দুইভাগে বিভক্ত জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল। দেবখন্ডে কবি ধর্মমঙ্গল এর মত করে সৃষ্টিলীলা ব্যাখ্যা করেছেন –

"অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ বটপত্রের উপর।
হলমধ্যে ভাসে দেব অনাদি ঈশ্বর।।"

শূন্যতা থেকে আবির্ভূত এই অনাদি ঈশ্বরই হল নিরঞ্জন। নিরঞ্জন তার ঘরে ভ্রাতাকে সৃষ্টি করতে বললে উৎপন্ন হল ধর্ম – ধর্ম থেকে সৃষ্টি হল বহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের। ধর্মের দীর্ঘনিঃশ্বাসে জন্ম হল মনসার। কন্যার রূপে আসক্ত হয়ে ধর্ম তাকেই বিয়ে করলেন। ঘটনা পরম্পরায় তিনি পুত্র শিবকে বরদান করলেন 'মনসা কামিনী হবে তোমার জননী' যার ফলে ধর্মের মৃত্যুর পরে সহমৃতা মনসা পরজন্মে হলেন গৌরী, হরগৌরীর বিবাহের পরে আত্মবিস্মৃত শিবের মনোবিকারের ফলে শিবের কন্যারূপে মনসা-বিষহরীর তৃতীয় জন্ম হয়। ধর্মের মতো শিবও কন্যাকে দেখে কামোন্মত্ত হয়ে ওঠে যদিও মনসার বাধাদানে শিবের প্রচেষ্টা সফল হয়নি।

আদিরসের বাহুল্যময় এই কাব্যে দেবখন্ডের মত বাণিয়াখন্ডেও রয়েছে লখিন্দরের মাতুলানীর সঙ্গে অগমাচার। সর্পদংশনের ভয়ে সনকা পুত্র লখিন্দরের বিয়ে দিতে যান নি –

"সনকায় বোলে ই কথা ন কহিয় বাপ।
বিভা রাত্রিতে বাছা খাইবে কালসাপ।।"

অথচ সাপগ্রস্ত দেবতাযুগল উষাও অনিরুদ্ধের, বেহুলা লখিন্দর হয়ে জন্ম মনসার মহিমা প্রচারের জন্য। তখন মনসার নির্দেশে কামসোনা অপ্সরা স্বপ্নে, মাতালানী কৌশল্যার বেশ ধরে লখিন্দরকে কামোন্মত্ত করে তুললে, স্বপ্নভঙ্গের পরে লখিন্দর মাতুলান্যর তীব বাধা সত্ত্বেও অগমাচারে লিপ্ত হল। তখন চাঁদ সদাগর বাধ্য হলেন পুত্রের বিবাহ দিতে –

"সাধু বোলে পুত্র যদি করে অনাচার।
বিভা দিব পুত্রকে করিলাম অঙ্গীকার।।"

দেবখন্ডে ধর্ম ও শিবের কামোন্মত্ত অগম আচার বা তার চেষ্টা এবং বাণিয়াখন্ডে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মত লখিন্দরের মাতুলানী দূষণ তন্ত্রবিভূতির প্রদর্শিত পথকেই আরও প্রশস্ত করেছে। মনসার সঙ্গে বিমাতা দুর্গার কলহতেও কবি কটুভাষার চূড়ান্ত নিদর্শন দিয়েছেন –

"দুর্গা বোলে কি বলিলে ঢেট মুরুদদারী।
তোর মত নই আমি ঢেমন ভাতারী।।
পদ্মা বোলে কহিলে উকুটা যায় যার।
তোর মত নহি আমি অসুর ভাতার।।"

আদিরসকে অসমাচার ও কটুভাষণে জারিত করে পরিবেশনার সঙ্গে সঙ্গে কবি উত্তরবঙ্গের জীবনচিত্রকে উপমা অলঙ্কারে সমৃদ্ধ করে আঞ্চলিক ভাষা ও তৎসম শব্দের সমন্বয়ে যেভাবে পেশ করেছেন তা প্রশংসনীয়। শুধু আদিরস নয় করুণরসের পরিস্ফূটনেও কবি বিশেষ সাবলীল।

"ভাসাইঞা পুত্র খানি অসার সংসার গুণি
শোকে সাধু কান্দে উচ্চ স্বরে।
বঞ্চিল দারুণ বিধি সাগরে ভাসাল নিধি
কেমতে থাকিব একেশ্বরে।।
ধিক মোর ধনজন প্রাণ ধরি অকারণ
অকারণ গৃহতে বসতি।
একে একে সাত জন মৈল মোর পুত্রাণ
অন্তকালে আমার কি গতি।।"

চাঁদের বেদনা প্রকাশে কবির আন্তরিকতা তাঁকে কালোত্তীর্ণ করেছে।

জীবনকৃষ্ণ মৈত্রেয়

অষ্টাদশ শতকের উল্লেখনীয় কবি জীবনকৃষ্ণ মৈত্রেয় যে কালজ্ঞাপক পদরচনা করেছিলেন তাঁর কাজে তা হল

"মহীপৃষ্ঠে শশী দিয়া বাণবিষ্ণু সমর্পিয়া
বুঝহ সনের পরিমাণ।"

এই উদ্ধৃতি থেকে জানা যাচ্ছে যে ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কবি কাব্যরচনা করেছিলেন। অষ্টাদশ শতকে কবি রচিত সুদীর্ঘ মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ কাব্যটি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। আত্মপরিচয়ে কবি জানিয়েছেন

টিপ্পনী

টিপ্পনী

"মহারাজা রাম কান্ত ভুবনে।
তাঁহার জামাতা বটে রাজা রঘুনাথ।।
তাঁহার রাজ্যেতে থাকি ভিক্ষা করে খাই।
ভিক্ষুকের কর্মদোষ নিন্দায় গোসাঞি।।
শ্রীবংশীবদন মৈত্র জ্ঞান মহাশয়।
চৌধুরী অনন্তরাম তাহার তনয়।।
অনন্ত নন্দন কবি শ্রীমৈত্র জীবন।
লাড়ি পাড়ার বাস বারিন্দ্র বাহ্মণ।।"

কবি উল্লিখিত এই লাড়ি বা লাহিড়ী পাড়া গ্রাম নাটোরের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কবি অন্যত্র নিজেকে নাটোরের রাণী ভবানীর পুত্র রামকৃষ্ণের রাজ্যের প্রজা বলে উল্লেখ করেছেন।

"সে সতী পুণ্যবতী রাণী ভবানী।
মহারাণী বলি যাকে ভুবনে বাখানি।।
যার পুত্র রামকৃষ্ণ রাজা রাজ্যেশ্বর।
অপার মহিমা যশ ভুবনে যাহার।।"

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে কবির রচনা সম্পর্কে বলেছেন ঃ "সংস্কৃত পুরাণ হৈতে নির্বিচারে অশ্লীল অংশ সমূহ গ্রহণ করিবার ফলে জীবনের কাব্য আদিরসের বর্ণনায় ভারাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে। জীবনের রচনা সর্বত্র সরল নহে, কবিত্ব অপেক্ষা পান্ডিত্যই তাঁহার অধিক ছিল। তাঁহার কাব্যে সংস্কৃত অলঙ্কার ও উপমার যথেচ্ছ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। শব্দচয়নে কবি তাঁহার কাব্যমধ্যে নীরস পান্ডিত্যের অবতারণা করিয়া কাব্যস্ফূর্তির পথে বাধ্য সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছেন।"

রচনার অনেকাংশেই কবি তাঁর পূর্বসূরী জগজ্জীবন ঘোষালের রচনা আত্মসাৎ করেছিলেন।

"বালা বোলে প্রাণপ্রিয়া কোলে আসি বৈস সিয়া
ছাড় পাশা কিসের ধামালী।
দেখিঞা তুমার ঠান মদনে হানিল বাণ
প্রাণ রাখ বানিয়ার বালী।।"

জগজ্জীবনের রচনা অনুকরণ করেই কবি লেখেন –

"বালা বোলে প্রাণপ্রিয়া কোলে য়াসি বোশাসিআ
তেজো পাশা কিসের ধামালি।
দেখিয়া তোমার ঠাম মদনে হানিল বণি
প্রাণ রাখো শাহের ঝিআরি।।"

উত্তর বঙ্গে তন্ত্রবিভূতিকে কেন্দ্র করে আদিরসাত্মক পদ্মাপুরাণ রচনার পরম্পরায় সাংসারিক বিষয়ে অনভিজ্ঞ, অন্তর্মুখী কবি তাঁর কাব্যপ্রতিভায় উত্তরবঙ্গের জীবনচিত্রকে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন; পূর্বসূরী ও সংস্কৃত রসশাস্ত্রের অনুসরণে কবি যে কাব্যরচনা করেছিলেন তা উল্লেখনীয় হলেও যুগোত্তীর্ণ হতে পারে নি।

২. চন্ডীমঙ্গল

মঙ্গলচন্ডীর বত বা ঘটস্থাপন বাংলাদেশের এক প্রাচীন রীতি। মনসার মত অতটা বিস্তৃত ও প্রসারিত না হলেও চন্ডীমঙ্গল কাব্য-এরও জনপ্রিয়তা খুব কম ছিল না। এই মঙ্গলকাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দুর্গা। তিনি মহিষাসুরমর্দিনী রণরঙ্গিনী নন, তিনি অভয়া। তাই অনেক চন্ডীমঙ্গল কাব্য পরিচিত অভয়ামঙ্গল হিসাবে। কেউ কেউ এঁকে বনদেবী চন্ডী, যিনি কিরাত সমাজে পূজিতা, বলে অভিহিত করতে চান। আবার কেউ চন্ডীদেবীর পরিচালনায় বাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-অবাহ্মণ সংস্কৃতির সমন্বয় লক্ষ্য করেছেন। কাব্যের রূপ চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরে পাওয়া গেলেও, প্রাক্-চৈতন্যযুগে এর নিদর্শনের উল্লেখ পাওয়া যায় 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে-

'ধর্ম কর্ম লোকে সভে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচন্ডীর গীত করে জাগরণে।।'

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় সংস্কৃতির ধারায় চন্ডীর আর্বিভাব বহু প্রাচীন। মার্কন্ডেয় পুরাণে চন্ডীর পরিচয় পাওয়া যায়। খ্রীষ্টিয় তৃতীয় শতকে চন্ডী রচনার কাল নির্ধারণ করা হয়েছে। বেশ প্রাচীনকাল থেকেই চন্ডী মূর্তির পরিকল্পনা করা হয়েছে। কোথাও তিনি অষ্টভূজা বা চতুর্ভূজা সিংহবাহিনী, কোথাও আবার দেবীর পদতলে গোধিকা মূর্তি, আবার কোথাও সিংহের সঙ্গে গজলক্ষীর মতো হস্তীর উপস্থিতি ঘটেছে। ফলে চন্ডীর পরিকল্পনা বেশ জটিল।

বাংলার বতপালনে চন্ডীর প্রচুর নাম পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে আছে-ওলাই চন্ডী, ঢেলাই চন্ডী, নাটাই চন্ডী, উড়ন চন্ডী, গোর চন্ডী, শুভ চন্ডী, কুলুই চন্ডী, কলাই চন্ডী, সুবচনী, সঙ্কটামঙ্গলচন্ডী প্রভৃতি। এগুলি মূলত গ্রামদেবতা-দের নাম। এই পূজা পদ্ধতি, বতপালন-সব লৌকিক, অস্মার্ত। লোকবিশ্বাস থেকেই এঁদের উদ্ভব। কালকেতু-ফুল্লরা উপাখ্যানে চন্ডীর লৌকিক রূপটিই বজায় রয়েছে।

কাহিনী

চন্ডীমঙ্গলের দুটি আখ্যান- আখেটিক খন্ড ও বণিক খন্ড।

আখেটিক খন্ডটি ব্যাধখন্ড নামেও পরিচিত। অভিশাপগ্রস্থ স্বর্গবাসী দম্পতি নীলাম্বর ও ছায়া-র মধ্যে আগমন ঘটে কালকেতু ও ফুল্লরা রূপে দেবী চন্ডীর পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে। ব্যাধের ঘরে জন্ম তাদের। দারিদ্র-দৈন্য লাঞ্ছিত জীবনে যখন পীড়িত তখন দেবী চন্ডীর কৃপা লাভ করেন তারা। রাজ্য ও প্রচুর সম্পদ লাভের পর দেবীকে বিস্মৃত হন তারা। তাতে দুর্গতির সম্মুখীন হন। শেষে চন্ডীর শরণাপন্ন হওয়া ও সুখসমৃদ্ধিতে জীবন পরিপূর্ণ হওয়া। দেবী চন্ডীর পূজা প্রচার। এখানে ব্যাধদের দেবী হিসাবে চন্ডীকে পাওয়া যায়। যদিও বিবাহ-ভোজন ইত্যাদি অংশে বাহ্মণ্য সংস্কৃতির ছাপ স্পষ্ট। আবার দেবীর স্বর্ণ গোধিকার রূপধারণ, ধনদান ইত্যাদি লৌকিক কাহিনী।

বণিকখন্ড বা ধনপতি উপাখ্যানের কাহিনী ধনপতি সওদাগর-লহনা-খুল্লনা-শ্রীমন্তকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। প্রথমা স্ত্রী লহনা ঘরে থাকা সত্ত্বেও রূপমুগ্ধ ধনপতি খুল্লনাকে বিবাহ করে। বাঙালীর পারিবারিক জীবনচিত্রের মতোই দাসী দুর্বলার প্ররোচনা ও সতীন বিবাদের ছবি ধরা

টিপ্পনী

পড়ে। এমন কি লহনা খুল্লনাকে দিয়ে ছাগল চরিয়েছে পর্যন্ত। সেখানেই খুল্লনার দেবী চন্ডিকার মাহাত্ম্য ও পূজো পদ্ধতি জানতে পারে। দেবীর বত পূজো শুরু করে। ধনপতি খুল্লনার প্রতি বেশী অনুরক্ত হলেও চন্ডীপূজো প্রথমে মেনে নেয়নি। সিংহলে বাণিজ্যযাত্রার পথে সমুদ্রে কমলেকামিনী মূর্তি দেখে। কিন্তু রাজাকে সেই দৃশ্য দেখাতে না পারায় কারাবন্দি হয়। এদিকে ধনপতির অনুপস্থিতিকালে খুল্লনার পুত্র শ্রীমন্তের জন্ম হয়। শ্রীমন্ত একটু বড় হলে দেবী চন্ডীর কৃপায় সেই অপূর্ব দৃশ্য সিংহল রাজাকে দেখিয়ে পিতাকে মুক্ত করে। ধনপতিও চন্ডীপূজায় রত হয়।

টিপ্পনী

কবি : মাণিক দত্ত

মনসামঙ্গলের আদি কবি হরি দত্তের মতো চন্ডীমঙ্গলের আদি কবি মাণিক দত্ত। স্বয়ং মুকুন্দ চক্রবর্তী লিখেছেন–

“আদ্যকবি বন্দিলাম মহামুনি ব্যাস।
মাণিক দত্তের দান্ডা করিয়ে প্রকাশ।।
যাহা হৈতে হৈল গীতপথ পরিচয়।
বিনয় করিয়া কবিকঙ্কণে কয়।।”

অর্থাৎ মাণিক দত্ত থেকে চন্ডীমঙ্গল কাব্যের লিখিত রূপ গতিপথ পেল। তবে মাণিক দত্তের যে পুঁথিগুলি পাওয়া গেছে সেগুলি তুলনায় অর্বাচীনকালের– ১৬৯৬ শকাব্দ বা ১৭৭৪ খি:-তে পুথি নকলের সময়কাল। আবার অন্য পুথির মধ্যে প্রাপ্ত একটি জমাখরচের হিসাবে সন ১১৯১ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৭৮৫ খি:। পুথিতে শৃঙ্খলাও রক্ষিত হয়নি। এর ভাষাও বেশ আধুনিক। যেমন–

নিদ্রায় আছিল শুইয়া আইল দেবী মহামায়া
আইল দেবী হেমন্তনন্দিনী।।

কিংবা,

মুখের অমৃত তাহার খসিয়া পড়িল।
সপ্তদীপা পৃথিবীতে জল উপজিল।।

বিশেষজ্ঞদের অনুমান এ ভাষা ষোড়শ শতকের নয়। তার উপর এ কাব্যে চৈতন্যদেব ও তাঁর অনুচর-পরিকরদের উল্লেখ আছে। গুজরাট নগর পত্তন উপলক্ষে ‘ফিরিঙ্গী’ শব্দটি কবি ব্যবহার করেছেন, যা আধুনিক। সুকুমার সেনের মত, “ প্রাপ্ত পুথির ‘মাণিক দত্ত’ অষ্টাদশ শতাব্দের আগেকার লোক না হওয়াই সম্ভব।”

মর্ত্যলোকে পূজা ও মাহাত্ম্যকাহিনী প্রচারের উদ্দেশ্যে মাণিক দত্তকে দেবী নির্বাচিত করেছিলেন।

চিয়াও মাণিক দত্ত পূজ দুর্গার বত
মুঞি দেবী জগতের মাতা।
রঘুরাঘব তোখে দুই পুত্র দিব

ব্যক্ত করহ ব্রতকথা।।

দেবী কবিকে পোথা দেন। মাণিক দত্ত পোথার মর্মোদ্ধার করেন শ্রীকান্ত পন্ডিতের কাছ থেকে। তরূপর সংস্কৃতে লেখা এই পোথার ভাবানুসারে কবি তিনশ ষাটটিপদে ব্রতকথা লেখেন। সংক্ষেপে কালকেতু উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন মাণিক দত্ত। ফুল্লরার বারমাস্যা এরকম-

কার্তিক মাসে ত মাও সমুদ্র ভাইটাইল
ডাঙ্গা ছাড়িয়া পশু পুলিনে নাম্বিল।
হাতে গন্ডিপ করি বীর সেহি বলে যায়
না পায়ামৃগ প্রভু অদৃষ্ট ধিয়ায়।. ....

ভাঁড়ু দত্ত এখানে কেবল ভাঁড় নয় শক্তিমান পুরুষও বটে।

আটদিনের পালার প্রথম চারদিন কালকেতু-ফুল্লরা কাহিনী, পরের চারদিন ধনপতির।

ধনপতির বাণিজ্যযাত্রার বর্ণনা-

প্রথমে গোঙ্গাড়িয়া খাট পাছ করিল-
ভ্রমরার গঙ্গায়ে গিয়া সাধু উত্তরিল।

কাব্যটির ভনিতায় পাওয়া গেছে-ভবানীর দাস, দেবীর দাস, দুর্গার দাস ইত্যাদি। অন্যদিকে কাব্যনাম হিসাবে পাওয়া গেছে- দুর্গার মঙ্গল, ভবানীর মঙ্গল প্রভৃতি।

মাণিক দত্ত মঙ্গলচন্ডীর ব্রতকথা লিখে বাজনদার-দোহারদের নিয়ে গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন। এটাই তাঁর জীবিকা ছিল। তবে গীতিকাব্যটিতে শিল্পসৌকর্যের পরিচয় তেমন পাওয়া যায় না।

দ্বিজমাধব

দ্বিজমাধব বা মাধবানন্দের চন্ডীমঙ্গলের পুথি প্রাপ্ত পুথিগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। তবে পুথির নকলের রকমভেদের জন্য প্রচুর প্রক্ষেপ বা অপপাঠের সম্ভাবনা রয়ে গেছে। অধিকাংশ পুথিতে কাব্যরচনার কালজ্ঞাপক একটি পদ পাওয়া যায়-

ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক বিয়োজিত
দ্বিজ মাধব গায় সারদাচরিত।।

পদানুসারে সন ১০৫১। অঙ্কস্য বামাগতির নিয়মে ১৫০১ শকাব্দ বা ১৫৭৯ খি:। 'ধাতা' শব্দটির পাঠান্তরে 'ধাতামুখ' বা 'দাতা' হলে শেষ সংখ্যাটি ৪ বা ২ হয় এবং তাতে সাল সংক্রান্ত একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। কবি কাব্যে আকবরের উল্লেখ করেছেন-

পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার।
একাব্বর নামে রাজা অর্জুন অবতার।।

কবি পশ্চিমবঙ্গের লোক হলে আকবর বাদশার উল্লেখ স্বাভাবিক। কিন্তু চট্টগ্রামের অধিবাসী হলে আকবরের নাম শোনা স্বাভাবিক নয়। মাধবের পুথি ও ব্রতকথা ছোট ছোট পালা গানে

টিপ্পনী

বিভক্ত। এই ধরণ চট্টগ্রাম-উত্তরবঙ্গে সুপ্রচলিত। চট্টগ্রাম অঞ্চলেই তাঁর পুথি পাওয়া গেছে এবং পশ্চিমবঙ্গে তাঁর কোনো প্রভাবই নেই। যদিও কবি গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলে তাঁর জন্ম বলে দাবি করেছেন (ত্রিবেণীর কাছে সপ্তগ্রামে)। তাঁর পিতার নাম পরাশর।

দ্বিজমাধব ভনিতায় কাব্য নাম হিসাবে 'সারদাচরিত'-এর উল্লেখ করেছেন। 'সারদামঙ্গল'ও বলা হয়েছে। কিন্তু 'চন্ডীমঙ্গল' বলেননি। চট্টগ্রামে এই কাহিনী 'জাগরণ' নামে পরিচিত। আটদিন জেগে থেকে এই গান হত বলেই বতকথা এ নামে অভিহিত হয়েছে।

টিপ্পনী

শিব কর্তৃক বর প্রাপ্ত মঙ্গলাসুর উদ্ধত-অসহনীয় হয়ে ওঠেন। তখন তাকে বধ করে দেবীর মর্ত্যলীলার শুরু-

জয় জয় জয় দুর্গা সর্ব বিঘ্ন খন্ডি।
মঙ্গলদৈত্যে বধি মাতা হইলা মঙ্গলচন্ডী।।

এই কারণে দেবী মঙ্গলচন্ডী নামে পরিচিত। এরপর গণেশ-বন্দনা করে কাব্যারম্ভ।

দ্বিজমাধবের কাব্যাকার সংক্ষিপ্ত। ধর্মঠাকুরের পুরাণানুসারী সৃষ্টিপত্তন বর্ণনা। মঙ্গলদৈত্য বধ করে দেবী স্বর্গে পূজিতা হলেন। ইন্দ্র পুজো করায় তাঁর গৌতমের শাপ থেকে মুক্তি ঘটল। তারপর মর্ত্যে পূজা প্রচারের ইচ্ছা। কলিঙ্গ রাজাকে দিয়ে প্রথম পুজো পাওয়া। অত:পর শিবের অভিশাপে ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরের ব্যাধ সর্দার ধর্মকেতুর সন্তান কালকেতু হিসাবে জন্মগ্রহণ। সিংহ শিকারে গিয়ে ধর্মকেতুর সিংহের কাছে মৃত্যুস্বীকার। এতে ক্রোধান্বিত কালকেতুর পশুদের নিধন যজ্ঞ শুরু। পশুগণের চন্ডীর শরণাপন্ন হওয়া ও দেবীর অভয়প্রদান-

কালকেতুর তরে তোরা না ভাবিহ ডর
মহাবীরের তরে আমি দিতে যাই বর।

দেবীর গোধিকা রূপ ধারণ, কালকেতুর তাকে শিকার করে আনা, দেবীর কৃপা লাভ, রাজ্যস্থাপন এবং সবশেষে অগ্নিতে স্বামী-স্ত্রীর জীবনাহুতি দিয়ে স্বর্গে প্রত্যাবর্তন।

কবির কাব্যের আকার সংক্ষিপ্ত কিন্তু সংহত। অনেকটা বতকথার ঢঙে রচিত। আখেটিক খন্ডে আখ্যান রস সর্বত্র সমানাকারে জমাট বাঁধেনি। দেবীর অঙ্গুরী দান ও সোম দত্তের কাছে আংটি বিক্রির ঘটনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। গুজরাট নগর পত্তন ও প্রজাস্থাপন ঘটবার কাহিনী যতটা পেরেছেন সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। যেমন বন্যার কোনরকম উল্লেখ নেই। তবে ভাঁড়ু দত্ত চরিত্রটির বিচিত্রময়তা লক্ষনীয়। দ্বিজমাধবের ভাঁড়ু স্বার্থপর, ঠগ। তার চাতুর্য ও শঠতাকে কবি চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন। কালকেতুর নির্দেশে ভাঁড়ুর শাস্তি হয়েছে ঘোড়ার মূত্রে চুল ভিজিয়ে মাথা ন্যাড়া করা। ক্ষৌরকার উল্টোদিকে ক্ষুর টেনে দুর্গতি বাড়িয়েছে। অনেকে 'শিরে ঢালি দিল লোনা জল'। ভাঁড়ু গঙ্গাপারে পালিয়ে গিয়ে বলতে শুরু করে যে গঙ্গাপারে গিয়ে মাথা মুড়িয়েছে। নানান ধরনের ভেট নিয়ে গিয়ে কলিঙ্গ রাজাকে সে উত্তেজিত করেছে-

দেওয়াবেত্তে যায় ভাডু মনে নাহি হেলা।
চুরি করি আনিলেক কুল কাঁচকলা।।
ভেট সজ্জা লয়ে ভাডু করে পরিপাটি
বাড়ির বাথুয়া শাক তুলি বান্ধিলেক আটি।।

বীরের খাসিটা লৈয়া দেওয়াক্ষেতে যায়
তারাপুর সিংহাপুর ত্বরাত্র এড়ায়। ি
বনোদপুর ছাড়াইয়া পাইল চন্ডীর হাট
উপনীত হৈল গিয়া যথা রাজপাট।।
ভেট সজ্জা থুইয়া ভাড়ু যায় এক ভাগে
দন্ডবৎ প্রণাম করে নৃপতির আগে। ি
ববেদিহু ধরাধীশ কর অবধান। রাজ্যের
বসতি করে ব্যাধ বলবান।।

টিপ্পনী

এইভাবে দ্বিজ মাধবের ভাঁড়ু দত্ত জীবন্ত চরিত্র হয়ে উঠেছে। কিন্তু অন্যান্য চরিত্র অঙ্কণে সেই দক্ষতার পরিচয় নেই। তবে তাতে যেমন অতিরিক্ততা নেই, তেমনি অস্বাভাবিকতাও নেই। কালকেতুর মধ্যে স্বভাব-ভীরু স্ত্রী-র অনুগত বাঙালীর পরিচয় পাওয়া যায়। কালকেতুর স্বর্গে নীলাম্বর রূপে প্রত্যাবর্ধনের পর শিব যে মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞান দান করেছেন তাতে তন্ত্রসাধনা-হটযোগের প্রকাশ।

শুন শুন কহি তত্ত্ব ওরে নীলাম্বর।
আপনা শরীর চিত্ত হইতে অমর।। সু
ষুন্না প্রধান নারী শরীর মধ্যে বৈসে।
ইঙ্গলা পিঙ্গলা তার বৈসে দুই পাশে।।
....
শিরে সহস্রদল পদ্ম কহি তার তত্ত্ব
অধোমুখে থাকি কমল বরিখে অমৃত।
....
মেরুদন্ডে ভর করি চরিবেক ধ্যান।
নবদ্বার বন্দ কৈলে জিনিবা শাসন।

চৈতন্য-পূর্ব বাংলায় তন্ত্রসাধনা-যোগ ক্রিয়াচারের প্রাবল্য লক্ষ্য করা যায়। তখনও অহৈতুকী ভক্তিপথ খানিকটা দূরে। মাধবের কাব্যে সেই তান্ত্রিকতারই প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয়। অবশ্য পালা শেষ করে এমন তত্ত্বকথার প্রকাশ প্রক্ষিপ্ত বলেই অনেকের সন্দেহ।

বণিকখন্ড বা ধনপতি সদাগরে আখ্যানের কাহিনীও সংক্ষিপ্ত। কাব্যকাহিনীর সূচনা শিব-পার্বতীর পাশা খেলা দিয়ে। খেলায় বিবাদ বাধলে মধ্যস্থতা করতে আসেন ইন্দ্রপুত্র মণিকর্ণ। শিবের ইশারায় সে দু-পক্ষের সমান হার-জিতের মীমাংসা করেন। এতে ক্রুদ্ধ দেবী তাকে মর্ত্যবাসের অভিশাপ দেন। সঙ্গে আসেন মণিকর্ণের স্ত্রী চন্দ্ররেখা ও অপ্সরা রূপবতী যথাক্রমে লহনা ও খুল্লনা রূপে। ধনপতির জন্ম -বড় হয়ে ওঠা- বিবাহ-পায়রার খোঁজে খুল্লরার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও রূপমুগ্ধ হওয়া- সিংহল যাত্রা- পথে কমলেকামিনীর রূপ দেখা-সিংহলরাজকে দেখাতে না পারা-কারাগার বন্দী হওয়া- শ্রীমন্ত জন্ম- পিতার সন্ধানে সিংহল যাত্রা- পথে কমলেকামিনীকে প্রত্যয় করা- রাজাকে দেখিয়ে সন্তুষ্টি প্রদান-সিংহল রাজকণ্যার সঙ্গে বিয়ে ও পিতা-স্ত্রী সহ ফিরে আসা-কাহিনী গতানুগতিক। কাহিনীর প্রথম দিকে বিরঞ্চুনের বন্দনা করা হয়েছে-'প্রথমে বন্দন গুরু ধর্ম বিরঞ্চুন'। সেখানেও তন্ত্রসাধনার কথা আছে। সরস পরিহাস আছে আখ্যানের মাঝে। সুশীলার বারমাস্যের সুখ-দু:খের কাহিনী পাঠককে ছুঁয়ে যায়। যেমন-

কাকেও না ছাড়ে বাসা কাল ভাদ্র মাসে
হেনকালে যাইতে চাহ দূর পরদেশে।
কিরূপে বঞ্চিমু মুক্তি অভাগিনী নারী
রান্দিয়া যোগাইমু অন্ন হেতা সঙ্গে করি।

লহনা-খুল্লনা চরিত্রদুটি খুব সাবলীল নয়। দীনেশচন্দ্র সেন মন্তব্য করেছেন-''মাধুর লহনা ও খুল্লনা ততদূর পরিষ্কার নহে- উহারা মুকুন্দের লহনা ও খুল্লনার রেখাপাত মাত্র।''

টিপ্পনী

দ্বিজমাধবের কবিত্ব শক্তি সাধারণ। কিন্তু প্রথমদিকের কাব্যরচয়িতা হিসাবে তাঁর মূল্য অস্বীকার করার নয়। তিনি ভাঁড়ুদত্তের মতো পূর্ণাঙ্গ চরিত্র নির্মাণ করে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু মুকুন্দ চক্রবর্তী বা ভারতচন্দ্রের মতো দৃষ্টিশক্তি বা চিত্তবৃত্তি সংযোগ মাধবের কাব্যে নেই। তবে বেশ কয়েকটি ধুয়া গান ও পদ আছে যা যথেষ্টই উচ্চমানের।

মুকুন্দ চক্রবর্তী

মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে যে নামগুলি উজ্জ্বল তাঁদের মধ্যে উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। শুধু চন্ডীমঙ্গল কাব্যধারার নয়, মঙ্গল কাব্যধারার শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম। কাহিনী, চরিত্রচিত্রণ, বাস্তবতাবোধ, মানবরসসৃজন, ভাষা-ছন্দ-অলংকার প্রয়োগ, শব্দ-বৈদগ্ধ্য-এসব দিক থেকে কবিকঙ্কণকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে না বসিয়ে উপায় নেই।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাব্যের নাম 'অভয়ামঙ্গল'। চন্ডীকে অম্বিকা বা অভয়া বলেই বেশী স্মরণ করেছেন কবি। যেমন-

''অম্বিকামঙ্গল গান শ্রী কবিকঙ্গণ''।।
''অম্বিকামঙ্গল কবিকঙ্গণে গান''।।
''শ্রীকবিকঙ্কণ গান অম্বিকার দাস''।
''অভয়ার চরণে মজুত নিজচিত।
শ্রী কবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত।।''
''অভয়া লইয়া কিছু শুনহ সংগীত।।''
''অভয়ামঙ্গল শ্রী কবিকঙ্কণে গান।।''

তবে এছাড়াও চন্ডী নামটিও পাওয়া যায়-

''চন্ডীপদে করি ধ্যান শ্রীকবিকঙ্কণে গান''
''চন্ডীর চরিত মধুর সংগীত
শ্রী কবিকঙ্কণ ভজে।।''

ভবানী ইত্যাদি নামগুলিও পাওয়া গেছে-

''শ্রীকবিকঙ্কণ গান ভাবিয়া ভবানী।''

বাংলা সাহিত্যের কবিদের মধ্যে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীই প্রথম বিস্তৃত আত্মপরিচয় প্রদান করেছেন। এই অংশে যে বাস্তববোধ, যে মানবরসের সন্ধান পাওয়া যায় মধ্যযুগের কাব্যে তা

বিরল। এই বর্ণনা কেবলমাত্র বস্তুগত নয়, কবি স্বয়ং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভবকে তাঁর আখ্যানে দ্রবীভূত করেছেন। দ্বিজমাধব যেখানে বিবৃতি দিয়েছেন মাত্র, সেখানে মুকুন্দের শিল্পী হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

বর্ধমান জেলার রত্না নদীর ধারে দামুন্যা গ্রামে (দামিন্যা) কবির কয়েক পুরুষের বসবাস। শিব চক্রাদিত্য নাম ধারণ করে গ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। শিবসেবায় গ্রামবাসীরা সবাই নিয়োজিত ছিলেন। দামুন্যা যেন কলিকালের কৈলাস। পূর্বপুরুষের মতো কবিও এই চক্রাদিত্যের সেবক ছিলেন–

টিপ্পনী

গঙ্গাসম সুনির্মল তোমার চরণজল
পান কৈলা শিশুকাল হৈতে।
সেই সে পুণ্যের ফলে কবি হই শিশুকালে
রচিলাম তোমার সঙ্গীতে।।

তপন ওঝার পুত্র উমাপতি, উমাপতির পুত্র শ্রুতকর্মা সুকৃতি মাধবশর্মা, মাধবশর্মার নয়পুত্রের অন্যতম জগন্নাথ মহামিশ্র ছিলেন কবির পিতামহ। মুকুন্দ-র পিতার নাম গুণরাজ বা গুণিরাজ এবং ভ্রাতা কবিচন্দ্র। দামুন্যায় পুরুষানুক্রমে কবিরা চাষাবাদ করতেন। কবির সমকালে তালুকদার ছিলেন গোপীনাথ নন্দী। এমন সময় একটা রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা দেখা দিল। ডিহিদার হয়ে বসলেন মামুদ সরিফ। তার শাসনে নানান রকম দুষ্কার্য চলতে লাগল এবং প্রজারা দুরবস্থার মধ্যে পড়ল। মুকুন্দরাম এর চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন–

'ধন্যরাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদাম্বুজভৃঙ্গ

সেই মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে
ডিহিদার মামুদ সরিপ।
....
....
উজীর হৈল রায়জাদা বেপারিয়ে দেয় খেদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে হৈল অরি।
মাপে কোণে দিয়াদড়া বানর কাঠায় কুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি।
সরকার হৈল কাল খিল ভূমি লিখে লাল
বিনা উপকারে খায় ধুতি
পোতদার হৈল যম তঙ্কায় আড়াই আনা কম
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি।'

আধুনিককালের কোনো কোনো গবেষক মনে করেন যে, আকবরের আমলে টোডরমলের কৃষিনীতির প্রয়োগ করা হয়েছিল বাংলায়। সেইজন্য নানান কৌণিক জমিগুলিকে বর্গক্ষেত্রের মাপে নিয়ে আসা হচ্ছিল। তার জন্যই কোণাকুণি দড়ি দিয়ে মাপামাপির ব্যবস্থা হয়। ফলে দেশের অর্থনীতিতে চাপ বাড়ল। রোজ দিলেও মজুর না মেলায় বাড়ল অনাবাদ। 'ধান্য গোরু কেহ নাহি কিনে।' খাজনার পরিমাণও বাড়ল। প্রজারা গ্রাম ছেড়ে পালাতে লাগল এবং তা আটকাতে গ্রামে গ্রামে চৌকিদার পাহারা বসে গেল। এমন সময়ে এক টাকার জিনিসও মাত্র দশ

আনার বেশী দামে বিক্রি হয় না। এমন সময়–

‘প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে হৈল বন্দি
কোন হেতু নহে পরিত্রাণে।।’

কবি পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে পরামর্শ করে গ্রাম ছাড়লেন চোখের জলে। স্ত্রী, শিশুপুত্র, ভাই রমানাথ বা রামানন্দ এবং অনুচর দামোদর নন্দীকে নিয়ে দিকে দিকে রওনা হলেন। পথিমধ্যে ডাকাত রূপ রায়ের কবলে পড়ে সব কিছু হারালেন। তারপর দারকেশ্বর, মুড়াই, নারায়ণ, পরাশর প্রভৃতি নদী পার হয়ে কবি গোচরিয়া বা গুচুরে গ্রামে এক পুকুর পাড়ে আশ্রয় নিলেন। ‘তৈল বিনা কৈনু স্নান’। শালুক ডাঁটা খেলেন। খিদের চোটে ‘শিশু কান্দে .... তরে’। পুকুরপাড়ে বিশ্রাম নেবার সময় দেবী কবির মায়ের বেশ ধারণ করে স্বপ্নে দেখা দিলেন–

‘মা কৈলে পরম দয়া দিল চরণের ছায়া
আজ্ঞা দিলা রচিতে কবিত্ব’

স্বপ্নে পাওয়া মন্ত্রাদেশ নিয়ে মুকুন্দ শিলাবতী নদী অতিক্রম করে অধুনা মেদিনীপুরের (তখন উড়িষ্যার অন্তর্গত) বাহ্মণভূমির রাজা বীর বাঁকুড়া রায়ের সভা আড়রা গ্রামে এসে উপনীত হল। মুখে মুখে শ্লোক রচনা করে রাজাকে আশীর্বাদ করলেন। রাজা কবির পান্ডিত্য ও বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পেয়ে তাঁকে আশ্রয় দান করলেন এবং নিজ পুত্র রঘুনাথের শিক্ষক নিযুক্ত করলেন। কালক্রমে বাঁকুড়া রায়ের মৃত্যু হয় এবং রঘুনাথ রাজা হয়ে বসেন। মুকুন্দরামের অবস্থাও ফেরে। কিন্তু তিনি চন্ডীমঙ্গল রচনার কথা ভুলে যান কিংবা আলস্যবসত হয়ে ওঠে না। কিন্তু সঙ্গী দামোদর নন্দী স্বপ্নের কথা জানতেন ও সর্বদা তাড়া লাগাতেন। অবশেষে এক পুত্র মারা যাবার পর কবি দীর্ঘদিন ধরে ‘অভয়ামঙ্গল’ কাব্যটি রচনা করেন। কাব্যটি প্রথম গীত হয়েছিল কামেশ্বর মন্দিরে। প্রধান গায়েন ছিলেন প্রাসাদ দেব।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর প্রথম মুদ্রিত কাব্যে কালজ্ঞাপক শ্লোকটি হচ্ছে–

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কতদিনে দিলা গীত হরের বণিতা।।

‘রস’কে যদি কটু, তিক্ত, কষায়, লবণ, অম্ল ও মধুর ধরা হয় তা হলে তা হবে ছয়। অর্থাৎ ১৪৬৬ শকাব্দ বা ১৫৪৪ খি:। আর ‘রস’কে যদি শৃঙ্গার, হাস্য ইত্যাদি ধরা হয় তা হলে তা হবে নয়। অর্থাৎ ১৪৯৯ শকাব্দ বা ১৫৭৭ খি:। রঘুনাথ ১৫৭৩-১৬০৪ খী: পর্যন্ত রাজা ছিলেন। সুতরাং ১৫৭৭ নয়, খুব সম্ভবত ১৫৪৪ খি:-তে কবি স্বপ্নাদেশ পান। ইতিহাস বলছে পাঠান রাজত্বের শেষদিকে ১৫৩৭ খি: থেকে ১৫৬৪ খি: পর্যন্ত বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে অস্থির ছিল। অন্যদিকে কাব্যে মুকুন্দ মানসিংহের কথা উল্লেখ করেছেন। মানসিংহ বাংলার সুবেদার ছিলেন ১৫৯৪ খি: থেকে ১৬০৫ খি: পর্যন্ত। তাহলে কবি ঘর ছাড়েন কি ১৫৯৪ খি:-তে? চট্টগ্রামের পুঁথিতে আছে– ‘ চাপ্য ইন্দু বাণ সিন্ধু শক বিয়োজিত’। ‘সিন্ধু’কে ‘ইন্দু’ ধরে ১৫১৫ শকাব্দ বা ১০৯৩-৯৪ খি: পাওয়া যায়। কিন্তু এতেও মতান্তর তৈরী হয়। কেননা কবি যদি এই সময়ে গৃহত্যাগ করেন তাহলে কীভাবে বাঁকুড়া রায়ের সঙ্গে দেখা করলেন? কীভাবে রঘুনাথের শিক্ষক হলেন? তাই ১৫৪৪ খি:-তে কবি গৃহত্যাগ করেন এবং ১৫৯১-৯২ খি: নাগাদ কাব্যরচনা করেন-এই সময়কালটাই সবচেয়ে সঠিক বলে মনে হয়।

টিপ্পনী

কাব্য-পরিচয়

মুকুন্দরাম মাণিক দত্তের উল্লেখ করেছেন দ্বিজ মাধবের করেননি। এর থেকে বোঝা যায় কবি মাণিক দত্তের কাব্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। সুতরাং 'নৌতনমঙ্গল' বা নতুনমঙ্গল পাঁচালী-বলে উল্লেখ করলেও মুকুন্দের আগেই চন্ডীমঙ্গল রচনা শুরু হয়েছিল। মুকুন্দের কাহিনীর প্রথমে বন্দনা ও সৃষ্টি কাহিনী, উপক্রমণিকা। এরপর দেবখন্ড-দক্ষ-সতী-শিব-পার্বতীর কাহিনী। এবার মর্ত্যকাহিনী বা আখেটিক খন্ড-এর সূচনা- পূজাপ্রচারের জন্য ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর এবং তার স্ত্রী ছায়ার ধর্মকেতুপুত্র কালকেতু এবং সঞ্জয়পুত্র ফুল্লরা হয়ে জন্মগ্রহণ। তারপরের কাহিনী একইরকম। ব্যাধের দ্বারা পূজিতা হবার পর চন্ডী ইন্দ্রের নর্তকী রত্নমালাকে ইছানী নগরের বণিক লক্ষপতি ও তার স্ত্রী রম্ভাবতীর কণ্যা খুল্লনা করে পাঠালেন। তারপর ধনপতি সদাগর বা বণিকখন্ড-এর কাহিনী। কালকেতু-ফুল্লরা উপাখ্যানে কবি যে সংহতি ও শিল্প সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ দেখিয়েছেন বণিকখন্ডে তা কোথাও কোথাও শিথিল হয়ে পড়েছে। বিশেষত ধনপতি ও শ্রীমন্তের সিংহলযাত্রার বর্ণনায় সেই ঋজুতার অভাব দেখা যায়।

মুকুন্দরামের কাব্যের সবচেয়ে বড় গুণ সমাজ বাস্তবতা। তাঁর সানুপুঙ্খ ও সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি সমকালকে ও সমসমাজকে দেখতে সাহায্য করেছে। তার কাহিনী বিস্তার ও বর্ণনায় ইতিহাসবোধ লুকিয়ে আছে। আত্মপরিচয় ও গ্রন্থোৎপত্তির কারণ অংশে যেমন আছে, তেমনই আছে কালকেতু-ফুল্লরার জীবন-যাপনে। গুজরাট নগর পত্তন উপলক্ষে বিভিন্ন জাতির আগমন ও বসবাসের রীতি সম্পর্কে একটা চমৎকার ধারাবিবরণী দিয়েছেন। যেমন-মুসলমানদের সম্পর্কে বলেছেন-

'বড়ই দানিসবন্দ   না জানে কপট ছন্দ
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।।'

বৈষ্ণব আগমন সম্বন্ধে কবির মন্তব্য-

সদালয়ে হরিনাম   বাস্তুভূমি পায় দাস
বৈষ্ণব বসিলা গুজরাটে।
কাঁথা কমন্ডুল লাঠি   গলাতে তুলসী কাঠি
সদাই গোঙায় গীত-নাটে।।

ফুল্লরা তাঁর বারোমাস্যার মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনের দু:খ-কষ্টকে তুলে ধরেছেন-

'দু:খ কর অবধান দু:খ কর অবধান।
জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ।।'

এরজন্যই বোধহয় গবেষকরা বলেছেন যে, মুকুন্দের মধ্যে ঔপন্যাসিকের গুণ ছিল। আর রমেশচন্দ্র দত্ত বলেছেন-"The thought and feelings and sayings of his men and women are perfectly natural, recorded with fidelity which has no paralled in the whole range of Bengali Literature."[The Literature of Bengal]

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন-"আধুনিক বাংলার বস্তুতান্ত্রিক উপন্যাসিকদেরও অগ্রদূত।"

টিপ্পনী

টিপ্পনী

প্রকৃত উপন্যাসিকের মতোই কবি পরিহাস-রসিকতাও করেছেন। দেবী চন্ডিকা কালকেতুকে সাতঘড়া ধন দিয়েছেন। কালকেতু কোলে-কাঁধে-মাথায় নিয়েও একঘড়া কম পড়ে যাওয়ায় স্বয়ং দেবীকে দিয়ে মোহর ভর্তি ঘড়া বইয়েছেন। শুধু তাই নয়-

'পশ্চাতে চন্ডিকা যান আগে কালু যায়।
দিরি দিরি কালকেতু পাছু পানে চায়।।
মনে মনে কালকেতু করেন যুকতি।
ধন-ঘড়া নিয়ে পাছে পালায় পার্ব্বতী।।'

এ দৃশ্য স্বভাবতই হাসির উদ্রেক ঘটায়।

আবার যখন বণিকখন্ডে ধনপতিকে শ্রীপতি বা শ্রীমন্ত সিংহল রাজার কারন্দকার থেকে মুক্ত করে তখন পিতা-পুত্রের মিলনে মুকুন্দ ট্র্যাজিক দৃশ্য এঁকেছেন-

'নিশ্চিন্তে করহ রাজ্য দীর্ঘ পরমাই। ি
পতামাতা সহ সুখে থাকুক সাত ভাই।।.........
দেহ একখানি ধুতি পথের সম্বল। ম
হাদেব-পূজা করি চিত্তিব মঙ্গল।।'

উভয়ের উভয়কে চিনতে না পারার এবং পুত্রের কাছে পিতার, বিশেষত এতবড় সদাগর ধনপতির দীনভাবে এই ভিক্ষা চাওয়া -এ ট্র্যাজেডির সৃষ্টি করেছে।

চরিত্রচিত্রণে মুকুন্দ অত্যন্ত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি কেবলমাত্র কিছু নির্দেশিকা পালনের জন্য তৈরী হয়নি, বরং সেগুলি রক্তমাংসের জীবন্ত হয়ে উঠেছে। হাসি-কান্নায়, সারল্যে-শঠতায়, ক্রূরতা-বোকমিতে চরিত্রগুলি ভাস্বর। কালকেতু ব্যাধসুলভ অমার্জিত। দেবতার আশীর্বাদধন্য হলেও তাঁর সভ্যতা-ভব্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে-''সায়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিটকাল।'' এমনকি সে দেবীকে দিয়ে ধনভর্তি ঘড়া বইয়েছে ও পাছে নিয়ে পালান তাই সন্দেহ প্রকাশ্য করেছে। এতো স্বাভাবিক মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতা। আর সেখানেই চরিত্রটি জীবন্ত, বরং রাজা কালকেতু ম্রিয়মান। ধনপতি সদাগর অবশ্য চাঁদ সদাগরের মতো প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠতে পারেনি। বরং দুই স্ত্রী নিয়ে তার ঘরকন্নার চিত্রটি স্নিগ্ধ মধুর। তিন্তু কোথাও কোথাও ট্র্যাজিক নায়কের রূপটি পরিস্ফুটিত হয়েছে। নারী চরিত্র চিত্রণে মুকুন্দরাম বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ফুল্লরা, লহনা ও খুল্লনা- সমসময়ের জীবন থেকে উঠে আসা। এ জীবন সাধারণ মানুষের জীবন। ফুল্লরা চন্ডীকে সতীন ভেবে তাকে নিরস্ত্র করতে চেয়েছে। কখনও বারমাসের দু:খকষ্টের বর্ণনা করে ভয় দেখাতে চেয়েছে কিন্তু ঘর ছাড়তে চায়নি-

'সতীনে কোন্দল করে দ্বিগুণ বলিবে তারে
অভিমানে ঘর ছাড় কেনি।'

কালকেতুকে দোষ দিয়েছে, আবার দেবী একটা বহুমূল্যবান আংটি দিতে চাইলে ফুল্লরা আরও সম্পদ নিশ্চিত করতে বলেছে-

'এক অঙ্গুরীতে প্রভু হবে কোন কাম?
মারিতে নারিব প্রভু ধরের দুর্নাম।।'

তবে ব্যাধ পত্নী ফুল্লরার পাশে রাজ পত্নী ফুল্লরা নিষ্প্রভ।

খুল্লনা শান্ত স্বভাবের। লহনা তাকে সতীন হওয়ায় কষ্ট দিয়েছে। কিন্তু পরবর্তী মিলনের পর খুল্লনা লহনাকে এই বিষয় নিয়ে কথা শোনাতেও ছাড়েনি। এই স্বাভাবিকত্বই মুকুন্দের কাব্যের বড়গুণ। লহনা সতীনের আগমনে ভীত-লজ্জিত-দু:খিত-শঙ্কিত। তার উপর সতীন খুল্লনা তার খুড়তুতো বোন। তাই সে বলেছে-

''পূর্বে জানিতেম আমি   অধীন আমার স্বামী
.... পোহাই রজনী।
না জানি দৈবের মাইয়া   আসি কোন পথ দিয়া
নারিকেলে সাজাইল পানি।।''

লহনা মুখরা হয়েছে, খুল্লনাকে কষ্ট দিয়েছে-এ সবই তার স্বামীকে আনার জন্য। তবুও খুল্লনাই স্বামী-সোহাগিনী হয়েছে। বন্ধ্যাজীবন নিয়ে লহনা আমাদের সহানুভূতি আদায় করে। মুরারশীল ও তার পত্নীর চরিত্রটি কবির অবিস্মরণীয় সৃজন। কালকেতু আংটি বিক্রি করতে গেলে মুরারী ভাবে কালকেতু বুঝি মাংসের টাকা নিতে এসেছে, তাই পালিয়ে ভিতরে চলে যায়........ সেই ধূর্ততা বজায় রেখেই কালকেতুকে বলে যে, তোমার খুড়া তো এখন ঘরে নেই। পরদিন ধার শোধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কালকেতুকে আরও কাঠ ও মাংস আনার কথা বলেছে। আংটির কথা শুনে সে আংটি দেখতে চেয়েছে। মুরারী ঘর থেকে সব শুনে দ্রুত আসরে নেমেছে এবং আংটির মূল্যমান জেনেও অশিক্ষিত ব্যাধকে ঠকাবার জন্য বলেছে-

''সোনা রূপা নহে বাপ এ বেঙ্গা পিতল।
ঘসিয়া মাজিয়া বাপু কর্য়াচ্ছ উজ্জ্বল।।''

কালকেতু দেবী প্রদত্ত আংটি বহুমূল্যবান জানায় আংটি দিয়ে নিয়ে যাবার কথা বলায় নান ছলা-কলা করেছে। শেষ পর্যন্ত চন্ডীর আদেশে সাত কোটি টাকা দিতে বাধ্য হয়েছে এবং শেষে বলেছে-''এতক্ষণ পরিহাস করিনু তোমারে।'-এই অর্থে নিষ্ঠুর, কপট, ঠগ-বণিক চরিত্রটি বর্তমান সমাজেও বিরল নয়। দুর্বলা দাসী টাইপের চরিত্র। রামায়ণের মন্থরার মতো। ধনপতির প্রবাসকালে দুই সতীনের মধ্যে মনোমালিন্য ছিল না, বরং একত্রেই থাকত। এতে দুর্বলা সন্তুষ্ট হয়নি।

''যেই ঘরে দু-সতীনে না করে কোন্দল।
সে ঘরে যে বসে চেড়ি সে বড় পাগল।।
অনুক্ষণ দু-সতীনে করয়ে কোন্দল।
তবে দাসদাসী পায় পরম মঙ্গল।।''

তারই কুমন্ত্রণায় সতীন-কোন্দল হয়েছে। লহনার ধনপতির গৃহে আগমন থেকে দুর্বলা তার পরিচারিকা। সুতরাং লহনার প্রতি দুর্বলতা দুর্বলার থাকারই কথা। ভাড়ু দত্ত বস্তুনিষ্ঠ ও নির্মলতার চরম পরিচয়। গুজরাট নগরে অনেকের মতো সেও এসেছে-

''ভেট লয়্যা কাঁচকলা   পশ্চাতে ভাঁড়ুর শালা
আগে ভাঁড়ুদত্তের ....
ভালে ফোঁটা মহাদম্ভ   ছেঁড়া ধুতি কোঁচা লম্ব
শ্রবণে কলম খরশান।।''

টিপ্পনী

তারপর বাকচাতুরীতে মুগ্ধ করেছে কালকেতুকে। যেন সে এসে কালকেতুকে ধন্য করেছে। অন্যায়ভাবে তোলা আদায় করেছে। তার পুত্রও তার পথ অনুসরণ করেছে। শেষে অভিযোগে অতিষ্ঠ কালকেতু তাকে ভৎর্সনা করলে ভাঁড়ু গুজরাট ছেড়ে কলিঙ্গে গিয়ে রাজাকে ভেট ও বাক্যবাণে ভুলিয়েছে এবং কালকেতুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে উত্তেজিত করেছে। যুদ্ধে কালকেতুর পরাজয় হলেও শেষ অবধি দেবী চন্ডীর প্রসাদে মুক্তি ও হৃত রাজগৌরব ফিরে পেয়েছে। তখন ভাঁড়ু আবার ফিরে এসেছে এবং নির্লজ্জের মতো বলেছে–

টিপ্পনী

"তুমি খুড়া হৈলে বন্দী   অনুক্ষণ আমি কান্দি
বহু তোমার নাহি খায় ভাত।
দেখিয়া তোমার মুখ   দূরে গেল সর্ব্ব দু:খ
দশদিক হৈল অবদাত।।"

এখানে ভাঁড়ুর প্রতারণার দিকটি কালকেতুর কাছেও স্পষ্ট হয়। যদি মুকুন্দরাম তার জন্য সাংঘাতিক শাস্তি বিধান করেননি। এখানেই কবির সহানুভূতিশীল দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

দ্বিজরামদেব

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আশুতোষ দাস দ্বিজ রামদেবের পুথি আবিষ্কার ও সম্পাদনা করেন। পুথিটি ত্রিপুরা থেকে আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু যে পরিবার থেকে এই পুথিটি আবিষ্কৃত হয়েছে তারা পূর্বে ছিলেন চট্টগ্রামনিবাসী। অর্থাৎ রামদেবের সঙ্গে চট্টগ্রামের যোগ ছিল। কেউ কেউ তাকে চট্টগ্রামনিবাসী বলেই মনে করেন। একটি পুথিতে কালজ্ঞাপক শ্লোক পাওয়া গেছে–

ইন্দুবাণ ঋষিবাণ বেদ সনহিত।
রচিলেক রামদেবে সারদাচরিত।।

১৫৭১ শকাব্দ বা ১৫৭৫ শকাব্দের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ ১৬৪৯ বা ১৬৫৩ খি: বাক্যটি লেখা হয়।

কবির কাব্যের নাম 'অভয়ামঙ্গল'। অনেক স্থানে সারদাচরিত বা সারদামঙ্গল বলেছেন।

রামদেবের কাব্যে দ্বিজ মাধবের প্রভাব রয়েছে। যেমন–দ্বিজ মাধব লিখেছেন–

সারদাচরণ সরোজ মধু লোভে।
দ্বিজ মাধব তথি অলি হইয়া শোভে।।

দ্বিজরামদেব লিখেছেন–

দেবী সরোজ সৌরভ অতিশয়।
দ্বিজ রামদেব তথি অলি হইয়া রয়।।

দ্বিজ রামদেব অনেক স্থানেই দ্বিজ মাধবের ভাষা পর্যন্ত অনুসরণ করেছেন অন্ধভাবে। এমনকি পালাবিভাজনেও দ্বিজ মাধবের পথেই হেঁটেছেন দ্বিজরামদেব। ফলে কবির মৌলিকত্বের দাবি ক্ষুন্ন হয়। তবে বেশ কিছু পার্থক্যও আছে। চরিত্রচিত্রণে, রচনাকৌশলে কবি নতুনভাবে

আলোকপাত করেছেন। তাঁর মধ্যে মনস্তত্ত্বের প্রয়োগ ও সাংসারিক ও পারিবারিক পটভূমি প্রেক্ষিতে মৌলিকতা আছে। দ্বিজ মাধবের বতকথা ধর্মিতা থেকে কাব্যরূপ দিয়েছেন দ্বিজরামদেব। কিন্তু দুজনেই চট্টগ্রামের হওয়ায় হয়ত পূর্বসুরীর প্রভাব পড়েছে। দ্বিজমাধব ও দ্বিজরামদেবের মাঝখানে এসে গেছেন শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। মুকুন্দের পরবর্তী চণ্ডীমঙ্গলের অগ্রগণ্য কবি দ্বিজরামদেব যিনি মাধবাচার্যের থেকে অনেক এগিয়ে আছেন। দ্বিজ রামদেবের অভয়ামঙ্গলের মানব ও দেবতা চরিত্রগুলি সমকালীন বাস্তবজগত থেকে উঠে এসেছে। ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান অন্যদের তুলনায় অনেক সংহত, সুগ্রথিত, অকারণ পুররাবৃত্তি বা শৈথিল্য মুক্ত। কাব্যটি মূলত বিবৃতিধর্মী। করুণরসের কারবারে কবি পাঠকদের সহানুভূতি আদায় করতে চেয়েছেন। যেমন পুত্র শ্রীমন্তের বাণিজ্যযাত্রায় পাঠিয়ে মাতা খুল্লনার আর্তনাদ। দ্বিজরামদেবের কাব্যের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল যে, অভয়ামঙ্গলে বিষ্ণুপদ রচনা। এই পদগুলি পূর্ণাঙ্গ বৈষ্ণবপদ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। যেমন- কৃষ্ণের বাঁশির ধ্বনি শুনে শ্রী রাধিকার অন্তর্দাহ-

কি আর কুললাজে সই কি আর কুললাজে।
শ্রবণ নয়নে সব জীবন যৌবন ধন
সকলি হরিল বজরাজে।।

ধনপতি-খুল্লনার মিলনে রাধাকৃষ্ণের মিলনের ধুয়া রচনা করেছেন।

টিপ্পনী

অন্যান্য কবি

দ্বিজ হরিরাম চণ্ডীমঙ্গল কাব্যটি লিখেছিলেন তার নাম 'অদ্রিজা-মঙ্গল'। মেদিনীপুর জেলার ঘাটালের চিতুয়া-বড়দহের জমিদার শোভা সিংহের সভাকবি ছিলেন দ্বিজ হরিরাম।

অদ্রিজামঙ্গল নাম বিরচিল হরিরাম
শোভাসিংহের রক্ষিবে অম্বিকা।

শোভা সিংহ খুব সম্ভবত ১৬৯৬ খি:-তে নিহত হন। অর্থাৎ কাব্যটি সপ্তদশ সতকে লেখা।

দ্বিজ জনার্দন চণ্ডীমঙ্গলের যে ক্ষুদ্র পুথিটি লিখেছিলেন সেটি মেয়েলি বতকথা-'মঙ্গলচণ্ডীর গীত'। খুব সম্ভবত সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক। কিন্তু তাঁর কাব্যের ভাষা সপ্তদশ শতাব্দীর নয় বলে অনেকের ধারণা-

ব্যাধেরে দেখিয়া দেবী উপায় চিন্তিল।
দুর্গতিনাশিনী দেবী সদয় হইল।।

৩. 'ধর্মমঙ্গল'

নিম্নবর্গের যে দেবতা মনসা চন্ডীর মত সংসুতায়িত হয়ে সমগ্র বাংলার আপমর জনসমাজে পূজিত না হলেও, ডোমসমাজের গন্ডী ভেদ করে বৃহত্তর ধর্ম দেবতা। ধর্ম মঙ্গলের কবি ও কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরালভাবে সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান (Cultural Authropology) চর্চার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে ধর্মপূজা-ধর্মমঙ্গলের ইতিবৃত্ত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে এসে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রথম এই বিষয়ে গবেষণার সূত্রপাত করেন। ধর্মঠাকুর ও ধর্মপূজার

উদ্ভব ও বিবর্তনের সূত্র ধরে যে প্রশ্নটি সবার আগে উঠে আসে তা হল, কে এই ধর্মঠাকুর?

ধর্মঠাকুরের স্বরূপ

সাধারণভাবে শালগ্রাম শিলার মতই একখন্ড কুর্মাকৃত বা ডিম্বাকৃতি পাথরের রূপেই পূজিত হন ধর্মঠাকুর। নির্জন গাছতলায় স্থাপিত হয় ধর্মের যান (স্থান), কখনও বা তার চার ধারে গড়ে ওঠে চালা ঘরের অথবা ইটের দেওয়ালে গাথা মন্দির। দেবতাকে লাল কাপড়ে আবৃত করে রাখা হয় কখনও বা পেরেক আটকে চক্ষু স্থাপন করা হয়। দৃষ্টি শক্তি ফিরৎ পাওয়া অথবা - কুষ্ঠরোগের আরোগ্য কামনায় ভক্তরা এসে মানৎ করে, ইষ্টলাভ করলে দেবতা অথবা দেবতার স্থানটিকে পরিপাটি করে সাজিয়ে তোলে। তবে তা কোনভাবেই দেউল নির্মানের মত বিলাসিতায় পর্যবসিত হয় না, কারণ পূজারী যেমন ডোম সম্প্রদায় ভক্তরাও তেমনি নিম্নবর্গের মানুষ। ডোম পূজারীরা পন্ডিত বা দেবংশী নামে পরিচিত হন। হাঁস, মুরগী, পায়রা, পাঁঠা, শূকর প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়। কোথাও নিত্যপূজা হয়, কোথাও হয় বাৎসরিক পূজা। বাৎসরিক উৎসব চৈত্র সংক্রান্তি থেকে শুরু হয়ে বারো দিন ধরে চলে, কোথাও বা শ্রাবণ মাস পর্যন্ত চলে এই উৎসব; ধর্মের সঙ্গে কামিন্যার বিবাহ এই উৎসবের এক বিশেষ অঙ্গ। গাজনের আচার অনুষ্ঠান, শূন্যপূরাণ বা রামাই পন্ডিতের কড়চা পাঠ ও ধর্মমঙ্গলের কাহিনী পাঠ এই পূজারই অঙ্গ। কারও মানসিক বা মনস্কামনা পূর্ণ হলে যে পূজা করা হয় তাকে বলে ঘর-ভরা। বারোদিন ধরে এই উৎসব হয় বলে একে বার্মাতিও বলে। বারো দিন বারোটি ধর্ম শিলামূর্তি প্রতিষ্ঠা করে, বরোটি ঘট স্থাপন ও বারো প্রকার উপকরণের মাধ্যমে এই পূজা করা হয়। ভোগরাগ নিবেদনে বাহ্মণ পুরোহিত অংশ গ্রহণ করে সংস্কৃত মন্ত্র পড়লেও ডোম পুরোহিতের বাংলা মন্ত্র পাঠেই অনুষ্ঠান শেষ হয়। গাজন, শূন্যপুরাণ-ধর্মমঙ্গল পাঠ ও এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ। বাহ্মণ্য আগ্রাসনে ধর্মের গাজনকে শিবের গাজন এবং ধর্মঠাকুরকে নারায়ণের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হলেও নিম্নবর্গের প্রাধান্য এখনও বজায় রয়েছে।

১৩০৪ বঙ্গাব্দের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা এবং ১৮৯৪ সালের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি (Royal Asiatic Society)-র মুখপত্রের ডিসেম্বর সংখ্যায় বাংলা দেশে বৌদ্ধ ধর্মের শেষ পরিণতি হল ধর্মঠাকুর এই মত পোষণ করেন। তাঁর মতে শূন্যমূর্তি বুদ্ধদেবই হস্তপদবিহীন কূর্মমূর্তিস্বরূপ ধর্মশিলায় রূপান্তরিত হয়েছে। ধর্মঠাকুরের এই বৌদ্ধ স্বরূপ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছাড়া আর যে সকল পন্ডিতগণ মেনে নিয়েছিলেন তাঁরা হলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ বসু, যোগেশচন্দ্র রায়, দীনেশচন্দ্র সেন, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। বৌদ্ধ ধর্মের ত্রিরত্ন বুদ্ধাং শরনং গচ্ছামি, ধর্মং শরনংগচ্ছামি ও সঙ্ঘংশরনংগচ্ছামি - তে বুদ্ধ-উপাসনা, ধর্ম-গ্রন্থাবলী এবং সঙ্ঘ-ভিক্ষুমন্ডলীকে সূচিত করে; ফলত কোন প্রত্যক্ষ বৌদ্ধপ্রভাবে ধর্মদেবতাকে বেঁধে রাখা যায় না।

'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস'-এ ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য ধর্মঠাকুরকে সূর্যদেবতা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। "-ধর্মঠাকুর সম্বন্ধে রাঢ় দেশে যে সকল লৌকিক আখ্যান প্রচলিত আছে। তাহা হইতেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধর্ম সূর্য ব্যতীত আর কিছুই নহেন।" তাঁর মতে "পূর্বভারতীয় প্রাগৈতিহাসিক সূর্যোপাসনা", "রাঢ় অঞ্চলে একমাত্র ধর্মপূজার" -মাধ্যমে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করেছে। রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্যের সম্পাদক হিসেবে এই গ্রন্থের ভূমিকায়

টিপ্পনী

ড. সুকুমার সেন বৈদিক সূর্যদেবতা ও ঈরানীয় (প্রাচীন পারশ্য, শাকদ্বীপ নামে পরিচিত) সূর্যদেবতার সঙ্গে তুলনা করেছেন, বিহারের ছট পরব কেও তিনি ধর্মপুজোর চিহ্নাবশেষ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ধর্মঠাকুর কুষ্ঠরোগ নিবারণ করেন বলে ভক্তদের বিশ্বাস, ভারতীয় পুরাণ সূর্যদেবতারও এই শক্তি স্বীকিত রয়েছে। ধর্মশিলায় অনুলিপ্ত রক্ত চন্দনকে সূর্যকিরণের প্রতীক বলে উল্লেখ করেছেন গবেষক ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য। মহিলা সমাজের সূর্যব্রত – পশ্চিমবঙ্গের স্ত্রী সমাজে প্রচলিত ইতুপুজো এবং পূর্ববঙ্গের করমপুজোর নানা উপাদান উল্লেখ করে ড. ভট্টাচার্য সূর্যের ব্রতকথা পাঁচালীর সঙ্গে ধর্মঠাকুরের যোগাযোগ উল্লেখ করেন। পশ্চিম বাংলায় আরও একটি "লৌকিক সূর্যদেবতা আছেন, তাঁহার নাম ইতু।.... প্রকৃতপক্ষে ইহা আদিত্য শব্দ হইতে হাত" – আদিত্য > আইত্ত > ইত্ত > ইত > ইতু –এভাবেই শব্দের বিবর্তন ঘটেছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে আরও বলেছেন "পূর্ববঙ্গে সূর্যোপাসনার আরও কয়েকটি লৌকিক রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাও সাধারণত মেয়েদের মধ্যেই প্রচলিত। প্রথমটির নাম সূর্যের ব্রত। ইহা ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম অঞ্চলেই প্রধানত প্রচলিত আছে।... এতদ্ব্যতীত তপাব্রত ও মাঘমন্দল ব্রত নামক দুইটি কুমারীব্রত সূর্যেরই ব্রত, কুমারী মেয়েরা এই ব্রত পালন করিয়া থাকে।" – গবেষক ড. ভট্টাচার্য মহাশয় আরও জানিয়েছেন যে "ছোটনাগপুরের ওরাওঁ জাতি তাহার পরম দেবতাকে 'ধর্মেশ' নামে অভিহিত করিয়া থাকে ... এই প্রকার মুন্ডা, হো, ধারহোর, খন্দ, খরিয়া, ভুইঞা, বোন্ডা, জুয়াঙ, শবর (শেওরা), সাঁওতাল, কোরোয়া, পার্বত্য খরিয়া, মালে বা সৌরিয়া পাহাড়িয়া প্রভৃতি বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যভারতের পার্বত্যাঞ্চলের অধিবাসী অস্ট্রিক বা দ্রাবিড় ভাষাভাষী প্রত্যেক আদিম জাতির মধ্যেই ধর্ম কিংবা সম উচ্চার্য কোন শব্দের নামীয় এক সূর্য দেবতার অস্তিত্ব আছে।.... বাংলার পূর্বসীমান্ত সংলগ্ন আসাম প্রদেশের অধিবাসী কোন কোন ইন্দোমঙ্গোলয়েড জাতির শাখার মধ্যেও এক অনুরূপ সূর্যদেবতার অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।... মনিপুর মাওনাগাগণও একটি সাদা রঙের মোরগ বলি দিয়া সূর্যদেবতার পূজা করে ... এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া মনে হইযাছে যে, পূর্বভারতে প্রাচীনকালে সূর্য পূজক এক আদিম জাতি বাস করিত, তাহাদের প্রভক যে কোন কারণেই হউক, আসাম হইতে উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে – সেই জন্য এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের অধিবাসী দৃশ্যত পরস্পর স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন জাতীয় লোকের মধ্যে এখনও ইহার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়।"

ধর্মপূজার অন্যতম প্রধান অঙ্গ চড়ক অনুষ্ঠানটিও সূর্যপূজার এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ। চড়কের গাছ ও চড়কের চক্র সূর্যকে কেন্দ্র করে তার চারপাশে গ্রহ্থাদির পরিভ্রমণকেই বোঝায়। গবেষক আশুতোষ ভট্টাচার্য 'দ্য অরিজিন অ্যান্ড গ্রোথ অফ রিলিজিয়ান' গ্রন্থোল্লেখ করে (The Origin and Growth of Religion, London. 1935 by W. Schmidt) জানিয়েছেন যে 'ইউরোপের কোন কোন জাতি – যেমন শ্যাভ, লিথুনীয়, লেট্ প্রভৃতির মধ্যে সূর্যপূজারূপ চড়কের অনুরূপ অনুষ্ঠানের প্রচলন আছে। এই জন্য চড়ককে যথার্থই মনে করা হইয়াছে, 'imitation of the swinging of the sun at the begining of the spring or at the solstices - a piece of magic to help the sun move.' পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সকল উল্লেখযোগ্য শিবমন্দিরেই এখনও চড়কের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। বর্তমানে হিন্দুদিগের প্রভাববশত কোন কোন স্থলে ধর্মমন্দির শিভমন্দির বলিয়া পরিচিত হইলেও উক্ত চড়কের সংশ্রব হইতেই তাহা যে পূর্বে সূর্যদেবতা বা ধর্মঠাকুরের মন্দির ছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।" ড. ভট্টাচার্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা বা রাসচক্রে পরিভ্রমণকেও রাশিচক্রের

টিপ্পনী

আবর্তনের মধ্য দিয়ে সূর্যের পরিভ্রমণের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর মতে "চড়ক ও রাসলীলা একই অনার্য ভিত্তি হইতে উদ্ভূত।.... ধর্মপূজার সঙ্গে চড়কের সম্পর্ক হইতেও ধর্মপূজা যে সূর্যপূজা তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।" অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠী, মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠী প্রাগাট, বৈদিক, ঈরাণীয় ও বাংলার লৌকিক পাঁচালী–বতকথার সূর্যদেবতার সঙ্গে ধর্মঠাকুরের সাদৃশ্য বিষয়ে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য ও ড. সুকুমার সেন তাঁদের গবেষণাকে যেভাবে প্রসারিত করেছেন সেভাবেই ১৯৪২ সালে অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে বৈদিক দেবতা বরুণের সঙ্গে ধর্মঠাকুরের একাত্মতা বিষয়ক গবেষণা প্রকাশ করেন। এর পরে ১৯৪৪ সালে সুকুমার সেন আবার রূপরামের ধর্মমঙ্গলের ভূমিকায় ধর্মঠাকুরকে বৈদিক বরুণ দেবতা বলে স্বীকার করেন। তিনি দেখান যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের রোহিত শুনঃশেফের গল্পের সঙ্গে ধর্মমঙ্গলের হরিশ্চন্দ্র লুইতন্দ্র কাহিনীর বিশেষ মিল আছে। শুধু ধর্মমঙ্গল নয়, রামাই পন্ডিতের শূন্যপুরাণেও রয়েছে এগুলো।

টিপ্পনী

চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'শূন্যপুরাণ' এ বলা হয়েছে – "ধর্মঠাকুর শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ পুরুষ। তিনি বৈকুণ্ঠ বা দ্বারিকায় বাস করেন" – এভাবে বিষ্ণুর সঙ্গে ধর্মকে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ধর্মের শিলাকে কোল গোষ্ঠীর কুর্মরূপী শিলা পূজা বা টোটেম জাতীয় ধর্মাচারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বলা হয় 'ধর্ম' শব্দটি অনার্য কোল গোষ্ঠীর কুর্মবাচক শব্দ 'দড়ম' বা 'দরম' থেকে এসেছে। নারায়ণের শালগ্রাম শিলা অথবা শিবলিঙ্গের সঙ্গে এর সাদৃশ্য দেখান হয়েছে।

গ্রামীণ জনসমাজে চৈত্রমাসে শিবও ধর্মের গাজন একাকার হয়ে যায় অনেক জায়গায়। ধর্ম–কামিন্যার সঙ্গে পূজিত হয় শিব–শঙ্করী। শুধু শৈব নয় নাথ ধর্মের কিছু প্রভাবও ধর্মপরিকল্পনায় দেখা যায়।

প্রাগার্য, বৈদিক, ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, লৌকিক প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের প্রভাবও পরিলক্ষিত হয় ধর্মের স্বরূপে। নিরঞ্জনের রুষ্মা বা বড়জালালি এবং ফকির দরবেশের ছড়া বা ছোটজালালির মধ্যে খোদা ও ধর্মকে এক করে দেওয়া হয়েছে।

ধর্মঠাকুর আঞ্চলিক দেবতা। সারা বাংলায় ধর্মঠাকুরের প্রচার নেই। এটি মূলত পশ্চিমবঙ্গের ও দক্ষিণবঙ্গে সবথেকে বেশি জনপ্রিয়। বেশির ভাগ স্থানে ধর্মঠাকুর শিলা রূপে পূজিত হলেও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ধর্মঠাকুরের পুরুষ মূর্তিও দেখা যায়। দঃ ২৪ পরগনার বহড়ু গ্রামের ধর্মঠাকুরের মূর্তিতে, উপবিষ্ট দেবতা, গোলাকার চক্ষু ও পাকানো গোঁফ দেখা যায়।

অন্যমঙ্গল কাব্যের সঙ্গে ধর্মমঙ্গলের পার্থক্য

সাংস্কৃতিক নৃতাত্ত্বিক (Cultural Authropology) পদ্ধতিতে ধর্মের স্বরূপ সন্ধান এবং তার পূজা পদ্ধতি আর সব মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে ধর্মমঙ্গলের প্রধান পার্থক্য সূচিত করে।

মধ্যযুগের অন্য মঙ্গলকাব্যের তুলনায় অনেক পরে রচিত হয় এই কাব্য কারণ ভোম সমাজের দেবতা ধর্মঠাকুর মনসা–চন্ডীর মত পুরোপুরি জাতে উঠতে পারেনি – অষ্টাদশ শতকের

কবি মাণিক রাম গাঙ্গুলীকেও ভয়ে ভয়ে লিখতে হয় এই কাব্য –

"জাতি যায় তবে প্রভু যদি করি গান।"

নিম্নবর্গের দেবতা হওয়ার দরুণ জাতিগত বৈষম্য এবং কাব্যরচনার সূত্রপাত অনেক দেরিতে হওয়ার জন্য সমগ্র বাংলার সমাদ্রিত হতে পারেনি ধর্মমঙ্গল, শুধুমাত্র দক্ষিণ ও পশ্চিম বাংলায় এর প্রচার ও প্রসার সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে।

ধর্মদেবতা আঞ্চলিক দেব হওয়া সত্তেও দক্ষিণবঙ্গে এখনও ব্যাপক আকারে ধর্মপূজার প্রচলন রয়েছে। এখনও নিত্যপূজা, চৈত্র-বৈশাখ মাসে গাজন সহ বাৎসরিক ধর্মপূজা এবং মনস্কামনা পূর্ণ হলে বারোদিনের ঘটভরা পূজা উদ্‌যাপিত হয়। বরিশালে শ্রাবণ মাসে মনসার ঘটপূজা ছাড়া, মঙ্গল কাব্যের আর কোন দেবতার পূজা বর্তমানে বিশেষ একটা প্রচলিত নেই; সর্বোপরি আঞ্চলিক হওয়া সত্ত্বেও এত ব্যাপক আকারে পূজা ও ধর্ম সম্প্রদায় মঙ্গলকাব্যের আর কোন দেবতার নেই।

মঙ্গলকাব্যের মধ্যে একমাত্র ধর্মমঙ্গলেই বীররসের প্রভাব দেখা যায় এবং রাঢ় বঙ্গের ইতিহাসের দু-একটি ঘটনার সঙ্গে এই কাব্যের আখ্যানের মিল থাকায় 'রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য' (The National Epic of Rarha) হিসেবে ধর্মমঙ্গলকে আখ্যায়িত করার প্রয়াস দেখা যায়।

টিপ্পনী

ধর্মমঙ্গলের কাহিনী

ধর্মোৎসবে ধর্মমঙ্গলের কাহিনী বারোরাত্রি ধরে পরিবেশিত হয় বলে একে বারোমতি বা বার্মাতি বলা হয়। প্রতিটি মতিতে বর্ণিত কাহিনী সূত্র নিম্নরূপ ঃ

প্রথম মতি ঃ রঞ্জাবতীর জন্মকাহিনী।

দ্বিতীয়মতি ঃ রঞ্জাবতী কর্তৃক হরিশ্চন্দ্র রাজার পুত্র লাভ ও পুত্রের প্রাণরক্ষার কাহিনী বর্ণনা।

তৃতীয় মতি ঃ শিশুলাউ সেনকে অপহরণের চেষ্টা; লাউসেনের আখড়ায় দুর্গার আগমন এবং লাউসেনের চরিত্রের পরীক্ষা।

চতুর্থ মতি ঃ লাউসেন কর্তৃক মল্ল বধ ফলক রচনা, কুমীর ও বাঘ বধ।

পঞ্চম মতি ঃ বারুই পাড়ার বর্ণনা ও লাউসেন কর্তৃক গোলাহাট স্ত্রীরাজ্যের রাণী সুরীক্ষার দম্ভ বিনাশ।

ষষ্ঠ মতি ঃ হস্তি বধ ও লাউসেনের ঘরে ফেরা।

সপ্তম মতি ঃ কামরূপরাজের কন্য কলিঙ্গার সঙ্গে লাউসেনের বিয়ে।

অষ্টম মতি ঃ লাউসেন কর্তৃক কলিঙ্গ রাজ সভায় লৌহ গন্ডার ক্ষয়।

নবম মতি ঃ লাউসেন কর্তৃক ইছাই ঘোষ বধ।

দশম মতি ঃ লাউসেন কর্তৃক গৌড়ে অতিবৃষ্টি নিবারণ।

একাদশ মতি ঃ লাউসেন ধর্মের সেবায় আসীন ও ময়না বিনাস।

দ্বাদশ মতি ঃ লাউসেন কর্তৃক পশ্চিমে সূর্যোদয়।

ধর্মমঙ্গলের কাহিনীতে উল্লিখিত এই পশ্চিমে সূর্যোদ্দয়ের সাধনা হল ধর্মপূজোর শ্রেষ্ঠ সাধনা – এ যেন ধর্মপূজার দ্বারা সূর্যের গতি নিয়ন্ত্রণ; ধর্মের সঙ্গে সূর্যের একাত্মতার আর একটি নিদর্শন। অন্যদিকে রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলে লাউসেন "লাম্বাদিত্য" নামে উল্লিখিত – এখানেও আদিত্য বা সূর্যের সঙ্গে ধর্মের অভিন্নতা দেখান হয়েছে।

টিপ্পনী

আবার অন্যদিক দিয়ে দেখতে গেলে বাংলার ইতিহাসের সঙ্গে ধর্মমঙ্গলের কাহিনীর একটি যোগসূত্র রয়েছে।

রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য

ধর্মমঙ্গলের কাহিনীতে ঐতিহাসিক পটভূমিকা অভাসিত হয়েছে। গোড়েশ্বরের পিতার নাম দেবপাল একটি ঐতিহাসিক চরিত্র – পাল যুগের শাসনকর্তা। ধর্মপালের পুত্র দেব পালও ঐতিহাসিক চরিত্র এবং উৎকল ও কামরূপের রাজাদের পরাজিত করেছিলেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যে কোথাও দেবপালের নাম উল্লিখিত হয়নি। ধর্মমঙ্গলে গৌড়েশ্বরের সামন্তরাজা তথা গৌড়েশ্বরের শ্যালিকা রঞ্জাবতীর পুত্র লাউসেন কামরূপ অধিকার করে রাজ কন্যা কলিঙ্গাকে বিবাহ করেন। অর্থাৎ নবম শতকে দেবপালের কামরূপ ও কলিঙ্গ বিজয়ের ঐতিহাসিক কাহিনীই সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকে ধর্মমঙ্গল রচনাকালে ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে পরিবেশিত হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি স্মরণীয় – "কলিঙ্গা নামটি কলিঙ্গ দেশীয় রাজ কন্যাকেই বুঝাইতেছে। হয়তো মূল ঘটনার প্রায় সাত-আট শত বৎসর পরে ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী নানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল বলিয়া ধর্মমঙ্গলের কবিগণ ঐতিহাসিক পারমুর্যের কিঞ্চিৎ গোলমাল করিয়া ফেলিয়া বলিয়াছেন যে, কামরূপরাজের কন্যা কলিঙ্গাকে লাউসেন বিবাহ করেন। কলিঙ্গা হয়তো পরাভূত কলিঙ্গ-রাজের কন্যাই ছিল এবং দেবপালের অভিযানকারী সামন্ত (অথবা খুড়তুতো ভাই জয়পাল) সেই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।"

ধর্মমঙ্গলের কাহিনী অনুযায়ী গৌড়ের সম্রাট ধর্মপালের মৃত্যুহলে তাঁর পুত্র গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। গৌড়েশ্বরের মন্ত্রী মহামদ ছিলেন গৌড়েশ্বরের শ্যালক। এই মহামদের ব্যর্থতায় গৌড়েশ্বর তাঁর ওপরে ক্ষুব্দ হন সোম ঘোষ নামে এক অনুগত প্রজা কারাবন্দী জীবন কাটাচ্ছে বলে। গৌড়েশ্বর সোম ঘোষকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করেন এবং অন্য এক সামন্ত কর্ণসেনের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। এই সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ কর্ণসেনকে পরাজিত করে তার জায়গীর দখল করে ঢেকুর গড় প্রতিষ্ঠা করে রাজত্ব করতে লাগলেন। গৌড়েশ্বর এর সমুচিত দন্ড দিতে চাইলেন কিন্তু যুদ্ধে কর্ণসেনের ছয় পুত্র মারা গেল ও তাঁর স্ত্রী পুত্র শোকে আত্মঘাতিনী হলে – গৌড়েশ্বর তাঁর শ্যালক মহামদের বাধ্য সত্ত্বেও বৃদ্ধ সামন্তরাজ কর্ণসেনের সঙ্গে তাঁর শ্যালিকা রঞ্জাবতীর বিবাহ দিলেন। ধর্মের কৃপায় এই অপুত্রক রঞ্জবতী লাউসেন ও কপূরসেন নামে দুই পুত্রের জননী হলেন। এই লাউসেনের বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী এবং ধর্মের সেবাপরায়নতার মধ্যেই ধর্মমঙ্গল কাব্য বিস্তার লাভ করেছে।

ঐতিহাসিক চরিত্র দেবপালের কলিঙ্গ বিজয়ে তাঁর খুড়তুতো ভাই জয়পাল অংশ গ্রহণ করেছিলেন। লাউসেন নামে কোন চরিত্রের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব নেই। ইছাই ঘোষের নামের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত এবং তাঁর ঢেকুর গড়ে সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ – "ঢেক্করী বিষয়ের অধিপতি

মহামান্ডলিক ঈশ্বরী ঘোষ এক বাহ্মণকে একখানি গ্রাম বাহ্মোত্তর হিসেবে দান করিতেছেন – এই মর্মে একখানি তাম্রলিপি পাওয়া গিয়াছে।" এন. জি. মজুমদারের 'ইনস্ক্রিপশন অফ বেঙ্গল' (N.G. Majumder, Inscription of Bengal, III)' অনুযায়ী ঐ তাম্রলিপির উল্লেখ করেছেন শ্রী অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ তৃতীয় খন্ড ঃ প্রথম পর্বে।' তাম্রপত্রে সাল তারিখের কোন উল্লেখ নেই। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের মতে দ্বাদশ শতাব্দীতে এই তাম্রলিপি উৎকীর্ণ হয়ে থাকবে সেকথা উল্লেখ করেছেন শ্রী অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ক্ষেত্রেও ঐতিহাসিক চরিত্রের নাম ব্যবহৃত হলেও কাল পরম্পরা অনুসৃত হয় নি।

রূপরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যের সম্পাদকরূপে লিখিত ভূমিকায় ড. সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন "প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য বলিয়া যদি কিছু থাকে তবে তাহা ধর্মমঙ্গল" (রূপরামের ধর্মমঙ্গল, প্রথম সংস্করণ, ভূমিকা) এই মন্তব্যের সূত্র ধারই ড. পীযূষকান্তি মহাপাত্র তাঁর সম্পাদিত ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যের ভূমিকায় বলেন ঃ "সর্বযুগের, সর্বকালের সকল শ্রেণীর মানুষের আশা আকাঙ্খাও আদর্শের কাহিনী মহাকাব্যে রূপায়িত হয়। .... ঘনরামের ধর্মমঙ্গলে এই লক্ষণগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য সমগ্রভাবে ধর্মমঙ্গলের কাহিনীতেই মহাকাব্যের কাঠামো আছে। ঘনরাম এই প্রচলিত কাহিনীকে অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু পৌরাণিক কাঠামোর মধ্যে কাহিনীকে অগ্রসর করিয়া বিশিষ্ট শিল্পরীতির মাধ্যমে কাহিনীকে তিনি মহাকাব্যের পর্যায়ে আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন" – পীযূষকান্তি মহামাত্র মহাশয় তাঁর মন্তব্যের শেষ পর্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে ঘনরাম তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনীতে "মহাকাব্যের পর্যায়ে আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন" – মধ্যযুগের পটভূমিকায় এই প্রচেষ্টাই ছিল সব থেকে উল্লেখনীয়। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকের কবিগণ নবম-দ্বাদশ শতকের ঐতিহাসিক পটভূমিকাকে মাথায় রেখে ধর্মমঙ্গলের ধর্ম ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে যেভাবে লিপিবদ্ধ করেছিলেন তা তুলনাবিহীন।

ধর্মমঙ্গলে ইতিহাসের ইঙ্গিত থাকলেও ঐতিহাসিক সত্যকে কাব্যিক সত্যের সঙ্গে মিশিয়ে কাব্য রচনার দায়বদ্ধতা ধর্মমঙ্গলের কবিদের ছিল না। বস্তুত পক্ষে এরূপ জাতীয় মহাকাব্য রচনার মত পৃষ্ঠপোষকেরও অভাব ছিল সেকালে, তাই নবম শতকের পাল বংশীয় রাজার কোন এবং সামন্তের প্রতিপক্ষ হিসেবে দ্বাদশ শতকের সেন বংশীয় সামন্ত ইচ্ছাই ঘোষের নাম অনায়াসেই ব্যবহৃত হয়েছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যকে রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য বা The National Epic of Rarha না বলে রাঢ়ের ধারকাব্য বা Heroic Poetry বলাই সংগত। সামন্তরাজা লাউসেন ও তার দুই পত্নী কলিঙ্গা ও কানড়ার যুদ্ধাভিযান, লাউসেনের অনুচর কালুডোম ও তাঁর স্ত্রী লখাই ডোমনীর রাজ্য রক্ষাত্রে প্রাণ ত্যাগ এর মত বীররসাত্মক কাহিনীর মধ্য দিয়ে বাংলার সামন্তরাজাদের বীরত্ব ব্যঞ্জনাই প্রতিফলিত করেছেন জায়গীরদারদের পৃষ্ঠপোষকতা ধন্য ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবিগণ।

উপসংহারে 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (তৃতীয় খন্ড ঃ প্রথম পর্ব) রচয়িতা ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি উল্লেখনীয় – "পুরুষের বলবীর্য, নারীর পাতিবত্য ও বীরাঙ্গনা মূর্তি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, শাঠ্য-ষড়যন্ত্র প্রভৃতি বাস্তব ধরণের বিষয়গুলি মধ্যযুগীয় কাব্যের মধ্যে ধর্মমঙ্গলের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মর্যাদা দিয়াছে। উপযুক্ত প্রতিভাবান কবির সাহায্য পাইলে ধর্মমঙ্গল কাব্য যথার্থই 'জাতীয় মহাকাব্যে' (National Epic) পরিণত হইতে পারিত।"

টিপ্পনী

ধর্মমঙ্গলের কবি

ধর্মমঙ্গলের আদি রচয়িতা হিসেবে ময়ূরভট্টের উল্লেখ পরবর্তী অনেক কবির রচনাতে থাকলেও ময়ূর ভট্টের প্রামাণ্য পুঁথি পাওয়া যায় না। যে কারণে সপ্তদশ শতকের কবি রূপরাম চক্রবর্তীকেই ধর্মমঙ্গলের আদি কবি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সপ্তদশ শতকের অপর তিন কবি হলেন রামদাস আদক, সীতারাম দাস ও যদুনাথ। এদের মধ্যে রামদাস আদকের রচনারও কোন প্রামাণ্য পুঁথি পাওয়া যায় নি। মৌখিক পরম্পরা (Oral Tradition) অনুযায়ী গায়েনদের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে ধর্মমঙ্গলের গান। সপ্তদশ শতকের কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী রূপরাম চক্রবর্তী। অষ্টাদশ শতকে ধর্মমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম চক্রবর্তী। অষ্টাদশ শতকের অপর উল্লেখনীয় কবি হলেন মাণিকরাম গাঙ্গুলী।

টিপ্পনী

ময়ূরভট্ট

ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি-রচয়িতা হিসেবে পরবর্তী কবিদের রচনায় উল্লিখিত ময়ূরভট্ট।

"ময়ূর ভট্ট কৃপান্বিত হৈল করতার।
মরতে ধর্মের গীত করিতে প্রচার।।"

রূপরাম চক্রবর্তী তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্যে একথা লিখেছেন ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁর কাব্যে লিখেছেন-

"ময়ূর ভট্ট বন্দির সঙ্গীত আদ্য কবি।
ময়ূর ভট্টে বন্দি দ্বিজ ঘনরাম গায়।।"

মাণিকরাম গাঙ্গুলী তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্যে লিখেছেন ঃ

"বন্দিরা ময়ূর ভট্ট-কবি সুকোমল।
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে শ্রী ধর্মমঙ্গল।।"

ময়ূর ভট্টের কাব্য বাংলা ১৩৩৭ সনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশ করেন বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। ১৩১০ সালের অনুলিখিত একটি পুঁথি এই গ্রন্থের আকর। এই গ্রন্থের প্রামাণিকতা বিষয়ে সকলেই সন্দেহ পোষণ করেছেন। ডক্টর সুকুমার সেন, ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য শ্রী যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, ড. পঞ্চানন মন্ডল, ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সকলে একমত যে এটি কোন এক অর্বাচীন কবির আধুনিক কালের রচনা। বিশ্বভারতীয় গবেষক পঞ্চানন মন্ডল গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে ঐ মুদ্রিত পুস্তকটি অষ্টাদশ শতকে রচিত রামচন্দ্র বাঁড়ু রাজ্যের ধর্মমঙ্গলের অনুকরণে রচিত।

ঘনরাম চক্রবর্তীর গীতারম্ভ অনুযায়ী -

"হাকন্দ পুরাণ মতে, ময়ূর ভট্টের পথে"

ময়ূর ভট্টের কাব্যের নাম 'হাকন্দ পুরাণ'। বীরভূমের রতন লাইবেরীর অধ্যক্ষ শিবরতন মিত্র পঞ্চদশ শতকের একটি পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন যা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দেখেও ছিলেন কিন্তু তার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না।

রূপরাম চক্রবর্তী

সপ্তদশ শতাব্দীতে ধর্মমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি রূপরাম চক্রবর্তী। ড. সুকুমার সেনের সম্পাদনায় এবং তাঁর ভূমিকাসহ 'রূপরামের ধর্মমঙ্গল' (১ম খন্ড) ১৩৫১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলের সংগৃহীত পুঁথির সংখ্যা ৩০। সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান সাহিত্য সভা, বিশ্বভারতী প্রমুখ প্রতিষ্ঠানে রূপরামের পুঁথি রক্ষিত আছে। প্রাপ্ত পুঁথির অধিকাংশই খন্ডিত। পুঁথিগুলোতে পাঠান্তরও প্রবল। ড. সেনের সম্পাদনায় যে অংশটি প্রকাশিত হয়েছে তাতে মূল কাব্যের এক তৃতীয়াংশেরও কম অংশ রয়েছে। আদি কবি বলে পরিচিত ময়ূর ভট্ট অথবা খেলারাম চক্রবর্তীর কোন পুঁথি এবং কাব্যরচনার যথাযথ প্রমাণ না পাওয়ার দরুণ – "ধর্মঠাকুরের মহিমা বিষয়ক লাউসেনের চরিত কথার আদি প্রবর্তক হিসেবে রূপরামকে স্বীকার করা যাইতে পারে।" –এই মতপোষণ করেছেন অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'–এ (তৃতীয় খন্ড ঃ প্রথম পর্ব) এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত তথ্যানুসারে ডোমসমাজে প্রচলিত লাউসেনের মৌখিক আখ্যানকে রূপরামই প্রথম লিপিবদ্ধ করেন।

আত্মপরিচয়ের শেষে কবি প্রহেলিকাময় ভাষায় কাব্যরচনাকালের যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তা হল

"শোকে শীমে জড় হইলে যত শক হয়।
তিন বাণ চারযুগ বেদে যত রয়।।
রসের উপরে রস তারে রস দেহ।
এই শকে গীত হইল লেখা কর‍্যা নেহ।।"

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এই চার ছত্রের মর্মোদ্ধার করেন ১৫২৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬০৪–০৫ খীষ্টাব্দ হিসেবে। সম্পাদক ড. সুকুমার সেন পুঁথিতে শাহসুজার উল্লেখ এবং কালবাচক পয়ারের তিন বাণ চারযুগ এর পরিবর্তে "চারিবাণ তিনযুগ" পাঠান্তর অনুযায়ী কাব্য রচনার কালনির্ণয় করেছেন ১৫৭২ শকাব্দ বা ১৬৫০ খীষ্টাব্দ।

রূপরাম এই বীররাত্মক আখ্যানকাব্যে ধর্মাচরণ ও ভক্তিরসের থেকে দুঃসাহসিক ঘটনা ও বীরত্ব ব্যঞ্জনাই প্রাধান্য পেয়েছে। দেবমহিমায় সম্পৃক্ত মধ্যযুগে মানব মহত্ব ও বীরত্বকে কাব্যরূপায়িত করার এই উদ্যোগ বিশেষ উল্লেখনীয়।

রূপরামের আত্মকথায় যে দুঃখকাহিনী বর্ণিত হয়েছে সেই অনুযায়ী কবির পৈতৃক নিবাস বর্ধমান জেলার দক্ষিণ প্রান্তবর্তী প্রাচীন গ্রাম কাইতির পার্শ্ববর্তী শ্রীরামপুর। পিতা শ্রীরাম চক্রবর্তীর ছিল বিরাট টোল সেখানেই প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় কবির। কিন্তু পিতার মৃত্যু, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রত্নেশ্বরের সঙ্গে মনান্তর, তর্ক পরায়নতার জন্য পাশ্ববর্তী গ্রামের গুরু রঘুনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে মতান্তরে কবি অনিকেত হয়ে পড়লেন; এই অবস্থায় ধর্মঠাকুর কবিকে বাহ্মণের বেশে দেখা দিয়ে বললেন

"আমি ধর্মঠাকুর বাঁকুড়ারায় নাম।
বার দিনের গীত গাও শুন রূপরাম।।
চামর মন্দিরা দিব অপূর্ব মাদুলি।
তুমি গেছ পাঠ পড়িতে আমি খুঁজে বুলি।।"

টিপ্পনী

ধর্মঠাকুর কবিকে "মহাবিদ্যা" মন্ত্র দিলেন এবং ধর্মের গীত গাইবার আদেশ দিয়ে অন্তর্হিত হলেন। এর পরে তিনি গোয়ালভূমের রাজা গণের রায়কে স্বপ্নাদেশ দিলেন যার ফলে গণেশ রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় কবি দ্বাদশ পালায় ধর্মের গান গাইলেন –

"গোয়ালভূমির রাজা গণেশ রায় নাম
বিপ্রকুল চূড়ামণি বড় ভাগ্যবান।
তারে গিয়া স্বপনে বলেন নিরঞ্জন
প্রতিষ্ঠা করিতে তারে দিল নানধন।
এতেক দিলেন দ্রব্য শুন সর্বজন
আচম্বিতে দুটি পাল্য দিল দরশন। (পাল্য-দোহার)
পাল্য দেখি মহারাজা আনন্দিত মনে
দ্বাদশ-মঙ্গল জুড়াইল শুভক্ষণে।"

টিপ্পনী

শুধু কাব্যরচনাতেই কবির কাজ শেষ হয় নি দোহার সহযোগে তিনি বিভিন্ন আসরে ধর্মের গান গেয়ে বেড়াতেন। তখন রাজমহলে বাস ছিল বাংলার সুবাদার শাহসুজার –

"রাজমহলের মধ্যে যবে ছিল শুজা
পরম কল্যাণে যত আছিল (সে) প্রজা ...."

সেই সময় থেকেই বিভিন্ন আসরে ধর্মের গান গাইতেন কবি –

"সেই হইতে গীত গাই আসর ভিতর
দ্বিজ রূপরাম গান শ্রীরামপুর ঘর।"

চরিত্র সৃষ্টি ও বর্ণনাকৌশল বিচার করলে রূপরাম চক্রবর্তী মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক প্রতিভাবান কবি। রাজা হরিশচন্দ্রের কাহিনীতে সন্ন্যাসীর আজ্ঞায় পুত্রকে কেটে ফেলার পরেও যখন জানতে পারলেন যে ধর্ম ছদ্মবেশে হরিশচন্দ্রকে পরীক্ষা করছিলেন তখন হরিশচন্দ্র ওতার স্ত্রী মদনার, পুত্র লুইচন্দ্রের জন্য স্নেহ-ব্যাকুলতা কবি যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা অনবদ্য ঃ

"এত শুনি গাজনে ধাইলা রাজারানী
লুঞ্যা লুঞ্যা বল্যা ডাকে চক্ষে পড়ে পানি।।
বাপধন বাছা কোথা যেলো ভাই বলে।
লুইচন্দ্র তখন ধাইয়া পড়ে কোলে।।
আচল ধরিঞা লুঞা হাসে খল খল।
মদনা বুকের মাঝে ঝাপিল আঁচল।।
লক্ষ লক্ষ চম্ব দিলা পুত্রের বদনে।
রাজরাণী হরিষ আনন্দ বড় মনে।।"

অপুত্রক হরিশচন্দ্র ও তার স্ত্রী মদনা যেভাবে পুত্রলাভ করেছিল ধর্মের আরাধনায় সেভাবেই পুত্র পাবে রঞ্জাবতী কিন্তু প্রাথমিক ভাবে রঞ্জাবতীর মন দ্বিধাগ্রস্থ কারণ দশ দিন কঠোর তপস্যা করেও সে ধর্মদেবতার দয়া পায় নি। হতাশ রঞ্জাবতী সামুলাকে বলে

"কোথা কোন দেবতা দুরন্ত হয়্যা আছে
কত আর করুণা করিব তার কাছে।

তুমি বল্যাছিলে বনি চাঁপাই নদী যাবে
অষ্টদিনে সেখানে ধর্মের দেখা পাবে।"

শালে ভর দিয়ে ধর্ম উপাসানা করতে হবে শুনে রাণী রঞ্জাবতী বলে –

"আমি যদি প্রাণ দিব শালের উপর
কবে তবে সাক্ষাৎ হইবে মায়াধর।
সবে বলে মরিলে জীবন নাহি পায়
তোমার বচন শুন্যা প্রাণ উড়্যা যায়।"

রাণীর এই কথা শুনে দাস দাসীরাও কৌতুক করতে পিছপা হয়না

"কল্যাণী মানিকী বলে ঘর নাঞী যাব
তুমি মৈলে দুই জনে চামর ঢুলাব।"

এইখানেই চরিত্রসৃজনে রূপরামের সার্থকতা ফুটে ওঠে। বিরূপ মনোভাব, দ্বিধা-দোলাচলতা থেকে চরম কৃচ্ছসাধনায় পুত্র লাউসেনকে পাওয়া – রঞ্জাবতী চরিত্রসৃজনে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন রূপরাম চক্রবর্তী।

শিশু লাউসেনের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেছেন –

"নির্মল সুধীর যেন শিরিষের ফুল।
পঙ্কজ সদৃশ দৃষ্টি চরণ রাতুল।।
তিলফুল উন্নতি নাসিকা অনুপাস।
তনুরুচি শোভে যেন দূর্বাদল শ্যাম।।"

লাউসেনে কিভাবে প্রাথমিক বিদ্যালাভ করতে সে বিষয়ে কবি বলেছেন ঃ

"ক খ আদি পড়িল অক্ষর পড়িল যাযাচিত।
চৌতিশ অক্ষর আগে পড়িল তুরিত।।
পড়িল আঠার ফলা হইয়া সাবধান।
আঙ্ক আঙ্ক পড়ে আর সিদ্ধি বানান।।"

এভাবেই 'পরস্মৈপদ' 'আত্মনেপদ' পাঠ সমাপন করে লাউসেন কিভাবে অধ্যয়ণে ব্যুৎপত্তি লাভ করে পন্ডিত হয়ে উঠল সে বিষয়ে কবি লিখেছেন ঃ

"যার তার সনে করে টীকার বাখান।
পড়িল নিগম শাস্ত্র ভারথ পুরাণ।।
জ্যোতিষ পড়িল কিছু রাজার কোঙর।
লাউসেন পড়ে আর কর্পূর পাতর।।"

'বাঙ্গালা সাহিত্যর ইতিহাস' রচয়িতা ড. সুকুমার সেন রূপরাম সম্পর্কে বলেছেন ('বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' ২য় খন্ড) "রূপরামের রচনা বাহুল্য ও অলঙ্কার ভার-বর্জিত, সরল এবং স্পষ্ট। এই খানে তাঁহার সহিত পরবর্তী অধিকাংশ কবির প্রধান পার্থক্য। জীবনের সম্বন্ধে খানিকটা সচেতনতায় কল্পনার উদ্দামতা ও উচ্ছলতা সংযত হইয়াছে।" আবার 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'

টিপ্পনী

(৩য় খন্ড ঃ ১ম পর্ব) রচয়িতা অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যের আত্মপরিচয় অংশকে মুকুন্দরামের সমকক্ষ বলে তুলনা করেছেন ঃ "আত্মপরিচয় টুকুতে বাল্য কৈশোরের সহজ স্বাভাবিক জীবন, লৌকিকতার প্রতি আকর্ষণ গার্হস্থ্যজীবন ও সামাজিক পটভূমিকায় যে জীবন্ত রেখাচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা মুকুন্দরামের সমকক্ষ।"

রামদাস আদক

টিপ্পনী

সপ্তদশ শতকের উলেখনীয় কবি রামদাস আদক। ১৩১১ সালের 'সাহিত্য সংহিতা' পত্রিকায় প্রথম 'অনাদিমঙ্গলের কবি' শীর্ষক প্রবন্ধে মধুসূদন অধিকারী রামদাস আদক ও তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্যের পরিচয় দেন। ১৩৪৫ সালে বসন্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 'রামদাসের অনাদিমঙ্গল' নামে রামদাস আদকের ধর্মমঙ্গল কাব্য সম্মাদনা করেন, যার প্রকাশক ছিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। বসন্তবাবুর সম্পাদিত এই গ্রন্থের আবার কোন প্রাচীন পুঁথি ছিল না, রামদাসের বংশ পরম্পরায় যে গায়কেরা তখন রামদাস আদক রচিত ধর্মমঙ্গলের গান গাইতেন বিভিন্ন গানের আসরে তাদের গায়ন পরম্পরারও মৌখিক উপাদান গানের খাতা অবলম্বনে রচিত এই কাব্য। এ সম্পর্কে 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ২য় খন্ডে ড. সুকুমার সেনের মন্তব্য উল্লেখনীয় – " 'অনাদিমঙ্গল' নামে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত (১৩৪৫) ... গ্রন্থের মূল কোন কোন আধুনিক গায়নের খাতা। ইহার বারো আনাই রূপরামের পুঁথির বস্তু। শুধু ভণিতা রূপরামদাসের।" রামদাসের কাব্যের পালা পর্যায় এবং কাব্য ভাষা বিচার করেও দুটি কাব্যের মধ্যে ভাব ও ভাষাগত একাত্মতা খুঁজে পাওয়া যায়।

রূপরামের ধর্মমঙ্গলে যেখানে বলা হয়েছে

"মনদিয়া শুন সভে চৈতন্য বন্দনা।
ধর্ম্মের পীরিতে হরি বল সর্ব্বজনা।।
জম্বদীপের সার পুরী বন্দো নবদ্বীপ।
পতিতপাবনী গঙ্গা যাহার সমীপ।।"

তারই অনুসরণে রামদাস আদক লিখেছেন ঃ

"সম্ভাষ করিয়ে সবে হরি বল বন্ধজন।
মন দিয়ে শুন সভে চৈতন্যবন্দন।।
সংসারের সার পুরী আছে নবদ্বীপ।
পতিত পাবনী গঙ্গা যাহার সমীপ।।"

এই সম্পর্কে 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' তৃতীয় খন্ড ঃ প্রথম পর্বে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য উল্লেখনীয় ঃ "আমাদের অনুমান রূপরামের কাব্যরচনার কিছুকাল পরে রামদাসের কাব্য রচিত হইয়াছিল এবং ইহা অতি অল্পকালের মধ্যেই বর্ধমান, হুগলী প্রভৃতি অঞ্চলে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। রামদাস পূর্বগামী খ্যাতিমান কবির দ্বারা যে প্রগাঢ়ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন, এবং সানন্দে অনেক পংক্তি নিজের গ্রন্থে স্থান দিয়াছিলেন, আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই এরূপ অনুমান করিতে হয় অথবা পরবর্তী কালের গায়েন ও পুঁথিলেখকেরা রূপরামের অনেক পংক্তি রামদাসের কাব্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন – এ অনুমানও অযৌক্তিক নহে।"

সার্বিক বিচারে রামদাস আদক সপ্তদশ শতকের এক উল্লেখনীয় কবি ছিলেন বলে মনে করা হয়।

"যশকীর্তিবিহীন জীবন অকারণ।
যশ যার নাই তার জীবন্তে মরণ।।"

যশপ্রার্থী কবির কাব্যে স্নিগ্ধ পদ লালিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়

"দুখ সুখ যত পাক সহোদর ভাই।
কখন বা দুঃখ আছে কভু সুখ পাই।।"

আত্মপরিচয় অংশে উল্লিখিত হয়েছে যে কবি চাষীকৈবর্ত পরিবারের সন্তান। কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করে কবি সংস্কৃত ভাষা, পুরাণ ও সাহিত্যে যে ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছেন তা প্রশংসাযোগ্য।

সীতারাম দাস

সপ্তদশ শতাব্দীতে ধর্মমঙ্গলের উল্লেখনীয় কবি সীতারাম দাস। এশিয়াটিক সোসাইটিতে রাখা পুঁথির কালজ্ঞাপক পয়ার অনুযায়ী কাব্য রচনা কাল ১০০৪ অব্দ।

"সীতারাম দাস গান ধর্ম্মপদতলে।
এই পুঁথি হৈল হাজার চারি সালে।।"

মল্লভূমে রচিত এই কাব্যের কালজ্ঞাপক সালটি মল্লাব্দ হলে তা ১৬৯৮-১৬৯৯ খীষ্টাব্দ হবে। আত্মকাহিনীমূলক থেকে জানা যায় বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস গ্রামে মাতুলালয়ে কবির জন্ম -

"শ্যামদাস মাতামহ গোত্র বাল্মীকে।
ইন্দাসের অম্বগোষ্ঠী জানে সর্ব্বলোকে।।"

আত্মকাহিনীতে কবি বারবার ময়ূর ভট্টের কথা স্মরণ করেছেন

"ময়ূর ভট্ট মহাশয়ের সুন্দর পাঁচালী।
আনন্দে হইল নষ্ট দুই এক কলি।।
ভুলভ্রান্তি গীত যদি গেছি এড়াইয়া।
নিদ্রার আলসে যদি না গেছি গাইয়া।।"

সীতারাম সহজ ভাষা ও সরল ভঙ্গীতে কাব্যরচনা করেছেন। লাউসেনের কামরূপ অধিকারের সময় কবির কামরূপ বর্ণনা উল্লেখনীয় -

"গড় দেখি সমুখে একাশী হাত খন্ডা।
সারি পথ ঘোড়ায় বসিতে নাঞি দান্ডা।।
তারপর বেতগড় ষাটি হাত ঘানা।
কেয়া বান দেখি কত পিব্যাসীর থানা।।"

লাউসেনের কাছে ইছাই ঘোষের দন্ড প্রকাশ অংশটিও অতি মনোরম ঃ

"বাহুবলে গৌউড় করিতে পারি জয়।

টিপ্পনী

সুন ২ আমার নামের পরিচয়।।
এক নাম ইছাই দিতি এ দসানন।
ত্রিতির লবণ বির বেরোতে দুর্জ্জুধন।।
পাঁচনাম তারক ছত্রতে ইন্দ্রজিত।
সাতনাম মহিধরি জগতে বিদিত।।
আট নাম বিত্রাহর নয় নামে বাণ।
বাপ বলে বাছা তুমি ইন্দ্রের সমান।।
দশনাম জোরাসিন্ধু আর কত আছে।
হাসিঞ্যা লাউসেন কহে ইছাএর কাছে।।"

টিপ্পনী

ইছাই ঘোষের এই নাম মাহাত্ম্যর মধ্য দিয়ে সীতারাম দাসের অনলঙ্কৃত ভাষায়, সহজ ভাবের পদ কবিকৃতিত্বে মুখর হয়ে ওঠে।

যাদুনাথ

ড. পঞ্চানন মন্ডলের সম্পাদনায় যাদুনাথ দাসের ধর্মপুরাণ প্রকাশ করে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। একটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখের মধ্য দিয়ে কবির রচনাকাল নির্ধারিত হয়।

"কৃষ্ণরামের নামে পাপতাপ বিমোচনে
চিরকাল রাজতি করেন বর্ধমানে।।"

যে বর্ধমান রাজের গুণ কীর্তন কবি করেছেন, সেই কৃষ্ণরাম যখন বিদ্রোহী শোভাসিংহের হাতে নিহত হন, তখন তাঁর দেওয়ান আততায়ীর দাসত্ব মেনে নেন এবং কৃষ্ণরামের রাণী বন্দী হন – সেই সময়ে কবির কাব্যরচনা শেষ হয় –

"ভার্য্যাবন্দী দাস হয়ে করোড়ি তাহার।
সেই কালে গীত সঙ্গে হইল আমার।।"

রাজা কৃষ্ণ রাম বাংলা ১১০৩ অব্দে অর্থাৎ ১৬৯৬ খীষ্টাব্দের পৌষ মাসে শোভাসিংহের হাতে নিহত হন, আর তখনই যদুনাথের কাব্যরচনা সমাপ্ত হয়।

নাথ সম্প্রদায় ভুক্ত এই কবি অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হয়ে তাঁর কাব্যরচনা করেছেন। বৈষ্ণব, শাক্ত এবং মুসলমান পীর-ফরিকী মতবাদের প্রতি কবি ছিলেন শ্রদ্ধাপূর্ণ। রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীতে ধর্মঠাকুর সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে রাজাকে পরীক্ষা করার জন্য, পুত্র লুইচন্দ্রকে তার মাংস রান্না করে সন্ন্যাসীকে দেওয়ার পরে যখন জানতে পারল যে তাঁর ছেলে বেঁচে আছে, তখন হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রী মদনার ব্যাকুলতায় কবিকৃতিত্ব ফুটে ওঠে ঃ

"যশোদা সন্তুষ্ট যেন পাইলা শ্রীহরি।
রামোর পাইল যেন কৌশল্যা সুন্দরী।।
তেমনি হইল রাণী পুত্র পাইয়া কোলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল বদনমুন্ডলে।।"

সহজ ভাষায় কবির এই অনুভূতিময় বর্ণনার মধ্য দিয়ে বোঝা যায় কবি সংস্কৃত পুরাণাদিতে

বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন বলেই রচনার অহেতুক পান্ডিত্যের স্পর্শ ছিল না। জননী মদনা বালক লুইচন্দ্রকে বনে যেতে নিষেধ করছে ঃ

"বাছা না যাইয়া বল্লুকার বনে।
কি জানি আছয়ে ভালে নিশি অবাশনকালে
বিপরীত দেখিনু স্বপনে।।
কোলে কইস দেখি চাঁদমুখ
তোমার বিপদবাণী কহিতে বিদরে প্রাণী
মনে বড় পাইরাদি দুখ।।"

মদনার এই ব্যকুলতার বৈষ্ণব পদাবলীর বাৎসল্যরসের আভাস পাওয়া যায়।

টিপ্পনী

ঘনরাম চক্রবর্তী

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধর্মমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গল কাব্যের অন্যতম প্রধান কবি। উনিশ শতকে মুদ্রণ সৌভাগ্যে তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্যই প্রথম প্রকাশিত হয়ে শিক্ষিত বাঙালি সমাজে সমাদৃত হয়। অন্নদামঙ্গল কাব্যের রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, শিবায়ন-এর রামেশ্বর ভট্টাচার্য এবং ধর্মমঙ্গল এর ঘনরাম চক্রবর্তী - এই তিন মঙ্গলকাব্যকার অষ্টাদশ শতকের বাংলা মঙ্গলকাব্যের ধারাকে গৌরবোজ্জ্বল করেছিলেন। 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' রচয়িতা শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে "চন্ডীমঙ্গল কাব্যের ঐশ্বর্য যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি যেমন ভারতচন্দ্র, ঘনরাম ও তেমনই ধর্মমঙ্গল কাব্যের ঐশ্বর্য যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।"

বর্ধমান জেলার রায়না নিবাসী মহেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রথম ঘনরামের কাব্য প্রকাশ করেন। এটি ছিল খন্ডিত কাব্য। সম্পূর্ণ কাব্য প্রকাশ করেছিলেন যোগেন্দ্র বসু ১২৮৯ সালে। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (দ্বিতীয় খন্ড) রচয়িতা ড. সুকুমার সেনের মতে মূল পুঁথিতে কবির আত্মকথা ছিল যা এই দুই প্রকাশক বাদ দেন - "আধুনিক মনোবৃত্তি সম্পন্ন ইংরেজি-শিক্ষিতের কাছে অলৌকিক রসাশ্রিত কাহিনীটি উপহাসের বিষয় হইবে মনে করিয়াই - প্রথম প্রকাশক মহেন্দ্রনাথ ঘোষ (?) এবং পরে যোগেন্দ্র বসু এই আত্মকাহিনীটুকু বাদ দিয়াছিলেন।" এই আত্মকাহিনী অনুসারে একদিন ফুল তুলতে গিয়ে কবির পায়ে কাঁটা বিধে যায়, কিন্তু কবির টোলের পন্ডিত ভট্টাচার্যের ইষ্টদেবতার কৃপায় সেই কাটা ইষ্ট দেবতার পায়ে বিধে আছে এ দৃশ্য দেখে অভিমানে ভট্টাচার্য গৃহত্যাগ করেন পুরীতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন কারণ পথিমধ্যে তিনি রাম-সীতা ও লক্ষ্মণকে দেখেও চিনতে পারেননি হনুমানের তিরস্কারে তিনি লজ্জিত হয়ে ফিরে ঘনরামকে রামায়ণ লিখতে বলেন; ঘনরাম রামের বন্দনা লিখলে তা ধর্মঠাকুরের বন্দনায় রূপান্তরিত এবং রামচন্দ্রের স্বপ্নাদেশে ঘনরাম ধর্মমঙ্গল রচনায় মনোনিবেশ করেন। ড. সেন এই কাহিনী নাড়গাঁ নিবাসী গায়েন অমূল্যচরণ পন্ডিতের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (তৃতীয় খন্ড ঃ ২য় পর্ব)-এ ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই আত্মকাহিনীকে একেবারে নস্যাৎ করে দিয়ে বলেছেন "এই রচনাটুকু যে গায়েন মহাশয়ের শ্রীহস্তের কারসাজি নহে, তাহাই বা কে বলিল? এ রূপ অনৃতাচার বাংলা পুঁথিতে তো বিরল নহে।" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ড. পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত গ্রন্থে ড. সেন সংগৃহীত আত্মকথা বিনা প্রমাণে গ্রহণ করা হয়েছে - এই বিষয়টিকেও মেনে নিতে পারেন নি ড. বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্য 'অনাদিমঙ্গল' এবং 'ধর্মপুরাণ' নামে আখ্যায়িত।

"পঞ্চালিকা ইতিহাস ধর্মের পুরাণ।
অনাদিমঙ্গল গাঁথা কবিরত্নে গান।।"

কাব্যে কবির পিতৃ পিতামহের উল্লেখ রয়েছে

"চক্রবর্তী ধনঞ্জয় তাহার তনয়দ্বয়
কবিবর শঙ্কর প্রধান
তদনুজ গৌরীকান্ত কাব্যসিন্ধু শান্ত দান্ত
তত্তনুজ ঘনরাম গান।।"

টিপ্পনী

পিতা মাতা সম্পর্কে কবি বলেছেন

"মাতা যার মহীদেবী সতী সাধ্বী সীতা।
কবি কান্ত শান্ত দান্ত গৌরীকান্ত পিতা।।"

কবি যে রামভক্ত ছিলেন, কাব্য মধ্যে তার অপ্রতুল নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে

"দুস্পার সংসার ঘোর বিস্তার সাগর।
নিস্তার পাইবে সুখে ভজ রঘুবর।।"

ভণিতাতেও কবি বলেছেন

"ঘনরাম ভণে যার নাম রঘুবীর।"

কাব্য সমাপ্তিতে কবি কালজ্ঞাপক পয়ার রচনা করেছেন ঃ

"সঙ্গীত আরম্ভ কাল নাইক স্মরণ।
শুন সবে যে কালে হইল সমাপন।।
শক লিখে রামগুণ রসসুধাকর।
মার্গকাদ্য অংশে হংস ভার্গব বাসর।।
সুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াক্ষ তিথি।
যামসংখ্য দিনে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুঁথি।।"

এই পয়ার অনুযায়ী কাব্যরচনা ১লা অগ্রহায়ণ ১৬৩৩ শকাব্দ বা ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে সম্পন্ন হয়।

ঘনরাম বহুবিধ পুরাণ-উপপুরাণ, মহাকাব্য ও কাব্য থেকে কাহিনী সঙ্কলন করে তাঁর বৃহদায়তন ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। চব্বিশ পালায় বিভক্ত এই কাব্য মহাকাব্যচিত ব্যাপ্তিতে বিস্তার লাভ করেছে। কাহিনী সংক্ষেপ নিম্নলিখিত ঃ

১) স্থাপনা পালা - দেবদেবী বন্দনা থেকে শুরু করে রঞ্জাবতীর জন্ম

২) ঢেকুর পালা - ইছাই ঘোষের কাহিনী

৩) কর্ণসেনের সঙ্গে রঞ্জাবতীর বিবাহ

৪) হরিশ্চন্দ্র পালা - অপুত্রক রাজার সন্তানলাভ-লুইচন্দ্রের কাহিনী

৫) রঞ্জাবতীর শালে ভর দিয়ে ধর্মঠাকুরের বরলাভ

৬) লাউসেনের জন্ম

৭) আখড়া পালা – দেবী চন্ডিকা লাউসেনকে পরীক্ষা করে দেখলেন।

৮) ফলানির্মাণ পালা – দেবী প্রদত্ত অস্ত্র দিয়ে ফলা নির্মাণ।

৯) গৌড়যাত্রা পালা – লাউসেন ও কর্পূরের গৌড় যাত্রা।

১০) কামদল পালা – লাউসেন বাঘ কামদলকে বধ করলেন।

১১) জামতি পালা – অসতী নারীদের কবল থেকে লাউসেনের আত্মরক্ষা।

১২) গোলাহাট পালা – গণিকা সুরক্ষার হাত থেকে লাউসেনের আত্মরক্ষা।

১৩) হস্তীবধ পালা – লাউসেনের হস্তীবধ।

১৪) কাঙুর যাত্রা পালা – লাউসেনের কামরূপ যাত্রা।

১৫) কামরূপ যুদ্ধ পালা – কামরূপের রাজার সঙ্গে যুদ্ধজয় ও রাজকন্যা কলিঙ্গাকে লাউসেনের বিবাহ।

১৬) কানাড়া সয়ম্বর পালা – হরিপালের কন্যা কানাড়ার সঙ্গে লাউসেনের বিবাহ।

১৭) কানাড়া বিবাহ পালা – লাউসেনের দ্বারা লোহার গন্ডার দিখন্ডিত।

১৮) মায়ামুন্ডি পালা – মাতুল মহামদের কুটিল চক্রান্তে লাউসেনের পত্নীদের বিভ্রান্ত করার কাহিনী।

১৯) ইছাই বধ পালা – লাউসেনের ইছাই ঘোষ নিধন।

২০) অঘোর বাদল পালা – গৌড়ে প্রবল ঝড় বৃষ্টি।

২১) পশ্চিমে উদয় পালা – লাউসেন পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় দেখাবার আয়োজন করেন।

২২) মহামদ লাউসেনের রাজধানী আক্রমণ করতে এসে পরাজয় ও পলায়ন।

২৩) পশ্চিম উদয় পালা – কঠোর সাধনায় লাউসেনের অসাধ্য সাধন।

২৪) স্বর্গারোহন পালা – লাউসেনের স্বর্গারোহণ এবং মহামদের উচিত শাস্তি লাভ।

একদিকে স্বভাব কবিত্ব, অন্যদিকে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যজ্ঞান ঘনরামের কাব্যকে উৎকর্ষতা দান করেছে। লাউসেনের বিদ্যাঅর্জন পর্বে কবি যে বর্ণনা দিয়েছে তা যেন কবির আত্মচরিতেরই বর্ণনা

"বেদজ্ঞানী বিজ্ঞ হন পড়িয়া পানিন
কাব্য অলঙ্কার কোষ আগম নিগম।
ভক্তিযোগ সার যার ঘুচে মনোভ্রম।।"

"তাহার কাব্যে ভারতচন্দ্রের ভাষা ও ভাবের পূর্বসূচনা দেখিতে পাই।" – তাঁর সম্পর্কে এই

টিপ্পনী

মতপোষণ করেছেন শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য (বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস)। অনুপ্রাসের ব্যবহার কবির রচনাকে মার্জিত ও শ্রুতিমধুর করে তুলেছে –

"করপুটে এ সঙ্কটে কাতরে কিঙ্কর রাট
উর ঘটে পুর অভিলাষ।
নিশি-নাশে নয়নে ছাড়িল নিদ্রামায়।
গদ গদ গরূড় গোবিন্দ গুণ গায়।
গুড়ি গুড়ি গরূড় গমনে গুড়ি যায়।।"

টিপ্পনী

প্রভাত বর্ণনাকালে কবির অলঙ্কার প্রয়োগ কোথাও কোথাও কাব্যের স্বচ্ছন্দ গতিকে একটু যেন ব্যাহত করেছে, যদিও শ্রুতিমাধুর্যে তা উৎকর্ষতার পরিচয়বাহী –

"ঘোর রযে ঘুঘু যেন ঘন ঘন ডাকে।
চঞ্চল চডুই চিল লিখে চক্রবাকে।।
চকোর চকোরী নাচে ডাহিয়া চপলা।
মনে হৈল নিকটে আইল মেঘ মালা।।"

সমাজ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা ঘনরামের কাব্যকে জীবন দর্শনের এক অন্য মাত্রা দিয়েছে –

"রোগ ঋণ-ঋপু-শেষ দুঃখ দেয় রয়ে।
হাতে শঙ্খ দেখিতে দর্পণ নাই খুঁজি।।
না করে মিথ্যাকে ভয় বিশেষে ঘটক।
বিবাহ বিষয়ে মিথ্যা দোষ নাহি তার।।
কলিকালে নারীর কুটুম্ব বড় ভাব।
সুব্যজ্ঞান ঝোল ঝালে, কুটুম্বিতা হালাগেলে
পরকালে কেহ কায় নয়।।"

অষ্টাদশ শতকের অপর দুই প্রধান কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য ও ভারতচন্দ্রের তুলনায় ঘনরামের কাহিনী আকারে বিশাল এবং চরিত্রচিত্রণে বৈচিত্র্যপূর্ণ। শত্রুর হাত থেকে নগরকে বাঁচাতে লাউসেনের অনুচর কালুডোমের বীর পত্নী লখাই যখন তার সপত্নী সনকার কাছে সাহায্য চাইল তখন কালুর উপেক্ষিত সনকা উত্তর দিল –

"মোর গায়ে উড়ে ঘড়ি তোর গায়ে চুয়া।
দাসীতে যোগায় পান গালে গোটা-গুয়া।।"

মাত্র দুই ছত্রের পয়ার বান্ধ সনকার চরিত্রটি যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়বাহী।

ঘনরাম অসংখ্য সংস্কৃত শ্লোককে সহজ ভাষায় সুন্দর ভাবে অনুবাদ করেছেন, যা অনেক সময় বাংলা প্রবচনের রূপলাভ করেছে। একেনাপি সুবৃক্ষেণ .... শ্লোকটি কবিকৃতিত্বে যে রূপধারণ করেছে তা হল

"সুবৃক্ষ চন্দন গন্ধে সুশোভিত বন।
সুপুত্র হইলে গোত্রে প্রকাশেষ তেমন।।"

একই ভাবে একেনাপি কৃবৃক্ষেণ শ্লোকটিকে কবি যে রূপ দিয়েছেন তা হল –

"কুপুত্র হইলে ঝুলে কুলাঙ্গার কহে
কৃবৃক্ষ কোটরে অগ্নি উঠে বনদাহ।।"

ঘনরামের ধর্মমঙ্গল বীররসে পরিপূর্ণ। বীরাঙ্গনা চরিত্রচিত্রণে কবি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আহত হয়ে ফিরে যখন প্রাণত্যাগ করল লাউসেনের পত্নী কলিঙ্গা – সপত্নী কানড়া কেঁদে আকুল। কিন্তু সেই কান্না দীর্ঘস্থায়ী পারল না। শোক করারও সময় তখন নেই।

"এলল করবী কেশ ধূলায় লুটায়।
মুখানি মুছায়ে দাসী দুর্মুখা পেতায়।।
কেদ না সুন্দরী শুন উঠ বুক বেঁধে।
মরিলে কে কোথাকার প্রাণ পেল কেঁদে।।
শোকের সময় নয় শত্রু আসে পুরে।
সংহার সংগ্রামে সাজি শোক ত্যজ দূরে।।"

আর একটি চরিত্র শুকা, যে মায়ের কাছে ভাইয়ের মৃত্যুসংবাদ শুনে মাকে বলে ঃ

"শুকা বলে শুনমা সমরে সেজে যাব।
শত্রু ত সংহারি রণে ভাই কোথা পাব।।
যে শোকে ব্যাকুল রাম অখিলের নাথ।
হেন শেল বুকেতে বাজিল বজ্রঘাত।।
এত বলি কাঁদে শুকা লখে দেয় বোধ।
শোক তেজে সমরে ডেয়ের ধার শোধ।।"

স্বভাব কবিত্ব, সংস্কৃতজ্ঞান, অলঙ্কার প্রয়োগ ও চরিত্র চিত্রণে ঘনরামের ধর্মমঙ্গল বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়বাহী।

মাণিকরাম গাঙ্গুলী

অষ্টাদশ শতকের ধর্মমঙ্গল কাজের উল্লেখনীয় কবি মাণিকরাম গাঙ্গুলী। বাংলার ১৩১২ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় সাহিত্য পরিষদ থেকে মাণিকরাম গাঙ্গুলীর শ্রী ধর্মমঙ্গল কাব্য প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে কোন সম্পাদকীয় ভূমিকা ছিল না এবং কবির কালজ্ঞাপক শ্লোকটি ছিল প্রমাদপূর্ণ। কবির বংশধরদের কাছ থেকে পন্ডিত যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি কালনির্দেশক যে কটি ছত্র উদ্ধার করেছিলেন তা হল ঃ

"শাকে রীত্ত (তু) সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সিউ সহ জ্জোগ দক্ষে যোগ তার মনে।।
বারে হল্য মহীপুত্র তিথি অব্যাহিত।
সর্ব্বরি সরাগ্নি দন্ডে সাঙ্গ হল্য গীত।।"

এই কালজ্ঞাপক চার ছত্রের মতই ড. পঞ্চানন মন্ডল সংগৃহীত বর্ধমান সাহিত্য সভার পুঁথির

টিপ্পনী

পাঠ

"শোকে ঋতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সিদ্ধ স (হ ফুগ প) ক্ষে যোগ তার সনে
বারে হল মহীপুত্র তিথি অব্যাহিত।
শর্ব্বরী সরাগ্নি দন্ডে সাঙ্গ হল গীত।।"

এই সঙ্কেত অনুযায়ী যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ গণনার মাধ্যমে যে কালনির্ণয় করেছেন তা হল ১৭০৩ শকাব্দ বা ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দ।

মাণিকরাম কাব্য মধ্যে যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তা হল –

"বাঙ্গাল গাঙ্গুলী গাঁই পিতা গদাধর।
স্ব সাহীন সম্প্রতি ছয় সহেদর।।"

মাণিকরামের পিতামহ অনন্তরাম, পিতা গদাধর, কাবরা ছিলেন ছয় ভাই ও এক বোন, মায়ের নাম ছিল কাত্যায়নী

"দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে কাত্যায়নী-সুত।
সত্যশুনে ধর্ম জাগে সদয় সদত।।"

স্বপ্নে যখন কবি ধর্মঠাকুরের কাছ থেকে তাঁর মাহাত্ম্য সম্বন্ধীয় কাব্যরচনার নির্দেশ পেয়েছিলেন তখন তাঁর মনের অবস্থা কি হয়েছিল সে সম্পর্কে তিনি লিখেছেন

"এতেক শুনিয়া মোর উড়িল পরাণ।
জাতি যায় তবে প্রভু যদি করি গান।।
অচিরাৎ অখ্যাতি হবেক দোশ দোশ।
স্বপক্ষের সন্তোষে বিপক্ষ পাছে হাসে।।"

অষ্টাদশ শতকেও ধর্মমঙ্গল রচনায় জাত হারাবার ভয় ছিল যা কবিকে দ্বিধান্বিত করেছিল।

"জগৎ ঈশ্বর কন আমি তোর জাতি।
তোমার অখ্যাতি বলে আমার অখ্যাতি।।"

এই আশ্বাসে কবি ধর্মমঙ্গল রচনায় আত্মনিয়োজিত হন।

"কহেন কিসের চিন্তা কিসের ব্যামোহ।
উঠ বাচ্ছা আমার বচনে মন বদহ।।"

বীর পসাত্মক ধর্মমঙ্গল কাব্যে তিনি যে তজস্বিনী ভাষা ব্যবহার করেছিলেন তা উল্লেখনীয়।

"কলুষ নাশিনী কালরাত্রি করালিনী।
নৃসিং নলাসিনী নমোস্তুতে নারায়ণী।।
দক্ষের দুহিতা দুর্গে দুর্গতিনাশিনী।
নাগারিবাহিনী নমোস্তুতে নারায়ণী।।"

মাণিকরামের গ্রন্থ ও ঘনরামের মত চব্বিশটি পালায় বিভক্ত।

কালুডোমের চরিত্রচিত্রণে কবি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন –

> "ম্লান মুখে সদাই শূকর সঙ্গে ফির‍্যা।
> কটিতে কৌপিণ তার গন্ডা দশ গিয়্যা।।
> তৈল বিনা তাম্র কেশ তনু যেন খড়ি।
> কেবল সঙ্কট কষ্ট কপালের ভেড়ি।।"

বাহ্মণ্য বিষয়কে কবি যেভাবে তৎসম শব্দ ও সংস্কৃতের ছন্দ-অলঙ্কার লুষমায় সাজিয়ে তোলেন ঠিক তেমন সাবলীলতার সঙ্গে কবি কালু ডোমের দারিদ্র্য পীড়িত জীবনের ছবি আঁকেন।

> "শক লার্ড সিদ্ধ করে সেও অলবন"

অষ্টাদশ শতাব্দীর নিম্নবর্গের আর্থসামাজিক প্রতিবেদন হিসেবেও কবির রচনা উল্লেখনীয়। জাতিগত বিধিনিষেধের ভয়াবহতা এবং প্রান্তিক সমাজের সীমাহীন দারিদ্র্যবর্ণনায় কবি অত্যন্ত আন্তরিক।

লাউসেনের বিদ্যার্জন প্রসঙ্গে কবি বলেছেন

> "অবশেষে পড়িলেন সাহিত্য সকল।
> মুরারি ভারবি ভট্ট নৈষধ পিঙ্গল।।
> কালিদাস কৃত কাব্য অন্য কাব্য কত।
> অলঙ্কার জ্যোতিষ আগম তর্ক শাস্ত্র।।
> ছন্দ শাস্ত্র পুরাণ পড়িল তার পর।
> উত্তম হইল বিদ্যা নয় দশ বছর।।"

লাউসেনের মধ্য দিয়ে কবি যেন নিজের বিদ্যাভ্যাসকেই তুলে ধরেছেন। সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়ে কবি যে জ্ঞানার্জন করেছেন তার প্রভাব তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। চরিত্রচিত্রণে সার্থকতা, ছন্দ-অলঙ্কারে উৎকর্ষতার সঙ্গে সঙ্গে যুগপ্রভাবিত আদিরসের বর্ণনাতেও সংস্কৃত রস শাস্ত্রানুসারী এবং সাবলীল।

প্রশ্নাবলী

১) ষোড়শ শতাব্দীতে মনসামঙ্গল কাব্যধারার পরিচয় দাও।

২) চৈতন্য পরবর্তী যুগে মনসামঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি কে? তাঁর কাব্যের বিশিষ্টতার পরিচয় দাও।

৩) বিপ্রদাস পিপলাই-এর কবিকৃতিত্বের পরিচয় দাও।

৪) সপ্তদশ – অষ্টাদশ শতাব্দীর মনসামঙ্গলের গৌণ কবিদের বাক্য সম্পর্কে আলোচনা করো।

৫) চন্ডীমঙ্গল কাব্যের আখেটিক খন্ড-এর কাহিনী বিবৃত করে দ্বিজমাধবের কবিত্ব শক্তিরপরিচয় দাও।

৬) চন্ডীমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে? কেন তাঁর কাব্যটি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে আলোচনা

টিপ্পনী

করো।

৭) মুকুন্দ চক্রবর্তীর আত্মপরিচয় দিয়ে তাঁর কাব্যের বিশিষ্টতার পরিচয় দাও।

৮) ধর্মঠাকুরের স্বরূপ বর্ণনা করে কবি রূপরাম চক্রবর্তীর কাব্যালোচনা করো।

৯) অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের থেকে ধর্মমঙ্গল কোথায় আলাদা তা নির্দেশ করো। এর কাহিনীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করো।

টিপ্পনী

১০) ধর্মমঙ্গল কাব্যকে কেন রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য বলা হয়? এর কাহিনীটি বিবৃত করো।

১১) ধর্মমঙ্গলকাব্যধারার শ্রেষ্ঠ্য কবি কে এবং কেন? তাঁর কাব্যটি সম্পর্কে আলোচনা করো।

১২) ধর্মমঙ্গল কাব্যের দুজন গৌণ কবির কাব্যের পরিচয় দাও।

১৩) সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো ঃ- দ্বিজ বংশীদাস, তন্ত্রবিভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল, মাণিক দত্ত, দ্বিজরামদেব, রামদাস আদক, ময়ূর ভট্ট, সীতারাম দাস, যাদুনাথ, মাণিকরাম গাঙ্গুলী, কালকেতু চৌতিশা, ভাঁড়ু দত্ত, মুরারীশীল, চাঁদবেনে, বেহুলা, লাউসেন।

১৪) ষোড়শ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্যের চৈতন্যের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করো।

নতুন মঙ্গলকাব্য - শিবায়ন - শাক্তপদাবলী সাহিত্যের ধারা

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনুবর্তন-পুনরাবৃত্তির ধারায় বেশ কিছু নতুন ধরণের মঙ্গলকাব্য লিখিত হয়েছিল। দেবতারা কেউ ব্যাঘ্ন, কেউ ষষ্ঠী, কেউ বা অন্নপূর্ণা কিংবা স্বয়ং শিব। এছাড়াও দেবী চন্ডীকে নিয়ে গড়ে উঠল শাক্ত পদাবলী। পুচ্ছানুগ্রহিতার যুগে এ-ও এক ধরণের আশ্রয়।

টিপ্পনী

কালিকামঙ্গল

কৃষ্ণরাম দাস

সপ্তদশ শতাব্দীতে লৌকিক দেবতাদের নিয়ে মঙ্গল কাব্য রচনার জোয়ার এসেছিল। ফলে এই সময়ে কেন কিছু নতুন মঙ্গল কাব্য পাওয়া যায়। সেই নবীন মঙ্গলকাব্য রচনায় পথ যিনি দেখিয়ে ছিলেন তিনি কৃষ্ণরাম দাস অদ্ভুত পাঁচটি মঙ্গল কাব্য লিখেছিলেন কালিকা 'মঙ্গল' রায় মঙ্গল, শীতলামঙ্গল ভাগীরথীর পূর্বপারে ও কমলা 'মঙ্গল' এগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কালিকা মঙ্গল। আত্মবিবরনী থেকে জানতে পারা যায় কলকাতার কাছেন নিমিতা অর্থাৎ বর্তমানের নিমতা নামক স্থানে কবির জন্ম।

অতি পুণ্যময় ধাম সরকার সপ্তগ্রাম কলিকাতা পরগনাতার।
ধরনী নাহিক তুল জাহ্নবীর পূটকূল নিমিতা গামেতে গ্রাম যার।।

কবির পিতা ভগবতী দাস। কবিরা ছিলেন কায়স্থ রায়মঙ্গলন কবি নীলকন্ঠ এর কথা এমন ভাবে বলেছেন যে মনে হয় নীলকণ্ঠ কবির পুত্র কিংবা অনন্ত স্নেহভাজন পাত্র মাত্র কুড়ি বছর বয়সে তিনি কালিকামঙ্গল কাব্যটি লেখেন। কবিকে দেবী স্বপ্নাদেশ দিয়েছিলেন-

শুন সভে একাচিত্ত যেমনে হইল গীত
এয়োদশী কৃষ্ণপক্ষে তিথি।
প্রথম বৈশাখ মাসে স্বপনে আপননামে
দেখিনু সারদা ভগবতী।।

দেবী শুধু গীত কর আমার মঙ্গল বলেননি কাব্যে কী থাকবে তাও নির্দেশিত করেছিলেন। কবি পরম বিনয়ী ছিলেন। নিজেকে বামন হয়ে চাঁদ ধরতে চাওয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন। কাক যেমন কোকিলকে ভেঙ্গায় প্রবালের যেমন ক্ষুদ্র গালার পুঁতি তেমনি মহা কবিদের পাশে কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গল-

মহা মহাকবি যথা তথায় আমার কথা
কোকিলেরে ভেঙ্গায় বায়মে।
যেন সুকুমার সাথে শঙ্খ কাটিহার গাঁথে
জউ পলা প্রবালের পাশে।।

কবি হেঁয়ালিতে কাব্য রচনা কালের কথা বলেছেন। তখন দিল্লির সম্রাট উরাংজেব এবং বাংলার

সুবেদার শায়েস্তা খাঁ

স্বরংসাহা ক্ষিতিপাল বিপুর উপরে কাল
রামরাজা সর্বজনে বলে
নবাব সায়িস্তা খাঁ আদি কবি সাতখাঁ
বহু সরকার করতলে।।

শায়েস্তাখাঁ দুবার বাংলার সুবেদার হয়েছিলেন ১৬৬৪ খিঃ থেকে ১৬৭৬ খিঃ এবং ১৬৭৯ খিঃ থেকে ১৬৮১খিঃ এই বিবরণীতে সালের উল্লেখ আছে। তাতে দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতো কারোর কারোর মতে সালটি ১৫৯৮ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৭৬খিঃ। এই তারিখটি অসমীচীন নয়।

টিপ্পনী

মাত্র কুড়ি বছর বয়সে এমন কাব্যে রচনা একটা কৃতিত্বের বিষয়। কাব্যেটি মুকুন্দরামের অভয়া মঙ্গলের আদর্শানুযায়ী লিখিত। কাহিনীতে বিদ্যাসুদরের প্রচলিত ধারাই অনুসরণ করা হয়েছে। কিছু নতুন সংযোনব আছে, বিশেষত নামকরণে। সুন্দরের পিতার নাম গুনসিন্দু দেশত কাঞ্চন পুত্রের নাম পদ্মলাভ বিদ্যার সন্ধানে এসে মালিনী বিমলার কাছে আশ্রয় বিড়েছে। কালিকা দেবীর বরে সুন্দর বিদ্যার কাছে পৌঁছেছে। কোটাল নিয়ুক কলাবতী নামক বাক্ষনী চোর ধরতে এসে বিদ্যা ও তার সখীদের কাছে লাঞ্চিত হয়েছে। এই লাঞ্ছাবায় কবির মৌলিবড় প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এঅংশ অশ্লীলতা দোষে দুই ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন “ অশ্লীল ভাষা ব্যবহারে কৃষ্ণরামের কোনো প্রতিপক্ষ নাই বাংলা সাহিত্যে। ” ভারতচন্দ্র হরত কৃষ্ণরামের কাছ থেকে কিছু সাহায্য নিয়েছেন, কিন্তু তিনি অবশ্যই কৃষ্ণরামকে ছাপিয়ে গেছেন।

কৃষ্ণরাম দাসের বৈষ্ণব কাব্য সম্পর্কে ধারণা ছিল। শাক্ত কাব্যে তার প্রভাব পড়েছে।

বন্দিলাম যশোদানন্দ পরম যাদরে।
পুত্রভাবে আপুনি আছিলা যার ঘরে।।
বসুদেব দৈবকী বন্দিলাম জোর হাথ।
পাইল পরমানন্দ অখিলের গথ।।

কোথাও কোথাও বজবুলি ভাষা ব্যবহার করেছেন–

কিসররাম কহ সুবানী
দেহি শরণ হরকী রাণী
হাম যেমন পতিত এমন
নাহি জনেক ভুবনে।

ছন্দ প্রয়োগে কবি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন অদিরস প্রয়োগের মধ্যেও কোথাও কোথাও রুচি ও মার্হিত ভাবের পরিচয় আছে।

তিতিয়া নয়ন জলে জামাতা করিলা কোলে
বিনয়বচনে বলে রায়।
পূর্বে কত অপবাদ না লবে দীনের নাথ
অনুগত জড়িয়া আমার।।

এমন পরিচ্ছন্নতা কখনো কখনো অন্দেহের সৃষ্টি করে। কেন না এ ভাষা আধুনিক কালের। কৃষ্ণরামের পুথিগুলির বিশৃঙ্খলা ও পাঠান্তর দেখে মনে হয় এতে প্রচুর প্রক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে।

তবে কবিকে প্রথম শ্রেণীর কবি বলা যাবে না। মুকুন্দরাম বা ভারত চন্দ্র যে উপাদান দিয়ে সোনার কেল্লা তৈরি করেছেন যেখানে কৃষ্ণরাম বাস্তব উপাদানকে যথাযথ ব্যবহার করতে পারেননি। সূক্ষ্মরস বা বিদগ্ধতার তাঁর কাব্য পিছিয়ে পড়ে। তবে সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কৃষ্ণরাম দাস বিদ্যাসুন্দর কানিকামঙ্কল আখ্যানকে সর্বপ্রথম একটি সুযংবদ্ধ পরিণতি দান করেছিলেন। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে এরকম কাজ মোটেও অগ্রাহ্য করার মতো নয়।

কবিশেখর বলরাম চক্রবর্তী

টিপ্পনী

সপ্তদশ শতাব্দীর কবি বলরাম দাসের পুথিটির শেষংশ খন্ডিত থাকার তাঁর সময় কাল ও নিবাস সম্পর্কে অনুমানের আশ্রয় নিতে হয়। তাঁর কাব্যে পূর্ববঙ্গের প্রচলিত ভাষা প্রয়োগ অনেক স্থানে থাকায় তাঁকে পূর্ববঙ্গের অধিবাসী বলে মনে হয়। উল্টোপক্ষে আবার দক্ষিণ রায় অঞ্চলের লৌকিক দেবদেবীর বর্ণনা ও বন্দনা কবিকে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তারউপর তিনি ছিলেন বিষ্ণুদাস বংশের কাশীজোড়ার সমস্ত প্রভু লক্ষীনারায়নের সভাসদ –

বিষ্ণুদাসের বংশ বিনদনে করে অংশ
ধন্যরাজা লক্ষীনারায়ন
হইয়া ত সভাসদ বন্দিয়া কালিকান্দ
শ্রী কবিশেখর সুরচন।

এই লক্ষী নারায়নের সময়কালে ১৬৬৯ খিঃ থেকে ১৬৯২ খিঃ। সুতারাং কবি সপ্তদশ শতাব্দীর ছিলেন শেষার্ধে বর্তমান ছিলেন। কবির পিতা দেবদাস আচার্য মাতা কাঞ্চানী, পিতামহ চৈতন্য। বলরাম চক্রবর্তীর আখ্যানে সুন্দরের পিতার নাম গুনসাগর মাতা ছিলেন গুনমতী উৎকল দ্রাবিড়দেশ মানিকা নগরে তার বামস্থান ছিল। বিদ্যার পিতা ছিলেন বীরসিংহ ও কুতী বীরসিংহে রাজত্ব বর্ধমানে। বিদ্যার রুপগুনের প্রশংসা সুন্দরকে তার প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। এই জন্য সুন্দর দেবী কালিকার পূজা করেন ও দেবীর আশীর্বাদ লাভ করেন।

লেহ মোর নিদর্শন শুআ পক্ষ হাথে।
কথার দোসর হব পুত্র তোমার সাথে।।
সর্বশাস্ত্র জানে শুআ বিচারে পন্ডিত।
প্রেম অলাপনে শুআ মনে পবে প্রীত।।

তারপর শুক পাখির কথায় বাবা মা বা কাউকে না জানিয়ে বিদ্যার উদ্দেশ্যে যাত্রা যাত্রাপথে কবি খুরদা, চটক পঠত নীলাচল ঝারিখন্ড ও বিষ্ণুপুরের উল্লেখ করেছেন। পুড়ুয়ার বেশে বর্ধমানে সুন্দরের আজমন। এরপরের কাহিনী গতানুগতিক।

আখ্যানরম সৃষ্টি চরিত্রচিত্রণ বা ভাষা ব্যবহারে বলরাম খুব বিশিষ্টতার পরিচয় দিতে পারেনি। তবে তাঁর সংস্কৃত গুণণ তন্ত্রে পান্ডিত্য ছিল। গ্রন্থে তিনি তন্ত্রসাধনার অভিগতা ব্যক্ত করেছেন। কবির বন্দায় চৈতন্য দেব বা লৌকিক দেবদেবীদের প্রতি শুদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে। তবে তিনি যে শাক্ত ছিলেন। এবিষয়ে যোবো সন্দেহ নেই। এমনকী আখ্যানের শেষ দিকে পর্যন্ত দেবীর মহিমা প্রচার করা হয়েছে। বিদ্যাকে নিয়ে সুন্দর দেশে ফিরে যাবার পর তাদের সন্তান সন্তানদের জন্ম

হল। কিন্তু দেবীর পুজোর তার কিছুটা অবহেলা তৈরি হল। এতে দেবী প্রেরিত এক রাখস এসে বালক পুত্রকে খেয়ে ফেলন। এতে সুন্দরের সম্বিৎ ফেরে এবং কালীর সাধনা করে সন্তান ফিরে পায়। রাজজনক করে কালী পূজো করে। এতে কালিকার প্রচার ও প্রসার হয়। বিদ্যা সুন্দরকে মৃত্যুর পর যাবে দেবী স্বর্গে নিয়ে যেতে উপস্থিত হল। এতে যম ইন্দ্র নারায়ন শিব সহ দেবতা দের সঙ্গে দেবী কালিকার যুদ্ধের বর্ণনা আছে। শঙ্করের যুদ্ধযাত্রা বর্ণনা বৈচিত্র্য আছে।

ঈষতে হাসিলা মাতা পরশে গগন।
প্রলয়ের মেঘ যেন করিছে নিস্বন।।
গুটিল শিবের কৃষ্ণ পাখ্যা মহা ডর।
গগনে দিবরে শিব বলে ধর ধর।।
দূরে গেল ডম্বর নিশান লাঠি খান।
কোথা গেল যিদ্ধি রুলি নন্দী মহাকাল।।

বলরাম বিদ্যাসুন্দরের প্রেমাপাখ্যানের থেকে বেশি জোর দিয়েছেন কালিকা দেবী মাহাত্ম্যা প্রচারে অর্থাৎ মঙ্গল কাব্য করে তোলার।

টিপ্পনী

গোবিন্দ দাস

গোবিন্দ দাসের কালিকামঙ্গল বেশ বড় কাব্য। রুাব্যটি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত বৃত্রাসুর বধ ও দেবরাজ্যে দেবী মাহাত্ম্য প্রচার ইন্দ্রের অহল্যাহরণ পাপ ভোগ ও দেবীর অনুগ্রহে বিস্তার লাভ চন্ডীর সপ্তশতী অনুসারে মহিষাসুর মর্দন ও শুম্ভ নিশুম্ভ বধ বিক্রমা দিত্যের উপাখ্যান এবং বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী। সুন্দরের পিতার নাম গুনিসার , মাতা ছিলেন কলাবতী, বিদ্যার পিতা বীর সিংহের নিবাস রত্নপুরে। সুন্দরের নিবাস গৌড় রাজ্যের কাঞ্চন নগরে।

গোবিন্দ দাসের কাব্য গীতি প্রধান। ফলে বিভিন্ন রাগরাগিনীর উল্লেখ আছে। আছে ছন্দের কুশলতা ভাষা স্বচ্ছ সরল প্রসাদ গুনযুক্ত ।অনেক গুলি গান আছে।এর মধ্যে কয়েকটি বজবুলি ভাষার লেখা। যেমন-

সজনিসই প্রাণবন্ধু যাইবেন মধুপুর
ছাড়ির গোকুল বাস জীববের বিবা আশ
বধভাগী হইল অক্রূর।
এই সেই বৃন্দাবন কেলি কৈলা অনুক্ষণ
বসিয়া গাঁথিল পুষ্পমালা
যত সখিগন্থন এই প্রাণসুন্দর কই
কতলা সহিব দেখ জ্বালা----

কবির বৈষ্ণব কাব্যে অধিকার ছিল। অবশ্য দেবী কালিকা মাহাত্ম্য প্রচারই প্রধান।

দুর্গামঙ্গল

বাংলায় চন্ডীমঙ্গলের ব্যাধ ও বণিক খন্ড প্রচার ও প্রসার লাভ করেছিল।এর বাইরে পৌরাণিক

চন্ডীর উপাখ্যানও রয়ে গেছে। মার্কন্ডেয় পুরাণে চন্ডী-সপ্তসতী অনুসরণে আমাদের দুর্গা বা চন্ডী পূজা হয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণ সমাজে এর প্রচলন ছিল না। সপ্তদশ শতাব্দীর দুই কবি এই দেবী মাহাত্ম্য বাংলায় লিখলেন। মার্কন্ডেয় পুরাণটিই অনুসরণ করা হল। কখনও সরাসরি অনুবাদ,কখনও ভাবানুবাদ করেছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রামচন্দ্রের দুর্গার অকালবোধন এবং মেনকা-হিমালয়-পার্বতী-শিবের কাহিনী। তাই এই কাব্যটিকে পুরোপুরি মঙ্গলকাব্য বা অনুবাদকাব্য কোনটিই বলা যায় না।

টিপ্পনী

দ্বিজকমললোচন

সপ্তদশ শতাব্দীর কবি কমললোচনের কাব্যটির নাম 'চন্ডিকাবিজয়' বা 'চন্ডিকামঙ্গল'। বাংলাদেশের রংপুর জেলার আন্ধুয়া পরগণার সরকার ঘোড়াঘাটের ঘর্ঘট বা ঘাগট নদীর তীরবর্তী চড়কাবাড়ী গ্রামে ছিল কবির নিবাস। পিতা যদুনাথ এবং গুরু ছিলেন শ্রীনাথ। কাব্যে 'দিল্লীশ্বর সুতের জাগীর'-এর উল্লেখ আছে। অর্থাৎ শাহসুজা তখন বাংলার সুবেদার। তাঁর সুবেদারী কাল ১৬৩৯ থেকে ১৬৬০ খি:। কমলমলোচন সেই সময়ের লোক।

'চন্ডিকাবিজয়' ১৪৬ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম তিনটি অধ্যায় বন্দনাংশ এবং তারপর থেকে মূল কাব্যের মূল কাব্যের সূচনা। গ্রন্থোরম্ভে কবি লিখেছেন-

''মার্কন্ড পুরাণে তোমার স্তবনে
সপ্তশত শ্লোকময়।
তাহাতে যে গুণ জানে বুধজন
সর্বথা পাতক লয়।।''

কাব্যের বিষয়

সুড়থ রাজার আখ্যান থেকে শুরু করে মহামায়ার উদ্ভব ও দনুজদলনে যাওয়া এবং তারপর মহিষাসুর বধ, শুম্ভ-নিশুম্ভ নিধন, চন্ডমুন্ডের সংহার, ধূম্রলোচন ও রক্তবীজ নিকেশ পর্ব এবং বাঙালীর দুর্গাপূজা বর্ণনা। মার্কন্ডেয় পুরাণে সংস্কৃত ভাষার ঝংকার-গাম্ভীর্য-অনুরণন প্রকাশিত হয়েছে আদ্যাশক্তির স্তবে বা অসুর নিধনে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই কমললোচনের বাংলায় তা অনুপস্থিত। তবুও কমললোচনের কোনো কোনো বর্ণনা যথেষ্ট প্রশংসনীয়-

''জবাপুষ্পের বর্ণ হৈল কলেবর।
মহাকোপে অভয়া কাঁপিছে থর থর।।
অধর ওষ্ঠ কাঁপে কোপযুক্ত মনে।
হস্তপদ আদি সব কম্প মনে মনে।।''

কাহিনীর কোথাও কোথাও সমকালীন ভাবনার প্রকাশ আছে। যেমন-দৈত্যদের বন্দুক হাতে দেবীকে আক্রমণ-''বন্দুক গেরাপ ছাড়ে কোন কোন বীর''। এমনকি স্থানীয় রংপুরের বাড়ির চাল (ছাদ) ছাইবার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে মহিষাসুরের যুদ্ধের ঘর নির্মাণের সময়।

ভনিতায় যদুনাথের নাম থাকায় কোনো কোনো গবেষক অনুমান করেন যে কাব্যটি পিতা-পুত্র

উভয়ের দ্বারা লিখিত। যেমন–যদুনাথের ভনিতায় মহাদেবের অর্ধনারীশ্বর বন্দনা পদটি এরকম–

"আজি কি পেখনু সমন্বিত হর-গৌরী।
সফল ভঞ্জো রে . ..... যুগ মেরি।।
....
পারিজাত মালা গলে গিরিবালা। গি
রশ গলে দোলত সেহি অক্ষমালা।।
হর-গৌরী নিরখে সারং লোকা ইওঁ
যদুনাথ উভয়-চরণ বলিযাইও।।"

টিপ্পনী

ভবানীপ্রসাদ রায়

জন্মান্ধ কবি ভবানীপ্রসাদ রায়ের কাব্যের নাম 'দুর্গামঙ্গল'। বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার আটিয়া পরগণার কাঁটালিয়া গ্রামে কবির নিবাস ছিল। পিতার নাম নয়নকৃষ্ণ রায়। কবি বৈদ্যবংশ জাত ছিলেন। উপাধি ছিল 'কর', কিন্তু 'রায়' উপাধি ব্যবহার করেছেন। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন ভবানীপ্রসাদ জ্ঞাতিবিরোধে নিগৃহীত হয়ে দু:খ-কষ্ট ভোগ করেছিলেন। পুথির অন্তিমে ১০৭১ সনের উল্লেখ আছে। এটি খুব সম্ভবত বঙ্গাব্দ। তাহলে রচনাকাল সমাপ্ত হয়েছে ১৬৬৫ খি:।

এই কাব্যটিও মার্কণ্ডেয় পুরাণের অনুসরণ। তবে কাব্যারম্ভে কিছু কাহিনী যোগ করেছেন কবি-রামচন্দ্রের বিরহ ও অগস্ত্যের সঙ্গে সংলাপ, মেনকার স্বপ্নদর্শন ও পুত্র মৈনাককে কৈলাসে প্রেরণ, মৈনাকের কৈলাসযাত্রা, শিব ও গৌরী সঙ্গে মিলন ও সংবাদ আদান-প্রদান, গৌরীর শিবের সঙ্গে আলাপ ও ৈকলাস থেকে বিদায় নিয়ে হিমালয় যাত্রা এবং হিমালয়ে মা গৌরীর আগমন। এরপর মার্কণ্ডেয় পুরাণানুসারে সুরথের উপাখ্যান দিয়ে কাহিনীর সূচনা। শেষে রামের অকালবোধন, দেবস্তুতি ও বরদান, শিবের হিমালয় আগমন, মেনকার বিলাপ, পার্বতীর কৈলাস প্রত্যাবর্তন-অংশটিতে মঙ্গলকাব্যের অনুসরণ রয়েছে।। কবি নিজেই বলেছেন–

"শ্লোক ভাঙ্গিয়া লিখি যদি পুস্তক বাড়য়।
সংক্ষেপে কহিলাম কিছু বুদ্ধে যেহি লয়।।"

কোথাও সরল অনুবাদ, কোথাও ভাবনুবাদ ও অনুসরণে ভবানীপ্রসাদের কাব্যটি এগিয়েছে। চন্ডী প্রণামের অংশটির অনুবাদ চমৎকার–

যেহি দেবী বুদ্ধিরূপে সর্বভূতে থাকে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে।।
যেহি দেবী লজ্জারূপে সর্বভূতে থাকে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে।।

এই ভাষা সহজ-সরল-প্রাঞ্জল। তবে তা অর্বাচীনকালের। কবি বাংলাদেশের বাসিন্দা হয়েও পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষায় দক্ষতা দেখিয়েছেন। কবির রচনায় ধ্রুপদী ভাব ছিল, তা ভয়ংকর বর্ণনাতেও বজায় রয়েছে–

খড়্গধারে মাথা তার কাটিয়া ফেলায়।
ভূমিতে পড়িবা মাত্র তুলিছে জিভায়।।
ছিটায় বাহ্মণী দেবী কমণ্ডুলের জল।
জলের ছিটায় ভস্ম হইছে সকল।।
করেন ইন্দ্রাণী দেবী বজ্রের প্রহার।
দেবগণে বনমধ্যে করে মহামার।।
শিবাগণে মরামাংস টানি টানি খায়। রু
ধির খাইয়া অস্থি অপরে চাবায়।।..........

টিপ্পনী

রূপনারায়ণ ঘোষ

ময়মনসিংহ জেলার আটিয়া পরগণার আদাজান বা আদাবাড়ী গ্রামে ছিল রূপনারায়ণের নিবাস। কাব্যের নাম 'দুর্গামঙ্গল'। কুলপঞ্জিকা অনুযায়ী রূপনারায়ণের সময়কাল সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। কবির পিতার নাম জগন্নাথ ঘোষ। কবি সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পুথিতে পুরনো ও আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ আছে–কহস্তি, করুকা, বলোঁ, মাঙ্গিলা অর্থাৎ মাগিলা, দেখিলোঁ, কমুন অর্থাৎ কেমন ইত্যাদি। এর সঙ্গে আছে আধুনিক শব্দ। হিন্দী ও বজবুলিতেও রূপনারায়ণ ঘোষের মুন্সিয়ানা ছিল। কাব্যটি পাঁচালীর ঢঙে রচিত। সংস্কৃতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দীর্ঘরূপ লাভ করেছে। ফলে কাব্যটি ব্যাখ্যাধর্মী হয়েছে। ছন্দ–অলংকার প্রয়োগে কবি নিপুণতা দেখিয়েছেন। যেমন–

পাবক তপন কিরণ দেহ।
চিন্দুর নিকর সজল মেহ।।
পীযূষসদন বদন ইন্দু।
তরল কমল শম্ভু সিন্ধু।।

কাব্যের সূচনায় যে পদ লিখেছেন তা তাঁর বৈষ্ণব মনোভাবের পরিচায়ক।

অন্যান্য কবি

সপ্তদশ শতাব্দীতে আরও কয়েকটি এই জাতীয় কাব্য পাওয়া গেছে উত্তরবঙ্গ–কোচবিহার প্রভৃতি স্থান থেকে। ১৬৯৭ খি: লিপিকৃত অজ্ঞাতনামার পুথির নাম 'ঘোরমঙ্গলচণ্ডী'। কোচবিহারের রাজদরবারের সংগ্রহশালায় পাওয়া গেছে দ্বিজমাধব রচিত 'চণ্ডিকার বতকথা' ও দ্বিজ শ্রীনাথের 'দেবীপূজা' পুথি। পরবর্তীকালে একরম পাঁচালী–বতকথা লেখা হয়েছে সুপ্রচুর। ছোট ছোট পুথিতে এইসব মেয়েলী বতকথায় দেশ ছেয়ে গেছিল। এগুলির সাহিত্য–মূল্য উৎকৃষ্ট নয়। ফলে তা অনুবর্তন–...........–পুনরাবৃত্তিতে মগ্ন ছিল।

শিবায়ন

শিবকে নিয়ে যে আখ্যানকাব্য বাংলায় গড়ে উঠেছিল তা শিবায়ন নামে পরিচিত। বৈদিক রুদ্র ও পৌরাণিক শিব বাংলায় লৌকিক রূপ ধারণ করেছেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে এই

শিবমাব্যঙ্গমূলক আখ্যায়িকা পূর্ণাঙ্গ রূপ পাওয়া যায়। বাংলায় শিবমাহাত্মের কাহিনিগুলি দুধরণের – ১) মৃগলুব্ধ কাহিনি, ২) শিবায়ন কাব্য।

মৃগলুব্দের কাহিনি – এই্ কাহিনি পুরাণকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। দেবদেবী বন্দনার পর মধুকৈভৈ অসুরবধ আখ্যান। মুনিপত্নীকে লঙ্ঘন করার অভিশাপে শিবের লিঙ্গচ্যুতি। এরপর হরপার্বতীর বৃতকথায় শিবচতুর্দশী পালনের পর রাজা মুচকুন্দ রাণী রক্মিনীর মুখ থেকে বতকথা শ্রবণ করেন। রুক্মিনীর কাহিনিটি এরূপ – দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় চিত্রসেন নৃত্যরত থাকার সময় শিকারের দৃশ্যে তাল ভঙ্গ করেন। দেবরাজ ক্ষুব্দ হয়ে চিত্রসেনকে মর্ত্যে ব্যাধ হয়ে জন্মাবার অভিশাপ দেন। চিত্রসেনের কাতর অনুরোধে জাবাবনে, যদি ভদ্রসেন মৃগের সাক্ষাৎ পায় তাহলে তার শাপমুক্তি ঘটবে। শিবচতুর্দশীর দিন ব্যাধ চিত্রসেন একটিও শিকার না পেয়ে ক্লান্ত অবসন্ন, ক্ষুধকাতর হয়ে রাত কাটাবার জন্য বিল্বগাছে আশ্রয় নেন। ওঠার সময় গাছের নিচের শিবলিঙ্গের উপর গাছ থেকে একটি বিল্বপাত্র পড়ে। এতে সন্তুষ্ট শিব চিত্রসেনকে পরদিন পশুলাভের বরদান করেন। চিত্রসেনের পাতা ফাঁদে পড়ে ভদ্রসেন মৃগ। আর তার সঙ্গিনীসৃপী নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে থাকে স্বামীকে উদ্ধারের জন্য। ব্যাধরূপী চিত্রসেন এলে মৃগী তাকে বলে যে জীব হত্যার মতো পাপ আর নেই। সেইসঙ্গে মৃগী তাকে ধর্ম উপদেশ দেন ও জীবহত্যার পাপ মুক্তির জন্য শিবরাত্রির বত পালনের কথা বলে। চিত্রসেন মৃগীর কথায় জ্ঞানলাভ করে। চন্দ্রভাল নদীর তীরের শিব মন্দিরে বতপালন করে চিত্রসেনের পাপ মুক্তি ঘটে। অন্যদিকে মৃগ ভদ্রসেন ও তার পত্নী মৃগীও শিবলোকে আরোহণ করে। রাণীর কাছে শুনে রাজা মুচকুন্দও শিবরাত্রির বত পালন করেন। পরদিন সকালে অর্থাৎ শিবরাত্রির পুজো শেষে রাজা নয়লোক থেকে শিবলোক প্রাপ্ত হন।

শিবায়নের কাহিনি

শিবায়নের আখ্যানের প্রথমাংশ পৌরাণিক। দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় শিব প্রজাপতি দক্ষরাজাকে প্রণাম জানান না, এতে দক্ষের ক্ষুব্দ হন, তিনিও যজ্ঞে শিবকে আমন্ত্রণ জানান না, সতী আসেনও স্বামী বিন্দা শুনে দেহত্যাগ করনে, শিবের রুদ্ররূপ প্রকশিত হয়, সতী হিমালয় ও মেনকার কন্যা উমা রূপে পুনর্জন্মগ্রহণ করেন, তারপর পার্বতীর সাধক ও পতিরূপে শিবকে লাভ। – এই প্রসঙ্গের পর লৌকিক কাহিনির অবতাড়ণ্য। হরগৌরীর বিবাহের পর ভিক্ষান্নে সংসার চলে না। ফলে কলহ বাধে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। পার্বতীর পরামর্শে শিবের কৃষিকাজ শুরু। লাঙল, মই ইত্যাদি সরঞ্জাম তৈরি করে দিলেন বিশ্বকর্মা। কুবের বীজধান। শিবের চাষআবাদে পৃথিবী ভরে উঠল ফসলে। পুলকিত ভোলানাথ পরিবারে কথা গেলেন ভুলে। প্রদিকে স্বামী ঘরে না আমায় পার্বতীর দুঃখের শেষ নেই। নারদের পরামর্শে মশা-মাছিদের পাঠালেন শিব জব্দ করার জন্য। কিন্তু মহেশ্বর বিঠিকার। তখন স্বয়ং দেবী পার্বতী শিব ছলনার জন্য বাগদিনীর কেশ ধারণ করলেন। মহাদেব বিভ্রান্ত হলেন। পার্বতী বাড়ি ফিরলেন, শিবও ফেরে এলেন। পার্বতী বরের কাছে শাঁখা পরাবার আর্জি জানালেন। কিন্তু দরিদ্রভিখারি শিব অর্থাভাবে তা দিতে পারলেন না। দুঃখে পার্বতী চলে গেলেন বাপের বাড়ি। শঙ্খ বণিকের ছদ্মবেশে শিব শ্বশুর বাড়িতে উপস্থিত হলেন। পার্বতী হরের কাছ থেকে শাঁখা পরে মহাকালী রূপ ধারণ করলেন। শেষে কলহ মিটিয়ে হরগৌরীর স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন ঘটল।

শঙ্কর কবিচন্দ্র

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য পর্বে বিষ্ণুপুরের বাহ্মণ বংশে শঙ্করের জন্ম। ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত, শীতলামঙ্গল প্রভৃতি শাখার কাব্যও রচনা করেছিলেন শঙ্কর। সম্ভবত ১৬৮০ খিঃ শিবায়ন রচিত হয়। তবে পুরো গুথিটি পাওয়া যায় নি। কবির মর্ষধরা পালাতে শিবায়নের একটি জনপ্রিয় পালা পাওয়া যায়। সেখানে লোকয়ত জীবনই ফুটে উঠেছে। ধূলি ধূসরিত মহেশ্বরের ছবি এঁকেছেন কবি। পার্বতীর বাগদিনীরূপ ও তা দেখে শিবের মুগ্ধ হওয়ার দৃশ্য বড়ই সুন্দর।

বাগদিনী বেশ করি উভ করি খোঁপা।
ফুলমালা তাতে শোভে সুবর্ণের ঝাঁপা।।
কান্ধেতে ঘুনসি জাল ইসাদের কড়ি।
পরিপাটি কান্ধে সাজে মর্চ্ছের চুপড়ি।।
ঠমক করি দান্ডাইল শিব পড়ে ভোলে।
সই সই বলি প্রভু করিলেন কোলে।।

কৃষক শিব ও বাগদিনী পার্বতীর বাস্তব – পরিচিত চরিত্রের প্রথম রচয়িতা শঙ্কর কবিচন্দ্র।

রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র

কবি রামকৃষ্ণ সপ্তদশ সতাব্দীর অপর কবি। আদিনিবাস হাওড়া জেলার আমতার দামোদর তীরবর্ত্তী রসপুর গ্রাম। কবিরা দক্ষিণ রাটী কায়স্থ দেব উপাধিধারী , পরবর্তীতে

রায় উপাধি গ্রহন করেন। পিতা কৃষ্ণ রায় এবং মাতা রাধাদাসী। দুইপুত্র জগন্নাথ ও বল রাম সুপন্ডিত কবি কাব্যটি রচনা করার আগেই কবিচন্দ্র উপাধিতে ভূষিত হন। কবির জন্মসাল নিয়ে মতভেদ আছে। ১৬১৮/ ১৫৯০ খীঃ – এই দুই সালের কথা পাওয়া যায়। বৃদ্ধ বয়সে বর্ধমানের রাজার আক্রমনে গৃহদেবতাকে হারিয়ে শোকাকূল কবি প্রানত্যাগ করেন। সালটি সম্ভবত ১৬৮৪ খিঃ। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, ১৬৫০ খিঃ নাগাদ কাব্যটি রচিত হয়। রামকৃষ্ণের শিবায়নের দুটি পুথি পাওয়া গেছে। কাব্যটি বিশালাকার ২৫টি পালায় বিভক্ত। এতে তিনটি ধারা আছে – ১) পৌরাণিক কাহিনী অনুসরণে তথ্য ও তত্ত্বের বর্ণনা, ২) শিবকাহিনী ও তার আনুষঙ্গিক পৌরাণিক উপকাহিনী এবং ৩) লোকপ্রচলন কাহিনী। শেষাংশটি স্বল্পতম। কাব্যের প্রথমাংশ থেকে কবির পান্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। শৈব ছাড়াও শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শনে কবির ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি বলেছেন –

'হরিহর দুঁহে এক শরীর অভেদ'।

আবার নিরাকার নির্গুন বহ্মের স্বরূপ সম্পর্কেও তিনি অবহিত –

"এক বহ্ম সনাতন নিরাকার নিরঞ্জন
নিত্য নির্গুণ বিধিকার।"

কাব্যে অনেক উপকাহিনী আছে, যা কাব্যটিকে মঙ্গলকাব্যের ছককে ছাপিয়ে পুরাণধর্মী করে

টিপ্পনী

তোলে। লৌকিক শিবকাহিনীকে অন্যান্য কবিরা উচ্ছ্বাসে দেনিল করে তুলেছেন, কিন্তু রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের কাব্য গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট নয়। তবে হরগৌরীর কিংবা গঙ্গা-পার্বতীর কলহে কোথাও কোথাও গ্রাম্য রসিকতা আছে।

"কোচিনী ভুলাও তালে নাগরালি বুড়া কালে
লোকমুখে শুনি বিপরীত।"

কবি রামকৃষ্ণ রায় লৌকিক কাহিনীতে নয়, শিবপুরাণের শান্ত সংযত পরিবেশ রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। তাঁর ভাষা, শব্দ ব্যবহার, ছন্দ প্রয়োগের নৈপুণ্য চমৎকার। তবে রচনা ভঙ্গিমাতে তত্ত্বের বর্ণনাই প্রধান। কবিত্বের থেকে গদ্যাত্মক বর্ণনাই বেশি চোখে পড়ে। তাঁর পদান্বয় ও বাকবিন্যাসরীতি আধুনিক গদ্যাভিমুখী।

টিপ্পনী

রতিদেব ঃ

মৃগালুব্ধ-এর জনপ্রিয়তম কবি রতিদেব। চট্টগ্রামের চক্রশালা পরগণার সুচক্রদন্ডী গ্রামে জন্ম কবির। এখানে ছিল প্রসিদ্ধ শৈবতীর্থকেন্দ্র। চৈত্রমাসে মহাআড়ম্বরে শিব-উৎসব পালিত হয়। সুতরাং শিব কাহিনী এখানে গড়ে ওঠার পূর্ণ অবকাশ ছিল। আর তাতেই বোঠহর দুজন মৃগলুব্ধ কাব্যের কবিকে পাওয়া যায়। রতিদেবের পুথি থেকে রচনাকাল সম্পর্কে জানা যায় ১৫৯৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৭৮ খিঃ কাব্যরচনার সূচনা।

রস অঙ্ক বাউ শশী শকের সময়।
তুলামাসে সপ্তবিংশতি গুরুবার হএ।।

পিতা গোপীনাথ, মাতা বধুমতী, মন্ত্রগুরু মোথদা ঠাকুর। কবি ভ্রাতাদের, এমনকী শ্বশুর-শাশুড়ীর নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন।

পন্ডিত কবি পুরাণ অনুসরণে শিভ চতুর্দশী বতের আখ্যান রচনা করেছেন। এই রচনা অন্য কবিদের থেকে প্রশংসার যোগ্য। শব্দ ব্যবহার ও ছন্দ প্রয়োগে তিনি বৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। সামান্য কাহিনীও তাঁর রচনাশৈলির গুণে সুপাঠ্য হয়েছে-

যমের দক্ষিণদ্বার অবিশ্রাম হাহাকার
যেব ডাকে সমুদ্রের জল।

নরক বর্ণনা বা পাপের শাস্তি বর্ণনায় রতিদের গম্ভীর পরিবেশ রচনা করেছেন। কবি মৃগীর বিলাপের প্রতি অধিক নজর দিয়েছেন, ফলে করুণপস একটা বিষাদময়তায় সৃষ্টি করেছে। মৃগী বর্ণিত শিবমাহাত্ম প্রচারই কবির প্রধান উদ্দেশ্য তা ব্যক্ত হয়েছে।

রামরাজা

চট্টগ্রাম অঞ্চলের আরেকজন কবি। এঁর ভণিতায় পাওয়া যায় - 'শঙ্কর কিঙ্কর রামরাজা'। একস্থানে 'শিশু' শব্দটি থাকায় ড. সুকুমার সেন এঁকে 'শিশুরাম রাজা' বলেছেন। কিন্তু ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শিক্ষাবিদদের ধারণা 'শঙ্কর রাম রাজা' নামটি সঠিক। কাব্যের

সম্পাদক আব্দুল করিম মনে করেন কবি ছিলেন মগ। কারণ পুথিটি পাওয়া গেছে মগের বাড়ি থেকে। লিপিকারও একজন মগ। রামরাজা ও রতিদেবের কাব্যের মধ্যে মিল আছে প্রচুর পরিমাণে। হয়ত দুজনেই এক স্থানের কবি বলেই এই আশ্চর্যরকম সাদৃশ্য। এটিও সংস্কৃত শিবপুরাণের শিবচতুর্দশীর বঙ্গীয় সংস্করণ। চরিত্রচিত্রণে বা বর্ণনা নৈপুণ্যে কবি খুব উল্লেখযোগ্যতার পরিচয় রাখতে পারেন নি। তবে কোথাও কোথাও আবার কবিত্ব শক্তি প্রাবল্য টের পাওয়া যায়। যেমন সতীহারা শিবের শোকজ্ঞাপন –

আত্ম বিস্মরিলুম মুঞি তোহ্মার বাপের শাপে।
সেই হেতু তোহ্মা লইআ ভ্রমি শোকতাপে।।
সেই কথা স্মরিলে মনে চক্ষুর জল পড়ে।
হারাইয়া পাছি তোহ্মা ধরিরাম করে।।

টিপ্পনী

রামেশ্বর ভট্টাচার্য

শিবায়নের সব থেকে জনপ্রিয় কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য অষ্টাদশ শতকে তাঁর কাব্য রচনা করেন। উনবিংশ শতকের শেষ পর্যায়ে বাংলা ১২৯৩ সালে ঈশানচন্দ্র বসুর সম্পাদনায় রামেশ্বরের শিবায়নের বঙ্গবাসী সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৫৭ সালে অধ্যাপক যোগিলাল হালদারের সম্পাদনায় শিবসংকীর্তন বা শিবায়ন নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ড. পঞ্চানন চক্রবর্তীর সম্পাদনায়।

শিব সংকীর্তন এর কাল নির্দেশক পয়ার অনুযায়ী কাব্যরচনার কালনির্ণয় অত্যন্ত কঠিন।

“শকে হল্য চন্দ্রকলা রাম করতলে।
বাম হল্য বিধিকান্ত পড়িল অনলে।।
সেইকালে শিবের সঙ্গীত হইল সারা।”

–দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর ‘বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য’ গ্রন্থে জানিয়েছেন যে “রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়নের ১৭৬৩ খীষ্টাব্দে লিখিত একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং শিবায়ন ঐ সময়ের পূর্বেই রচিত হইয়াছিল।”

কবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মেদিনীপুরাধিপতি ও কর্ণাগড়ের অধিবাসী যশৌবন্ত সিংহ –

“রঘুসিংহ মহারাজা রঘুবীর সমতেজা
ধার্মিক রসিক রনধীর।
যাহার পুণ্যের ফলে অবতীর্ণ মহীতলে
রাজা রামসিংহ মহাবীর।।
তস্য সুত যশোবন্ত সিংহ সর্বগুণযুত
শ্রীযুক্ত অজিত সিংহ পত।
মেদিনীপুরের পতি কর্ণগড়ে অবস্থিতি
ভগবতী যাহার সাক্ষাৎ।।”

রাজা রামসিংহের মৃত্যুর পরে বিদ্যোৎসাহী রাজা যশোবন্ত সিংহ কবিকে শিবসংকীর্তন রচনায়

নিয়োজিত করেন। যশোবন্ত সিংহ ১৬৫৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৩৪ খীষ্টাব্দে দেওয়ান নিযুক্ত হয়ে ঢাকায় যান এবং ১৭১১ খীষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পরে মেদিনীপুরের অধিপাতি হন। অর্থাৎ ১৭১১ থেকে ১৭৩৪ সালের মধ্যে কোন একটি সময় কবি রামেশ্বর তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন।

"রাজা রামসিংহ সুত যশোবন্ত নরনাথ
তথ্য পোষ্য দ্বিজ রামেশ্বর।"

১৭১১ খীষ্টাব্দে যশোবন্তের সিংহাসন লাভ এবং কবির মুদ্রিত কাব্যে উদ্ধৃত ১৬৩৪ শকাব্দ অনুযায়ী অনুমান করা হয়। ১৭১২ খীষ্টাব্দেই কবি এই কাব্যরচনা সমাপ্ত করেন। কবির আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় যে যদুপুরে অর্থাৎ মেদিনীপুর জেলার যদুপুর গ্রামে আছে কবি বাস করতেন সেখানে কোন কারণে রাজা রামসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র হেমৎ সিংহ কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে রাম সিংহের আশ্রয়ে আসেন।

"পূর্ববাস যদুপুরে হেমসিংহ ডাঙে যারে
রাজা রামসিংহ কৈল প্রীত।
স্থাপিয়া কৌশিকী তটে বরিয়া পুরাণ পাঠে
রচাইল মধুর সঙ্গীত।।"

যশোমন্তের রাজধানী কর্ণগড় মেদিনীপুর শহর থেকে তিন ক্রোস দূরে। তার ধ্বংসাবশেষ এখনও রয়েছে। জনশ্রুতি অনুযায়ী সেখানে যশোমন্ত প্রতিষ্ঠিত মহামায়ার মন্দিরে কবি রামেশ্বর যোগাশনে বাস শিবচন্দ্র যপ করতেন।

রামেশ্বরের কাব্যের আসল নাম চল 'শিব-সংকীর্তন' গ্রন্থে কোথাও 'শিবায়ন' বা 'শিবমঙ্গল' নামের উল্লেখ নেই। যদিও মেদিনীপুর অঞ্চলে এই কাব্য শিবায়ন নামেই পরিচিত', অনুমান করা হয় রামায়নের প্রভাবে কাব্যের নাম হয়েছে শিবায়ন।

কাব্যে ভণিতা স্বরূপ রামেশ্বর বলেছেন

"যশোবন্ত সিংহে দয়া কর হরবধূ।
রচে রাম অক্ষরে অক্ষরে ঘরে মধু।।"

মধুক্ষরার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্র কাব্য হিসেবেও কবি তাঁর রচনাকে অভিহিত করেছেন –

"ভব-ভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর।"

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবসংকীর্তন সাতটি পালা ও জাগরণ আরম্ভ পালায় সমাপ্ত হয়েছে। প্রথম তিনটি পালায় পুরাণাশ্রিত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয় পালার মাঝামাঝি অংশ থেকে লৌকিক কাহিনী অনুসৃত হয়েছে। আটটি পালার কাহিনীসূত্র নিম্নরূপ

প্রথম পালা ঃ দেবতাদের উৎপত্তি বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পালা ঃ দক্ষযজ্ঞ নাশ, সতীর দেহত্যাগ ও দক্ষের ছাগমুন্ডের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয় পালা ঃ হিমালয়ের ঘরে গৌরীর জন্ম, সেখানে শিবের আগমন, মহাদেবের তপস্যা, গৌরীর কাথে ছদ্মবেশী শিবের শিবনন্দা, শিবের বিবাহের উপক্রম –এই পর্যন্ত পৌরাণিক কাহিনী অনুসৃত হয়েছে পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, কালিদাসের কুমার সম্ভবন প্রমুখ পৌরাণিক

টিপ্পনী

শাস্ত্র ও ধ্রুপদী সাহিত্য অবলম্বনে।

তৃতীয় পালার পরবর্তী পর্যায় থেকে রামেশ্বর লৌকিক শিবের কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয় পালা ঃ (শেষ অংশ) বরবেশী শিবকে দেখে মেনকার বিলাপ, শিবের মোহনমূর্তী ধারণ ও হরগৌরীর বিবাহ।

চতুর্থ পালা ঃ শিবের গার্হস্থ্য জীবন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

পঞ্চম পালা ঃ কৃষ্ণের রুক্মিনীহরণ ও বিবাহ। (পৌরাণিক কাহিনী)

ষষ্ঠ পালা ঃ বাণরাজার কন্যা উষার সঙ্গে কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের গোপন মিলনকে কেন্দ্র করে হরিহরের যুদ্ধ – এই পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে মহাদেবের কৈলাস ত্যাগ ও কৃষিকার্য গ্রহণের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

সপ্তম পালা ঃ শিবের মাছ ধরার লৌকিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

জাগরণ আরম্ভ পালা ঃ গৌরীর শাখা পরাকে কেন্দ্র করে হরগৌরীর দুঃখসুখের জীবন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

কাব্যের লৌকিক অংশ হরপার্বতীর দারিদ্রময় জীবনের যে চিত্র কবি ফুটিয়ে তুলেছেন তা অত্যন্ত সহজ ও সরস। পার্বতী কৃষিকার্যরত শিবকে কৈলাসে ফিরিয়ে আনার জন্য ডাঁশ মশাকে পাঠালেন, যার

"সূক্ষ্ম বটে শরীর সামর্থ্যে নহে ক্রটি।
হাতী পারা জন্তুকে হারাতে পারে দুটি।।"

মশার হাত থেকে আত্ম রক্ষা করতে গিয়ে মহাদেব যেভাবে মশা মেরেছেন তার বর্ণনা অতি কৌতুকময়।

"ঠুস ঠাস ঠুই ঠাঁই ঠাকুরের করে।
দশ পাঁচ উড়্যা যায় দুই চারি মরে।।"

মশা-মাছি-জোঁক কোন কিছুতেই মহাদেবকে কাহিল করতে না পেরে কাদিনী বেশে মহামায়া এলেন। বাগদিনী মোহে মহাদেব

"ধরেন পাবদা-পুঁঠি পাঙ্গাস পাঠীন।
চিতল চিঙ্গড়ী চেলা চাঁদকুড়্যা মীন।।"

এই অবস্থায় বাগদিনী বেশী মহামায়া কৌশলে "শিবের মাণিক্য অঙ্গুরী" নিয়ে কৈলাসে চলে গেলেন আর বাগদিনীর দেখা না পেয়ে বিফল মনোরথে কৈলাসে ফিরে শিব পার্বতীর কাছে তিরস্কিত হলেন।

"বাগতির লাজ নাঞি ঘরে ঢুকে মোর।
ছেল্যাপুল্যা ছুঁইলে ছুতুক হবে ঘোর।।
ভালো যদি চাও তো এখান হৈত্যে যাকু।
যেখানে রাখিয়া আল্য বাগদিনী মাগু।।"

টিপ্পনী

নারদের মধ্যস্ততায় এই ঝগড়ার মীমাংসা হলেও নারদের পরামর্শেই দেবী শিবের কাছে শঙ্খ পরার বাসনা ব্যক্ত করলে শিব জ্বলে উঠে বলেন

"ভিখারীর ভার্য্যা হৈয়া ভূষণের সাধ।
কেন অকিঞ্চন সনে কর বিসম্বাদ।।
বাপ বটে বড়লোক বল গিয়া তারে।
জঞ্জাল ঘুচুক যাহ জনকের ঘরে।।"

টিপ্পনী

এই অবস্থায় দেবীর অভিব্যাক্তি ব্যাক্ত করে কবি বলেছেন

"একথা ঈশ্বরী শুনি ঈশ্বরের মুখে
শূন্য হইল সব যেন শেল মাইল বুকে।।"

এর পরে পার্বতীরক পিত্রালয় গমন দারিদ্র্য পীড়িত বাঙালি বধূর অবস্থানকেই সূচিত করে।

কৌতুক রসের আবহে কবি সপুত্র মহাদেবের ভোজন এবং পার্বতীর পরিবেশনের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা বাঙালী পরিবারের অতি পরিচিত চিত্র –

তিন জনে বার মুখ পাঁচ হাতে খায়।
এই দিতে এই নাই হাঁড়ি পানে চায়।।
দেখি দেখি পদ্মাবতী বসি এক পাশে।
বদন বসন দিয়া মন্দ মন্দ হাসে।
সুক্ত খেয়ে ভোক্তা চায় হস্ত দিয়া শাকে।
অন্ন আন অন্ন আন রুদ্র মূর্তি ডাকে।।
কার্তিক গণেশ ভাবে অন্ন আনমা।
হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য ধরে খা।।"

এই প্রসঙ্গে 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' তৃতীয় খন্ড ঃ দ্বিতীয় পর্বে, ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি উল্লেখের দাবী রাখে – "ভারত চন্দ্রের রঙ্গ রসে মার্জিত নাগরিকতার চাকচিক্য বেশি, রামেশ্বরের হাস্য কৌতুক গ্রাম্য কৃষাণজীবনেরই সরিক। তাঁহাকে কৃষকের কবি বলা না গেলেও (কারণ সাধারণ কৃষকে তাঁহার কাব্য বুঝিবে না) এই কাব্য রচনাকালে তাঁহার মানসনয়নে যে রাঢ়ের কৃষকপল্লীর বাস্তবচিত্র ভাসিতেছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কয়েকস্থলে অবশ্য কবি প্রায় ভারত চন্দ্রের মতোই কৃতিত্ব দেখাই যাচ্ছেন। সপুত্র মহাদেবের ভোজন এবং দুর্গার পরিবেশনের বর্ণনাটি চমৎকার ফুটিয়াছে।"

"কুলীনের পাকে আর কি বলিব আমি।
বাছার অশেষ দোষ ক্ষমা কর তুমি।।
আঁটু ঢাক্যা বস্ত্র দিয় পেট ভরা ভাত।
প্রীত করা যেমন জানকী রঘুনাথ।।"

বিয়ের পরে কন্যা বিদায়ের প্রাকমুহূর্তে শাশুড়ী মেনকা, তাঁর জামাই মহাদেবের কাছে কন্যার জন্য যে 'আঁটু ঢাক্যাবস্ত্র' ও 'পেটু ভরা ভাত' দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন সমস্ত বাঙালী জামাইয়ের কাছে শাশুড়ীর বিনীত অনুরোধ হিসেবে কালোত্তীর্ণ হয়েছে, মনে হয় এ কাব্য যেন

অষ্টাদশ শতকের কৌলিন্য প্রথার সামাজিক ইতিহাসে তুলে ধরে, যেখানে "আঁটু ঢাক্যা বস্ত্র দিয় পেটভরা ভাত" –"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে" (ভারতচন্দ্র, অন্নদামঙ্গল) অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়।

অন্নদামঙ্গল ও কবি ভারতচন্দ্র

কালিকামঙ্গল – অন্নদামঙ্গল ধারার অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি, বলা যেতে পারে মধ্যযুগের অন্যতম প্রধান কবি ভারতচন্দ্র।

টিপ্পনী

কবিজীবনী ঃ হাওড়া জেলার ভুরসুট (প্রাচীন বাংলা ভূরশ্রেষ্ঠ গ্রাম) পরগণার পেঁড়ো গ্রামে ভারতচন্দ্রের জন্ম। গ্রাম ভূস্বামী নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র ভারতচন্দ্র।

"ভূরিশিটে ভূপতি নরেন্দ্ররাঢ় সুত।"

তাঁর মা ও স্ত্রীর ভবানী ওরাধা। তিনপুত্র – পরীক্ষিত, রামতনু ও ভগবান। কবি ঈশ্বর গুপ্ত ভারতচন্দ্রের জীবনী সংগ্রহ করে জানিয়েছেন যে, তাঁর জন্ম ১৬৩৪ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭১২ খিঃ এবং তিরোধান ১৬৮২ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৬০ খিঃ। তবে মতান্তরে ১৭০৫–১৬ খিঃ মধ্যে ভারতচন্দ্রের জন্ম বলে অনেকেরই অনুমান।

ধনী পিতার সন্তান হয়েও ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে কবিকে যেতে হয়। এরপর নানান স্থানে নানান কর্মে নিয়োজিত হন। সেই সঙ্গে সংস্কৃত, ফারসী ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। বর্ধমান রাজার কারাগারেও বন্দি হয়েছিলেন। বৈষ্ণব দলে যোগ দিয়ে 'মুনি গোঁসাই' নামেও খ্যাত হন। শেষ পর্যন্ত ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সান্নিধ্যে আসেন। ইন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে ব্যবসার সূত্রে কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পরিচয় ছিল। তাঁর অনুরোধেই কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে চল্লিশ টাকা মাসোহারায় সভাকবি নিয়োগ করেন। কৃষ্ণনগরে বসবাস কালেই অন্নদামঙ্গল কাব্যটি লেখেন। রাজাজ্ঞায় কাব্যে রাজার পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের প্রসঙ্গ অন্তর্ভূক্ত হয়। কাব্যটি লেখার জন্য কৃষ্ণচন্দ্র 'রায়গুণাকর' উপাধি দান করেন। সেইসঙ্গে ছয়শ টাকা বিনিময়ে মূলাজোড় গ্রামটি দান করেন। পরবর্তীকালে মূলাজোড়েই কবি স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তবে কবির দারিদ্র কাটেনি। প্রথম চৌধুরী বলেছেন – "রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ হয়েও তাঁর দারিদ্র্য ঘোচেনি, এবং দারিদ্র্য তাঁকে নিরানন্দ করিতে পারেনি, করেছিল শুধু 'প্রমোদের প্রভু' (ভারতচন্দ্র)"।

কাব্যপরিচয় ঃ ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কীর্তি অন্নদামঙ্গল। এতে দেবী অন্নপূর্ণার সঙ্গে সঙ্গে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের কীর্তিত্ত বর্ণনা করা হয়েছে। কাব্যটিতে তিনটি আলাদা অংশ – ক) শিবায়ন–অন্নদামঙ্গল, খ) বিদ্যাসুন্দর বা কালিকামঙ্গল এবং গ) মানসিংহ বা অন্নপূর্ণামঙ্গল।

প্রথমাংশে আছে – সতীর দেহত্যাগ, উমারূপে পূর্বজন্ম গ্রহণ, আস্যা, মহেশ্বরের সঙ্গে বিবাহ, ঘরসেরস্থালি, অন্নপূর্ণার রূপধারণ, কাশীর প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। এই উপাখ্যানটি পৌরাণিক। এইটই প্রকৃত অন্নদামঙ্গল। এরপর হরি হোড়ের কাহিনী। গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্তী বড়গাছি গ্রামের দরিদ্র বিষ্ণু হোড় দেবীর আশীর্বাদে হরিহোড়কে সন্তান রূপে পান। দেবীর কৃপায় হরিহোড়

টিপ্পনী

লক্ষপতি হন। বৃদ্ধ বয়সে তরসী ভার্যাকে বিয়ে করেন। সংসারে সতীন কলহ শুরু হয়। এই অশান্তিতে দেবী ক্ষুব্ধ হয়ে লক্ষ্মীর ঝাঁপি বিয়ে গাঙ্গিনী পার হয়ে আন্দুলিয়া গ্রামে বাহ্মণ রাম সমাদ্দার-এর বাড়িতে আসেন। রাম ও সীতার পুত্র ভবানন্দ মজুমদার দেবীর কৃপা লাভ করেন।

দ্বিতীয়াংশের সূচনা রাজা মানসিংহের প্রতাপদিত্ত্যকে দমনের জন্য বর্ধমানে আগমন দিয়ে। ভবানন্দ তখন কানুনলে এবং তিনি মানসিংহকে রসদ যোগাতে বর্ধমানে আসেন। সেখানে থাকার সময় সুন্দরের কাটা সুরঙ্গ দেখে কৌতূহলী মানসিংহ ভবানন্দের কাছে বৃত্তান্ত জানতে চান। ভবানন্দ বিদ্যা-সুন্দরের কাহিনীর বর্ণনা দেন। রাজকন্যা বিদ্যার প্রতি সুন্দরের অদম্য প্রেম, প্রেমকে সার্থক করার জন্য বিদ্যার শয়নকক্ষে পৌঁছবার জন্য সুন্দর সুরঙ্গ খনন করে বিদ্যার সঙ্গে মিলিত হন। বিদ্যার সঙ্গে সুন্দরের বিবাহ। রাজ্যশাসন ও শেষে পুত্রের হাতে রাজ্যভার তুলে দিয়ে শাপমুক্তি ও স্বর্গারোহণ।

তৃতীয়াংশের কাহিনীতে আছে - মানসিংহের যশোরে আগমন ও দেবী অন্নদার কৃপায় ভবানন্দের সহায়তায় প্রতাপাদিত্যের পরাজয়। ভবানন্দ বাদশাহের কাছ থেকে খেলাৎ পাবার জন্য দিল্লি যান এবং সেখানে দৈবী মাহাত্ম্যে রাজাপদে ভূষিত হন।

বলাবাহুল্য এই ঐতিহাসিক বর্ণনায় সত্য কতটুকু আছে তা নিয়ে যথেষ্ঠ সন্দেহের অবকাশ আছে।

অন্নদামঙ্গলের ভাষা-ছন্দ-অলংকার ঃ ভারতচন্দ্র ছিলেন রাজসভার কবি দলে তিনি জানতেন সরস প্রাঞ্জল ভাষা ব্যবহারে কাব্য প্রসাদগুণযুক্ত হবে।

"পড়িয়াছি সেই মত লিখিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি।।
নারবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল।।"

অর্থাৎ সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত কবি সংস্কৃত ছেড়ে সমকালীন চাহিদা মেলে ফারসী মিশ্রিত বাংলা ভাষায় কাব্যচর্চা করেছেন। একে দরবারী ভাষাও বলা যেতে পারে। যেমন মানসিংহ বা অন্নপূর্ণামঙ্গল খন্ডে মানসিংহ ও জাহাঙ্গীরের কথোপকথনের ভাষা -

বন্দগী করিবে বন্দী জমিনে ঠুকিয়া।
করিম দিয়াছে মাথা করম করিয়া।।

ফারসীর পাশাপাশি তিনি তৎসম শব্দও বহুল পরিমাণে প্রয়োগ করেছেন। বলা যেতে পারে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ শব্দাশিল্পীতে তিনি। ভারতচন্দ্রের কাছের প্রধানরস তাঁর বাগবৈদগ্ধ্য। অত্যন্ত সহজ ও সংক্ষিপ্ত কথায় গভীরতম ভাবদ্যোতক প্রবচনের মতো পঙ্‌ক্তি রচনার তিনি অদ্বিতীয়।

১) মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

২) সে কহে বিস্তর বিছা যে কহে বিস্তর।

৩) যার কর্ম তার সাজে

অন্য লোকে লাঠি বাজে।

৪) আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।

৫) নগর জুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?

৬) বাঘের বিক্রমসম মাঘের হিমানী।

৭) বড়র পিরীতি বালির বাঁধ
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেক চাঁদ।

৮) মিছা কথা কিঁচা কতক্ষণ রয়।

ভারতচন্দ্রের আগে বাংলা ছন্দ পয়ার-ত্রিপদী আবদ্ধ ছিল। ভারতচন্দ্র সেই গন্ডিকে ভেঙ্গে দৃশ্য-বৈচিত্র্য নিয়ে এলেন। মিশ্রবৃত্ত ছন্দ ব্যবহারের পাশাপাশি ভুজঙ্গপ্রয়াত, তুলক, তোটক প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ, হরিগীতা নামক প্রাকৃত ছন্দ এবং গ্রাম্য ধামালী ছন্দ ব্যবহার করেছেন। এছাড়াও রয়েছে লঘু ত্রিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী, একাবলী, দলবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ছন্দ।

ক) ভুজঙ্গপ্রয়াত - মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ববম্বব ববম্বব শিঙ্গাঘোর বাজে।।

খ) পেটক - রতিরঙ্গ রচন-মজিলা দুজনে।
দ্বিজভারত তোটক শব্দঘণে।।

গ) তূণক - মৈল দক্ষ ভূত যজ্ঞ সিংহনাঙ্গ ছাড়িছে।
ভারতের তূণকের ছন্দোবন্দ বাড়িছে।।

ঘ) ধামালী - আই আই ওই বুড়া কি
এই গৌরীর বর লো।
বিয়ারবেলা এয়োর মাঝে
হৈল দিগম্বর লো।।

ঙ) একাবলী - বড়র পিরীতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেক চাঁদ।।

অলঙ্কার প্রয়োগেও ভারতচন্দ্র কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। রাজসভার কবি ছিলেন তিনি, দলত তাঁকে সাড়ম্বরপূর্ণ কাব্য পরিবেশক করতে হবে। তাই ছন্দ-অলংকার প্রয়োগে বিপুলতা ও বৈচিত্র্য বিস্তার ঘটানোর প্রয়োজন। ভারতচন্দ্র এই সহজ সত্যটি জানতেন এবং তাঁর পান্ডিত্য ও সহজাত কবিত্ব দিয়ে এই নৈপুণ্যে প্রদর্শনী করেছেন। শব্দ ও অর্থ - দূরীকরণের অলংকারই প্রয়োগ করেছেন।

১) অনুপ্রাস - কোটার নয়নে দুটি মিটিমিটি করে।

২) চমক - ক) ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুণে।
খ) মায়া করি মহামায়া হৈল বুড়ি।

৩) শ্লেষ - অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।

টিপ্পনী

কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন ।।

৪) উপমা – মাঘের বিক্রমসম বাঘের হিমাণী।

৫) ব্যাজস্তুতি – সভাজন শুন জামাতার গুণ
বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই সেথা সেথা ঠাঁই
সিদ্ধিতে নিপুণ দড় ।।
সুখে সুখ জানে দুখে দুখ মানে
পরলোকে নাহি ভয়।
কি জাতিকে জানে কারে নাহি মানে
সদা কদাচারময় ।।

৬) রূপক – মুখপদ্ম গন্ধে মত্ত মধুকর উড়ে।

৭) বিরোধাভাস – অচক্ষু সর্বত্র চান অর্পণ শুনিতে পান
অপদ সর্বত্র গতাবাতি।

৮) ব্যতিরেক – চন্দ্রের হৃদয়ে কালী কলঙ্ক কেবল।
কৃষ্ণচন্দ্র হৃদে কালী সর্বদা উজ্জ্বল ।।
দুই পক্ষ চন্দ্রের অসিত সিত হয়।
কৃষ্ণচন্দ্রে দুই পক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময় ।।

এরই সঙ্গে বলা যায় কবির অনুকার শব্দ ব্যবহারের দক্ষতা ঈর্ষনীয়।

লটাপট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলছল টলটল কলকল তরঙ্গা ।।

ভারতচন্দ্রের কাব্যের ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথম চৌধুরী যা বলেছিলেন সেটিকে যথার্থ বলে মনে হয় – "As regards Bharat Chandra's language. There is nothing more limpid, more bright more gracefull one more elegant in the whole range of Bengali Literature."

আর সেই জন্যই যেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন – "বঙ্গ ভারতীর কণ্ঠে তিনি যে সাতনরী হার দোলাইয়া দিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটিতে দামী পাথর ও মণিমাণিক্যের প্রভা স্পষ্ট।"

চরিত্র পরিকল্পনা ঃ কেউ কেউ অন্নদামঙ্গলের চরিত্রকে টাইপড চরিত্র বলে সমালোচনা করেছেন। কিন্তু চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে তাদের মধ্যে থেকে অন্তর্নিহিত সত্যটি প্রকাশিত হয়। বিশেষত দেবচরিত্রগুলির আড়ালে মানবিক রসাবেদন লুকিয়ে আছে। দেবতারা মর্ত্যমানবে পরিণত হয়েছেন। যেমন শিব ভিখারী, বেদে বা যাদুকর শ্রেণীর মানুষ। ভিক্ষার ঝোলা নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ান। আর তাঁকে দেখে ছেলের দলরসিকতা করে –

কেহ বলে এই এল শিব বুড়া বাপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ ।।

টিপ্পনী

কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল।
কেহ বলে জ্বালা দেখি কপালে অনল।।

আবার বিয়ের আসরে উপস্থিত সধবা মহিলারা শিবকে বিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করেছেন –

আই আই ওই বুড়া কি এই গৌরীর বর লো।
বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে হৈল দিপশ্চর লো।।

সবমিলিত শিব তাঁর পৌরাণিক শিবত্ব বজায় রাখতে পারেন নি। মা মেনকা মেয়ে উমার এই বর জোটাজোয় ঘটক নারদকে গালি দিয়েছেন –

ওরে বুড়া আঁটকুড়া নারদা অল্পেয়ে।
হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে।।

এখানে কন্যা দায়গ্রস্তা বাঙালি মাতার চিরকালীন বাণী ধরা পড়ে। মেনকা তাই অতি দুঃখে বলেছেন –

উমার গলে মণির হার বুড়ার গলে হাড়ের ভার
কেমন করে উমা করিবে বুড়ার ঘর লো।

–এতো মেয়ের মায়ের চিরন্তন আশঙ্কার বিষয়। কৌলিন্য-প্রথা বজায় রাখতে গিয়ে বয়ঃক্রম ও অর্থ সামর্থের দিকে তাকান হয় না। ফলে যেন ফারাক থেকেই যায়। মা যেন অন্তরের বেদনা থেকেই এই দুঃখ প্রকাশ করেন। মেনকার মধ্য দিয়ে সমকালীন বাঙালি মাতার তরিত্রটি স্পষ্ট হয়।

বামদেবের চরিত্রটি দ্বন্দ্বমূলক। তিনি সদা বেদ পরায়ণ নিকট, কিন্তু তিনি আমাদের চিরাচরিত ভাবনাকে বিপর্যস্ত করে তোলেন। কেননা, তিনি প্রথমে ভেকধারী বৈষ্ণব, শিবকে নিন্দা করতেন। পরবর্তীতে তিনি শিবের দলে ভিড়ে পুরশে ধর্মকে নিন্দা করতে শুরু করেন। দলবদলের সঙ্গে সঙ্গে দেশবদলও ঘটে।

মুছিয়া দেলিয়া হরি-মাদ্রির তিলকে।
অর্ধচন্দ্র ফোঁটা কৈল কপালে দলকে।।
ছিঁড়িয়া তুলসী কণ্ঠ লব্ধি মালা যত।
পরিল রুদ্রাক্ষমালা সইব অনুগত।।

সমকালীন সমাজে যে অবক্ষয় তার পরিচয় ফুটে উঠেছে ব্যাসদেবের চরিত্রে। জ্ঞানী পন্ডিত হয়েও তিনি অহংকারী, স্বার্থপরাদেবী গঙ্গাকে তুই-তোকারী করে গালি দেন। ধর্ম নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছিল সেই সময়ে ব্যাসদেব তারই প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

ড. সুকুমার সেন মন্তব্য করেছন – "ভারতচন্দ্রের রচনায় কোন সজীব ব্যক্তি মানুষেরই দেখা মিলে না। সবাই যেন ছাঁচে ঢালা। তাহারা যেন মুখের কথার মানুষ।... মুকুন্দরাম দেবতাকে মানুষ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র দেবতাকে নট নাচাইয়াছেন।" এখানেই ড. সেন ঈশ্বরী পাটনীকে একমাত্র বাস্তব মানুষ বলে অভিহিত করেছন। মাঝি ঈশ্বরীর সচ্চলচিত্ত পাঠককে অভিভূত করে। অধ্যাপক সুকুমার সেন অনুসরণে আমরা বলতে পারি – "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে –এই সামান্য প্রার্থনার মধ্যে শুধু ঈশ্বরী পাটুনীর নহে, অনাদিকালের দৈবহত দরিদ্র বাঙ্গালী

টিপ্পনী

নরনারীর স্নেহ-ব্যাকুলতা প্রতিধ্বনিত।”

সমাজ ভাবনা

ভারতচন্দ্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পূর্বপুরুষের প্রশস্তিমূলক কাব্য লিখতে চেয়েছিলেন। তাই ইতিহাসের সত্যের সঙ্গে অনেক কল্পনাকেও মিশিয়েছিলেন। মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত বা বন্দি করতে পারেন নি। তাঁর পরবর্তী বাংলার সুবেদার ইসলাম খাঁ (কাল ১৬০৮ - ১৬১৩ খ্রিঃ)-র আমলে মুঘল সেনানায়ক মির্জা নাথন প্রতাপাদিত্যকে ১৬১২ খ্রিঃ পরাজিত করেন। যদিও দেওয়ান কার্তিকেয় রায়ের “ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত্রম্” গ্রন্থে জানিয়েছেন যে, মানসিংহ ভবানন্দ মজুমদারের সহায়তায় প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত ও বন্দি করেন। যাইহোক না কেন, ভারতচন্দ্র যে সময় কাব্যটি লেখেন তখনও ইংরেজ অধীনস্থ হয়নি ভারত। ফলে দেশপ্রেম সেভাবে প্রকাশ পায়নি। পরবর্তীকালে প্রতাপাদিত্যকে নিয়ে যে দেশপ্রেমমূলক সাহিত্য রচিত হয়েছিল ভারতচন্দ্রের সময়ে তা রচনার সুযোগ ছিল না। কিন্তু রাজস্যবর্গের যাপন ও শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে কবি সুপ্রসন্ন ছিলেন না। এমনকী নবাবের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বর্গী হানাকে তিনি সমর্থন জানিয়েছেন। রূপকের আড়ালে কাব্যে সমালোচনা করেছেন রাজাদের। তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন চৈতন্যপূর্ব মানসিক সংকীর্ণতা, ধর্মান্ধতা এবং পরবর্তীকালে অবক্ষয়, অবনতিকে। দুইয়ের প্রভাব পড়েছে ভারতচন্দ্রের কাব্যে। যদিও তাঁকে অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যদের মতো শিক্ষাবিদের মত যে, ভারতচন্দ্রের মধ্যে মধ্যযুগ পূর্ণছাপ সমাহিত, পরবর্তীযুগের সূর্যোদয় তিনি দেখেননি। তবে মঙ্গলকাব্যধারার নিজস্বতার পরিচয় দিয়েছেন। অধ্যাপক ভট্টাচার্যের মন্তব্য - “তিনি মঙ্গলকাব্যের যুগের অবসান ঘটাইয়াছেন।” তিনি আগামীযুগের অনদূত ও বটে। তা না হলে মধ্যযুগীয় দেববাদনির্ভর সাহিত্যে কেন সন্দেহসূচক বাণী উচ্চারিত হবে -

“নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়”

- এ-ই তো যুগসন্দিক্ষণের লক্ষণ।

টিপ্পনী

শাক্ত পদাবলী

মধ্যযুগের প্রথমার্ধে বৈষ্ণব পদাবলীর কর্তৃত্ব থাকলেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে শাক্ত সাহিত্যের ধারার সূচনা হল। উমাকে কেন্দ্র করে শক্তি সাহিত্যের ধারা গড়ে উঠল। মা-কে আশ্রয় করে বিপরীত মানুষ নিজেদের দুঃখ-দুর্দশাকে ব্যক্ত করলেন। সেই সঙ্গে তাঁকে কন্যারূপেও হৃদয়ে ঠাঁই দিলেন। পুরাণ অনুযায়ী দেবী পার্বতী যখন চন্ড-মুন্ডের সঙ্গে লড়াই করছেন। সেই সময়ে দেবীর ভ্রূকুটি কুটিল থেকে উৎপত্তি হল করালবদনা, বিকটদর্শনা, অস্থিচর্মকার, উদ্যত্ত খড়গ্ হস্তা দেবী কালিকার। তিনি দুষ্টের দমনকর্ত্রী। এই দেবীই বাংলার আর্দ্র আবহাওয়ায় মাতৃরূপ পরিগ্রহ করলেন। তিনি আমাদের কাছে আশ্রয়দাত্রী মাতা। আবার তাঁকেই আমরা মেয়ে রূপে কল্পনা করে আপনগৃহে স্থান দিয়েছি। সেইসঙ্গে কবিরা দুটি পরিবারে কথা বলেছেন - একটি হিমালয়-মেনকার, অন্যটি হর-গৌরীর। এই দুটি পরিবার যেন বাঙালির আপন পরিবার। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বৈষ্ণব পদাবলী আমাদের ভাবের কথা, শাক্তপদাবলী আমাদের ঘরের কথা ব্যক্ত করেছে।

মূলত দুভাগে শাক্ত পদাবলী বিভক্ত - ১) আগমনী-বিজয়ার পদ এবং ২) ভক্তের আকুতি পর্যায়ের পদ। প্রথমটিতে উমাকে কন্যারূপে দেখে কবিরা বাৎসল্যরসের সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে উমা স্বয়ং মা। প্রতিবাৎসল্য রসে কবিরা নিজেদের আকুতি-আবেদনকে মাতৃনাদে নিবেদন করেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শুরু হলেও এখনও পর্যন্ত শাক্তপদ রচিত ও গীত হচ্ছে। তবে প্রধান কবিরা হলেন - রামপ্রসাদ সেন, কমলকান্ত ভট্টাচার্য। পরবর্তীকালে মধুসূদন দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ বা নজরুল ইসলামরাও বিষয়ে কাব্য রচনা করেন।

টিপ্পনী

১) আগমনী-বিজয়া ঃ হিমালয়-মেনকার কন্যা উমার বিয়ে হয় শিবের সঙ্গে। মেয়েকে শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়ে আনেকদিন ধরে মা মেনকা কন্যা বিহনে চিন্তিত ও দুঃখিত। গিরিরাজকে তিনি বারে বারেই মেয়েকে বাপের বাড়ি আনার কথা বলেন -

আমি কি হেরিলাম নিশি-স্বপনেঃ
গিরিরাজ অচেতনে কত না ঘুমাও হে।
এই এখনি শিয়রে ছিল, গৌরী আমার কোথা গেল হে,

এই নিশায় স্বপ্ন থেকে যাত্রা শুরু। তারপর মায়ের সন্তানের জন্য বিলাপ ও ক্রমে পাগলিনী পারা হয়ে ওঠা। গিরিরাজকে বারংবার উমা আনার অনুরোধ জানান।

গিরি হে, তোমায় বিনয় করি আনিতে গৌরী,
যাও হে একবার কৈলাসপুরে।

অবশেষে হিমালয় শিবালয়ে গিয়ে উমাকে নিয়ে আসেন। কিন্তু উমাও শিবের অর্ধাঙ্গিনী সুতরাং তাঁকে আসার আগে মহাদেবের অনুমতি নিতে হয়। তারপর রণরঙ্গিণীবেগে মায়ের অঙ্গনে মেয়ের প্রবেশ এবং মা-মেয়ের মান-অভিমানের পালা। হিমালয়গৃহে কন্যার আগমনে আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

কেমন করে চারটি দিন কেটে গিয়ে নবমী নিশি আসে। পরদিন প্রভাতে কৈলাসে গমন উমার। মা ছাড়াতে চালনা মেয়েকে। তাই নবমীর রাত্রিকে চিরকালীন হবার মিনতি জানান -

যেও না, যেও না, নবমী রজনী,
সন্তাপহারিনী হয়ে তারাদলে।
গেলে তুমি দয়াময়ি, উমা আমার যাবে চলে।
তুমি হলে অবসান, যাবে মেনকার প্রাণ

তবুও নিশার আঁধার কাটে। স্বয়ং শঙ্কর এসে উপস্থিত হন হিমালয়ের দ্বারপ্রান্তে পার্বতীকে নিয়ে যেতে।

এ দ্বারে বাজে ডমুর, হর বুঝি নিতে এল।
নবমী না পোহাইতে অমনি এসে দেখা দিল।।

বক্ষফেটে যায়। তবু চলে যেতে দিতে হয়। মেনকা চোখের জলে মেয়েকে বিদায় জানান।

এস মা, এস মা উমা, বলো না আর 'যাই যাই'।

মায়ের কাছে, হৈমবতি, ওকথা মা বোল্‌তে নাই।।
বৎসরান্তে আসিস্‌ আবার, ভুলিস্‌ না মায়, ওমা আমায়!
চন্দ্রাবনে যেন আবার মধুর ‘মা’ বোল শুনতে পাই।।

উমার বাপের বাড়ি আসা উপলক্ষে আগমনী এবং বাপের বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবার গান বিজয়। বাঙালির নিজস্ব নীতি, মাতৃহৃদয়ের গান।

টিপ্পনী

২) ভক্তের আকুতি ঃ শাক্ত কবি মাত্রই ভক্ত। মায়ের কাছে নিজের হৃদয় যন্ত্রণার অকপট স্বীকারোক্তি। অষ্টাদশ শতাব্দীর স্থবির সমাজে জমে উঠেছিল পঙ্কিলতা। ফলে অত্যাচার-অনাচার দেখা দিয়েছিল। তখন কবিরা মাতৃপদে নিজেদের নিবেদন করে নিজ আকাঙ্খার কথা জানিয়েছেন। আগমনী-বিজয়া-তে বাৎসল্যরসে পূরিত হয়ে উমাকে কন্যা হিসাবে দেখা। আর ভক্তের আকুতি পর্যায়ে স্বয়ং জগজ্জননী দেবীর কাছে নিজেদের জন্য আবেদন প্রার্থনা। এখানে প্রতি-বাৎসল্য রস সৃষ্টি হয়েছে। মায়ের কাছে সব সমস্যার সমাধান প্রার্থনা করেছেন কবিরা।

মা গো তারা ও শঙ্করি,
কোন অবিচারে আমার পরে করলে দুঃখের ডিক্রী জারি?

মায়ের কাছেই তো সন্তানের সব আবদার। তাই মাহে দোষদিয়ে বলা যায় -

কার প্রতি সুনতি, কুমতি হও মা কার প্রতি,
আপনারো দোষ তাক কারে দোষ দিয়ে।।

সেইসঙ্গে পার্থিব সংসারে বেঁচে থাকার জন্য সম্পদের কামনা করা হয়েছে।

আমায় দে মা তবিলদারী।
বা, অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এ সংসার সবারি।

কিন্তু কবিরা জানেন এ পার্থিব সংসার মায়া বন্দন মাত্র। তাই একে ছিন্ন করে মাতৃচরণে আশ্রয়-ই তাঁদের শেষ কথা।

মা, না নির্বাণে আশ, না চাহি স্বর্গাদি বাস,
নিরখি, চরণদুটি হৃদয়ে রাখিরে।
কিংবা, জননি, পদ-পঙ্কজ দেহি শরণাগত জনে কৃপাবলোকনে তারিণি!

শাক্ত পদাবলীর সমাজচিত্র

সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের যোগাযোগ চিরকালীন। বাচুলা সাহিত্যিক আদি যুগ থেকে সমাজ সম্পৃক্ততার নিদর্শন আমরা পেয়েছি। মধ্য যুগের সাহিত্য সমাজ বিচ্ছিন্ন কোনো বস্তু নয়। এযুগের এক দম অন্তিম পর্বে লেখা অষ্টাদশ। উনবিংশ শতাব্দীর শাক্ত পদাবলীতে সমাজ অন্যতম প্রধান উপাদান হয়ে উঠেছে। শাক্ত ধর্ম ও দর্শন আমাদের সমাজ-এ বহুদিন ধরে প্রচলিত ছিল। কিন্তু তা যখন লেখ্য রূপনিল তখন সমাজ বহির্ভূত তাত্ত্বিক ধর্মীয় চেতনায় আবদ্ধ থাকল না। সেই সময় কবিদের হাতে চিরন্তনের বাণী হয়ে উঠল।

আমাদের পাঠ শাক্ত পদাবলীর দুটি পর্যায় -

১) আগমনী-বিজয়া

২) ভক্তের আকুতি

দুটি পর্যায়ে দু'রকম বিষয় চর্চিত হয়েছে। অথচ দুটিতেই কবিরা সমকালকে ভুলে যাননি। আগমনী ও বিজয়ার পৌরাণিক পট্ভূমি গৌণ ভূমিকা ধারণ করে বাৎসল্য রস মুখ্য হয়ে ওঠে। কন্যা উমার প্রতি মা মেনকার বাৎসল্য। বাৎসল্যের এই প্রবল উৎসাহের পটভূমিকায় আছে তৎতকালীন সমাজের রূঢ় রীতিনীতি এবং কঠোর অনুশাসন। অষ্টম বর্গীয় কন্যাকে বিয়ে দেওয়ার রীতি ছিল তখন। এই গৌড়ীয় দান প্রথার চিত্র ফুটে উঠেছে এই পর্যায়ের পদগুলিতে। পুণ্য লাভের আশায় কন্যাকে মহেশ্বরের হাতে সমর্পণ করে সমাজের অনুশাসন রক্ষা করা হলে মাতৃ হৃদয়ের সংখ্যা দূরীভূত হয় না। মাতৃহৃদয়ের এই আশঙ্কা করুণ রাগিনীতে বারবার বেজে উঠেছে আগমনী বিজয়ার গানে। তাই মা মেনকা স্বপ্ন দেখেন -

"বাছার নেই সে গড়ন, নাই আভরণ
হেমাঙ্গি হইয়াছে কালীর বরণ।"

"একান্ন পরিবারে আমরা দূর ও নিকট, নাম মাত্র আত্মীয়কে ও বাঁধিয়া রাখিতে চাই, কেবল কন্যাকে ফেলিয়া দিতে হয়। আমাদের মিলন ধর্মী পরিবারে সেই একমাত্র বিচ্ছেদ।. ...

হর গৌরীর কথা বাংলার একান্ন পরিবারের সেই বেদনার ব্যথা। এই নিতান্ত লৌকিক বেদনার কথা শাক্ত পদাবলীতে অলৌকিক রূপরস লাভ করিয়াছে। এগুলির রঙ্গভূমি বস্তুত কৈলাশ বা হিমালয় পুরী নহে। প্রতি গৃহস্থের হৃদয়ে ইহার অনুভূতি ক্ষেত্র।"

রবীন্দ্রনাথ কৃত আগমনী বিজয়া সম্পর্কিত এই মন্তব্যটি থেকে আমরা এই কৌলিন্য পদে বিবৃত তৎকালীন সমাজকে স্পষ্ট রূপে প্রত্যক্ষ করতে পারি। কৌলিন্য প্রথার যুগে আর্থিক স্বচ্ছল্যতা, বয়স ইত্যাদির বিচার না করে কেবল মাত্র কুল রক্ষার তাগিদে কন্যাকে কে রকমে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হত। ফল স্বরূপ বিবাহ পরবর্তী জীবনে দরিদ্র ও শত পত্নীর লাঞ্ছনা সহ্য করতে হত। মেনকার আর্তনাদের মধ্যে যেন সেই চিত্র ফুটে ওঠে,

বিয়ে দিলে এমনি ঘরে ভিক্ষা করে কাল হরে
অন্ন বস্ত্র নাহিক ঘরে, অতি দুঃখিনী

একে সতীনের জ্বালা, না সহে অবলা, জাতনা প্রাণে কত না সরেছে।
তাতে সুর ধ্বনি স্বামী সোহাগিনী, সদা শংকরের শিরে রয়েছে।।

তুমি রাজার বালিকা মায়ের প্রাণাধিকা
ভাগ্যেতে মা হলি শিব দারা।
মায়ের দুঃখেতে শংকরী শংকর ভিখারী
উপজীব্য ভিক্ষা করা।।

পুরুষ বর্হিমুখী, নারী অন্তপুর বাসিনী ফলে কন্যা বিচ্ছেদের বেদনা পুরুষের হৃদয়ে যতটা বাজে মায়ের হৃদয় তার থেকে অনেক বেশি ক্ষরিত হয়। তাই মা চান -

ঘর জামাতা করে রাখব কৃত্তিবাস
গিরি পুরে করন দ্বিতীয় কৈলাশ।

টিপ্পনী

ঘর জামাই প্রথার ইঙ্গিত এ প্রসঙ্গে – স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে আগমনী – বিজয়া একান্তই মাতৃহৃদয়ের গান। বাঙালি পারিবারিক জীবনে মা ও মেয়ের যে দৈনন্দিন ছবি তাই ফুটে উঠেছে আগমনী বিজয়াতে। আর সেখানে যার বেদনা বেশি সেই মেনকার জবানিতে অসহায়তা ঝরে পড়েছে –

কাঙ্খিনী করিল বিধি তেঁই হে তোমারে সাধি
নারীর জনম কেবল যন্ত্রনার সাহিতে।

এই হিসাবে আগমনী বিজয়া অসহায় নারীর করুণ প্রতিলিপি। এই কঠোর সামাজিক অনুশাসনের পরেও এক নিবিড় আত্মীয়তা বোধ পরিস্ফুট হয়। সেই বোধ কন্যার সন্তান নিয়ে ঘরে আসায় জামাইকে সাদর অভ্যর্থনায়, প্রতিবেশীদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে দুঃখ আনন্দ উপভোগে।

টিপ্পনী

রামপ্রসাদ সেন

সপ্তদশ শতকের শেষপর্বে অবক্ষয় ও শূন্যতা প্রাপ্ত। বাংলা গীতিকবিতার পুণর্জন্ম ঘটে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাম প্রসাদ ও কমলা কান্তের হাতে। ঈশ্বর ও ভক্তের, দেবজ ও মানুষের মানবিক বৃত্তি যোগে এক নতুন ভক্তিরসের প্রবর্তনা করে রাম প্রসাদ অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেন। ঈশ্বর গুপ্ত যথার্থই মন্তব্য করেছেন –

ইহার তুল্য বঙ্গ-ভাষা-ভাষিত গৃহরত্ন এ পর্যন্ত কোন কবি কর্তৃক প্রচারিত হয় নাই, অঙ্গ দেশের মধ্যে মত মহাশয় কবি রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে রাম প্রসাদ সেনকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। কারণ তিনি সকল রসের রসিক, প্রেমিক, ভাবুক ও ভক্ত এবং জ্ঞানী ছিলেন।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষে বা তৃতীয় দশকের প্রারম্ভে হালিশহরের কুমার হট্টতে সেন বংশে তাঁর জন্ম হয় বলে ঐতিহাসিকরা অনুমান করেছেন। হালি শহরেই ১৭৮১ খীষ্টাব্দেতে কবির দেহাবসান হয়। কবি জমিদার বাড়িতে মহুরিগিরি বা মুজরাগিরি করতেন। সেরেস্তা খাতায় আমায় দাও মাতবিল দাবী। গানটি লেখেন এবং জমিদারের নজরে পড়ায় পরবর্তীতে এর জন্য তিনি মাসিক বৃত্তি পেতেন। 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের আত্ম পরিচয় থেকে জানা যায় কবিরা বৈদ্য এবং সেন বংশ পরম্পরাগত ভাবে অভয়ার রেণাশ্রিত, পৌরাণিক বিপর্যয়ই গ্রামজীবন ত্যাগ করে শহরে এসে চাকরি নিতে বাধ্য করে। মাত্র ১৭/১৮ বছর বয়সে মাসিক বৃত্তি লাভ তাকে অনুপ্রাণিত করায় তিনি সঙ্গীত রচনায় নিয়জিত হন এবং পরবর্তীতে চাকরী ছেড়ে তন্ত্রীক কালী সাধনায় নিয়োজিত হন। সমকালীন বিদ্যোৎসাহী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাকে সভাসদ হবার প্রস্তাব দিলে বিষয়া সক্তি শূন্য কবি তা প্রত্যাখান করেন। রাজা তাকে কবি রঞ্জন উপাধি ও একশো বিঘা নিষ্কর জমি দিতে সম্মানিত করেন।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

শাক্ত পদাবলীর যে ধারার সূচনা করেছিলেন রাম প্রসাদ সেন, তারই সার্থক উত্তর সাধক হিসেবে আমরা পাই আর এক সাধক কবি কমলাকান্ত ভট্টাচার্যকে। শাক্ত পদাবলীর ইতিহাসে রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের গীতি প্রবাহ গঙ্গা যমুনার মতোই পুণ্য সঙ্গম।

কমলাকান্ত রাম প্রসাদের জন্মের প্রায় অর্ধ শতাব্দীর পর জন্ম গ্রহণ করেন। কমলাকান্তের জীবন উপকরণ যৎ সামান্য। এমনকি ঈশ্বর গুপ্তের কবি জীবনীতে কমলাকান্তের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করার মতো। কিছু অলৌকিক উপাদান এবং কিংবদন্তি কমলাকান্তের জীবন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। হয়তো কবি অপেক্ষা সঠিক সিদ্ধ হিসাবেই তাঁর খ্যাতি রাম প্রসাদের বেশী ছড়িয়ে পড়েছিল। বাঙালির প্রান্তে কমলাকান্তের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী সংকলিত হয়েছে তার থেকে আমরা জানতে পারি বর্ধমান জেলার অন্তর্গত অম্বিকা কালনা গ্রামে তার জন্ম। তাঁর পিতার নাম মহেশ্বর মাতা মহামায়া, কমলাকান্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। চেন্নায় মাতুলালয়ে থাকবার সময় উনি সংস্কৃত টোলে অধ্যায়ন করেন এবং সেখানে প্রধান অধ্যাপক পরে অধ্যক্ষর পদ অলংকৃত করে ছিলেন। ১২১৬ সালে কমলাকান্ত বর্ধমানে আসেন এবং মহারাজ তেজেশ চন্দ্র বাহাদুর কর্তৃক সভাপন্ডিতের পদে অলংকৃত হন। কথিত আছে কমলাকান্ত পঞ্চমুন্ডির আসনে বসেই মাতৃ সাধনা করতেন। ১৮২১ সালের এই আসনে বসেই তিনি দেহরক্ষা করেন। তেজেশচন্দ্রের পুত্র মহাতাগ চাঁদ এর আগ্রহে ১৮৫৭ খীঃ বর্ধমান রাজ সভা থেকে কমলাকান্তের ২৬৯ খানি গানের একটা সংকলন প্রকাশিত হয়। আক্ষরিক অর্থে সভাকবি হলেও কমলাকান্তের পদে দূষিত রসোল্লাস প্রতিফলিত হয়নি। নিতান্ত নিষ্ঠাপূর্ণ শান্তি কামী দিন যাপন, নিয়ন্ত্রিত তান্ত্রিক বিধি সম্মত আশার শান্ত নিরুদ্বিগ্ন জীবনে অভ্যস্থ কমলাকান্তের সারস্বত সাধনায় এই সবই প্রতিবিম্বিত হয়েছে সভাপন্ডিত বা রাজসভার কবি পরিচয় অপেশ রাজবংশের কুল গুরু রূপেই সম্ভবতঃ তিনি পরিচিত হয়েছিলেন। শ্যামা মায়ের প্রতি অনন্য সাধারণ উক্তি ও একান্তিক আত্মনিবেদনের নিদর্শন হিসাবে কমলাকান্তের সঙ্গীতগুলি মানুষের হৃদয়ের গভীরে রেখা পাত করে। প্রত্যক্ষ ভাবে রাম প্রসাদের পদ এবং পরোক্ষভাবে বৈষ্ণবীয় পদাবলীর উত্তরাধিকারে তাঁর পদের পরিপূরক। কেবল তত্ত্বের দিক শ্যামা ও শ্যামায় আদৃত উপলব্ধি নয়, শ্যাম গীতির ভাষায় এবং ছন্দ অলঙ্কারের ব্যবহার ও তাঁর কবিতায় বৈষ্ণব কাব্যের ঐতিহ্যের প্রভাব পড়েছে। শ্যামা বিষয়ক পদাবলীতে তাঁর আবেগ নিয়ন্ত্রণ ভাষা, সংস্কৃত ঋদ্ধ ছন্দসুর নির্ভরতা হেতু শ্রবণ মধুর, হৃদয় বৃত্তি প্রকাশ ও বহুমুখী নয়, কিন্তু মাতৃসাধনায় ব্যকুলতা তাঁর কণ্ঠ সুর হয়ে উঠেছে, সঙ্গীতে পল্লবিত হয়েছে। এর মূলে একান্ত অকিঞ্চিৎকর নয় তাছাড়া বাঙালির গার্হস্থ্য জীবনের আনন্দ বিষাদের গীতিনাট্য আগামী বিজয়া কমলাকান্তের হাতে পড়ে হয়ে উঠেছে অসাধারণ। তাঁর অধিকাংশ পদের ভীষণা দেবীর নৃত্য ভঙ্গিমার সৃষ্টি ও ধ্বংসের প্রলয় রঙ্গ অভিনীত হওয়ায় পরিবর্তে লাবণ্যের এক মাধুক্ষরা ধ্বনি শ্রুতি গোচর। কমলাকান্ত শাক্ত পদাবলীতে রূপানুযুগের প্রবর্তন করেছেন।

প্রশ্নাবলী

১) বাংলা সাহিত্যে শাক্ত পদাবলী সাহিত্যের ধারাটি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

২) শাক্ত পদাবলীতে তৎকালীন যুগজীবনের যে চিত্র প্রকাশিত হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করো।

৩) রামপ্রসাদ সেনের কবি কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

৪) কবি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য শাক্ত পদাবলী সাহিত্যে অন্যতম প্রধান স্থান অধিকার করে আছেন - তাঁর কাব্যের আলোচনা করে দেখাও যে তিনি অন্যতম প্রধান কবি।

টিপ্পনী

৫) ভারতচন্দ্র ও তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্যের পরিচয় দাও।

৬) অন্নদামঙ্গল কাব্যের ভাষা-ছন্দ-অলঙ্কার সম্পর্কে আলোচনা করো।

৭) 'অন্নদামঙ্গল কাব্য রাজকণ্ঠের মণিমালা' – মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বিচার করো।

৮) শিবায়নের কাহিনী বিবৃত করে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কবিত্ব শক্তি সম্পর্কে আলোচনা করো।

টিপ্পনী

৯) মৃগলুব্ধ-এর গৌণ কবিদের সম্পর্কে আলোচনা করো।

১০) কবি কৃষ্ণরাম দাস ও তাঁর রচিত কাব্যগুলির পরিচয় দাও।

১১) বাংলার গৌণ মঙ্গলকাব্যগুলির পরিচয় দাও।

১২) টীকা লেখো – কবিশেখর বলরাম চক্রবর্তী, গোবিন্দ দাস, দ্বিজ কমললোচন, ভবানীপ্রসাদ রায়, রূপনারায়ণ ঘোষ, শঙ্কর কবিচন্দ্র, রামরাজা, রামকৃষ্ণকবিচন্দ্র, ঈশ্বরী পাটনী, ব্যাস, শিব, অন্নপূর্ণা, অগমনী-বিজয়া, ভক্তের আকুতি, গীতিকবিতা হিসাবে শাক্ত পদাবলী।

আরাকান রাজসভা

সপ্তদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত মুসলমান কবিরা প্রধানত রোমান্টিক ও অধ্যাত্মমূলক প্রেম গাথা , বীরত্বের কাহিনি ও নীতিতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এগুলির মধ্যে কেবলমাত্র রোমান্টিক ও অধ্যাত্মমূলক প্রণয় গাথা গুলির সঙ্গেই বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত সম্পর্ক। কবিদের কাব্য দক্ষতা এই ক্ষেত্রেই সর্বোচ্চ মহিমায় প্রকাশ পেত। এই সময়কালে আরাকান ও চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে যে সব মুসলমান কবিদের আবির্ভাব হয়েছিল, তাঁরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। কারণ তাঁদের আখ্যান মূলক রোমান্টিক কাব্য গুলি ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল রসগ্রাহী পাঠকের উপভোগ্য হতে পেরেছে।

টিপ্পনী

সপ্তদশ শতাব্দীতেই বঙ্গদেশের মুসলমান কবিরা সাহিত্যে তাঁদের উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গিয়েছেন। আরাকান ও চট্টগ্রামে মুসলিম শাসকের পৃষ্ঠপোষকতার দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওল তাঁদের রচনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছেন। এই দুজন কবি ছাড়া ও আরও কয়েকজন মুসলমান কবির রচনার উল্লেখযোগ্য। মুহম্মদ খান সত্য কলি বিবাদ সংবাদ রচনা করেন। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম রুপককাব্য হিসেবে পরিগণিত হয়। এই কাব্যটি পাঁচটি অধ্যায়ে সমাপ্য। গ্রন্থটিতে সত্য ও কলির বিবাদ ও শেষে সত্যের জয়লাভ আলোচিত হয়েছে। কাব্যটির রচনাকাল ১৬৩৫ খিঃ ।এছাড়া মুসলিম সমাজে সুপ্রচলিত হানফা ও কয়রাপরী সংক্রান্ত কিস্যা। সাবিরিদ খান এই জাতীয় গল্প অবলম্বনে কাব্য রচনা করেছিলেন এর পূর্বেই। মুহম্মদ খান ও হানিফার লড়াই রচনা করেন একই বিষয় অবলম্বন করে। তাঁর মুক্তাল হোসেন এ কারবালা প্রান্তরের শোকাবহ ঘটনার সুদক্ষ বর্ণনা রয়েছে। সেকারণে মুসলমান সমাজে মুক্তাল হোসেন যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করে। চট্টগ্রামের মুসলমান সমাজ এখনও এই গ্রন্থটিকে সমাদর জানান।

যাবতীয় সম্প্রদায় ধর্ম নির্বিশেষে যাঁরা কাব্য রচনা করেছিলেন, মুসলমান ধর্মের এমন দুজন কবি আজও বাংলা সাহিত্যে বিশেষ স্থানের অধিকারী। আরাকানের দুই বিখ্যাত কবি দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলা ওলের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

দৌলত কাজী

সপ্তদশ শতাব্দীর আগে থেকেই চট্টগ্রাম ও আরাকানের রাজসভায় ঐ সলামিক প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছিল। যদিও রাজসভা ছিল বৌদ্ধ ধর্মের অন্তর্গত , কিন্তু উচ্চপদস্থ সকল কর্মচারী ছিলেন ধর্মান্তরিত বাঙালি মুসলমান। তাঁরা সংস্কৃতিক ভাবে আরবীয় বণিকদের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তেমনই দু এক পুরুষ আগেকার হিন্দুধর্মীয় চেতনাও তাঁদের রক্তে প্রবাহিত ছিল। এঁদের উৎসাহে তৎকালীন কবিরা কেউ রচনা করলেন ইতিহাস ও পুরানকে আশ্রয় করে ,কেউ বা সূফী যোগ দর্শন সংকান্ত রুপক কাব্যকে অবলম্বন করে, আবার কেউ হিন্দু সমাজে প্রচলিত প্রণয় বিষয়ক কাহিনি অবলম্বনে কাব্য রচনা করে খ্যাতিলাভ করলেন। এঁদের মধ্যে দৌলত কাজী বিষয় নির্বাচন ও দক্ষপ্রয়োগে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী আরাকান রাজ থিরি থু ধন্মা (শ্রী সুধর্ম) র রাজত্ব কালে (১৬২২- ১৬৩৮ খীঃ) দৌলত কাজী সতী ময়নামতী কাব্যটি রচনা করেন। রাজ

অমত্য ও সেনা পতি আশরফ খানের নির্দেশে এই কাব্যটি রচিত হয় উত্তর ভারতীয় কবি সাধনের লেখা কাব্য মৈনা সৎ (অবধী ভাষার) অবলম্বনে সতী ময়নামতী লিখিত । ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষালের মতে ১৬২২- ৩৮ সালের মধ্যে সতী ময়নামতী রচিত । এই কাব্যের সঙ্গে আশরিফ খানের রাজকার্যের দায়িত্ব অর্পনের প্রসঙ্গে দৌলত কাজী বলেছেন -" মহারাজা আয়ুশেষ জানি শুদ্ধ মন/ তান হস্তে রাজনীতি কৈল সমর্পন।" থেকে সংগৃহীত তথ্য এখানে দাখিল করেছেন ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল। এই তথ্য থেকে জানা যায় শ্রী সুধর্ম তাঁর ষোল বছর রাজত্বকালে বারোবছর অভিষিক্ত হননি। অর্থাৎ অভিষেক না হওয়া দায়িত্বাধীন নরপতি ছিলেন। রাজ্যাভিষেকের এক বছরের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হবে এমন ভবিষ্যদ্বানী ছিল। তাই ১৬৩৫খিঃ ব্দে তাঁর অভিষেক হয়, নরবলি ইত্যাদি ভয়াবহ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। ১৬৩৫ খিষ্টাব্দে রাজ্যাভিষেকের পর রাজ্যের দায়ভার আশরফ খানকে অর্পন করেন রাজা। তারপর দৌলত কাজী সতীময়নামতী লেখেন ও উপরোক্ত বিষয়টি তাঁর কাব্যে উল্লেখকরেন। দৌলত কাজী গ্রন্থ অসম্পূর্ণ অবস্থায় রেখেই দেহত্যাগ করেন তখনও শ্রী সুধর্ম জীরিত। সুতরাং এবিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে ১৬৩৫- ১৬৩৮খিষ্টাব্দের মধ্যে সতী ময়নামতী কাব্যটি রচিত হয়েছিল।

দৌলত কাজীর কাব্যে আরাকানের রাজধানী রোসাঙ্গ এবং শ্রীসুধর্মের রাজত্ব সম্পর্কিত তথ্য থাকলেও কবি পরিচিতি খুব অল্পই আছে। সেখান থেকে জানা যায়, কবি সোলতান পুরে এক সম্ভ্রান্ত কাজী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। রোসাঙ্গে তিনি এই কাব্য রচনা শুরু করেন। এছাড়া তঁর সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায়না। তিনি কাব্যটির এক তৃতীয়াংশ অসমাপ্ত রেখেই পরলোক যাত্রা করেছিলেন দৌলত কাজীর মৃত্যুর প্রায় তিরিশ বছর পর কাব্যটি সম্পূর্ণ করেন সৈয়দ আলাওল। আরাকানরাজ চন্দ্র সুধর্ম বা সান্দ যু ধম্মার প্রধান মন্ত্রী সুলেমানের পৃষ্টপোষকতার সতীময়নার অবশিষ্টাংশ ১৬৫৯ খিঃ সমাপ্ত করেন সৈয়দ আলাওল।

আশারফ খান ছিলেন বিদ্যোৎ সাহী। তিনি তরুন কবি দৌলত কাজীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। একদা বিপিন বিহারে গিয়ে রাজকান খিরি থু ধম্মার রাজসভা বসল অরণ্যে। সঙ্গে ছিলেন লঙ্কর উজীর শ্রী আশরফ খান তিনি দৌলত কাজীকে নির্দেশ দিলেন লোরস রাজাও সতী ময়নার কাহিনী শোনাতে " স্তনিতে লোরক রাজ ময়নার ভারতী।" কবি সাধন সতী ময়নার কানিহী লিখেছিলেন ঠেট গোহারী ভাষার। কিন্তু এই ভাষা বাঙালিদের বোধগম্য হতনা। তাই দৌলত কাজীকে বাংলা ভাষার এই কাব্য রচনার আদেশ দিলেন আশরফ খান।

দৌলত কাজী রচিত সতী ময়নামতী কাব্যটির মূল উৎস সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেন এবং লোর চন্দ্রানী সতীময়নার সম্পাদক অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল কিছু তথ্য দিয়েছেন। ডঃ সুকুমার সেন প্রদত্ত কয়েক টি অপ্রধান উৎস হল

১ চর্তুদশ শতাব্দীতে জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর রচিত বর্ণনরত্নাকর এ লোরিক নাচ এর উল্লেখ পাওয়া যায়। মনে করা হয় চর্তুদশ শতাব্দীর আগেই হিন্দি ভাষার লোরের কাহিনী নির্ভর নৃত্যগীত বিহারে প্রচলিত ছিল।

২ গ্রীয়ার্সন ও শ্রী শচন্দ্র মজুমদারের মিলিত উদ্যোগে দক্ষিণ বিহারের আহীর (গোয়ালা) সমাজে প্রচলিত লোরিক মল্লের গান সংগৃহীত হয়। এই গীতি কাহিনীর সঙ্গে দৌলত কাজী রচিত কাব্যটির কাহিনিগত সাদৃশ্য রয়েছে।

৩ লাহোর মিউজিয়ামে লোর চন্দ্রানীর কাহিনী বিষয়ক চিত্র গুলির ও দৌলত কাজী রচিত

কাব্যের সঙ্গে ঐক্য আছে।

সব থেকে মূল্যবান ও অজ্ঞাতপূর্ব উৎস অবশ্য অন্যত্র রয়েছে। আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী তথা ভাষা বিজ্ঞান বিদ্যাপীঠ কেন্দ্র থেকে ডঃ বিশ্বনাথ প্রসাদ ও ডঃ মাতা প্রসাদে গুপ্তের সম্পাদনায় চন্দায়ন নামক একটি লোকগীতিকাব্য প্রকাশিত হয়েছে।

এখানে সম্পাদক মহাশয় গন মুল্লা দাউদ রচিত চন্দায়ন কাব্যটি সম্পাদনা করতে গিয়ে লোরকা হিনি সম্পার্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য উদ্ধার করেছেন। এই চন্দায়ন কাব্যের রচয়িতা মুল্লা দাউদের উল্লেখ ঐতিহাসিক বদায়ুনের গ্রন্থে আছে। এটি হিন্দি সাহিত্যের প্রেমমূলক প্রথম সূফী কাব্যের নিদর্শন। এই চন্দায়ন কাব্যটি মুল্লা দাউদ ১৩৭৬ খিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে রচনা করেন। এটিই লোর কাহিনি সংকান্ত প্রাচীনতম কাব্য অবশ্য লোকমুখে এই কাহিনির প্রচলন পূর্ব থেকেই ছিল। ছত্তিশগড়ী নানা উপকথায় এই কাহিনির সামান্য পার্থক্যসহ প্রায় সম্পূর্ণ টাই পাওয়া যায়। হায়দাবাদে সালরজঙ্গ মিউজিয়ামে দক্ষিনী ভাষার রচিত একটি পুথি আছে। সেখানেও কাহিনিটি মুল্লা দাউদের কাহিনির অনুরুপ। অর্থাৎ উত্তর দক্ষিণ পূর্বভারতের বিভিন্ন লোকগাথায় সতীময়নার কাহিনিটির জনপ্রিয়তা অম্লান ছিল।

সতীময়না কাব্যের আখ্যানটি এইরকম –

গোহারি দেশের রাজা লোরের সঙ্গে বিবাহ হয় অপরুপ সুন্দরী রাজকন্যা ময়নাবতীর। তাদের দাম্পত্য জীবন সুখেই অতিবাহিত হচ্ছিল। এমন সময়ে এক যোগীর আগমন ঘটে লোরের সভায়। যোগী লোরকে মোহরা দেশের রাজকন্যা চন্দ্রানীর চিত্র দেখালেন। চ ন্দ্রানী বিবাহিতা , কিন্তু তার স্বামী বীর যোদ্ধা হলেও বামন ও নপুংসক। যোগী লোরকে বললেন–

চন্দ্রানীর তোমার মিলন মনোরম
বিদ্যা সঙ্গে সুন্দরের যেন সমাগম।

যোগীর কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে চন্দ্রানীর রুপে মুগ্ধ লোর মোহরায় গেল। লোর ও চন্দ্রানী দু জনেই দু জনকে দেখে মুগ্ধ হল এবং তাদের মিলন ঘটল। চন্দ্রানীর স্বামী তাদের অবাধ মিলনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালে লোর ও বামনের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ হল। যুদ্ধে বামন পরাজিত ও নিহত হল। এদিকে চন্দ্রানী সাপের দংশনে মৃতপ্রায় এই দুঃসংবাদ পেয়ে চন্দ্রানীর পিতা সেখানে এসে উপাস্থিত হলেন। এক যোগী এসে চন্দ্রানীকে সুস্থ করে তুললেন। রাজধানীতে ফিরে গিয়ে রাজা লোরের হাতে কন্যা চন্দ্রানী ও রাজ্যভার অর্পন করলেন। লোর মোহরা রাজ্য শাসনভার গ্রহণ করল। এখানেই প্রথম খন্ড সমাপ্ত।

দ্বিতীয় খন্ড সতী ময়না। এই খন্ডটি শুরু হয় ময়নার বিরহের বর্ণনা দিয়ে। স্বামীর কল্যানে শিব দূর্গার আরাধনায় নিযুক্ত হয়েছেন ময়না। এর মধ্যে ছাতন নামক এক লম্পট রাজকুমার ময়নাকে অধিকার করার জন্য এক কূটনীর মাধ্যমে কুপ্রস্তাব দিয়ে ময়নার কাছে পাঠাল ময়না তাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন। এখানে ময়নার বিরহের বারমাস্যা অংশের এগারো মাসের বর্ণনা পর্যন্ত দৌলত কাজীর রচনা।

দৌলত কাজীর কাব্য দক্ষতা এঁর অসমাপ্ত কাব্যটি থেকে বোমা যায়। শ্রাবণ মাসের বিরহবর্ণ নাটি কবির মৌলিক ভাবনার ফসল। অতি উৎকৃষ্ট মানের এই বিরহবর্ণনায় মাত্র একটি ছত্র

টিপ্পনী

ছাড়া সাধনের মূল কাব্যের সঙ্গে কোনও মিলই নেই। কবির পরিমিতি বোধের ও প্রকাশ ঘটেছে এই অংশে।

দৌলত কাজীকে সাহিত্য সমালোচ কগন " মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের সর্ব প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মত্য জীবনরসের কবি" বলে মনে করেছেন। কাজীর কাব্যে হিন্দু সামাজিক আচার, জীবন যাপন পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা যে নিষ্ঠার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, তা মুসলিম ধর্মাবলম্বী কবির কাছে আশাতীত। চিত্রকল্প, উপমা, রূপক প্রভৃতি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে কবি সবত্র সামঞ্জস্য পূর্ণ ভাবে হিন্দু মনোভাব রক্ষা করেছেন কাব্যের সূচনায় বন্দনা অংশ ও মহম্মদের সিকত এই দুটি অনুচ্ছেদ ছাড়া কাব্যে অন্য কোথাও মুসলমান সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ করা যায়না। দ্বারিকাতে শোভে যেন গোবিন্দ সমাজ, " প্রেমভাবে গৌরি অঙ্গ প্রত্যক্ষ শঙ্কর " " যেন রাধার কোলে কানাই " প্রভৃতি বহু উক্তিতে হিন্দু ঐতিহ্যজ্ঞানে কবির দক্ষতা উল্লেখযোগ্য। অথচ দৌলত কাজী সূফী সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। সবথেকে বড় কথা এই রোমান্টিক কাব্যটি মত্যজীবনরসের অধার ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ কীর্তি মানবের জয়গান গেয়েছেন–

নিরঞ্জন সৃষ্টি নর অমূল্য রতন।
ত্রিভুবনে নাহি কেহ তাহার সমান।।
নর বিনে চিন নাহি কিতাব কোরান।
নর সে পরম দেব তন্ত্র মন্ত্র জ্ঞান।।
নর সে পরম দেব নর সে ঈশ্বর।
নর বিনে ভেদ নাই ঠাকুর কিঙ্কর।।

এই মানব তত্ত্ব সহজিয়া সাধনার মূল কথা।

কাব্যের কাহিনিটি একেবারেই কবির মৌলিক নয়। কিন্তু মূল চরিত্র তিনটিই দৌলত কাজী সুদক্ষ হাতে বিচক্ষনতার সঙ্গে বনর্ণা করেছেন। সতীময়নার স্নিগ্ধ সতীত্ব চন্দ্রানীর জীবনপূর্ণ নায়িকা মূর্তি বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হওয়ার যোগ্য ময়না মধ্যে যেমন হিন্দু রমনী আদর্শ মূর্তিটি অঙ্কিত হয়েছে, তেমনই বৈপরীত্যে উচ্ছ্বল চন্দ্রানী জীবনরস প্রাচুর্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

লোরের চরিত্রটিও বাস্তব ধর্মী নায়ক চরিত্রের সার্থকতা লাভ করেছে। কাব্যটি সম্পূর্ণ রচনা করা সম্ভবপর হলে তাঁর কাব্য প্রতিভার প্রকাশ ও পরিচয়টি সম্যকরূপে লাভ করা যেত। অন্যান্য অপ্রধান চরিত্র গুলি ও তাঁর লেখনীতে চমৎকার বিকশিত হয়েছে। কুট্টিনী ছাতন ও চন্দ্রানীর নপুংসক স্বামীর চরিত্র ও যথোপযুক্ত হয়েছে।

রচনারীতির বিচারেও ক্লাসিক ও রোমান্টিক রীতির যথাযোগ্য উপস্থিতি কাব্যটিকে উপভোগ্য করে তুলেছে। যোগীর বর্ণনা–

জটাধারী ব্যাঘ চর্ম্ম বিভূতিভূষণ।
কণ্ঠে রুদ্রমালা মূর্তি যেন ত্রিনয়ন।।
জ্বলন্ত প্রদীপ দীপ্তি দিব্য কলেবর।
যোগানলে দহিছে সকল অভ্যন্তর।

এত পরিচ্ছন্ন পয়ার সত্যিই প্রশংসাযোগ্য। দৌলতকাজীর কবিত্ব শক্তি উচ্চমানের গীত গোবিন্দ এর আদর্শে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার মিশ্রনে চমৎকার পদরচনা করেছেন। ছন্দের ক্ষেত্রেও

টিপ্পনী

জয়দেবের দ্বারা অনুপ্রণিত হয়েছেন–

নবচূত অঙ্কুর কিশলয় মঞ্জুল
রঞ্জিত তরুলতা পুঞ্জে।
কোকিল কাকলি কলাকল কুঞ্জিত
লুলিত ললিত নিকুঞ্জে।

দৌলত কাজী রচিত অনেক উক্তি প্রায় প্রবদ্ধ প্রতিম হয়ে উঠেছে–

১ মন বিনা তনু যেন মৃত্তিকা পিঞ্জর।

২ যাহার নাহিক লজ্জা কি ফল গঞ্জনা /তস্করেতে ধর্মকথা বেশ্যাকে ভৎযনা।

দৌলত কাজীর এই কাব্য প্রতিভা সৈয়দ আলাওলে সুলভ নয়। সৈয়দ আলাওল হয়ত কাজীর তুলনায় অধিক পন্ডিত ছিলেন, কিন্তু কাজীর কাব্য শক্তি সৈয়দ আলাওল স্পর্শ করতে পারেননি বলেই সমালোচক পন্ডিতদের ধারনা।

সৈয়দ আলাওল

সৈয়দ আলাওল মধ্যযুগের সর্বাধিক প্রচারিত ও খ্যাতিসম্পন্ন মুসলমান কবি। আলাওলের জীবনকাহিনী বৈচিত্র্য পূর্ণ তাঁর পৈতৃক নিবাস ফতেহাবাদের অন্তর্গত জালালপুরে । পিতা ছিলেন মজলিস কুতুবের অমাত্য ফতেহাবাদের অবস্থান সম্পর্কে দ্বিমত রয়েছে। কিছু পন্ডিতের মতে এটি চট্টগ্রামে অবস্থিত কারো মতে এটি পশ্চিমবঙ্গে কবি তাঁর আত্মপরিচয়ে বলেছেন–

মুল্লুক ফতেয়াবাদ গৌড়তে প্রধান।
তথাতে জালালপুর অতি পুণ্য স্থান।।

এছাড়াও বলেছেন–

গৌড় মধ্যে প্রধান ফতেয়াবাদ্দ ভূম।
বৈমে সাধু সৎলোক হর্ষ মনোরম।।
হিন্দুকুলে মহাসভ্য আছে ভট্টাচার্য।
ভাগীরথী গঙ্গাধারা বহে মধ্যে রাজ্য।।

এখানে ফতেয়াবাদ যে গৌড়ের অন্তর্গত সে কথা যেমন বলা হচ্ছে তেমন ভাগীরথী তার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত সে কথারও স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তাই ফতেয়াবাদ চট্টগ্রামে বা ফরিদপুরে অবস্থিত একথা নির্বিচারে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। আলাওল তাঁর রচিত গ্রন্থ পদ্মাবতী সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল সতীময়নামতীর শেষংশ ও সেকেন্দারনামার বলেছেন যে দৈববশে পর্তুগীজ জলদস্যুদের সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়ার কারণে তিনি আরাকানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর গ্রন্থগুলিতে যে গর্বের সঙ্গে ফতেয়াবাদের ভৌগোলিক বিবরণ ও সামাজিক অবস্থানের বিবরণ দিয়েছেন তাতে বোঝা যায় ফতেয়াবাদ শুধু তাঁর পিতার নয় তাঁরও স্বদেশ ভূমিই ছিল। অন্যদিকে সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল এর প্রথমদংশে আলাওল রোসাঙ্গে উপনীত হওয়ার বর্ণনা দেবার সময়ে নিজেকে পরদেশী বলেছেন তিনি চট্টগ্রামের মানুষ হলে নিশ্চয়ই একথা বলতেননা।

টিপ্পনী

সেকেন্দারনামা ও সয়ফুলমুলুক অনুসারে কবি আরাকানে এসে অশ্বারোহী সৈনিকের বৃত্তি গ্রহণ করেন। তিনি বাংলা সংস্কৃত ও আর্বি ফার্সিতে সুদক্ষ ছিলেন। ভারতীয় মার্গসঙ্গীতে তিনি পারদর্শী ছিলেন। তাঁর গুনের কথা প্রচারিত হলে আরাকান শাসনকর্তাদের নির্দেশে তিনি কাব্য অনুবাদে মনোনিবেশ করেন। অনূদিত কাব্য গুলির জন্য বিশেষ খ্যাতি ও অর্জন করেন। আরাকানের অর্থমন্ত্রী সুলেমানের নির্দেশে সৈয়দ আলাওল দৌলত কাজীর অসমাপ্ত কাব্য সতীময়নামতী সম্পূর্ণ করেন আনুমানিক ১৬৫৮ খিস্টাব্দে আরাকানের প্রধানমন্ত্রী মাগন ঠাকুরের পৃষ্টপোষকতার কবি পদ্মাবতী ও সয়ফুলমুলুক রচনা করেন। সেনাপতি সৈয়দ মহম্মদের অনুরোধে তিনি সপ্তপয়কর রচনা করেছিলেন। এই সময়ে শাহসুজা বাংলা থেকে পালিয়ে আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং আরাকান রাজের বিরাগভাজন হয়ে সপরিবারে নিহত হন। শাহসুজা ও আলাওল সূফী সাধক ছিলেন। ফলত সুজার সংস্রবে থাকার জন্য কবিকে দুমাস কারাবাসের যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। শেষে আরাকানের বিচারপতি কাজী সৈয়দ মসুদ শাহের দাক্ষিন্যে তিনি রাজ সভায় পুনরায় স্থান পেলেন ও কাজীর নির্দেশে সয়ফুলমুলুক রচনা করলেন। আরাকানরাজ শ্রীচন্দ্র সুধর্মার নির্দেশে সেকেন্দারনামা অনুবাদ করলেন। তাঁর শেষ কাব্য সেকেন্দারনামা রচিত ১৬৭১খিঃ। এর অল্প পরেই আলাওলের মৃত্যু হয়।

সৈয়দ আলাওয়ের রচিত গ্রন্থাবলী

১ পদ্মাবতী (আনু১৬৪৬খিঃ)

২সতীময়নার অবশিষ্টাংশ (১৬৫৯খিঃ)

৩সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল (১৬৫৮-৭০খিঃ)

৪ সপ্তপয়কর (১৬৬০খিঃ)

৫তোহ্ফা (১৬৬৩-৬৯খিঃ)

৬ সেকেন্দারনামা (১৬৭২খিঃ)

আলাওলের শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁর অনুবাদ গ্রন্থ গুলি। আরবি ফার্সি ও হিন্দি ভাষার কাহিনি গুলির তিনি সার্থক অনুবাদ করেন। কবিত্বশক্তি মৌলিকত্ব ও বেশ কিছু স্থানে উল্লেখযোগ্য সবথেকে বড় কথা মধ্যযুগে এত অনুবাদ কর্ম তিনি ছাড়া আর কেউ বিশেষ করেননি।

পদ্মাবতী

এই কাব্যটি কবির মৌলিক সৃষ্টি নয়, একটি হিন্দি কাব্যের অনুবাদ। এই অনুবাদ কর্মের জন্যই কবি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। কাব্যটির মূল গ্রন্থ পদুমাবৎ হিন্দি অবধি ভাষার রচিত। রচয়িতা হিন্দি সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক কবি মালিক মুহম্মদ জায়সী। বাংলায় পয়ার ত্রিপদী ছন্দে পরিচ্ছন্ন সাধু ভাষার সৈয়দ আলাওল অনুবাদ কর্মটি সমাপ্ত করেন জায়সীর পদুমাবৎ রচনার প্রায় একশ বছর পর। পদুমাবৎ এর কাহিনী টডের রাজস্থান থেকে মূলত গৃহীত। কিন্তু জায়সী সূফী ধর্মমতের প্রেক্ষাপটে রুপক কাব্য হিসেবে পদুমাবৎ রচনা করেন। ফলত আলাউদ্দীন পদ্মিনীর এই কাহিনী ঐতিহাসিক বাস্তবতা কতখানি

রয়েছে তা তর্কসাপেক্ষ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে মাগন ঠাকুরের নির্দেশে হিন্দি চৌপাই ছন্দ ভেঙে বাংলা পয়ার ত্রিপদীতে পদ্মাবতী কাব্য রচনা করলেন আলাওল।

জায়সী রচিত পদ্মাবতী সম্পূর্ণ তই মানব প্রেমের কাহিনী অন্যদিকে সূফী মতাবলম্বী আলাওল নিছক রোমান্টিক কাহিনী অবলম্বন করে অনুবাদ কর্মটি করলেও কাব্যের বিভিন্ন স্থানে গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও বর্ণনা করেছেন। যোগদর্শনেও কবির দক্ষতা প্রশংসনীয় ছিল। তিনি এই কাব্যে অত্যন্ত সরল ভাবে যোগতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন। এমনকি হিন্দু তন্ত্রসাধনায় তাঁর বিশেষ অধিকার এই কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। পদ্মাবতীর আখ্যানটি সংক্ষেপে এরকম– চিতোবের রানা রত্নসেন ও তাঁর প্রথমা পত্নী নাগমতী। রাজা একদা হীরামন পাখির কাছে সিংহল রাজার কন্যা পদ্মাবতীর রুপবর্ণনা শুনে মুদ্ধ হন এবং বহু কপ্টে সিংহলে পদ্মাবতীর সঙ্গে মিলিত হন। তারপর সিংহলেই পত্নীসহ মুখে বসবাস করতে থাকেন। কিন্তুপ্রথমা পত্নীর বিরহ যন্ত্রনার কথা শুনে আবার চিতোরে ফিরে আসেন এবং দুই পত্নীসহ রত্ন সেন চিতোরে মহানন্দে রাজ্য শাসন করতে থাকলেন। এদিকে দিল্লির সুলতান আলাউদ্দীন পদ্মাবতীর রুপবর্ণনায় মুগ্ধ হয়ে চিতোর অবরোধ করতে এলেন এবং বিফল হয়ে কৌশলে রত্নসেনকে বন্দী করে দিল্লিতে নিয়ে আটক করে রাখলেন। রাজার অনুপস্থিতিতে তাঁর এক পুরোনো শত্রু দেবপাল পদ্মাবতীকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টার ছিল রত্নাসেন দুই রাজভক্ত রাজ পুতের সহায়তার দিল্লির কয়েদখানা গোপনে থেকে চিতোরে চলে এলেন এবং দেবপালকে নিহত করলেন। যুদ্ধে নিজেও আহত হলেন এবং কিছু পরে প্রাণত্যাগ করলেন। নাগমতী ও পদ্মাবতী সহমরণে গেলেন। আলাউদ্দীন পদ্মাবতীর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারলেননা।

এই কাহিনিটি পদুমাবৎ ও পদ্মাবতীর মূল কাহিনী। কিন্তু জায়সী এই বিয়োগান্ত কাব্যটিকে রুপকার্থে ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর কাব্যের প্রারম্ভেই তিনি সে কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন–

দেহ হল চিতোর মন হল রাজা , সিংহল হৃদয় বুদ্ধি পদ্মিনী শুক গুরু নাগমতী জাগতিক ধাঁধা আলাউদ্দীন মায়াবদ্ধ জীব ইত্যাদি। জায়সীর এই গভীর তত্ত্ব দর্শনকে আলাওল জীবন রসে সিক্ত করেছেন। অনেক তত্ত্বের স্থানই আলাওল এড়িয়ে গেছেন বা সংক্ষিপ্ত করেছেন, তাতে অনেকের মনে হয়েছে তিনি এই তত্ত্বের গূঢ়ার্থ

অনুসাধন করতে পারেননি কারো মতে তিনি জায়সীর তুলনায় নিম্নস্তরের সূফী সাধক ছিলেন। তবে আলাওল যেখানে কল্পনার রাশ ছেড়েছেন, সেখানে কিন্তু কাব্য মৌলিকত্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পদ্মাবতীর বিভিন্ন স্থানে আলাওলও সূফী প্রেমসাধনার গভীর ব্যঞ্জনাগর্ভ উক্তি করেছেন। এর ফলে অনুবাদ কর্মটি বিশিষ্টতা লাভ করেছে–

প্রেম বিনে ভাব নাহি ভাব বিনে রস
ত্রিভুবনে যত দেখ প্রেম হন্তে বশ।
যাঁর হৃদে জমিলেক প্রেমের অঙ্কুর
মুক্তিপদ পাইলে সে সবার ঠাকুর।
প্রেমহত্নে জনমে বিরহ তিন অক্ষর
পঞ্চাক্ষরে বিরহিনী লক্ষ্য পঞ্চশর।
যার ঘটে বিরহের জ্যোতি প্রকাশিল
সুখ দুঃখ প্রতিতার আপদ তরিল।

টিপ্পনী

পদ্মাবতীতে আলাওলের সম্পূর্ণ নিজস্ব এগারোটি পদ আছে। আলাওলের এই পদ গুলির কবিত্ব শক্তি ও আন্তরিকতা তৎকালীন সময়ের সাপেক্ষে উল্লেখযোগ্য।

সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল

এই গ্রন্থটি আলাওল রচিত দ্বিতীয় গ্রন্থ। মাগন ঠাকুরের পৃষ্ট পোষকতায় কবি আরব্য উপন্যাস আলিফ লায়লার অবলম্বনে এই গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটি কবির মৌলিক রচনা অন্যকোনও গ্রন্থের দুবহু অনুবাদ নয়। পদ্মাবতীর মৃত্যু বর্ণনার পর জায়সীর রচনায় এক গাঢ় বিবাদপূর্ণ আবহাওয়া তৈরি হয়েছে। তাঁর এই অংশের রচনার অনুবাদ করলে দাঁড়ায় কোথায় সেই রুপবতী রাণী পদ্মাবতীর পৃথিবী থেকে তাঁর কাহিনী ছাড়া সব স্মৃতি মুছে গিয়েছে। ফুল শুকিয়ে যার। কিন্তু সুবাস টুকু মরেনা। আলাওল এই গভীর তাকে তাঁর কাব্যে স্পর্শ করতে পারেননি।

টিপ্পনী

কোথা গেল গন্ধর্ব সেন সঙ্গে মন্ত্রিগণ।
কোথা গেল রত্নসেন সঙ্গের রাজন।।
কোথা গেল চিতাত্তর রত্ন চিত্রসেন।
কোথা গেল পদ্মাবতী ত্রিলক্ষ মহন।।
কোথা গেল হীরামণি শুক মে পন্ডিত।
চিরদিন যার আছে পৃথিবীত।।

জায়সী ইসলাম ধর্মাবলম্বী হলেও এই কাব্যে নিজধর্মের পরিচয় প্রদান বা সম্প্রদায়ের বিবরণে যাননি। কিন্তু আলাওল কয়েকটি স্থানে মুসলিম সমাজের কথা বলেছেন। জায়সীর কাব্যে আলাউদ্দীনের সঙ্গে রত্নাসেনের যুদ্ধ আরম্ভ হলে আলাউদ্দীনের হিন্দু সেনাপতিরা তাঁর পক্ষ ত্যাগ করে হিন্দু রত্নসেনের পক্ষ নেবার অনুমতি প্রার্থনা করলে আলাউদ্দীন তাতে সম্মতি দেন। কিন্তু আলাওলের কাব্যে আলাউদ্দীন হিন্দু জাতিকে মুসমানের বিশ্বাস করা কর্তব্য নয় বলেই সভয়ে হিন্দু সেনাপতির অনুমতি মঞ্জুর করেন। অবশ্য এই মনোভাব সাম্প্রদায়িক মনোভাবা পন্ন মুসলিম নকল নবীশের ও হতে পারে। এই গ্রন্থের আত্নপরিচয়েই তিনি শাহ্‌সুজা সংক্রান্ত তথ্য এবংনিজের কারাবাসের কষ্ট ভোগের কাহিনী বিবৃত করেছেন। কাব্যটির প্রথমাংশ মাগন ঠাকুরের অনুরোধে কবি রচনা করেন। তারপর তাঁর জীবনে কারাবাসের বিপর্যয় নেমে এল। প্রায় নয় বছর পর তাঁর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল। আরাকান রাজ্যের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী কাজী সৈয়দ মুসার পৃষ্ট পোষকতায় আলাওল অসমাপ্ত সয়ফুলমুলুক সমাপ্ত করেন।

এই কাব্য গ্রন্থটি রোমান্টিক প্রেমগাথা এই কাব্যে আলিফ লায়লার ছায়া থাকলেও রচনা গুনে কাব্যটি মৌলিকত্বের দাবিদার। কাব্যের নায়ক সয়ফুল মুলুক। তিনি মিশরের রাজকুমার অমাত্যপুত্র সৈয়দের সঙ্গে সয়ফুলের অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব বোস্তানেরঅন্তর্গত এক পরীরাজ্যের রাজকন্যা বদিউজ্জামাল। অপূর্ব সুন্দরী সে। সে ই এই কাহিনির নায়িকা সুন্দরী রাজকুমারীর ছবি দেখে সরফুল তার প্রেমে পাগল হয়ে যান। বন্ধু সৈয়দ সে সংবাদ সয়ফুলের পিতাকে জানায়। কিন্তু বদিউজ্জামালের পরীরাজ্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়না।শেষ পর্যন্ত নায়িকা স্বপ্নে এসে সয়ফুলকে নিজের পরিচয় দেয়। সয়ফুল বন্ধুকে নিয়ে নায়িকার দেশে যাত্রা করেন। যাত্রাপনের অলৌকিক বর্ণনা কাব্যরসকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কাব্যের শেষে উভয়ের মিলন ঘটে। মানুষ ও পরীর প্রেম

মর্ত্য ও অমর্ত্যের মিলনের এই ভাবনাটি নতুনত্বে পূর্ণ এই কাব্যটি মুসলিম সমাজে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল তা বোঝা যায় এই গ্রন্থটি বাইশটি পুনি পাওয়া যাওয়ার ফলে। রচনারীতি বা কাহিনি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। উপকাহিনির প্রধান্যে মূল কাহিনির গতি একাধিকবার শ্লথ হয়ে গিয়েছে। তবে মৌলিকত্বের ও জনপ্রিয়তার কারণে কাব্যটি সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য।

সপ্তপয়কর (হপ্তপয়কর)

১১৯৯ খিঃ ইরানি কবি নেজামি সমরকন্দ ফারসি ভাষার হপ্ত পৈকর নামে একটি কাহিনি রচনা করেন। কাহিনিটির সঙ্গে আলফা লায়লার মূল গত সাদৃশ্য রয়েছে। এখানে লোমান রাজার পুত্র বাহ্‌রাম। রাজা রাজপুত্রের জন্য সাতরঙের সাতটি উচ্চ ভবন নির্মান করেন। বাহ্‌রাম পার্শ্ববতী সাতটি রাজ্য জয় করে সেখানকার রাজকন্যাদের বিবাহ করেন এবং সাতটি উচ্চ ভবনের বাসস্থান রুপে ব্যবহার করে আনন্দে দিন অতিবাহিত করতে থাকেন। এই রানীদের কাছে বাহ্‌রাম সাত দিনে যে সাতটি গল্প শুনেছিলেন সেই গল্পের সংগ্রহই হপ্ত পয়কর গল্প গুলি খুব সহজে বর্নিত হলেও গ্রন্থটির কাব্য মূল্য খুবই নগন্য।

তোহ্‌ফা

তোহ্‌ফা শব্দের অর্থ উপহার। ফারসি তুহফাতুনসেনা নামক নীতিকথা বিষয়ক একটি কাব্য রচনা করেন শেখা ইউসুফ দেহলবী। তোহ্‌ফা পঁয়তাল্লিশ অধ্যায়ে বিভক্ত মুসলিম সমাজের নীতিকথার সংগ্রহ যেখানে ধর্ম আচার বিচার দৈনন্দিন জীবনে পালনীয় বিষয় সমূহ লিখিত রয়েছে। আলাওল কারাবাস সমাপ্তির পর ১৬৬৩-৬৪ খিঃ তুহ্‌ফাতুন অবলম্বনে তোহ্‌ফা গ্রন্থটি রচনা করেন। মুসলমান সমাজে গ্রন্থটি বিশেষ সমাদৃত হয়। অনুবাদকর্মটিও পরিচ্ছন্ন।

সেকেন্দারনামা

নেজামী সমরকন্দীর ইস্‌কান্দারনামা অবলম্বনে সৈয়দ আলাওল সেকেন্দারনামা গ্রন্থটি রচনা করেন। মূলত ইসকান্দারনামা র অনুবাদ কিন্তু কবির মৌলিক রচনাও এই কাব্য রয়েছে। আলোকজান্ডারের বিজয় কাহিনি সংক্রান্ত যে সমাপ্ত আজগুবি গল্প গড়ে উঠেছিল সেই গল্প অবলম্বনেই নেজামী ইসকান্দারনামা রচনা করেন। এই গ্রন্থে ইতিহাসের পাশাপাশি অতিরঞ্জিত কাহিনী ও সমানভাবে বর্ণিত হয়েছে। মূল কাহিনী ও আজগুবি গাল গল্প মিশ্রিত কাহিনীটি এই রুপ সেকেন্দার ফয়লকুছের (ফিরিপ) পালিত পুত্র। ফয়লকুছের রাজধানী সখদুমিয়া (ম্যাসিডোনিয়া) মিশর জয় করে সেকেন্দার ইস্‌কান্দারিয়া নগরী (আলেকজান্দ্রিরা) স্থাপন করেন। পারস্য রাজ দরায়ু (ডেরিয়াস) সেকেন্দারের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। সেকেন্দার দরায়ুর কন্যা রৌসনকে বিবাহ করেন। এরপর তিনি হিন্দুস্থান জয়ের জন্য যাত্রা করেন। সেখানাকার রাজা ভীত হয়ে তাঁর কন্যার সঙ্গে সেকেন্দারের বিবাহ দেন। সেকেন্দার এরপর চীন ও রুশ দেশ ও জয় করেন। কিছুদিন রোমে অবস্থান করে স্বদেশ ইউনানে যাত্রা করেন। এখানেই কাব্যের সমাপ্তি ঘটেছে। এই কাব্যে যুদ্ধের দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে। অনেক অলৌকিক ওমনগড়া কাহিনী গল্পের গতিরোধ করেছে। তবে অনুবাদের ভাষাটি স্বচ্ছ ও প্রাজ্ঞল, একথা অনস্বীকার্য।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

সতীময়নার শেষাংশ (লোরচন্দ্রানী)

সময়ানুক্রম অনুসারে পদ্মাবতীর পরই দৌলত কাজী রচিত সতীময়নার অবশিষ্টাংশ রচনা করেন সৈয়দ আলাওল দৌলত কাজীর মৃত্যুর পর শ্রী সুধর্মার পর আরও তিনজন রাজার রাজত্বকাল সমাপ্ত হলে রাজা চন্দ্র সুধর্মার (১৬৫২-৮৪খিঃ) প্রধান মন্ত্রী সোলেমানের পৃষ্ঠ পোষকতায় কবি আলাওল সতীময়নার অবশিষ্ট অংশটি সমাপ্ত করেন। দৌলত কাজী কাহিনিটি যে পর্যন্ত লিখে যেতে পেরেছিলেন, তারপর আলাওল রচিত অংশটি এই রূপ কুটনী রওনার কুপ্রাস্তাবে ক্ষিপ্ত হয়ে ময়না তাকে মারধর অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন। ময়নার এক সখী তাঁর দুঃখ দূর করার জন্য এক কাহিনী শোনালেনতাঁকে মূল কাহিনীর সঙ্গে এই কাহিনীটি খুবই শিথিল ভাবে যুক্ত। এই উপকাহিনিটি দীর্ঘ ও নীরস ধর্মবতী নগরীর রাজা উপেন্দ্রদেব তাঁর গর্ভবতী স্ত্রী রতন কলিকা কে কোন কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে ভেলায় করে জলে ভাসিয়ে দেন। রতনকলিকা এক বৃদ্ধ বাক্ষন পরিবারে গিয়ে উপনীত হন ও সেখানে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন। তার নাম রাখা হয় আনন্দ। আনন্দ বহু অসাধ্য সাধন করে পিতার সঙ্গে মিলিত হন এবং পিতা মাতার মিলন ঘটান। এই উপকাহিনিটির মাধ্যমে সখী ময়নাকে বোঝায় ভাগ্যের উপর নির্ভর করা ছাড়া কোনও পথ নেই। স্বামীর জন্য ধৈর্মমহকারে অপেক্ষা করাই ময়নীর একমাত্র কর্তব্য এরপর ময়না এক বাক্ষন কে লোরের কাছে প্রেরণ করলেন। বাক্ষনের শিক্ষিত সারিকার মুখে ময়নার কথা শুনে লোরের তার প্রথমা স্ত্রীর কথা স্মরনে এল। তিনি চন্দ্রানীকে নিয়ে ময়নার কাছে ফিরে এলেন। তিনজনে মুখে জীবন অতিবাহিত করলেন। লোরের মৃত্যুর পর দুই স্ত্রী সহমরনে গেলেন। এই ভাবে কাহিনীটির সমাপ্তি ঘটে।

আলাওল ও দৌলত কাজীর রচনা শক্তির প্রতিভা বিচার করলে আলাওলের কাব্য যে নিকৃষ্ট সে কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা। কৃত্রিমতা ও অকারণ আড়ম্বর তাঁর কাব্যের সহজাত ভাবটিকে নষ্ট করেছে। দৌলত কাজীর আন্তরিকতা ও সরস রচনারীতিটি হৃদয় স্পশী আলাওল কাব্যটিকে বিষাদান্তক কাব্যে পরিণত করেছেন। দৌলত কাজীর পরিকল্পনা হয়ত সেরকম ছিলনা কারণ প্রথম খন্ডের শেষে তিনি বলেছেন–

চন্দ্রানীরদেশে যদি গেলা লোরপতি
কোন কর্ম্ম করিলা এথাতে ময়নাবতী।।
ময়নাবতী রাজ্যে লোরেন্দ্র আইল পুনি।
তবে কোন উপাত্র করিলেক চন্দ্রারানী।।
কোন মতে এ তিন মিলিবে তার সঙ্গ।
কোন মতে ময়না সঙ্গে ছাতনা প্রসঙ্গ।।

" কোন মতে এ তিন মিলিতে তার সঙ্গ " – এই লাইনে মনে হচ্ছে তিন জনের মিলনেই তিনি কাব্যে সমাপ্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আলাওল লায়লা মজনুর বিষাদ স্তক পরিণতির অনুসরণে দেহত্যাগে কাব্যের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন।

প্রশ্নাবলী

১) আরাকান রাজসভার সাহিত্য বাংলা সাহিত্যকে কিভাবে সমৃদ্ধ করেছে?

২) আরাকান রাজসভার সাহিত্যকে কি ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য হিসেবে চিহ্নিত করা যায়?

৩) রোমান্টিক প্রণয়কাব্য রচয়িতা হিসেবে দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওলের সাফল্যের পরিচয় দাও।

৪) দৌলত কাজী ও আলাওলের অনদিত কাব্য অন্ধ অনুকরণ নয়, তা কবিদের স্বকীয়তা উজ্জ্বল - আলোচনা কর।

৫) আলাওলের ঘাত প্রতিঘাত পূর্ণ জীবন কিভাবে তাঁর সাহিত্যকর্মকে প্রভাবিত করেছে তা আলোচনা করুন।

৬) টীকা লেখ ঃ ক) লোরচন্দ্রাণী খ) পদ্মাবতী গ) সপ্ত পয়কর
ঘ) সয়ফুলমুলুক-বদিউন্মামাল ঙ) তোহ্‌ফা চ) সেকেন্দারনামা।

টিপ্পনী

NOTES

টিপ্পনী